অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি

সংকলন - গ্রন্থনা
তুষার ভট্টাচার্য



বাংলা চটি সিরিজ

একটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা

অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি

সংকলন-গ্রন্থনা

তুষার ভট্টাচার্য

একটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা

Aprakasita Marichjhanpi
Collection-Compilation by Tushar Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০ (আশ্বিন ১৪১৭)
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ : সায়ন করভৌমিক
আলোকচিত্র : ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক
ভিডিও অনুলিখন : দিলীপন ভট্টাচার্য

মূল্য : ২০০.০০ টাকা (ভারত)

প্রকাশক ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক, ৯/২ বলরাম বোস ঘাট রোড, কলকাতা ২৫
বর্ণায়ন সুদীপ দাস, বরাহনগর, কলকাতা-৩৬
মুদ্রক এস. এস. প্রিন্টস, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৯

বাংলায় একটু আশ্রয়ের জন্য যাঁরা
'স্বাধীনতার বলি' হয়েছেন
এবং
সব কিছু খুইয়ে আজও যারা
জীবনের স্বপ্ন দেখেন
তাঁদের উদ্দেশে

গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনার অন্যান্য বই:

অবান্তর পাঠশালা— জয়া মিত্র
এবং বাদল সরকার— অদ্রীশ বিশ্বাস
নখদন্ত— মলয় রায়চৌধুরী
অসুখ সারান— ঈপ্সিতা পালভৌমিক
অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা— মলয় রায়চৌধুরী
খেরোবাসনা— সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্য যৌনতা— সংকলন
প্রসঙ্গ ধর্ষণ— সংকলন
বাংলা কাব্যগীতির অন্য ধারা— সংকলন
আমার কারাবাস শাহবাগ এবং অন্যান্য— আসিফ মহিউদ্দীন
বর্ণসংকর—বিপুল দাস
বিশুদ্ধ নিত্যকর্মপদ্ধতি— সুমেরু মুখোপাধ্যায়
অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস— মলয় রায়চৌধুরী
অন্য মহীন অন্য ধারার গান— সংকলন
খাণ্ডবদাহন— সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
কাঠপাতার ঘর— কুলদা রায়
পেলেকার লুঙ্গী— আনোয়ার শাহাদাত
মহাভারত— শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ
কোনো এক— শ্রাবণী
কারাগার মধ্যভূমি ও স্মৃতিকথকতা— কল্লোল
আমার উন্মন বাদ্যকর— ইন্দ্রনীল ঘোষদস্তিদার
শিন্টু ধর্মাবলম্বী রাজা সবুজ ভদ্রমহিলা, একজন অভদ্র সামুকামী— আবু মুস্তাফিজ
বন্দরের সান্ধ্যভাষা— সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
লা জবাব দিল্লি— শমীক মুখোপাধ্যায়
ঘেন্নাপিত্তি— সোমনাথ রায়
আমার সত্তর— দীপ্তেন
হাম্বা— সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়
পূর্ব প্রকাশিতের পর— সুমেরু মুখোপাধ্যায়
আলোচাল— সুমন মাননা

সূচি

গুরুচণ্ডালীর পক্ষ থেকে

মানুষের নিজস্ব গড়ে তোলা সংগঠনের নাম মরিচঝাঁপি। দেশভাগ, দাঙ্গা, সহায়সম্বল হারিয়ে বাস্তুভিটে ত্যাগ করা পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের নিম্নবিত্ত মানুষ মানাক্যাম্প, দণ্ডকারণ্য ঘুরে থিতু হতে চেয়েছিলেন সুন্দরবনের প্রান্তে মরিচঝাঁপিতে। সেই অভিজ্ঞতাগুলির পুনঃপ্রকাশ তুষার ভট্টাচার্য সংকলন 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি'। মরিচঝাঁপি প্রাণ ও অধিকার হত্যার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ, কিন্তু তার পাশাপাশি মরিচঝাঁপি নিরন্ন, অনিকেত মানুষের নতুন করে গড়ে তোলার লড়াইও। পুলিশি আক্রমণের আগে ও পরে সবসময়ই উজ্জ্বল থেকেছে মরিচঝাঁপির এই লড়াইয়ের দিকটা, যেখানে যাঁরা বসতি গড়ে তুলছেন কিংবা পুলিশি জুলুমের পরে অসম আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন প্রবলতর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, যার নাম রাষ্ট্র। তুষারবাবু তথ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে এই কাজে নামেন। তিনি মরিচঝাঁপির লড়াইয়ের যে পরিসরটি দেখতে পান, তা পুলিশ প্রশাসনের অত্যাচার-গণহত্যার বাকি দলিলগুলির থেকে কিছুটা বেশ বিস্তৃত। মরিচঝাঁপির মূল প্রোথিত থাকে বাংলাদেশের মতুয়া-নমঃশূদ্র আন্দোলনে, জল হাওয়া পায় মানা ক্যাম্প-দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে। ১৯৭৮-৭৯র সরকারি নির্যাতনের পরও শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে রাখে মরিচঝাঁপি, দমদমের বস্তিতে, 'পথের শেষ' কলোনিতে এবং বাংলা কি ভারতের বহু আবাসনে। আলোকপ্রাপ্ত ভদ্রসমাজ সেদিনও মরিচঝাঁপিকে দেখতে পায় নি। তার পরেও হায়না। ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় মাঝে মাঝে বোড়ের মতন মরিচঝাঁপির নামটা এগিয়ে দেওয়া হয়, ওই অবধিই। ফলে লেখকের মতন আমরাও তাগিদ অনুভব করি, 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি'-র পুনঃপ্রকাশের। চারপাশে যখন সমাজ-সভ্যতার আরও বেশি করে একমাত্রিক হয়ে উঠছে, তখন মরিচঝাঁপির সার্থকতাকে ফিরে দেখার প্রয়োজন অনুভব করি। কীভাবে পরিস্থিতির দাবিতে অশিক্ষিত, নিম্নবর্ণের চাষী-জেলে এক হয়ে যান, কীভাবে ২০০০০-এর সুন্দরবনের নির্জন দ্বীপে জনবসতি গড়ে তোলেন, ভাটি অঞ্চলের প্রতিবেশীদের দেখে কীভাবে নোনাজলে বাঁধ দিয়ে চাষ-আবাদ, মাছচাষ শুরু করেন সেগুলো বুঝবার দরকার পড়ে

বই কি! লিপিবদ্ধ করার দরকার থাকে সেই মৌখিক ইতিহাসমূহের যা আলোচনা করে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে গড়ে তোলা এই দ্বীপের পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-চিকিৎসা এমনকী পরিবেশভাবনাও। জীবন-জীবিকার সঙ্গে কীভাবে আইডেন্টিটির প্রশ্নটি জুড়িয়ে যায় এবং বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন জেলা থেকে আসা অসংগঠিত মানুষ কীভাবে এই পুরো পদ্ধতিতে ঐক্যবদ্ধ হন আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখেও অটুট থাকেন তা খুঁজে দেখার চেষ্টা করা দরকার। প্রয়োজন মনে করি এটা বোঝারও যে কেন রাষ্ট্র, এমনকী কমিউনিস্ট নামধারী একটা পার্টির সরকারও অহিংস, অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠনের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। সরকারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা-খাওয়া-কাজ করার লড়াইয়ের ওপর যখন পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে, বাকি সমাজ নীরব থাকে কেন? এরকম অনেক প্রশ্নের আলোচনার পরিসর তৈরি করছেন সংকলক এই বইটিতে। ইতিহাসের বহুভাষ্যের দাবি মেনে সরকার পক্ষের লোকজনের সাক্ষাৎকারও রাখা হয়েছে। আইনি লড়াই এবং তার পর্যালোচনাও রাখা হয়েছে, আইনের চোখের সামনে কীভাবে মানবাধিকার লুণ্ঠিত হতে পারে তা দেখে নিতে। পূর্ণাঙ্গ আকারে বইটি ইতিহাসের একটি দলিল হয়ে থাকবে এ আমাদের প্রত্যাশা। মরিচঝাঁপির লড়াইকে ঘিরে দেখতে হবে বারবার।

সোমনাথ রায়

প্রথম প্রকাশনার পর যা ঘটেছে, ঘটছে

'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি' আত্মপ্রকাশের পর রাজ্য ও কেন্দ্রে সরকারের পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটেনি মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের জীবনে। বামফ্রন্ট সরকার 'উদ্বাস্তু' হাতিয়ার করে ক্ষমতায় এসেছিল, তারাই মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের শায়েস্তা করেছিল বন্দুকের নলে উদ্বাস্তু হত্যা করে। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের ইস্যুর পাশে 'মরিচঝাঁপি'ও ইস্যু হয়েছিল 'পরিবর্তনের' পক্ষে। তৃণমূল পার্টি মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে সভা-সমিতি করেছেন, সরকার পরিবর্তন হলে 'মরিচঝাঁপিতে' হত্যাকারীদের বিচারের এবং পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন রাজভবনে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হলে, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের স্বপ্ন তারা দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হতে বেশি সময় নিল না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবর্তনের পর এই প্রতিবেদক সহ তিনজন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতা মহাকরণের ডাক পেয়ে দুই মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। পশ্চিমবঙ্গে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বসবাসকারীদের সংখ্যা বিস্তারিত জানাতে বললেন এবং যতো শীঘ্র সম্ভব তারা পুনর্বাসন পাবেন— এই আশার কথা শুনে তারা ফিরে এলেন। ঝড়-জল উপেক্ষা করে অর্থব্যয় করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের খুঁজে বার করে দু দফায় সরকারকে জমা দিলেন নাম-ঠিকানা। এরপর উদ্বাস্তুদের নিয়ে টালবাহানা। তারা একবার দেখা করতে চাইলন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। হল না। বরং বলা হল 'তোমাদের কাগজপত্র সব হারিয়ে ফেলেছ, তাই তদন্ত হবে না।' আর পুনর্বাসন নিয়ে সবাই কুলুপ আটলেন।

নরেন্দ্র মোদি ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে গেলেন— 'উদ্বাস্তুদের ফিরে যেতে হবে।' উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে রাজনানা সহ অন্যান্য নেতাদের পাঠিয়ে প্রলেপ দেবার চেষ্টা করলেন, 'আজকেও যেসব হিন্দুরা ভারতে আসবেন তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।'

২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছিল বিজেপি সরকার। তাতে উদ্বাস্তুদের উৎখাত করার কৌশলটি সযত্নে উল্লেখ ছিল। উদ্বাস্তু সংগঠনগুলো বারবার সংশোধিত আইন নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। সরকার গড়ার পর দেখা গেল উদ্বাস্তুরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথের সঙ্গে দেখা করেছেন। উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সভায় বিজেপির মন্ত্রী, এম.এল.এ., এম.পি.রা সভা আলোকিত করে প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। এবং দলে দলে উদ্বাস্তুরা বিজেপির পক্ষেই হাত তুলেছেন। ভিন রাজ্যের এক রাজ্যস্তরের উদ্বাস্তু সংগঠক জানালেন, 'বিজেপি মুসলমানদের তাড়াবে,

হিন্দুদের নয়।' দেশভাগের পর সরাসরি আঞ্চলিকভাবে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সফলভাবে রূপায়িত করার দায়িত্বে ছিলিন যাঁরা, অর্থাৎ নেহেরু-লিয়াকত-মাউন্টব্যাটেন, তাঁরা মজা দেখেছিলেন। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় চিরস্থায়ী শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যবাদী খেলাটা এদের মাথায় ঢুকল না। প্রবল হিন্দুত্ববাদ আর জাতীয়তাবাদের ধ্বজা তুলে নতুন খেলা শুরু হল। মূল উদ্দেশ্য হল বাজার অর্থনীতিকে সামনে রেখে কৃষক-শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকারগুলো কেড়ে নিয়ে বিদেশি পুঁজির কাছে সমর্পণ করা।

প্রবল আন্দোলন ছাড়া উদ্বাস্তু সমস্যা কেন, সাধারণ মানুষেরই সমস্যার কোন সমাধান রাজ্য-কেন্দ্র, কোনো সরকার আর করবে না। এদের অধিকার থাকবে শুধু ভোটের বাক্সে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে বসানো। যারা প্রকৃতপক্ষে পুঁজির পক্ষে ওকালতি করবে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে নয়। পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন পাওয়া বাঙালি উদ্বাস্তু, যারা গুছিয়ে নিয়েছেন— তারা অনেকেই খাতায় কলমে উদ্বাস্তুদের নিয়ে মায়া কান্না কাঁদছেন, সংগঠন করেছেন, প্রচার পুস্তিকা ছাপছেন অথচ চিরস্থায়ী সমস্যা নিয়ে কেউ এগিয়ে আসছেন না। তারা খবর রাখেন না পশ্চিমবঙ্গের বাইরের ১৮টি রাজ্যে যেখানে বাঙালিদের ঠাঁই দেওয়া হয়েছে তাদের কথা। ঘোষিত দণ্ডকারণ্যের কথা অনেকেই জানেন কিন্তু যে সমস্ত রাজ্য দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট-এ যেতে চাননি সেইসব রাজ্য এবং দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট বন্ধ হয়ে যাবার পর কীভাবে বাঙালিদের রাখা হয়েছে তার খবর তারা রাখেন না বা রাখতে চাননা। হাতে গোনা গুটি কয়েকজন ব্যক্তিগত উদোগে খোঁজখবরের চেষ্টা করছেন। তারা আড়ালে আত্মপ্রচার করছেন, না আন্তরিকভাবে উদ্বাস্তুদের পাশে আছেন— তাদের কর্মপদ্ধতির দিকে নজর করলে সন্দেহ থেকেই যায়।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলা ভাষা শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাগরিকত্বের অধিকারের জন্য আন্দোলন— নতুন পর্যায়ে শুরু হয়েছে। এই সংগঠিত আন্দোলনের খবর স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রথম পাতার খবর হলেও পশ্চিমবঙ্গের সংবাদ মাধ্যম সেখান থেকে দূরে থেকেছে। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের রাজ্যগুলিতে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি। উদ্বাস্তু নিয়ে এই বঙ্গের সংবাদমাধ্যম যে খুব সোচ্চার তাও নয়। গত ২৪ অক্টোবর ২০১৪-য় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় রাস্তা তৈরির জন্য উদ্‌বাস্তুদের অধিকৃত জমি থেকে উৎখাতের অভিযান যে উদ্‌বাস্তুরা রুখে দিলেন সে খবর একটি সংবাদপত্র ছাড়া আর কেউ প্রচারের আলোয় আনল না।

স্বাধীনতার পর প্রথম উদ্বাস্তু বাঙালিরা দিল্লির যন্তর-মন্তরে অবস্থান করলেন তাদের দাবি নিয়ে। গত ২১, ২২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে অবস্থানের পরদিন তারা বিরাট মিছিল পরিচালনা করেন। অবস্থানে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন প্রদেশের উদ্বাস্তু নেতারা। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন 'নিখিল ভারত বাঙ্গালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি'। ২৫ মার্চ ২০১২ গুয়াহাটি শহরে প্রথম উদ্বাস্তুরা বিশাল সমাবেশ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আসামে ভোটার পরিচয়পত্রে 'D Voter' হিসাবে উল্লেখ থাকে বেশিরভাগ বাঙালি উদ্বাস্তুদের নামে। 'D' অর্থাৎ Doubtful বা সন্দেহজনক। আসামে ৭০ লক্ষ হিন্দু, ৮০ লক্ষ মুসলিম বাঙালির বসবাস। এই সভায় নাগরিকত্ব আইন বদলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সব দলের নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। উদ্বাস্তু বাঙালিদের এই সভার সংবাদ স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রথম পাতার মুখ্য খবর হয়েছিল।

বাংলা ভাষা শিক্ষার দাবিতে ৪২ বছর লড়াই চালিয়ে আসছিলেন কর্ণাটকের ৫টি বাঙালি উদ্বাস্তু কলোনীর ২৫ হাজার পরিবার। তারা দাবি আদায় করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় ভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষা পড়বার অধিকারের দাবি। গত ১ মে ২০১১ তারিখে বিজয় উৎসব পালিত হল। কিছুদিন আগে বাংলা ভাষা স্কুলে পড়াবার দাবি নিয়ে ছত্তিশগড়ের বাঙ্কের জেলায় পাখানজোড়ে ১১৭টি গ্রামের বাঙালি উদ্বাস্তুরা অনশন শুরু করেন। সরকার তাদের দাবি মেনে সার্ভে শুরু করেছে।

উত্তরপ্রদেশে দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে তপশিলি জাতির পরিচয়পত্র দেবার দাবি মেনে তালিকাভুক্ত করার কাজ সরকার শুরু করেছে। কর্ণাটকে ৫০০০ ভূমিহীন বাঙালি উদ্বাস্তু পরিবারকে জমি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মহারাষ্ট্রে বাঙালি উদ্বাস্তুরা অর্থের অভাবে তাদের জমি রেজেস্ট্রি করতে পারছিলেন না। আন্দোলনের ফলে সরকার বাধ্য হয় ফি মকুব করতে। ফি মকুবের পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা।

উড়িষ্যার মালকানগিরি জেলা শহরের বাজার ও ২৬টি বাঙালি পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়াতে উদ্বাস্তুরা লাগাতার আন্দোলন শুরু করেছেন। সম্প্রতি আসামের মরিগাঁও ও কর্ণাটকের রায়চুরে উদ্বাস্তু মহিলাদের উপর সংগঠিত বলাৎকারের ঘটনায় উদ্বাস্তুর বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার তখন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।

মধ্যপ্রদেশের চোকনায় আছে ১৫০ উদ্বাস্তু গ্রাম। সেখানে বাংলা ভাষা পড়াবার দাবি চলছিল দীর্ঘদিন। মধ্যপ্রদেশ সরকার উদ্বাস্তুদের দাবি মেনে কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ শুরু করেছেন এবং সার্ভে শুরু হয়েছে। ১৮টি প্রদেশের বাঙালি উদ্বাস্তুরা প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আন্দোলনগুলির মুখ্য দাবি হল:

১. 'নাগরিকত্ব আইন ২০০৩'-এর সংশোধন করা।

২. ছিন্নমূল বাঙালিদের তফশিলি স্বীকৃতি।

৩. জমির মালিকানা অর্জন করা।

৪. মাতৃভাষা শিক্ষার অধিকার, উচ্চশিক্ষা ও জীবিকামুখী শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা।

৫. বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধন করা, তাদের সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশে সাহায্য করা।

বহু উদ্বাস্তু সংগঠন খাতায় কলমে থাকলেও বর্তমানে মৌলিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করা ও বিজয় লাভের দিশা দেখাচ্ছে 'নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি'। এই সংগঠনের সভাপতি সুবোধ বিশ্বাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে, সাংগঠনিক ক্ষমতায় আন্দোলনকে এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছেন, উদ্বাস্তুদের মধ্যে আশা জাগিয়েছেন, স্বপ্নকে সার্থক করার দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন।

'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি' প্রথম প্রকাশের পর মরিচঝাঁপিতে আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সতীশ মণ্ডল, অরবিন্দ মিস্ত্রি ও পবিত্র বিশ্বাসকে হারিয়েছি, হারিয়েছি উদ্বাস্তু সংগঠক সুব্রত চ্যাটার্জিকে। নিঃসন্তান পবিত্র বারাসতের রেল লাইনের পাশে ঝুপড়িতে থাকতেন। স্ত্রী এখন অন্যের বাসায় কাজ করে জীবিকা অর্জন করছেন। এই প্রতিবেদক তৃতীয়বার উড়িয্যার মালকানগিরিতে দেখে এসেছিলেন মরিচঝাঁপি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালিকে। তখন তিনি অসুস্থ। এখন প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায় অভাবের ঘেরাটোপে দিন কাটাচ্ছেন।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা অনেকেই করেছিলেন, কিন্তু গুরুচণ্ডালীর ঈপ্সিতা পাল চৌধুরীর একান্ত আগ্রহে সংকলনটি প্রকাশিত হচ্ছে। সংকলনে যুক্ত হল উদ্বাস্তু নেতা বীরেন বিশ্বাসের মরিচঝাঁপির লেখার অংশ।

'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি' বইটির অসংখ্য সমালোচনা প্রকাশিত হলেও একটি মর্মস্পর্শী সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছে, লিখেছেন শ্রদ্ধেয়া মীরাতুন নাহার। পরিশেষে লিখতে হয়— স্বাধীনতা যাদের পরাধীন করেছে, যারা অখণ্ড ভারতের অধিবাসী, তারা আর কতবার উৎখাত হবেন, কতবার তাদের শিল্প সংস্কৃতি জাতিসত্ত্বার অধিকার কেড়ে নিয়ে জন্তু জানোয়ারের মতো চাবুক নিয়ে তাড়া করবেন মহামান্য রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারকেরা? আসলে যাদের কুকুর বেড়ালের মতো ভারতের দুর্গম অঞ্চলে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তারা সবাই নিম্নবর্গের মানুষ। তাদের নিয়ে যা খুশি তাই করা যায়। তাদের নিয়ে যা খুশি তাই করা যায়। তাই আজও স্থায়ী একটা ঠিকানার আশায় ছুটে বেড়াচ্ছেন নেতা-নেত্রীদের দোরে দোরে, ভারতের নানা প্রান্তে। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে শুধুমাত্র জল আর খাদ্যের জন্য বামফ্রন্ট তথা জ্যোতি বসুর পুলিশ গুলি করে মারে অসংখ্য উদ্বাস্তুকে। তারই স্মরণে 'মরিচঝাঁপি দিবস'-এর প্রথম স্মরণসভা 'ভারত সভা হলে' ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়, তখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-এর গোয়েন্দা পুলিশ তার ভিডিও রেকর্ড করে রাখে। গত ২০১৪র ৩১ জানুয়ারি আবার কোলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হবার কথা হলেও পুলিশ বারংবার স্থান পরিবর্তন করে ওয়াই চ্যানেলে অনুমতি মেলে শেষ মুহূর্তে— তখন বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন উদ্বাস্তুরা। পরিবর্তিত সরকারের পুলিশের প্রশ্নবাণে পূর্ণতা পেল না 'স্মরণ সভা'। আমরা আবারও অপেক্ষা করবো— নতুন কী খেলা উদ্বাস্তুদের জন্যে অপেক্ষা করছে!

তুষার ভট্টাচার্য

কৃতজ্ঞতা

৩ বছর মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্রের জন্য তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে যতো মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁদের সকলের নাম মনে রাখতে পারিনি, লিখে রাখাও সম্ভব হয়নি। 'মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ আক্রান্ত মানবিকতা' তথ্যচিত্রে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি এই সংকলনে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করছি না। ২০০৮-এর পরও তথ্যানুসন্ধান থেমে থাকেনি, থেমে থাকেও না।

ভিডিও রেকর্ডে সাক্ষাৎকার থেকে বইয়ের পাতায় নিয়ে আসা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সাড়ে তিন মিনিট থেকে পাঁচ মিনিটের সাক্ষাৎকার দেখে-শুনে লিখতে সময় লাগে গড়ে এক ঘণ্টা। প্রায় আড়াই মাস ধরে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৬ ঘণ্টা নিরলসভাবে ৪৬ ঘণ্টার নির্বাচিত অংশের প্রাথমিক ভিডিও অনুলিখনের কাজটি করেছেন দিলীপন ভট্টাচার্য।

দিগন্ত মুখার্জি, 'মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ আক্রান্ত মানবিকতা' তথ্যচিত্রের আবহসংগীত ও সম্পাদনার কারিগর। 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি'র প্রচ্ছদ, দলিল ও সমস্ত ছবির অলংকরণের কাজটি করেছে দিগন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে। সহযোগিতায় ছিল রুবেল বর্ধন।

বই ছাপার ব্যাপারে নিতাই জানার পরামর্শ ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিতাই যোগাযোগ করিয়ে দেয় সেলিম মল্লিকের সাথে। সেলিমের পরামর্শ, সংকলন প্রকাশনার ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয় খোঁজখবর করতে সাহায্য করেছে। সুদীপ দাস ডিটিপি-তে কোন অক্ষর দিয়ে, কেমনভাবে সাজালে বইয়ের সৌন্দর্য বাড়বে, সেটাও নিজেই ঠিক করেছে। সময় ও দায়িত্ববোধ সুদীপের কাছ থেকে শিখে নিতে হয়।

'লণ্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস'-এর গবেষক অনু জালে বই লেখার ব্যাপারটা প্রথম আমার মাথায় ঢোকায়। অজস্র তথ্য ও ছবি সংগ্রহ দেখে অনুর ইচ্ছে প্রকাশ। অনু ১৯ মাস সুন্দরবন কাটিয়েছে, দণ্ডকারণ্যতে গেছে গবেষণার কাজে। ঠিক ছিল দুজনেই আরও কিছুদিন কাজ করে ইংরাজিতে বই প্রকাশ করবো। দিল্লি থেকে প্রকাশক এলেন, কথাও বললেন। কিন্তু অনু গবেষণার কাজে লণ্ডন, এরপর আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাবার জন্য সেই পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে।

'মরিচঝাঁপি : নৈঃশব্দের অন্তরালে'র লেখক জগদীশচন্দ্র মণ্ডল এবং 'মরিচঝাঁপির কান্না'র লেখক শিবনাথ চৌধুরী হচ্ছেন আমার অভিভাবক। যে কোনো সমস্যা যখনই

হাজির করেছি, তখনই ওরা আন্তরিকতার সঙ্গে তা সমাধান করেছেন। অসুবিধেগুলো হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছেন। আমার তথ্যচিত্রের তথ্যানুসন্ধান করার ক্ষেত্রে ওদের বই ছিল মাইল স্টোন। সেই সাথে ওদের সংগৃহীত সমস্ত তথ্য আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে আমি নিয়মিত জাতীয় গ্রন্থাগারে যেতে পারতাম না। আমার হয়ে দিনের পর দিন নীরবে কাজটি করে দিয়েছেন জগদীশদা। শিবনাথ চৌধুরী, শিবুদার আক্ষেপ ছিল মফস্বলের লেখক-গবেষকরা কোলকাতায় ব্রাত্য, সেটা যে সঠিক নয় তার বেশ কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থের জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ। শিবুদা 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি' গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন এটাই বড় প্রাপ্তি।

মেদিনীপুরের চপল ভট্টাচার্য, 'ঐক্য' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশংকর সরকার ; সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছিলেন। দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মানস ঘোষ, সাংবাদিক সুকুমার মিত্র আমার কাজের উৎসাহদাতা। সাংবাদিক রুদ্রদেব মিত্রের অনেক মূল্যবান পরামর্শ প্রকাশনার কাজে সহায়তা যুগিয়েছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল মরিচঝাঁপির তথ্যানুসন্ধানের কাজে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেও শারীরিক কারণে শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আমার কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করেন আমার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার পরিধি ছাড়িয়ে। আর একজন মানুষ যাকে যখন তখন ডাকলেই কাছে পাওয়া যায় তিনি হলেন অধ্যাপক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত। গায়ক নচিকেতার আগ্রহ এবং কর্তব্যবোধ ওর ভেতরেই আছে। কাজটা ব্যক্তিগত নয় সে উপলব্ধি আছে বলেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে নচিকেতা এগিয়ে এসেছে। দিল্লির 'মেইনষ্ট্রিম' পত্রিকার সম্পাদক সুমিত চক্রবর্তী, সাংবাদিক উদয়ন নাম্বুদিরি, মানবাধিকার কর্মী রবি হিমাদ্রি, বিপিন, তথ্যচিত্র নির্মাতা ঝর্ণা সিং— এদের সহযোগিতা কোনো শব্দ দিয়ে সাজানো যাবে না।

বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের ফণিগোপাল ভট্টাচার্য আমার সমস্যার সমাধানের পথ বাতলে দেন প্রয়োজনীয় মুহূর্তে। আমি নিজেও শ্রমজীবী পরিবারের একজন সদস্য। আমাদের পরিবারে সুব্রত, গৌতম, সমীরদাকে মনে রাখতে হয় সব সময়।

তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন মরিচঝাঁপিতে নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালী এবং তাঁর সংগ্রামী স্ত্রী তরুবালা মণ্ডল, মরিচঝাঁপির যুবনেতা দেবব্রত বিশ্বাস, ওর ডাইরি, সংগ্রহ করা ছবি তুলে দিয়েছেন। মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু পক্ষের আইনজীবী শাক্য সেন মরিচঝাঁপি নিয়ে মামলার নথিপত্র, ছবি তুলে দিয়েছেন। সেই সব ছবি গ্রহীতার নাম এখনো জানা যায়নি। ১৯৭৯ সালে উদ্বাস্তু উৎখাত হবার পর উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল, অরবিন্দ মিস্ত্রী এবং রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের টেপ রেকর্ডারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন নকুল মল্লিক। সুভাষচন্দ্র তরফদার দণ্ডকারণ্যের সমস্ত তথ্যসূত্র জুগিয়েছেন। দণ্ডকারণ্যর প্রথম যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন পরিমল বৈদ্য। সেই যাত্রায় সুনীল বিশ্বাসকে ভোলা যাবে না। ওর ব্যবস্থাপনায় ৮২নং গ্রাম পর্যন্ত

যেতে পেরেছিলাম। দণ্ডকারণ্যে দ্বিতীয়বার যাত্রায়, শিক্ষক মিহির বিশ্বাস ও তার স্ত্রী বেবী বিশ্বাসের আতিথেয়তা এবং সঙ্গী হওয়াতে অনেক কাজ সহজ হয়েছে সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালের অরুণ সেন অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও রায়পুর, বিলাসপুর, মানা, ইন্দোর, সুন্দরবনের গোসাবা, কুমিরমারি, মরিচঝাঁপি, মোল্লাখালির সঙ্গী ছিলেন। দ্বিতীয়বার কুমিরমারিতে যোগাযোগ করিয়ে দেবার সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন আর এস পি-র দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় অশোক চৌধুরী কুমিরমারিতে সমস্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন প্রফুল্ল মণ্ডল। চরম অসুবিধের সময় প্রণব ঘোষ ও বিনয় বিশ্বাসের সহযোগিতা ভোলার নয়। কুমিরমারি, দণ্ডকারণ্য, মানাতে বহু মানুষ সহযোগিতা করেছেন। মানাতে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন প্রয়াত রাইহরণ বাড়ৈ-এর পরিবারের সদস্যরা। সঞ্জয় মিত্র মরিচঝাঁপিতে তার তোলা ছবিগুলি দিয়েছেন, প্রতিনিয়ত সঙ্গে থেকেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা তাদের প্রতিও, সমগ্র দণ্ডকারণ্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও আমাকে যারা ঠিকানা দেননি, যারা জাতি বিদ্বেষ তৈরি করে কাজ করতে বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন। দণ্ডকারণ্যে যোগাযোগের পর যারা প্রচার করেছিলেন আমি সমস্ত তথ্য বিদেশে বিক্রি করেছি কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে। আমাকে যেন কোনো তথ্য না দেওয়া হয়।

প্রায় ৩ বছর ধরে তথ্যচিত্রের জন্য ৪০ ঘণ্টার ছবি তোলা হয়। প্রাথমিক সম্পাদনায় ২ ঘণ্টা করা হয়। এরপর ২ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা ৭ মিনিট ২১ সেকেন্ডে আনা হয়। তখন নাম দেওয়া হয় 'মরিচঝাঁপি ফিরে দেখা'। কয়েকজন সুহৃদকে ছবিটি দেখতে দেওয়া হয় মতামতের জন্য। যেহেতু ছবিটি চূড়ান্ত সম্পাদিত হয়নি, স্বভাবতই পরিচালকের নাম ছবিতে ছিল না। ইতোমধ্যে 'কোলকাতা টিভি' ছবিটা প্রদর্শনের অনুমোদন পায়। তখন তথ্যচিত্রটি নতুন করে সম্পাদনা করে ১ ঘণ্টায় আনা হয়। নাম দেওয়া হয় 'মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ আক্রান্ত মানবিকতা'। চূড়ান্ত সম্পাদিত তথ্যচিত্রটি ২৪ ও ৩১ জুলাই ২০০৮-এ সন্ধ্যায় এবং গভীর রাতে কয়েকবার প্রদর্শিত হয় 'কোলকাতা টিভি'তে।

এরপর দেখা গেল 'মরিচঝাপি ফিরে দেখা', যা চূড়ান্ত সম্পাদিত নয়, ছবিটি বাজারে এবং সভাসমিতিতে বিক্রি হচ্ছে ১৫০/২০০ টাকায় 'সৌজন্যে কোলকাতা টিভি'র নাম ছাপিয়ে। অথচ 'কোলকাতা টিভি'তে 'মরিচঝাঁপি ফিরে দেখা' ছবিটি প্রদর্শিত হয়নি। দুটি সভাতে এই নকল সিডি বিক্রির ছবি আমরা তুলে রাখি। পরিচালক হিসাবেও অন্য নাম প্রচারিত হয়।

আখের গোছানোর জন্য, কৃত্রিম আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যারা এই জঘন্য পন্থা নিতে পারেন, সেই সব অর্থলোলুপ, শঠ, প্রতারকদেরও ধন্যবাদ।

পাঠক এবং তথ্যচিত্রের দর্শককে জানিয়ে রাখা দরকার, 'মরিচঝাঁপি তথ্যচিত্র'

নিয়ে কারোও সাথে কোনোরকম চুক্তি হয়নি পরিচালকের সঙ্গে। 'কোলকাতা টিভি' 'মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ আক্রান্ত মানবিকতা'র প্রচারে Exclusive বললেও তারা পরিচালককে একটি পয়সাও দেননি এবং ছবি তৈরির খরচও বহন করেন নি। প্রসঙ্গত জানাই আমার অজান্তে 'নিউজ টাইম' টি ভি চ্যানেলে গত ১৮ জুলাই ২০১০ 'মরিচঝাঁপি তথ্যচিত্রের' অংশ দেখানো হয়। অন্যদিকে 'ই টি ভি বাংলা'তে 'মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ আক্রান্ত মানবিকতা' গত ১৫, ১৬, ১৭ আগস্ট ২০১০-এ সম্প্রচার করা হয়। 'ই টি ভি বাংলা' কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করে সুবীর চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ— তারা জানেন তথ্যচিত্রের পরিচালককে কিভাবে সম্মান জানাতে হয়।

ধন্যবাদ তো তাদেরও দিতে হয়, দণ্ডকারণ্য থেকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাবার পর পশ্চিমবঙ্গে যারা দলিতদের স্বার্থে গলা ফাটান— তারা তাদের সতীর্থদের কাছ থেকে দণ্ডকারণ্যের টেলিফোন নম্বর নিয়ে ক্রমাগত আমার নামে কুৎসা করেছেন আমাকে যেন সেখানে ঢুকতে না দেওয়া হয়। এতে করে দণ্ডকারণ্যের শ্রমজীবী মানুষের সাথে একাত্মটা আরও গভীর হয়, তৈরি হয় হৃদয়ের এক অভিন্ন ভাষা।

'মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ আক্রান্ত মানবিকতা' ও তার ইংরাজি 'Marichjhanpi 1978-79 Tortured Humanity' তৈরি হবার পর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা গোষ্ঠীর সাংবাদিক পলাশ বিশ্বাসের উদ্যোগে হিন্দীতে এটি তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তিনি যোগাযোগ করেন বোম্বের বামন মিশ্রমের সাথে। এরপর তিনি কোলকাতায় এলেন, আলোচনা হোল সেই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জগদীশ মণ্ডল। পরবর্তীতে বামন মিশ্রম কোলকাতায় এলেন চুক্তি করতে। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল, তিনি এলেন না। পরে পলাশ বিশ্বাসের কাছে জানলাম হিন্দি তথ্যচিত্রটি যাতে না হতে পারে একটি বিশেষ গোষ্ঠী তাকে বুঝিয়েছেন। ইতোমধ্যেই পলাশ বিশ্বাস ও তার স্ত্রী সবিতা বিশ্বাস দিনের পর দিন স্টুডিওতে অনুবাদ ও ধারাভাষ্যের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এদের কাছে আমি লজ্জিত।

কিছু চতুর মানুষ আছেন যারা অন্যের পরিশ্রমের ফসলকে নিজেদের বলে চালাতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, কেননা তারা মানুষের সততা, বিশ্বাস, সরলতা ও বিনয়কে 'চরম বোকামী' হিসাবে ঠাওরান। সম্প্রতি 'মরিচঝাঁপি, ছিন্ন দেশ ছিন্ন ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমার একটি প্রকাশিত লেখাও ছাপা হয়েছে। সম্পাদক মধুময় পাল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন অধ্যাপক সুনন্দ সান্যালের মাধ্যমে। কিছু লেখা চান। আমি উৎসাহিত হয়ে রস মল্লিক, অন্নু জালে, ঝিনুক চক্রবর্তীর লেখা, বিধানসভায় জ্যোতি বসুর বক্তৃতা ও প্রফুল্ল মণ্ডলের সাক্ষাৎকার সম্পাদকের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। এরপর গাঙচিল থেকে এলেন অধীর বিশ্বাস। তিনি ঐ সংকলনের প্রচ্ছদের জন্য ২টি ছবি চাইলেন। আমি ৮টি ছবির মধ্যে ২টি ছবি বেছে নিতে বললাম। উনি ২টি ছবি নির্বাচন করে 'পরে ফেরত দেবেন বলে' সব কটি নিয়ে

যান। পরে টেলিফোন করে জানালেন ৮টি ছবিই ওরা ছাপাবেন। আপত্তি করার কারণ নেই। কেননা এই ৮টি ছবিই ব্যবহার করা হয়েছে তথ্যচিত্রে। সৌজন্যতা জানিয়ে ছবিগুলি প্রকাশ করেছে 'দৈনিক স্টেটসম্যান', 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'ইন্ডিয়া টুডে' ছাড়াও বহু পত্র-পত্রিকায় ও ওয়েভ ম্যাগাজিনে। 'মরিচঝাঁপি, ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস' হাতে আসার পর দেখলাম ২য় পাতায় 'প্রচ্ছদ অলংকরণ' এবং Inside back cover-এ লেখা হল 'প্রচ্ছদপট : বিপুল গুহ'র নাম।

এদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, এই কারণে এরা 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি' দ্রুত প্রকাশ করার প্রেরণা।

বই বাঁধাই, ছাপার কাজ, কভার ছাপাই এবং ফিল্ম প্রসেসিং-এর কাজ যারা করেছেন কারো সাথে পরিচয় নেই। সকলেই তো অংশীদার 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপির'।

আমার মেয়ে তিস্তা ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি লেখার সাথে ছবি তোলা, গান করা, বই পড়া ওর নেশা। তিস্তা আমার লেখার পাতাতে মাঝে মাঝেই চোখ বুলিয়ে যায়। তিস্তার ন্যায্য আবদারের অধিকার কখনই প্রকাশও করেনি আমার ব্যস্ততা দেখে।

অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে

মরিচঝাঁপি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-লেখক-প্রশাসক-গবেষকদের বহু রচনা, বহু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সে সব প্রকাশিত লেখা 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি'তে থাকছে না কেবল দুটি লেখা ছাড়া। লেখা দুটি কুমিরমারি পঞ্চায়েত প্রধান প্রফুল্ল মণ্ডলের সাক্ষাৎকার এবং ঝিনুক চক্রবর্তীর লেখা। প্রয়োজনের দাবিতে আবার তা রাখতে হোল।

বহু প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলের মূল লেখাগুলিকে উদ্ধার করলেও সে সব ২০০২-এ প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র মণ্ডল এবং ২০০৪-এ প্রকাশিত শিবনাথ চৌধুরীর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে, তা নতুন করে ছাপানো হোল না।

গবেষকের কাজ সাক্ষী-সাবুদসহ তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা থেকে নিটোল কাহিনি বুনন। 'কাহিনির গল্প সত্য' হলেও 'গল্পের কাহিনি সত্য' হয়না। তাতে উপস্থাপকের প্রলেপ পড়ে সত্যের উপর। 'স্বাধীনতার বলি' হওয়া অপমানিত, প্রতারিত ও জন্মভূমি থেকে উৎখাত হওয়া ছিন্নমূল মানুষগুলোর নিজস্ব উপলব্ধি, নিজস্ব ভাবনা, অভিযোগের, অভিমানের কথা সরাসরি প্রকাশ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে এই সংকলন।

এই সংকলনে ৩০ জন মরিচঝাঁপির আহত এবং আক্রান্ত উদ্বাস্তুদের লেখা এবং সাক্ষাৎকার থাকছে। এছাড়া ২২ জনের লেখা আছে। মানচিত্র, দলিল ও ছবি আছে মোট ৫৯টি। যারা লিখেছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তাদের ৩৭ জনের ছবি আছে। বেশ কয়েকটি ছবি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

শাক্য সেন কোলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মরিচঝাঁপি তদন্তে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখায় অবিশ্বাস্য সব বর্ণনা উঠে এসেছে। সৌমেন গুহ লিখেছেন মরিচঝাঁপির মামলা নিয়ে। এই প্রথম মরিচঝাঁপি মামলার বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রকাশিত হোল।

জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের মরিচঝাঁপি নিয়ে লেখা বইয়ের সমালোচনা লিখেছিলেন শৈলেন চক্রবর্তী ঝিনুক চক্রবর্তী ছদ্মনামে। লেখাটি নিষিদ্ধ হয় পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর মুখপত্র 'পুস্তকমেলা'য় ২০০২ সালে। শৈলেন নিষিদ্ধ লেখার উপর আলোকপাত করেছেন 'আইটেম মরিচঝাঁপি'তে।

আলপনা বিশ্বাস শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জানতে সরাসরি হাজির হয়েছিলেন দণ্ডকে। মরিচঝাঁপি, নেতাজীনগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালী এবং তার স্ত্রী তরুবালা মণ্ডলের সাক্ষাৎকার এবং তথ্যের ভিত্তিতে লিখেছেন 'নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠ, মরিচঝাঁপি'।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রথম জানিয়েছিলেন মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বনাঞ্চল নয় এবং

তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন মরিচঝাঁপির ঐতিহাসিক দাবীদার এরাই। তার অমূল্য সাক্ষাৎকারটি রাখা হয়েছে।

দীনবন্ধু মণ্ডল, ভবসিন্ধু মণ্ডল ছিল পুলিশের ভাড়া করা গুণ্ডা। ওদের স্বীকারোক্তি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে উদ্বাস্তুদের ওপর অত্যাচার কোন পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

উদ্বাস্তুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল কুমিরমারির স্থানীয় মানুষের, তাদের সাক্ষাৎকার যেমন থাকছে সেই সাথে রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকার থাকছে যারা সরাসরি মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা অত্যাচারের যে সব বর্ণনা করেছেন তার চরিত্র সব একই রকম। তাই নির্দিষ্ট কয়েকজনকে বাছাই করে তাদের সাক্ষাৎকার রাখতে হয়েছে।

নিরঞ্জন হালদার, সাংবাদিক-মানবাধিকার কর্মী, উপরন্তু নিপীড়িত মানুষের সংগঠক, তার সাক্ষাৎকার রাখলাম।

বামফ্রন্টের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ ও রাম চ্যাটার্জি দণ্ডক ঘুরে আসার পরই উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি সতীশ মণ্ডল ২২ জানুয়ারি ১৯৭৮-এ এক চিঠিতে সুন্দরবনে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন। সেই চিঠি এবং মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু উৎখাতের পর ২৫ মে ১৯৭৯ তারিখের একটি চিঠি প্রকাশিত হল।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু যুব নেতা দেবব্রত বিশ্বাসের ডাইরি একটি অমূল্য সম্পদ। দুটি পৃষ্ঠা প্রকাশ করা হল।

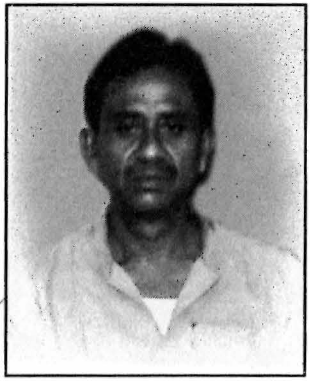
মরিচঝাঁপির যে সব তথ্য এবং দলিল সংগ্রহ করতে পেরেছি তার পাঁচ শতাংশ প্রকাশিত হোল, অনেক ছবিও প্রকাশ করা গেল না।

যে কোনো কাজ করতে গেলেই ভুল হয়। এই সংকলনে যদি কোনো ভুল আবিষ্কৃত হয় সেটা 'সচেতন ভুল নয়, অবচেতন ভুল', সেই ভুল স্বীকারের মানসিকতা নিয়েই সংকলনে হাত দেওয়া।

আমি সাহিত্যিক-গবেষক-লেখক নই, মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্র করতে গিয়ে যা জেনেছি, দেখেছি, শুনেছি, পেয়েছি তার একটা অংশ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়ে আগ্রহী পাঠকের কাছে পৌছোবার এই প্রচেষ্টা। অজস্র মূল্যবান যে সমস্ত তথ্য, দলিল প্রকাশ করা গেল না, তোলা থাকলো ভবিষ্যৎ আগ্রহী গবেষকদের জন্য।

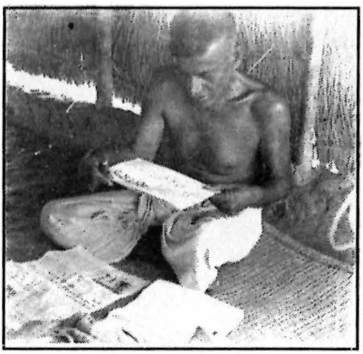
তুষার ভট্টাচার্য

যে উদ্বাস্তু সেনাপতিরা আজ নেই



রাইহরণ বাড়ৈ

প্রয়াত রাইহরণ বাড়ৈ ছিলেন সারা ভারত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সাধারণ সম্পাদক। অসুস্থতাজনিত কারণে কোলকাতার আর জি কর হাসপাতালে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

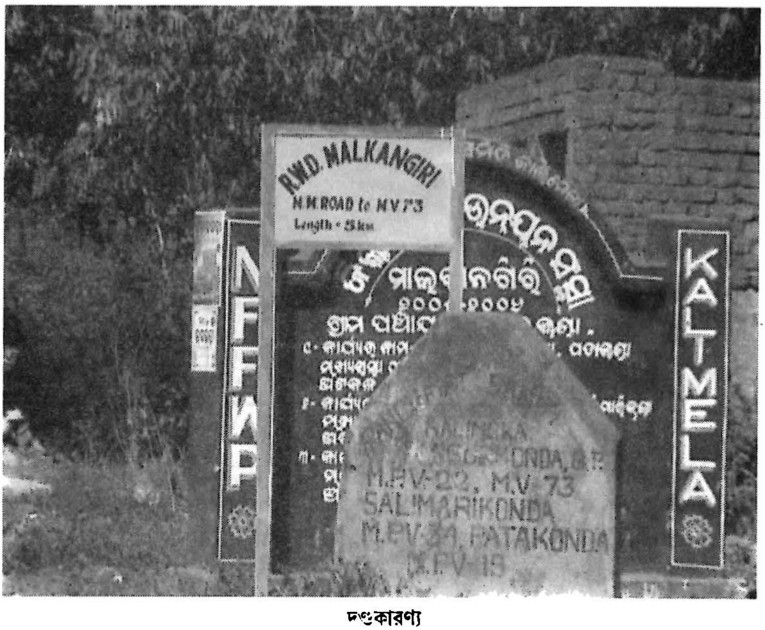


রঙ্গলাল গোলদার

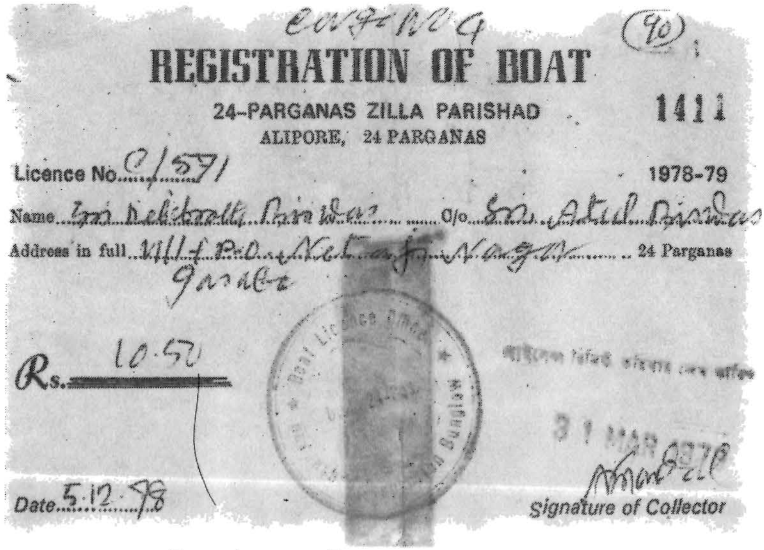
প্রয়াত রঙ্গলাল গোলদার ছিলেন উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির কোষাধ্যক্ষ এবং মরিচঝাঁপির নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠের প্রধান উপদেষ্টা। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রয়াত হন।



মরিচঝাঁপির মানচিত্র



দণ্ডকারণ্য



REGISTRATION OF BOAT

24-PARGANAS ZILLA PARISHAD 1411

ALIPORE, 24 PARGANAS

Licence No. 1978-79

Name c/o

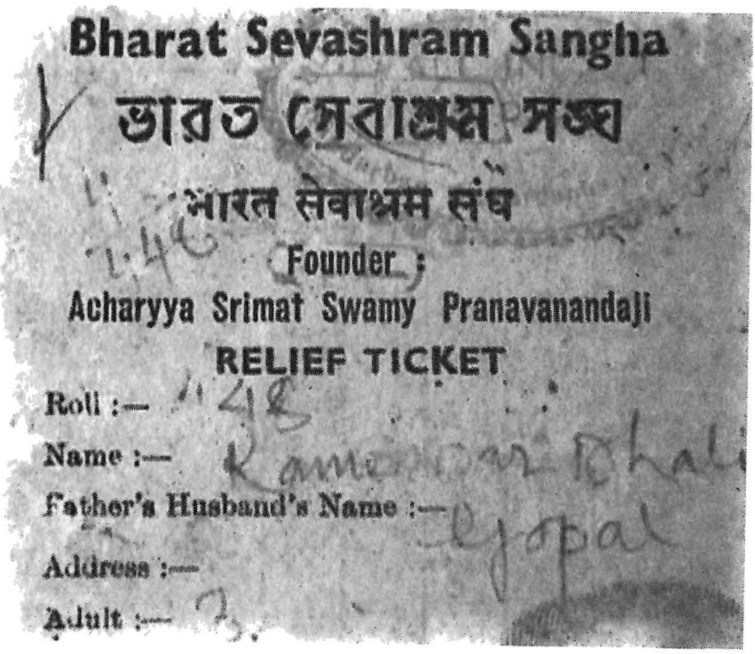
Address in full 24 Parganas

Rs. 10.50

31 MAR 1979

Date 5.12.78 Signature of Collector

নৌকা লাইসেন্স : পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া



Bharat Sevashram Sangha

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

भारत सेवाश्रम संघ

Founder :

Acharyya Srimat Swamy Pranavanandaji

RELIEF TICKET

Roll :— 48

Name :—

Father's Husband's Name :—

Address :—

Adult :—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-এর দেওয়া উদ্বাস্তুদের ত্রাণের টিকিট



উৎখাত হবার পর মরিচঝাঁপি



মরিচঝাঁপিতে প্রথম জলের কল

'স্বাধীনতার বলি' যাত্রাপালা রচিত হয়েছিল মরিচঝাঁপির মাটিতে। রচনা করেছিলেন উদ্বাস্তু যুব নেতা রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস। 'স্বাধীনতার বলি'র অমূল্য পাণ্ডুলিপিটি ঘাতকবাহিনী মরিচঝাঁপির মাটিতে ভস্মীভূত করে দেয়। কিন্তু মৃত্যু হয়নি ঐ যাত্রাপালার গানটির। গানটি সেদিনের এগারো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ পাইকের কণ্ঠে তিন দশক পরে আজও জীবিত।

স্বাধীনতার বলি

চল তোরা মরিচঝাঁপি রিফিউজি মেলায়
নদীর বাঁকে দেশের লোকে
অবাক চোখে চেয়ে রয়
চল তোরা মরিচঝাঁপি রিফিউজি মেলায়।
পুলিশ লঞ্চে দেয় পাহারা
দ্বীপেতে আবদ্ধ তারা,
নৌকাগুলি যাচ্ছে মারা
গেয়ে গেয়ে বিপ্লবের জয়।
সাপে-বাঘে দিল অভয়
হাঙ্গর-কুমীর তা মেনে লয়
কেবল বসু সরকার বাদ সাধে তায়।
চল তোরা মরিচঝাঁপি রিফিউজি মেলায়।
বর্দ্ধমানে চলে গুলি,
নদীপথে সন্দেশখালি
স্বাধীনতার চরম বলি
রক্তে রাঙ্গা ধারা বয়।
কেউ কী আছে এ ভারতে
উদ্বাস্তু সব কবরে হাঁটে,
কেউ কী আছে এ বাংলায়
উদ্বাস্তু সব কবর যায়।
চল তোরা মরিচঝাঁপি
রিফিউজি মেলায়।



মুখোমুখি মরিচঝাঁপি

তুষার ভট্টাচার্য

১৯৭৮-৭৯ তে মরিচঝাঁপিতে যে ঘটনা ঘটেছিল তাকে ধামাচাপা দেবার চক্রান্তকে উদ্‌ঘাটিত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে রাজনৈতিক নেতারা হয়তো লাভবান হবেন— কিন্তু যে মানুষগুলোকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হোল, তাদের কি হবে, তাদের জন্যে আমরা কতোটুকু ভাববো, তাদের ডেকে এনে গলায় মালা দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলবো— 'আপনাদের সংগ্রাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, সম্মানিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে' বলে কর্তব্য সমাপ্ত করবো ?

'বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে শেষ করে দেবার যে প্রক্রিয়া চলছে তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ এই মরিচঝাঁপি'— বলাটা কি অন্যায় হবে ? ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাঙলা ভাগ করলে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ঝড়ের দাপটে ছ-বছরের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে হলো। অথচ ১৯৪৭-র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক'জনার কণ্ঠে প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল ? কেননা এখানে তো আমরা স্বাধীনতার স্বাদ নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার অংশীদারিত্ব পেয়েছিলাম। তাই চুপ

করেছিলাম। দেশভাগ নিয়ে 'শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি' করেছি পরবর্তীকালে, কিন্তু ১৯৪৭ এর আগে আমরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনের ঝড় তুলিনি।

ব্রিটিশ বাঙালি জাতিসত্ত্বার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করেছিল বলেই বাঙালিকে বিলুপ্ত করার প্রয়াস শুরু করেছিল। তারই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মরিচঝাঁপি, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। একটা জাতি সত্ত্বার শিল্প-সংস্কৃতি-সভ্যতা কারা গড়ে দেয়? ব্রেকট এর বিখ্যাত কবিতা,

কারা গড়েছিল থিবিস নগরীর সাতসাতটি
প্রবেশদ্বার?
ইতিহাসের কেতাবে লেখা হরেক রাজার নাম।
কিন্তু বড় বড় চাঙড়গুলো ঠেলে ঠেলে
তুলেছিল যারা
তারা কি রাজা ছিল?

আমরা পশ্চিমবাংলায়, ভারতবর্ষে ওদের নানানভাবে বর্ণনা করছি— দলিত শ্রেণি, হরিজন, নমশূদ্র নামে, রাজনৈতিক ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সভ্যতা সৃষ্টির ধারক-বাহক এই শ্রমজীবী মানুষগুলোকে আসলে আমরা স্বীকৃতি দিতে ভয় পাই— তাহলে আমরা 'বাবুশ্রেণি' পরবর্তীকালে হয়েছি 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক'। জয়া চ্যাটার্জি যথার্থই তার গবেষণা গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন— 'ভদ্রলোক হল দেশের অনুভূতিহীন মাটির সন্তানদের ঠিক বিপরীত। কায়িক পরিশ্রম থেকে বিরত থাকাতে এই 'বাবু' শ্রেণির লোকেরা নিজেদেরও সমাজের নিম্ন শ্রেণির লোকেদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্বের জন্য অপরিহার্য উপাদান বলে বিবেচিত করত।' জয়া চ্যাটার্জি ব্রুমফিল্ড এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন— "ব্রুমফিল্ড 'ভদ্রলোক' কথাটি ব্যবহার করেন 'পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণির লোক' হিসেবে এবং তাদের গণ্য করেন 'ওয়েবারিয়ান (Weberian) গ্রুপের' লোকদের মর্যাদসম্পন্ন লোকদের মতো।"— এরাই এখন 'মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত শ্রেণি' হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন।

'মরিচঝাঁপি' হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি। গোপন কুঠুরিতে আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু গোপন ছিল উদ্বাস্তুদের উৎখাত প্রক্রিয়া। বহু প্রকাশ সূত্র ছিল যা থেকে এই গোপন প্রক্রিয়ার সত্যটা জানা সহজ ছিল। বামফ্রন্টের 'গরিব মানুষের বলভরসার তকমা আঁটা নামাবলিটা শক্তপোক্ত ছিল' সেটা ভেদ করে অবিশ্বাসের ছিদ্রের দিকে আমরা প্রবেশ করতে চাইনি। তাছাড়া এই অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া কৃষক, শ্রমজীবী মানুষকে তো আমরা 'নিপীড়িত শ্রেণি' হিসেবে মর্যাদা দিয়েছি। সুতরাং তাদের দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে অজস্র উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলোর অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা, তাদের বেঁচে

থাকার জন্য বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহ গুলি চালিয়ে দমন করার খবর প্রভাতী সংবাদপত্রের পাতাতেই থেকে গেছে, চায়ের ধোঁয়ার মতো উবে গেছে, মনের গভীরে প্রবেশ করতে পরেনি, ক্ষতকে দেখতে চাইনি, এর মধ্যেও রয়েছে বাঙালি জাতি সত্ত্বাকে পিষে ফেলার গভীর চক্রান্ত।

দেশভাগ ছিল বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার প্রাথমিক ধাপ। এই সফলতাকে পুঁজি করে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে পাঠানো হল উদ্বাস্তুদের। একটা দ্বীপের বাঙালির সাথে অন্য দ্বীপের বাঙালিরা কতোটুকু যোগাযোগ রাখতে পারে? সুপারি বিক্রি করে **যাদে**র সারা বছরের খোরাক জোটে না তাদের খবর আমরা রেখেছি ক'জন? পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের মানা ট্রানজিট ক্যাম্পের অন্তর্গত ক্যাম্পগুলিতে ৮-১০ বছর কিভাবে রাখা হয়েছিল সে খবর আমরা রাখিনি। শুধু বাংলায় থাকার ন্যায্য আবেদনকে দমন করার জন্য মিলিটারি প্রশাসক নিয়োগ করতে হয়েছিল সরকারকে। কর্নেল শ্যামাপ্রসাদ নন্দী আর বিগ্রেডিয়ার দাস অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কর্তব্য পালন করেছিলেন উদ্ধত উদ্বাস্তুদের গুলি করে হত্যা করে।

পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছর ভিন রাজ্য থেকে মানুষ এসে বাসা বাঁধেন গড়ে এক লক্ষের উপর। তাদের জন্য জায়গা হয়। জায়গা হয় সালেম, জিন্দাল, টাটাদের জন্য। জায়গা হয় না উদ্বাস্তু বাঙালিদের জন্য। তখন নেতারা বলেন, পশ্চিমবাংলা Over crowded হয়ে গেছে, 'এক তিলও জায়গা নেই'।

জল মাটির আবহাওয়া থেকে উদ্বাস্তুদের ছুঁড়ে ফেলা হল দণ্ডকারণ্যের পাথুরে জমিতে। কতো বড়ো প্রতারণা তখন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এই বাঙালি উদ্বাস্তুদের সঙ্গে করেছিল প্রয়াত শৈবাল গুপ্তর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে।

'দণ্ডকারণ্যের কথা' বলে প্রচার বিভাগের যে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হত তাতেও নানা প্রবন্ধে ছবিতে এবং চিঠিপত্রে সফলতার দৃষ্টান্তগুলি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হত, কিন্তু যেখানে সেটা সফল হয়নি, অর্থাৎ যেখানে লোক জমি থেকে উৎপন্ন শস্যে সম্বৎসর চালাতে না পেরে অনশনে বা অর্ধাশনে বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করতে বাধ্য হত, সেই সব কথা উহ্য রাখা হত।'

"সত্যের বিকৃতি যে কতোখানি ক্ষতি করে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে। মানা শিবিরে আমার অজ্ঞাতসারে অত্যুৎসাহী প্রচার বিভাগ কর্তৃক 'সকাল থেকে সন্ধ্যা' ফিল্মটি দেখানোর পরে যখন উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরে পাঠানো হল তারা দেখল যে ছবির সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই, তখন তাদের মধ্যে অনেকে বেঁকে বসল, বলল 'আমাদের তো এরকম জায়গায় আনবার কথা ছিল না। যে জায়গা ছবিতে দেখানো হয়েছিল সে জায়গা কই?' অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও ছিল শিবির-ত্যাগের একটা কারণ।"

To
Shri ProSonna Badan Mehatai,
Honourable leader. Inquiry Committee,
Regarding Police firing & other inhuman
torturing on homeless/helpless Refugees at,
Natagi nagar, Marichjapi, Sundarban. 24, Parganas.
Dated 22nd ... March 1979

Sub:- Refugees from Dandak to Sundarban.

Respected Sir,

I, on behalf of 30 Thousand of refugees beg to Submite The followings for your Kind perusal and Sympathetic. Kind Considaration.

Since a long 12 to 15 year's. We have been living a Sub human life in various trasit Camps under Retired army perSonels, beeing assulted and torteered brutolly by Camp auThorios and State Palices on differant fabricated/Concooked-grounds lodged by The army perSonels and Theis pet group the local administration. We have lost lives in police firing now and then, When we started to Cry far redress of our Unbound Sufferings and Solvation of our long out Standing problems. Through genuine ingruing/investigations. After our arrest the modisty of our Women and young girls have been deranged by the local employees C.R.P, Police, S.A.F, in every time of massacres and and police appression leading to obstruction and weakness of daily lives. Even a larg humber of Refugeos are Still in Jail under various Sections.

In Rehabilitation Centres/Sites Wheather in Dandakaranya or in other States, We had to live like Cows and buffelowos in The Slang Their houses having little Seceeirity of life inspite of magor Sufferings appressions torturing without any hasital.

(1) 3 to 5 acores of land perfed into 4/5 plotes alloted to migrants family having a distance of 4 to 5 K. M, are Completely barren Covering with Stony, Sandy meed without any water Supply facilities.

মরিচঝাঁপিতে তদন্তে আসা তিন সংসদীয় তদন্ত কমিটিকে দেওয়া উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির চিঠির প্রথম পৃষ্ঠা

UDBASTU UNNAYANSHIL SAMITY (ALL INDIA) ESTD. 1973 Sundarban 24 Parganas W. Bengal

Page No 9

(4) An immediately relese order may please be passed to the Refugees in jail under various Section with the withdrawal of all the cases agaist the Refugees and their Representatives without any condition

And your petitioner the Samity with the Refugees as in duty bound shall ever pray.

With best regards
Your's Sincerly

Rai Haran Barai
(RAI HARAN BARAI)
General Secretary 22/3/79
UDBASTU UNNAYANSHIL SAMITY
ALLINDIA
Sundarban-24 Parganas.
West Bengal

Coppy to

(1) Dr. Laxmi Narayan Panday, M.P.
Honourable Member, Inquiry Committee.

(2) Shri Mangal Deo Bisharad M.P.
Honourable Member of Inquiry Committee
Regarding Refugees at Netagi nagar (Marichjhapi)

Requesting Symapathetic Considaration infavour of effective Resettlement in Marichjhapi including immediate removal of all the Cases on Refugees without any teerms and Conditions.

মরিচঝাঁপিতে তদন্তে আসা তিন সংসদীয় তদন্ত কমিটিকে দেওয়া উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির চিঠির শেষ পৃষ্ঠা

আই সি এস শৈবাল গুপ্ত ছিলেন দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। তার লেখাগুলি তার দিনপঞ্জীর পাতা থেকে উদ্ধার করা নয়, সমস্ত লেখাগুলি সংবাদপত্র থেকে বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। অশিক্ষিত মানুষদের কতো সহজে বোকা বানিয়ে ঠকানো যায়, তাদের অধিকারকে নস্যাৎ করা যায় তার ভুরি ভুরি প্রমাণ দিয়েছেন শৈবাল গুপ্ত।

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে প্রথম একদল উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় আসার চেষ্টা করে। কোলকাতা ময়দানে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু এসে জমায়েত হয়। ৪ দিন পর সিদ্ধার্থ রায় সরকার তাদের জেলে পুরে দেয়। বাকিরা যারা আসার চেষ্টা করে তাদের খড়গপুর স্টেশন থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আসে জরুরী অবস্থা। উদ্বাস্তু নেতারা মিসাতে গ্রেপ্তার হন।

১৯৭৭ সাল। উদ্বাস্তুদের স্বপ্ন দেখার বছর। বামফ্রন্ট এলো ক্ষমতায়। ১৯৭৭ সালের পূর্বেকার ইতিহাস আমাদের জানা। বামফ্রন্টের নেতা মন্ত্রীরা উদ্বাস্তুদের ক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মরিচঝাঁপিতে আসার জন্যে। তালিকায় বাদ ছিলেন না জ্যোতি বসুও।

১৯৭৭ সালেই উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল সহ এক উদ্বাস্তু প্রতিনিধি দল এলেন রাইটার্সে। ২ দিন সাক্ষাৎকারের পর মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আশ্বাস পেয়ে ফিরে গেলেন দণ্ডকারণ্য। উদ্বাস্তুদের সংগঠিত করে ডাক দিলেন 'চলো সুন্দরবন'। '১৯৭৮ এর মার্চ মাসের শেষ থেকে ১৯৭৯ এর ১৬ মে' হচ্ছে— মরিচঝাঁপির ইতিহাস। এই ইতিহাসে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন বহু সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী। সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সহ নামী শিল্পীরা অনুষ্ঠান করে অর্থ তুলেছেন। সুনীল গাঙ্গুলী, সাংবাদিক জোতির্ময় দত্ত, উদ্বাস্তু যুব নেতা দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে গিয়ে সতীশ মণ্ডলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ২০ হাজার টাকা। যাঁরা ওদের স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখেছেন, দেখেছিলেন অনাহারে মৃত্যু, গুলিতে মৃত্যু— তারা তো এই ইতিহাস লিখতে পারতেন। নির্মমভাবে ওদের তাড়ানো হল। এরপরের ইতিহাসের খোঁজ আমরা করিনি। খোঁজ করিনি তারা কোথায় হারিয়ে গেল। যাঁরা ইতিহাস লিখতে পারতেন— হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর খোঁজ নিতে পারতেন তাঁরা আজ অনেকেই,

'রাজার প্রসাদভোজি
  রাজকবি রচে নাট্যকলা
অন্ধকার রঙ্গভূমে
  ভূলুণ্ঠিতা কাঁদে শকুন্তলা।'

সরোজ দত্তের কবিতা আজ বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

মানুষগুলোকে তাড়ানো হোল, এরপর ওদের ঠিকানা কোথায় হল, অথবা

দণ্ডকারণ্য ফিরে ওদের অবস্থাটা এখন কেমন— এ খবর রাখার প্রয়োজনীয়তা কেউ দেখাননি। এ সম্পর্কে শৈবাল গুপ্ত লিখেছেন 'দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য জানবার আগ্রহ আমাদের দায়িত্বশীল মহলে খুব কম লোকেরই আছে।'

...'আসল কারণ কারও উস্কানি বা প্ররোচনা নয়, সুষ্ঠ জীবনযাপন ও অসহনীয় অবস্থার প্রতিকারের তাগিদ। সে সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান না করেই যদি বর্তমান সরকার প্রত্যাগত শরণার্থীদের পত্রপাঠ বিদায় করেন তবে এই কথাই প্রমাণ হবে যে ক্ষমতা পেলে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট দলে কোনো তফাৎ থাকে না। দু-পক্ষই ঘাড় থেকে আপদ বিদায় করতে পারলে বাঁচেন'।

আমি লেখক-কবি-সাহিত্যিক-গবেষক নই, তথ্যচিত্র তৈরি করি। তথ্যচিত্র তৈরি করার সূত্রে আলাপ ছিল শৈলেন চক্রবর্তীর সঙ্গে। ২০০২ এর বইমেলায় ওর সঙ্গে দেখা করে জানলাম কোলকাতা বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর মুখপত্র 'পুস্তক মেলা'তে জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের লেখা 'মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দের অন্তরালে' বইটির সমালোচনা বেরোয় শৈলেনের ছদ্মনাম 'ঝিনুক চক্রবর্তী'র নামে। লেখাটি নিয়ে টানপোড়েন। অবশেষে লেখাটিকে অদৃশ্য করে নতুন বইয়ের সমালোচনা ছাপা হলো। ঠিক করলাম মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্র করবো। মরিচঝাঁপির বিষয় নিয়ে কাজ করতে গেলে নিজের যে সমস্ত টেকনিক্যাল জিনিস থাকা দরকার তা আমার নেই। ২০০৫ সালে প্রস্তুতি নিলাম। ঠিক করলাম অন্তত মরিচঝাঁপির একটি লোকের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ করতে হবে। এঁরা সবাই ভারতবর্ষেই আছেন, অতএব একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

প্রথম যোগাযোগ করি জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের সঙ্গে, এরপর 'অদল বদল' পত্রিকার সম্পাদক বিমল বিশ্বাসের কাছে 'পথের শেষ' গ্রামের কাহিনি শুনলাম। মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হবার পর কয়েকটি পরিবার আছেন এখানে। সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, সুব্রত চ্যাটার্জি, বিমল বিশ্বাস, শিবনারায়ণ রায় এবং আরও কয়েকজনের অর্থে ঘুঁটিয়ারি শরীফের কাছে গ্রামটি গড়ে ওঠে। প্রয়াত উদ্বাস্তু নেতা রঙ্গলাল গোলদার গ্রামের নাম দিয়েছিলেন 'পথের শেষ'।

১৪ ডিসেম্বর ২০০৫ বিমল বিশ্বাসের গাড়ি করে হাজির হলাম 'পথের শেষ' গ্রামে। সঙ্গে লেখক জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, অধ্যাপক দিলীপ হালদার এবং কয়েকজন কলাকুশলী, সাহায্যকারী।

মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান শুরু করেছিলাম তথ্যচিত্রের জন্য, বই প্রকাশের কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। ২৪ জুলাই ২০০৮-এ প্রথম টিভি প্রদর্শনের পর নতুন করে জানলাম, বহু মানুষের কাছে মরিচঝাঁপি নামটাই ছিল অজানা। অথচ আমার কাছে তখন মরিচঝাঁপি নিয়ে এতো তথ্য, কয়েকহাজার পাতার বই হয়ে যায়। তথ্যচিত্রে সমস্ত তথ্য দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তথ্যচিত্র বেশি আকর্ষণীয় এই

কারণে যে মানুষ সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন জানতে পারছেন। মুখোমুখি হতে পারছেন সেই সমস্ত মানুষের কাছে যারা মরিচঝাঁপি ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে জড়িত এবং চলচিত্রের ভাষাটাও আন্তর্জাতিক।

মরিচঝাঁপির ইংরাজি 'Marichjhaupi 1978-79 Tortured Humanity' লন্ডনে অ্যামেনিষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, আমেরিকায় ইন্টারন্যাশনাল হিম্যান রাইটস এবং সেখানকার বাঙালিরা ছবিটা দেখেছেন। এ ছাড়া চেকোশ্লাভাকিয়া, ইটালি, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নাইজেরিয়াতে ছবিটা দেখানো হয়। ভারতে মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর, নাগপুর, পাঞ্জাব, আসাম এবং দিল্লির ইন্ডিয়ান সোস্যাল ইনস্টিটিউট-এ ছবিটি দেখানো হয়। এখানে Other Media-র আমন্ত্রণে দিল্লির প্রদর্শনে উপস্থিত থেকে বহু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হই। পশ্চিমবঙ্গের কমবেশি প্রায় সমস্ত প্রান্তেই বাংলা তথ্যচিত্র 'মরিচঝাঁপি, আক্রান্ত মানবিকতা ১৯৭৮-৭৯' দেখানো হয়। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছি মাত্র ৪ জায়গায়।

দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদক মানস ঘোষ আমাকে মরিচঝাঁপির উপর একটা লেখা দিতে বলেন কাগজের জন্য। তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়াতে বাধ্য হই লিখতে। আমি লেখার মানুষ নই, তাই লিখতে অনীহা। দৈনিক স্টেটসম্যানে লেখা ছাপা হবার পর দেশের বহু জায়গা থেকে টেলিফোন পাই। লেখাটা পুনর্মুদ্রণ হোল বহু পত্রপত্রিকায়। মরিচঝাঁপি নিয়ে মানুষের মনে যখন একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তখন মরিচঝাঁপি নিয়ে অনেকেই লিখতে শুরু করেছেন। সে সব লেখায় দেখলাম সঠিক তথ্যের অভাব থাকছে। প্রথমে বাংলায় একটা বই লেখার তাগিদ অনুভব করলাম। আর ইতিমধ্যেই যে সব প্রশ্ন উঠে এসেছে তার জবাব দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হোল। যদিও মরিচঝাঁপি নিয়ে আরও অনেক বেশি গবেষণার বিষয় লুকিয়ে আছে।

তিন দশক আগে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু উৎখাত কাণ্ডে প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিক এবং সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবীরা অনেক লেখা লিখেছেন। সে সব লেখা বহু মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা, তাদের নেতারা কী ভেবেছেন, কেন এসেছেন, কোন দৃষ্টিতে সামগ্রিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন তা জানা দরকার। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর ধরে তথ্যচিত্রের জন্য কাজ করে, সেই ছবি প্রদর্শিত হবার পরও কাজকে গুটিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। এরপরও কয়েকবার দণ্ডকারণ্য যেতে হয়েছে সেই সব মানুষের কাছে যাঁদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ আগে হয়নি যাঁরা মরিচঝাঁপিতে এসেছিলেন।

জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু নিধন, উৎখাতের যে পৈশাচিক নিদর্শন রেখেছিলেন, সে সময় আমরা যারা খোঁজ খবর রাখতাম তাতে অবাক হইনি। কেননা রাষ্ট্রযন্ত্র হাতে পাবার পর সেই রাষ্ট্রের নায়কেরা

সাধারণ মানুষের নামাবলি পরে আসলে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করে সাধারণ জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালাবে— এ 'বিজ্ঞান' আমাদের জানা ছিল। এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ভয়াবহতা জনগণের সামনে হাজির করার তাগিদ থেকেই মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান। কেননা বামফ্রন্ট সরকার সুচতুর কৌশল নিয়েছিল অত্যাচারের সমস্ত তথ্য গোপন করার, কেননা জনদরদী মুখোশটা 'গণতন্ত্রে' অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি উদ্বাস্তুরা এলো পশ্চিমবাংলায়। সমস্যা বহু, সেই সমস্যা উসকে দিয়ে বামফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করে পশ্চিমবঙ্গের। ক্ষমতা দখলের একটা অঙ্গ ছিল দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত বাঙালি উদ্বাস্তুরা। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের দাবি দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি জানানোর সাথে সাথে ১৯৭৭-এর অনেক আগে থেকেই দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের প্রতি সহমর্মী হয়ে আজকের বামফ্রন্টের অনেক নেতা মন্ত্রীরা ঘন ঘন যাতায়াত করেছেন দণ্ডকারণ্যে। জ্যোতি বসু ভিলাইতে ডেকে এনে কথা বলেছিলেন দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের। আর ক্ষমতা দখলের পর রাইটার্সে এনে বৈঠক করেছেন। সি পি এম পার্টির সমর মুখার্জি বহুবার গেছেন দণ্ডকারণ্যে। আর সি পি এম পার্টি নেতাদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ অশোক ঘোষ এবং কিরণময় নন্দের দ্বিচারিতা আর কেউ না জানুন দণ্ডকবাসীরা মর্মে মর্মে জানেন।

সত্য মিথ্যা যাই হোক— প্রচার একটা বড় হাতিয়ার। এই প্রচার ঠিক ঠাক কাজে লাগাতে পারলেই অতি বড় বুদ্ধিমান বুদ্ধিহীন হয়ে যেতে বাধ্য সাময়িকভাবে হলেও। এরা জানতো সাধারণ খেটে খাওয়া জনগণের দুর্বল জায়গাটা কোথায়। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯, ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে তারা পুলিশ দিয়ে দ্বীপটিতে খাদ্য অবরোধ করে দেয়। ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ তুচ্ছ করে অপর পারে কুমিরমারিতে খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে তাদের গুলি করে মারা হয়, তারিখটা ছিল ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯। এই পদ্ধতি তারা আর রাখঢাক না করে জনগণকে টাইট করার রণকৌশলকে রণনীতিতে পরিণত করেছিল নন্দীগ্রামে 'লাইফ হেল' ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। নিরস্ত্র বেয়াদপ প্রতিবাদী জনগণকে শায়েস্ত করার উন্নততর সূক্ষ্ম রণকৌশল হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের পুলিশের গুলি, পোষা গুণ্ডা এবং ক্ষুধার অস্ত্র। এটা বামফ্রন্ট ক্রমাগত সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেশি-বিদেশি পুঁজিবাদীদের আস্থা অর্জন করেছে।

'মানা', মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতা প্রয়াত রঙ্গলাল গোলদারের কন্যা। রায়পুরের মানা ক্যাম্পে জন্ম। তাই রঙ্গলালবাবু মেয়ের নাম দিয়েছিলেন 'মানা'। মানার স্বামী আনন্দ সরকার বেকার। একমাত্র মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ। বাড়িতে ব্লাউজ সেলাইয়ের কাজ করছে। আতিথেয়তা করার জন্য মানা চা-চিনি খুঁজতে গেলেন অন্য বাড়িতে। মাটির দাওয়া বেড়া— খড়ের ঘরে মাথা নীচু করে ঢুকে চৌকির ওপর বসলাম। সাক্ষাৎকার নিলাম মানা, আনন্দ সরকারের। এরপর মানার দু-ভাই, মায়ের

বাড়িতে। এক ভাই রিকসা চালায়, আর এক ভাই অনিয়মিত দিনমজুর খাটে। ওরা কারো খবর রাখেন না, রাখতে পারেন না, ওদের খবরও কেউ রাখে না। মরিচঝাঁপি থেকে আর একটি নির্বাসিত দ্বীপে ওরা আছেন। এটাই ওদের শেষ আশ্রয় 'পথের শেষ'। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতা আনন্দ সরকারের কাছ থেকে শুনলাম মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতা 'সারা ভারত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ হুগলির কোন মাছের হাটে মাছের ব্যবসা করছেন। উত্তরপাড়া, কোননগর, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর, চণ্ডীতলা, জিরাট, বলাগড়, জয়রামবাটি হুগলির কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না রাইহরণবাবুর। তিনমাস অতিক্রান্ত। একদিন আমার বাড়ির কাছের মাছের বাজারে পরিচিত মাছ বিক্রেতা অনিলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাটে তো যান রাইহরণ বাড়ৈ বলে কাউকে চেনেন?' অনিল জানালো, 'রায়বাবু নামে একজন ছিলেন, তিনি কয়েক বছর হলো মারা গেছেন। আর একজন বয়স্ক মানুষ আছেন হাটের আড়তে, তিনি হয়তো জানতে পারেন।' পরদিন রাত তিনটেয় মাছ বিক্রেতাদের ট্রাকে চলে গেলাম পাতিপুকুরে মাছের হাটে। অনিল আমাকে সেই বয়স্ক মানুষটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার পর জানলাম রায়বাবুই রাইহরণ। তার দুই ছেলে এখন আড়ত দেখাশোনা করছেন। ছেলেরা আসার পর উদ্দেশ্য জানালাম, ঠিকানা টেলিফোন নম্বর নিয়ে একদিন হাজির হলাম দমদমের বাড়িতে। রাইহরণ বাড়ৈ-এর স্ত্রী পারুলবালা বাড়ৈ এর কাছে মরিচঝাঁপির অনেক তথ্য পেলাম। জানলাম যুবনেতা পবিত্র বিশ্বাসের ঠিকানা, পেলাম ছত্তিশগড়ে, রায়পুরে একদা মানা ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের মুখ্য নেতা সতীশ মণ্ডলের আস্তানার হদিশ।

ক্যামেরাম্যান সঞ্জয় ঘোষ জানালো ওর বাড়ির কাছেই মরিচঝাঁপি কলোনী। পরিচিত লোকজন আছে। বললাম, কথা বলো কালকেই যাচ্ছি।

দমদম স্টেশনের কাছে চিড়িয়ামোড় বি টি রোডের দিকে এগোতেই ছানাপট্টির পরে মরিচঝাঁপি কলোনী শুরু। আসলে এটা কলোনী নয়, বস্তিও নয়, একটা বাজার তৈরি হয়েছিল একসময়। ১৯৭৮-এ বন্যার সময় বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার এখানে উঠে আসে। তারা ছেড়ে যাননি। ১৯৭৯ এ মরিচঝাঁপি থেকে বামফ্রন্ট উৎখাত করে দেবার পর বাকি ঘরগুলো দখল করে উদ্বাস্তুরা। বাজারের সবজি বা মাছের দোকানের আয়তনের সমান এবং একটি ঘরে একটি করে পরিবার। বহু বস্তি দেখেছি এমন বস্তি দর্শন আগে হয়নি। ওরা কেউই কথা বলতে চাইলেন না। এমন কি ছবি তুলতেও মানা। বুঝলাম, সি পি এম-এর মুঠোয় ধরা আছে ওদের এই ক্ষুদ্র আস্তানা। অগত্যা অন্যদিন মোটর সাইকেলে চেপে চলন্ত অবস্থায় মরিচঝাঁপি কলোনীর ছবি ধ'রে রাখলাম।

সমাজসেবী অশোকা গুপ্ত দণ্ডকারণ্য থাকাকালীন ওখানকার মেয়েদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য বহু প্রকল্প গড়ার কাজ শুরু করেছিলেন। উনি আমার সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন কিন্তু ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাইলেন না। শেষে নাছোড়বান্দা হওয়াতে উনি ক্যামেরার সামনে যা যা বলেছিলেন সেইটুকুই তুলেছিলাম। শেষে উনি ওনার মা জ্যোতির্ময়ী দেবীর কয়েকটি অসাধারণ বই দিলেন আমাকে। সেই সঙ্গে শৈবাল গুপ্তের ইংরাজি বাংলায় লেখা বই। বেদনা একটাই, কথা দিয়েছিলাম তথ্যচিত্র তৈরি হবার পর তার কপি দিয়ে আসবো। ২৪ জুলাই ২০০৮-এ টিভি প্রদর্শিত হয় মরিচঝাঁপি তথ্যচিত্র; উনি পরলোকগমন করেন ৮ জুলাই ২০০৮-এ।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 'উপেন বিশ্বাস' নামেই পরিচিত। উনি যে এই নিপীড়িত শ্রেণির জন্য এতো ভাবেন, সেটা ওর সাক্ষাৎকার নেবার আগে জানতে পারিনি। উনিই প্রথম জানালেন ২০০০ সাল পর্যন্ত 'মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বনাঞ্চল' বলে চিহ্নিত এমন কোনো রেকর্ড সরকারের ঘরে নেই। অথচ সরকারের দেওয়া এই তথ্যের ভিত্তিতেই আদালত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। উপেনদা তার গবেষণালব্ধ সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন মরিচঝাঁপির ভূমিপুত্র এরাই। এই অশিক্ষিত নিপীড়িত শ্রেণির পক্ষ হয়ে তিনি নিরলস প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। মরিচঝাঁপি নিয়ে ইন্টারনেটে-ওয়েবসাইট খুলেছেন। আমার কাজ নিয়ে তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল মনে রাখার মতো। এখানেই থেমে থাকেননি কয়েকটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পরামর্শদাতা হিসেবে সঙ্গী হয়েছিলেন।

কোলকাতার উচ্চ আদালতে একটি মাত্র মামলা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের জারি করা খাদ্য ও পানীয় জল অবরোধের বিরুদ্ধে। প্রয়াত আইনজীবী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সহকারী শাক্য সেন সেই মামলা লড়েছিলেন উদ্বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে। হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার এবং উদ্বাস্তুপক্ষের আইনজীবীদের মরিচঝাঁপি তদন্তে যাবার কথা। যথানিয়মে বামফ্রন্ট সরকারের আইনজীবীরা তদন্তে যাননি। শাক্য সেন তদন্ত করে ৩৫ পাতার রিপোর্ট দিয়েছিলেন আদালতে।

২০ বছর ধরে চলা অর্চনা গুহ মামলায় বার বার হোঁচট খেতে হয়েছে সৌমেন গুহকে। শেষে তিনি নিজেই আইনজীবীর পোষাক পরে মামলা লড়ে জিতেছিলেন। পরীক্ষিত সৌমেন গুহকে তুলে দিয়েছিলাম মরিচঝাঁপি মামলার নথিপত্র। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন 'ইতিহাসে মরিচঝাঁপি মামলা' লেখায়।

'নির্মলেন্দু ঢালি'র নাম নিয়ে একটা ছোট বিতর্ক ছিল। কোথাও 'নির্মলকান্তি ঢালি' কোথাও 'নির্মলেন্দু'। এই বিতর্কের জবাব নিজেই দিয়েছেন। ওনার আসল নাম নির্মলকান্তি ঢালী, মরিচঝাঁপিতে আসার পর উদ্বাস্তুদের মূখ্য নেতা সতীশ মণ্ডল

'নির্মলেন্দু ঢালী' নামে পরিচিত হতে বলেন। দণ্ডকারণ্যের মালকানগিরিতে তিনি নির্মলদা বা ঢালীদা নামেই পরিচিত।

'সারা ভারত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র সভাপতি সতীশ মণ্ডল আছেন ছত্তিশগড়, রায়পুর, মানাতে। সতীশ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করাটা ছিল খুব জরুরী। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ এর কাকা শ্বশুর ছিলেন সতীশ মণ্ডল। রাইহরণ-এর স্ত্রী এবং পুত্ররা মানাতে যাবার জন্য যোগাযোগ, টেলিফোন নং দিলেন। সেখানে থাকা যাবে বলে জানালেন। টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। ওখান থেকে টেলিফোন নম্বর পেলাম সতীশ মণ্ডলের ছেলে স্বপন মণ্ডলের। সতীশবাবুর আরও দুই পুত্র— তপন ও তাপস। তিনি জানালেন তার বাবা অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি। প্রতিদিনই ফোন করি। ১০ দিন পর সতীশ মণ্ডল হাসপাতাল থেকে বাড়ি এলেন। আমরা রওনা হলাম। আমার সঙ্গী ছিলেন সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালের কর্ণধার অরুণ সেন। হাওড়া-রায়পুর। সেখান থেকে অটো রিক্সায় সেই বিখ্যাত মানা ট্রানজিট ক্যাম্প, তারিখটা ছিল ২৭ মে ২০০৬। মানাতে নেমে রিক্সায় নির্দিষ্ট বাড়িতে। পাশের বাড়িটাই সতীশ মণ্ডলের। দোতলা বাড়ি স্বচ্ছলতার ছাপ। বিশ্রাম নেবার পর জানলাম এ বাড়ির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ও বাড়ির, কারণটা পারিবারিক। শুনলাম সতীশবাবু সূর্য ডোবার পর বাইরের উঠোনে এসে বসেন। তখন একটা সুযোগ। গ্রীষ্মকাল। অসম্ভব গরম। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই আমরা সতীশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত। জ্যেষ্ঠপুত্র জানালেন তার বাবার সাথে মরিচঝাঁপি বা অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে দেবেন না। কোনো অনুরোধই তিনি শুনলেন না। এমনকি তার ছবি তোলাতেও আপত্তির কথা জানালেন। সমস্যা জানালাম রাইহরণবাবুর শ্বশুরবাড়িতে। ওরা একটা উপায় বললেন, উদ্বাস্তু সংগঠনের সহ সভাপতি ছিলেন রবীন চক্রবর্তী। তিনি কয়েক কিলোমিটার দূরে থাকেন। তিনি মাঝে মাঝেই আসেন সতীশবাবুর বাড়িতে। মাঝখানে দুটো দিন। তারপরই চলে যাবো ইন্দোর। সন্ধ্যাতেই এ বাড়ির একটি ছেলের মোটর সাইকেলে হাজির হলাম রবীনবাবুর বাড়ি। বাড়িতেই কালীমন্দির। পুজো-আচ্চা নিয়ে আছেন। স্ত্রী প্রসাদ এগিয়ে দিলেন। সব শুনে তিনি পরদিন সকাল ৯টায় চলে আসবেন বলে জানালেন।

পরদিন সকাল ৯টা ১০টা ১১টা রবীনবাবুকে বারবার ফোন করছি, তিনি সময় নিচ্ছেন। এলেন বিকেল ৪টেয়। এ বাড়িতে তার সাক্ষাৎকার নেবার পর সতীশ মণ্ডলের বাড়িতে প্রায় ৫টায়। তার জ্যেষ্ঠপুত্র সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফেরেন। মাছের ব্যবসা, জ্যেষ্ঠপুত্রের আগমন এবং দিনের আলো বিদায় নেবার আগে ক্যামেরাবন্দী করতে হবে সতীশবাবুর সাক্ষাৎকার। সতীশবাবু বাইরে চেয়ারে বসা,

বেশ অসুস্থ। কথায় জড়তা। স্ত্রী চা দিলেন। আধ ঘণ্টার উপস্থিতিতে ১৫ মিনিটের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা হোল।

পশ্চিমবঙ্গের দলিত নেতারা মূলত বুদ্ধিজীবী। এদের বেশির ভাগ দলিত শ্রেণির সরকারি সুযোগ নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। অবসরের পর তারা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন দলিতদের নিয়ে। মরিচঝাঁপি নিয়ে সভাসমিতি সেমিনার করছেন— অথচ এই সব নেতাদের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মিনিটের হাঁটাপথের দূরত্বে রেললাইনের পাশে ঝুপড়ি বেঁধে আছেন মরিচঝাঁপির বহু উদ্বাস্তু। এদের খবর কেউ রাখেন না। এটাও বুঝতে অসুবিধা হয়না 'দলিতদের' পুঁজি করেই এরা নেতা হতে চান। অন্যদিকে দণ্ডকারণ্য গিয়ে দেখেছি বর্ণ জাতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না। এটি পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা।

মানা ট্রানজিট ক্যাম্প। পূর্ব বাংলার সমস্ত শ্রমজীবী অশিক্ষিত উদ্বাস্তুদের এখানে জমা করা হোত। ৮-১০ বছর পর এদের পাঠানো হোল দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ৫টি রাজ্যে। অন্ধ্র, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের গহন অরণ্যে। সেই মানা ট্রানজিট ক্যাম্পের কেন্দ্রীয় অফিস, উদ্বাস্তুদের দুর্গা মণ্ডপ, আন্দোলনের প্রথম ধাপ অনশন মঞ্চ— সব ঘুরিয়ে দেখালেন রবিন চক্রবর্তী। আমরা সমস্ত ছবিই ভিডিও রেকর্ডিং করে চলেছি।

২৮ মে ২০০৬ সকাল ৭টা মন্মথ বিশ্বাস এলেন রায়পুর থেকে। উনি ছত্তিশগড় নমশূদ্র কল্যাণ সমিতির সভাপতি এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারী। এলেন বিনোদ মজুমদার, চেহারায় শ্রমজীবী মানুষের ছাপ। ওদের সাক্ষাৎকার তথ্যচিত্রে রেখেছি। পরদিন সকাল ৯.১৫ তে ইন্দোরের ট্রেন বিলাসপুর থেকে। ইন্দোর থেকে যেতে হবে ধার জেলায় যা প্রায় বাসে ৩ ঘণ্টার পথ। ধারের পরে গুজরাট রাজ্যের শুরু। সেখানে মরিচঝাঁপি হাসপাতাল-এর চিকিৎসক সমীর সমাদ্দার থাকেন একরকম আত্মগোপন করে। ওর টেলিফোন জোগাড় করে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি বারবার অনুরোধ করেছিলেন ওঁর আস্তানার খবর কাউকে না জানাতে। এখন উনি অন্যত্র বাসা বদল করেছেন।

সকাল ৯টার মধ্যে রায়পুর থেকে বিলাসপুর যাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা রায়পুরে বেলা ১১টার ট্রেন ধরার জন্য রওনা হলাম মন্মথ বিশ্বাসের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ না করে। বিলাসপুর হোটেলে রাত কাটিয়ে সকালেই চলে গেলাম স্টেশন-এ। ২৭ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রা। চা-বিস্কুট খেয়ে ট্রেন যাত্রা শুরু। দুপুরে কোথাও খাবার পেলাম না। আমাদের সহযাত্রী দুটি মেয়ে বিলাসপুরের, ওরা ইন্দোর নার্সিং ট্রেনিং কলেজের ছাত্রী, ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। ওরা জোর করেই ২টো করে পরোটা আমাকে আর অরুণদাকে দিল। এবং আশ্বাস দিল রাতের খাবারের চিন্তা করতে হবে না। ওদের মামা সন্ধের পর কোনো এক স্টেশনে এসে খাবার দিয়ে যাবে।

মোবাইল ফোনে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে। রাতে অতিরিক্ত খাবার খেয়ে পরদিন বেলা এগারোটায় ইন্দোর পৌঁছে বাস ধরি। বাস থেকে নেমে দেখলাম অপেক্ষা করছেন সমীর সমাদ্দার। কাছেই বাসা। জলের সমস্যা তীব্র এখানে। একদিন পর পর আধঘন্টার জন্য পাইপ লাইনে জল আসে। ছোট ২ ড্রাম জল কিনেছেন ২০০ টাকায়। মধ্যপ্রদেশের এই সীমান্ত জেলার কয়েকটি অঞ্চল আমরা ঘুরলাম। এখানে বহু বাঙালি কোয়াক ডাক্তার আছেন, বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা। মূলত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা করে থাকেন। দুদিন এমন কয়েকজন চিকিৎসকেরও সাক্ষাৎকার নিলাম।

মরিচঝাঁপি যেতে হলে কুমিরমারির দ্বীপ হয়ে যেতে হয়। এই কুমিরমারিতেই দণ্ডকারণ্য থেকে প্রথম ওঠেন উদ্বাস্তুরা। এখান থেকেই ওরা পানীয় জল খাদ্য সংগ্রহ করতেন। মূলত আর এস পি-র প্রভাব ছিল এখানে। উদ্বাস্তুরা বার বার কুমিরমারির পঞ্চায়েত প্রধান প্রফুল্ল মণ্ডল এবং জেলা পরিষদের প্রদীপ বিশ্বাসের অবদানের কথা বলেছেন। যদিও প্রদীপ বিশ্বাস পরে আর এস পি থেকে সি পি এম শিবিরে যোগ দিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করেও কুমিরমারির যোগাযোগ পাচ্ছি না। অরুণ সেন সরবেড়িয়ায় শ্রমজীবী হাসপাতাল এবং কৃষিচক্র পরিচালনা করেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এখানে আসেন পরিষেবা নিতে। এমনই একটা অনিশ্চিত যোগাযোগে রওনা হলাম কুমিরমারি। ধামাখালি থেকে ভুটভুটিতে ৩ থেকে ৪ ঘন্টার পথ। তারিখ ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬। প্রথম আমরা উঠলাম ছোট মোল্লাখালিতে এরপর মোল্লাখালিতে সেই পরিচিতের বাড়ি। সেখানে আহার সেরে এসে উঠলাম কুমিরমারি বাগনাতে বনবিভাগের অফিসের পাশেই। দেখা হোল দীনবন্ধু মণ্ডল ও ভবসিন্ধু মণ্ডলের। দুজনেই পুলিশের হয়ে ভাড়া খেটেছিলেন মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু উচ্ছেদ কাণ্ডে।

কিন্তু যোগাযোগ হোল না প্রফুল্ল মণ্ডলের সাথে। এবারে সরাসরি যোগাযোগ করি আর এস পি-র সভাপতি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। আমার সামনে বসেই আর এস পি-র কৃষক ফ্রন্টের নেতা অশোক চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আমাকে সাহায্য করার কথা বললেন। সেদিন ছিল ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭। বর্ষীয়ান অশোক চৌধুরী ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর প্রাক্তন বিধায়ক। ওর বাসায় যাই ৮ মার্চ ২০০৭-এ। অশোক চৌধুরীর সরাসরি মাটির সাথে যোগাযোগ। সেই কারণে ওর সাক্ষাৎকারে জড়তা, অস্পষ্টতা ছিল না। অশোকবাবুর স্ত্রীর আতিথেয়তায় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন দিগন্ত মুখার্জী। সাক্ষাৎকারের শেষে কুমিরমারি যাবার পরিকল্পনা হোল। ৭ এপ্রিল ২০০৭ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উনি গাড়ি করে নিয়ে গেলেন বাসন্তীতে। পথে সরবেড়িয়া থেকে তুলে নিলাম অরুণ সেনকে। বাসন্তীতে মাতলা নদীর ওপারেই গোসাবা।

ওখানে আসতে বলেছেন প্রফুল্ল মণ্ডলকে। প্রফুল্ল মণ্ডল ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান, ২৫ বছর প্রধান হিসাবে ছিলেন। মরিচঝাঁপি ঘটনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত এক ঐতিহাসিক সাক্ষী।

গোসাবার আর এস পি-র পার্টি অফিসে প্রফুল্ল মণ্ডল আরও দুজনকে এনেছেন। একজন নিতাই মুণ্ডা। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ পুলিশের গুলিতে নিহত আদিবাসী মহিলা মেনি মুণ্ডার ভাই। অন্যজন রবি মণ্ডল, যার ঘরের উঠোনে প্রায় ৪০ জন উদ্বাস্তুকে পুলিশ গুলি করে মেরে জড়ো করে রেখেছিল পাচার করার জন্যে। তিনজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হোল। প্রফুল্ল মণ্ডলের সঙ্গে কথা হোল কুমিরমারিতে যাওয়া নিয়ে।

২৩ এপ্রিল ২০০৭। ধামাখালি থেকে সকাল ৯.৩০ নাগাদ গোসাবা থেকে আসা ভুটভুটিতে করে বেলা পৌনে একটা নাগাদ কুমিরমারি বাজার। সেখান থেকে হাঁটা পথে আধ কিলোমিটার প্রফুল্ল মণ্ডলের বাড়ি। পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে কুমিরমারির শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ মৃধা। চোখের সামনে দেখেছেন উদ্বাস্তুদের আগমন, পুলিশি অত্যাচার। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল উদ্বাস্তু নেতৃবৃন্দের। ওর সাক্ষাৎকারে বিস্তারিত রয়েছে। পেলাম নিহত মেনি মুণ্ডার পুত্রকে— রাম মুণ্ডা। তার বাড়িতে মাকে হত্যার বিস্তারিত বিবরণ। বাসুদেব মণ্ডল বর্তমান অঞ্চল সদস্য। তার দেখা উদ্বাস্তু এবং লাশ পাচারের কাহিনি। সবই ভিডিওতে রেকর্ড করতে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছি, মাঝখানে করাণখালি নদী এপারে কুমিরমারি ওপারে মরিচঝাঁপি। মরিচঝাঁপির বেশ কিছু অসহায় পরিবারকে প্রফুল্ল মণ্ডল পঞ্চায়েত প্রধান থাকাকালীন থাকতে দিয়েছিলেন। তারা এখানেই সংসার পেতেছেন। অনেকের সাক্ষাৎকার নিলাম। অমলা সরকার, পঞ্চানন মণ্ডল এরা কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছিলেন কুমিরমারিতে।

সিদ্ধার্থ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী সে সময় সি পি এম-এর উদ্বাস্তু সংগঠন কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (U C R C) এর সুহৃদ মল্লিক ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী দণ্ডক সফর করে সেখান থেকে সতীশ মণ্ডল, রাইহরণ বাড়ৈ, রঙ্গলাল গোলদার ও রবিন চক্রবর্তী— এই চারজন উদ্বাস্তু নেতাকে নৌকা করে সুন্দরবন ভ্রমণ করেন। তাঁদের ৪টি দ্বীপ দেখান, মরিচঝাঁপি (তখন বলা হোত মরিচচক-লেখক), আড়বেলে, আড়দেশিয়া এবং অন্য একটি দ্বীপ। এরপর যাদবপুর ইউ সি আর সি-র উদ্বাস্তু সম্মেলনে মরিচঝাঁপি দ্বীপটিকে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখনও মানা ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে সব উদ্বাস্তুকে সরানো হয়নি।

জ্যোতি বসু ভিলাইয়ের জনসভায় বলেছিলেন, তারা ক্ষমতায় এলে বাঙালি উদ্বাস্তুদের বাংলায় পুনর্বাসন দেবেন। ক্ষমতার আসার পর রাইটার্সে উদ্বাস্তু

নেতাদের জানালেন— তারা নিজস্ব উদ্যোগে কিছু করলে করতে পারেন, সরকার কোনো সহযোগিতা করবে না। ওরা মরিচঝাঁপি এলেন। জলের সমস্যা। প্রথম জলের কলটি দিলেন নিখিলবঙ্গ নাগরিক সমিতির সুব্রত চ্যাটার্জি। গোসাবা থানায় দুটি কল এলো। ওসি জানালেন, সরকারিভাবে ঘোষণা করে কল দুটি দেবার অসুবিধা আছে। ওখানে আছে নিয়ে যান। বেশ কয়েকটি নৌকোও ওরা পেলেন থানা থেকে। পেয়ে গেলেন নৌকার লাইসেন্স। আলিপুর জেলা পরিষদ থেকে দেওয়া হোল সেই লাইসেন্স। তারা লাইসেন্স পেলেন মরিচঝাঁপির স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে। আরও রহস্য এই যে ১৬ মে ১৯৭৯ তারিখে মরিচঝাঁপি থেকে সমস্ত উদ্বাস্তুকে উৎখাত করা হয়, কিন্তু কোলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮ জুন ১৯৭৯ তারিখে দিয়েছেন নেতাজী নগর, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে প্রমাণপত্র। এইভাবে ওরা পেয়েছেন পাউরুটি কারখানারও লাইসেন্স।

উগ্র বাঙালিত্ববাদী নেতা রাম চ্যাটার্জিকেও ব্যবহার করা হল। অনেকের মনে হতে পারে রাম চ্যাটার্জি বোধহয় নিজস্ব উদ্যোগে বাঙালি উদ্বাস্তুপ্রেমী হয়ে সব কাজ করছেন। সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তকে রাম চ্যাটার্জি জানিয়েছিলেন, জ্যোতি বসুর নির্দেশে অথবা তাকে জিজ্ঞাসা না করে তিনি কিছু করেন না। এদিকে জাতীয়তাবাদী নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি উদ্বাস্তুদের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা আছে, তারা মরিচঝাঁপির নাম দিয়েছিলেন 'নেতাজীনগর'। ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ এটা জানতেন, তিনি উদ্বাস্তু দরদী হয়ে পড়লেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা ছিলেন মূলত যশোর খুলনার মানুষ। কুমিরমারির মানুষও ছিলেন মূলত খুলনার লোক এবং নমঃশূদ্র শ্রেণির। এছাড়া কুমিরমারি সহ গোটা দ্বীপটিই ছিল আর এস পি প্রভাবিত। উদ্বাস্তুরা কোনো রাজনৈতিক দলেই গেলেন না। অন্যদিকে 'আমরা বাঙালি'-র তখনকার সম্পাদক অমলেন্দু ভট্টাচার্য ওদের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। অন্যদিকে নিখিলবঙ্গ নাগরিক সমিতি প্রাথমিকভাবে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের সহযোগিতার পরিকল্পনা করে আসছিলেন। ১৩ এপ্রিল ১৯৭৯ তারিখে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিকেল ৫টায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় অবস্থার কথা জানাতে জনসভা করলেন নিখিল বঙ্গ নাগরিক সমিতি। মূলত পূর্ববঙ্গের বাঙালি উদ্বাস্তুদের বিশেষ করে দণ্ডকের উদ্বাস্তুরা শুধু মরিচঝাঁপিতে থাকার স্বপক্ষে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের সঙ্গেই হাত মিলিয়েছেন উদ্বাস্তুরা। কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের রং নিজেদের নিজেদের গায়ে লাগাতে চাননি। ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের কূটকৌশল প্রয়োগ করার মতো ক্ষমতাও তাদের ছিল না। মুখ্য নেতা সতীশ মণ্ডল লেখাপড়া জানতেন না। যুবনেতা পবিত্র বিশ্বাসের কাছে তিনি সই করাটা শিখেছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ। রাইহরণ বাড়ৈ, রঙ্গলাল গোলদার, দেবব্রত বিশ্বাস, এরা পড়াশোনা জানতেন।

জ্যোতি বসু যখন দেখলেন কোনোভাবেই এরা তাদের ছত্রছায়ায় গেলেন না— উপরন্তু নেতৃত্ব চলে যাবার সম্ভাবনা অন্য সংগঠনের হাতে, অপরদিকে প্রথম বামফ্রন্টের মুসলিম বিধায়করা 'অশিক্ষিত নমশূদ্ররা উগ্র মুসলিম বিরোধী' এই তকমা লাগিয়ে পুনর্বাসনের বিরোধিতা করলেন। শৈবাল গুপ্তের 'কেন এরা আসছে ?'—এ পাঠ নিলেন না জ্যোতি বসু। এ সব প্রশ্নে না গিয়ে জ্যোতি বসু ফন্দি ফিকির খুঁজতে লাগলেন উদ্বাস্তুদের বিরোধিতা করার। মানবিকতার প্রশ্নে নয়, মানবাধিকারের রাস্তায় না গিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জনগণের স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধের জায়গা থেকে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারের পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। যুতসই জনমত গঠনের জন্য কোন পদ্ধতি উনি অবলম্বন করেননি ? 'ওরা বিদেশিদের অর্থ সাহায্য পাচ্ছে, মরিচঝাঁপিতে অস্ত্রের কারখানা, বন আইন ভাঙছে, ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা, সমান্তরাল প্রশাসন চালাচ্ছে।' বিলেতে পড়াশোনা করা জ্যোতি বসু ব্রিটিশের Divide and Rule প্রতিষ্ঠা করলেন। একদিকে পুলিশ দিয়ে যতোরকম অত্যাচার সম্ভব, সংগঠিত করলেন। তার সেক্রেটারি, মন্ত্রীদের পাঠালেন। নিজে টাকিতে, মোল্লাখালিতে সভা করে বললেন, 'মরিচঝাঁপি দ্বীপে মানুষের বসতি হলে অন্যান্য দ্বীপের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' এইভাবে পার্শ্ববর্তী দ্বীপের মানুষকে উদ্বাস্তু বিরোধী করে তোলার চেষ্টা করলেন, অন্যদিকে জ্যোতি বসুর ধমক খেয়ে রাম চ্যাটার্জি দালালির ভূমিকা নিলেন। উনি গোপনে উদ্বাস্তু নেতা অরবিন্দ মিস্ত্রিকে নিয়ে গেলেন রাইটার্সে। এইভাবে জ্যোতি বসু উদ্বাস্তু নেতৃত্বের মধ্যেও ভাঙন ধরাবার প্রক্রিয়া চালু করার চেষ্টা চালিয়েছেন। রঙ্গলাল গোলদার, রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস, রাইহরণ বাড়ৈ, পবিত্র বিশ্বাস, সতীশ মণ্ডল— এদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বিধানসভায় সতীশ মণ্ডলের নাম উল্লেখ করে বিষোদগার করেছেন জ্যোতি বসু। উচ্ছেদ প্রক্রিয়ার অঙ্গ ছিল বিরোধী নেতা কাশীকান্ত মৈত্রকে গ্রেপ্তার করা, সাংবাদিকদের ঢুকতে না দেওয়া, পরে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা এবং কোনো মানবাধিকার কর্মীকে ঢুকতে না দেওয়া। 'সিটিজেনস ফর ডেমোক্র্যোসি'র সভাপতি ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, সম্পাদক ছিলেন বিচারপতি ভি এম তারাকুণ্ডে। সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার, অ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে তারাকুণ্ডেকে মরিচঝাঁপিতে আসতে বলেন। খবর পেয়ে জ্যোতি বসু তাঁকে চিঠি লিখে জানান— ওরা আইন ভাঙছে বন নষ্ট করছে। চিঠি দিয়েই ভরসা করেন নি। চলে গেলেন দিল্লিতে তারাকুণ্ডের বাড়ি। অরুণ শৌরী তখন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে। তার কাগজে মরিচঝাঁপির কোনো খবর ছাপা হোত না। অরুণ শৌরী জ্যোতি বসুর পক্ষ নিয়ে তারাকুণ্ডেকে বোঝালেন। তিনি মরিচঝাঁপিতে আসা স্থগিত রাখলেন। এইভাবে রণকৌশল সাজিয়ে পুলিশ বাহিনীর সাথে ক্যাডার বাহিনীকে লেলিয়ে নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত করলেন।

সন্তোষ সরকার, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে একটা পা-কাটা যায় তার। ওর দেখা পেলাম হঠাৎ করে। তখন 'জলঙ্গীর নদীভাঙ্গন' এর সম্পাদনা চলছে। ভিডিও সম্পাদন করছেন জুহুরুল নস্কর, মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান চলছে ও জানতো। জুহুরুল একদিন বললো ও এমন একজনের সন্ধান পেয়েছে যে মরিচঝাঁপিতে পুলিশের গুলি খেয়েও বেঁচে আছে থাকেন ঘুঁটিয়ারি শরিফ-এ। খোঁজ নিয়ে একদিন সকালে গিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করছি আমি আর জুহুরুল। উনি এলেন। সন্তোষ সরকার নিয়ে গেলেন সেই পরিচিত পথের শেষ গ্রামে। আগেও এখানে এসেছি তখন ওর কথা জানতে পারিনি। বামফ্রন্ট সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে। শুধুমাত্র ক্ষুধার অস্ত্রে উদ্বাস্তুদের মেরে ফেলার চক্রান্ত হয়েছিলো। খাদ্য ও পানীয় জলের অবরোধ। যা কুমিরমারি দ্বীপ থেকে আনতে হোত। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে কুমিরমারি দ্বীপে খাদ্য আনতে গিয়ে প্রাণ হারান প্রায় ৪০ জন। ঐ দলে সন্তোষ ছিল। সন্তোষের পায়ে গুলি লাগে। একটা পা বাদ চলে যায়। গুলি করেও ক্ষান্ত হয়নি বামফ্রন্টের পুলিশ, ওকে জেলে পোরা হলো। এতো বড় অপরাধীকে সহজে ছেড়ে দেওয়া যায়! সন্তোষ সরকার এখন একটি এন জি ও চালায়। দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা এই সংস্থার কাজ।

মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুরা উৎখাত হবার কয়েকদিন পরেই নকুল মল্লিক একটি অডিও টেপে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সতীশ মণ্ডল, অরবিন্দ মিস্ত্রি এবং রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের। প্রশান্ত হালদার ছিলেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের যশোর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। আজীবন কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস করে এসেছেন। দেশভাগের পর টাকিতে এসে থাকেন। তিনি লঞ্চ ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন। প্রশান্ত হালদার সম্পর্কে সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারের মেজদা। নিরঞ্জন হালদার যোগাযোগ করিয়ে দেন প্রশান্তবাবুর সঙ্গে। তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন মরিচঝাঁপি কাণ্ডে।

ভারত ভাগ হবার পরে পরেই পূর্ববঙ্গের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকাংশই ভারতে চলে আসেন। এরপর আসেন ব্যবসাদার শ্রেণি। ডিসেম্বর ১৯৪৯ খুলনা এবং ১৯৫০, ৮ ফেব্রুয়ারি বরিশাল ও ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবার পর এক লাখের কাছাকাছি মানুষ ভারতে চলে আসেন। এর ফলে ৮ এপ্রিল ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৫২ সালে পাসপোর্ট-ভিসা চালু হবার পর দু লক্ষ এবং পরবর্তী মাসগুলোতে গড়ে ১০ হাজার করে মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসেন। ১৯৫৫ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় সীমান্ত পার হতে থাকেন মাসে ৩০ হাজার। ১৯৫৬ সাল থেকে মাইগ্রেসন ছাড়া ভারতে আসার কোনো অনুমতি দেওয়া হলো না। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩ শ্রীনগর হজরতবাল মসজিদ থেকে কেশ চুরি যাবার ঘটনায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে দাঙ্গা হয়। তখন বহু হিন্দুরা বিশেষ করে

শ্রমজীবী মানুষেরা ভারতে আশ্রয় নেয়। সমস্যা নিয়ে ১৯৬৪ জানুয়ারির শেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ, অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী, পুনর্বাসন মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না এবং পশ্চিমবঙ্গের সর্বদলীয় নেতারা দুঘণ্টা আলোচনা করেন। ১৯৬৪ সালে যারা পশ্চিমবঙ্গে এলেন, তাদের জন্য কোনো পুনর্বাসন ক্যাম্প খোলা হল না। রিসিভিং সেন্টার থেকে চিরকুট ধরিয়ে বিভিন্ন স্টেশন থেকে তাদের সরাসরি দণ্ডকারণ্য পাঠানো হল। এরাই হচ্ছে সরকারের বাড়তি বোঝা এবং আপদ। এই আপদগুলোকে মানুষ ভাবা হয়নি। তাই নানা শিবিরগুলোতে এদের জেলখানার আসামীদের চেয়েও চরম অব্যবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল। ৮-১০ বছর নারকীয় ক্যাম্প জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে ফেলা হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে।

অনেক চেষ্টা করেও দণ্ডকারণ্যের কোনো যোগাযোগ পাচ্ছি না। দণ্ডকারণ্যর মূল জায়গা যেখান থেকে ব্যাপক উদ্বাস্তু এসেছিলেন মরিচঝাঁপিতে, সেই উড়িষ্যার মালকানগিরি। কোনো সূত্র থেকে যোগাযোগ হয়ে উঠছে না। হঠাৎ একদিন জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের ফোন। ওর বই পড়ে মালকানগিরি এম ভি ৭৯ (মালকানগিরি ভিলেজ নং ৭৯) থেকে চিঠি দিয়েছেন গোবিন্দ হালদার, সঙ্গে টেলিফোন নম্বর। সেদিন ছিল ১৫ ডিসেম্বর ২০০৬। তৎক্ষণাৎ গোবিন্দ হালদারকে টেলিফোন করে আমার উদ্দেশ্য জানাই। উনি জানালেন যারা আমার কাজের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন তাদের নাম টেলিফোন নম্বর কয়েকদিন পর পাঠাচ্ছেন। অবশেষে উনি পাঠালেন ২৪ ডিসেম্বর ২০০৬ এ, ৫ জনের নাম পাঠালেন টেলিফোন নং দিয়ে। একজন পশ্চিমবঙ্গে থাকেন তিনি ওখানে যাতায়াত করেন। মালকানগিরি থেকে প্রকাশিত বই ছাপার কাজ দেখাশুনা করেন। সেই পরিমল বৈদকে টেলিফোন করি। তিনি ২৫ ডিসেম্বর ২০০৬-এ এলেন। ওর কথামতো জানুয়ারি ২০০৭-এর মাঝামাঝি রওনা হই মালকানগিরির উদ্দেশ্যে। বাকি ৪ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি টেলিফোনে। মালকানগিরি পৌঁছে আর অসুবিধে হয়নি। পৌঁছাবার পরদিন ভোরবেলায় রওনা হই মালকানগিরির বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনের জন্য। ৮২ নম্বর গ্রাম পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম প্রথম দিন। ১০০ কিলোমিটার ছিল দূরত্ব। সেদিন সুমো গাড়িতে ছিলেন সুনীল বিশ্বাস, অশোক মালী আরও দু-তিনজন। সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন সুনীলদা। সুনীল বিশ্বাস মালকানগিরি জেলার লেবার অফিসে চাকরি করেন। বাংলা ভাষাকে অন্তত ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে উড়িষ্যায় প্রাথমিক স্তরে পড়ানো হয় তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মালকানগিরিতে দেখলাম যারা ছাত্র-ছাত্রী তারা কেউই বাংলা ভাষা পড়তে জানেন না। ওড়িয়া ভাষা পড়ার মাধ্যম। ওদের সরকারি কাগজে লিখতে হয় মাতৃভাষা ওড়িয়া, বাঙালি হয়েও।

মালকানগিরি সদর থেকে কালীমেলা ৪০ কিলোমিটার। সেখানে সুভাষচন্দ্র তরফদারের সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ হয়েছিল। তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন

বিভিন্ন গ্রামের মরিচঝাঁপিতে অত্যাচারিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার। সুভাষদার সাক্ষাৎকার নেবার পর অন্যান্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। দুদিন পর চলে যাই পটেরু হরিচাঁদ-গুরুচাঁদের আশ্রমে। কালীমেলা থেকে ১০ কিলোমিটার পথ। এতোদিন পরেও রাস্তা নামেই আছে— স্বাভাবিকভাবে চলার যোগ্য হয়ে ওঠে নি। রাস্তা থেকে এক একটা গ্রামের দূরত্ব ২০/২৫ কিলোমিটার। প্রথম দিকে কালীমেলার হাটে কাউকে আসতে গেলে হাঁটা পথে আসতে হোতো। পরদিন গ্রামের বাড়িতে ফিরতেন। জমি সব পাথুরে রাস্তার দুধারে পাহাড়। পাহাড়ের কোলে গ্রাম।

পটেরু একমাত্র নদী মালকানগিরির ভেতর থেকে বয়ে গেছে। সরকার পটেরু নদীর উপর নানান পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখিয়েছেন উদ্বাস্তুদের। আশ্রমটি নদীর পাড়েই— অসম্ভব সুন্দর পরিবেশ। বিজয়চন্দ্র পাড়ী— তিনি আশ্রমের কর্ণধার। ছ'ফুটের উপর লম্বা ঋজু দেহ, বয়স ৬০-এর উপর। উড়িষ্যাভাষী বিজয়বাবু ঠিকাদারির কাজ করতেন মালকানগিরিতে। উদ্বাস্তুদের অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে তিনি মতুয়া ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সব ছেড়ে হরিচাঁদের আশ্রমের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তার আতিথেয়তায় কয়েকদিন আশ্রমে থাকলাম। এখানে প্রথম দেখা হয় মরিচঝাঁপিতে নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালীর সঙ্গে। ওর সাক্ষাৎকার ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। সাইকেল ছাড়া যাবার উপায় নেই কোথাও। আমার জন্য আলাদা করে কোনো সাইকেল পাওয়া গেল না। তাছাড়া ক্যামেরা ও তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র তিনটে ব্যাগ নিয়ে যাতায়াত করাও কঠিন। শিক্ষক নির্মলদার বাড়ি আশ্রম থেকে সাত কিলোমিটার ভিতরে। উনি সাইকেল নিয়েই এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার দণ্ডকারণ্য যাত্রায় ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

বিজয়চন্দ্র পাড়ী মারুতি ভ্যান ব্যবহার করেন। রাত নটার মধ্যে ফেরার কথা কালীমেলা থেকে। পরদিন সকালে আশ্রম ছেড়ে চলে যাবো। রাত সাড়ে নটায় ফোন এলো রাস্তায় গাছ আর কতকগুলো পোস্টার পড়ে। এখানকার মানুষ জানেন এর অর্থ কী? পরদিন ২৬ জানুয়ারি অর্থাৎ মাওবাদীদের ডাকা বন্ধ। বিজয়বাবু রাস্তা থেকে ফিরে গিয়েছেন কালীমেলায়।

আশ্রমে থাকাকালীন স্থানীয় কয়েকটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওদের প্রশ্ন করি— এখানে কি মাওবাদীরা আছে? তখন জানলাম এখানে ওরা জঙ্গল পার্টি নামে পরিচিত। ওরা বললো— আপনি আগে জানালে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। প্রতি সপ্তাহে এরা সবাই যায়— সবাইকে নিয়ে মিটিং হয়, এখান থেকে ৭/৮ কিলোমিটার গ্রামের ভিতরে পাহাড়ের গায়ে। ওরা জানালো— বাঙালিরা কিছু কিছু থাকলেও বেশিরভাগই আদিবাসী। পটেরু থানাটা আশ্রমের উল্টোদিকে নদীর

ওপারে। এই থানা দুবার মাওবাদীরা পুড়িয়ে দেয় লুট করে নিয়ে যায় সমস্ত অস্ত্র। এখন মাঝে মাঝে ওরা থানায় এসে থানার নতুন অস্ত্রগুলো নিয়ে পুরোনো অস্ত্র পাল্টে দিয়ে যায়। এ সব শুনলাম ওদের কাছে।

২৬ জানুয়ারি ২০০৭ ফিরে যাবো মালকানগিরি। সেখান থেকে উমরকোট। দান্তেওয়াড়া, বস্তার হয়ে রায়পুর।

খুব ভোরে উঠে প্রস্তুত হচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বুলেট প্রুফ সাঁজোয়া বাহিনীর গাড়ি। আমাদের মালপত্র নিয়ে পটেরু বাস স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করছি। শুনলাম, ঐ ট্রাকটি মাওবাদীরা উড়িয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ আজ কোনো গাড়ি চলবে না। এখানে সারাদিনে মাত্র কয়েকটি বাস চলে জেপুর পর্যন্ত। জেপুর থেকে উমরকোটের পথ। কোরাপুট সদর ৩০ কিলোমিটার।

সারাদিন সেই অর্থে কোনো কাজ নেই। এখানে শীতকাল বলে কিছু মনে হচ্ছে না। ঘরে ফ্যান চালাতে হয়। শেষ রাতে সামান্য ঠাণ্ডার ছোঁয়া। আশ্রম থেকে পটেরু নদী অনেকখানি দেখা যায়। রাস্তা চোখে পড়ে। দেখি খাকি উর্দিপরা রোগা চেহারার একজন পুলিশ একহাত লম্বা একটা লাঠি নিয়ে এদিক ওদিক করছে। স্থানীয় একজন বললেন, উনি থানায় ওসি। সন্ধে তখনও বাকি। আমি গিয়ে আলাপ করলাম পরিস্থিতিটা জানার জন্যে। এরপর বললাম, 'মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে এমন ঘটনা ঘটে গেল, আপনি একা এভাবে অস্ত্র ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন?' ওসি বললেন, 'মা নাই। বিহা করি নাই, মরিব মরিব কঁড় করিব।' স্থানীয় মানুষের কাছে আরও গল্প শুনলাম, স্থানীয় এম এল এর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে মাওবাদীরা। ধ্বংসস্তূপের মতন দাড়িয়ে আছে বাড়িটা। এম এল এ এখন থাকেন শহরে।

পরদিন সকালে বাস পেয়ে গেলাম, ৪০ কিলোমিটার পথ পেরোতে লাগলো আড়াই ঘণ্টা। মালকানগিরি সদরে পৌছে শুনলাম ছত্তিশগড়ের সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। আমাদের উমরকোট, বস্তার যাওয়া বাতিল করতে হোল।

দণ্ডকারণ্যের পর্বে যতোটুকু দেখেছি তা মালকানগিরিতেই। এখান থেকেই প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ চলে গিয়েছিলেন মরিচঝাঁপি। এমন কোনো গ্রাম নেই যে গ্রামের বহু পরিবারের অনেক সদস্যকে হারিয়ে এসেছেন সুন্দরবনে। ২১৭টি গ্রামের মালকানগিরিতে গড়ে এক একটি গ্রামে ৫০টি করে পরিবার। অতীত স্মৃতির কথা বলতে বলতে ওরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। বার বার অভিসম্পাদ দিচ্ছেন জ্যোতি বসু আর তার বামফ্রন্ট সরকারকে।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল, ছত্তিশগড়ের মানা থেকেও গিয়েছিলো বহু পরিবার। যদি ঠিকমতো গবেষণা কেউ করতে চান তবে বেশির ভাগ হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে পাবেন। পাওয়া সম্ভব। ১২ শতাংশ উদ্বাস্তু মালকানগিরিতে ফিরে যাননি।

মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন ১ লক্ষের উপর উদ্বাস্তু। ২৭/২৮ বছর পর অত্যন্ত কঠিন শ্রম করে বেঁচে থাকার জন্য কিছুটা স্বনির্ভরতা আয়ত্ব করলেও এখনও ৩০ ভাগ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটান। এ তথ্য সরকারি কর্মচারী সুনীল বিশ্বাসের।

কয়েকটা প্রদেশ নিয়ে দণ্ডকারণ্যের ব্যাপ্তি। একটা প্রদেশ থেকে আর একটা প্রদেশের দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটার। বাঙালি বাংলার সংস্কৃতি-শিক্ষার কথা ভাবাই যায় না। পরিকল্পনা করেই এটা করা হয়েছিল। প্রথমেই জানিয়েছিলাম বাঙালি জাতিসত্বার অবলুপ্তি ঘটানোটাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বাংলাটা এখন অপরিষ্কার উচ্চারণ করে। বাইরে তো ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশে হিন্দি, মহারাষ্ট্রে মারাঠি, অন্ধ্রে তেলেগু আর উড়িষ্যায় ওড়িয়া ভাষা লিখতে পড়তে বলতে ওরা অভ্যস্ত। এ প্রজন্মের পর বাংলা বলাটাও ওরা ভুলে যাবে।

মরিচঝাঁপিতে যারা গিয়েছিলেন, যতোজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, প্রত্যেকেই বয়ান একই রকম। পুলিশ আর ভাড়াটে গুণ্ডার নির্মম আক্রমণ। নির্বাচিত সাক্ষাৎকারগুলি তুলে দেওয়া হোল পাঠক-উদ্বাস্তুদের মুখোমুখি করার জন্য।

অমিয়কুমার সামন্ত ছিলেন পুলিশ সুপার অবিভক্ত ২৪ পরগনার। অমিয় সামন্তই যে মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু উৎখাত কাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এটা অনেকের অজানা ছিল। সবাই জানলেন যখন মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্র দেখানো হোল টিভি চ্যানেলে। আর যতটুকু বাকি ছিল তিনিই জানিয়ে দিলেন 'দ্য স্টেটসম্যান ফেস্টিভ্যাল ২০০৯' এবং মরিচঝাঁপি একটি সংকলন গ্রন্থে বিরাট প্রতিবেদন লিখে। কিন্তু অমিয় সামন্ত সম্পর্কে সবাই যে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তা নয়। সিদ্ধার্থ রায়ের গুডবুকে একজন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক আমাকে জানিয়েছিলেন, মরিচঝাঁপি নিয়ে যখন জ্যোতি বসু চিন্তিত, তখন সিদ্ধার্থ রায়ের পরামর্শে জ্যোতি বসু উদ্বাস্তু নিধন কাণ্ডে অমিয় সামন্তকে নিয়োগ করেন।

এই অমিয় সামন্ত সিদ্ধার্থ রায়ের পরামর্শে নকশাল দমনের নামে ১৪ থেকে ১৯ বছরের বহু নিরীহ কিশোর যুবককে খুন করেছিলেন বীরভূমে মাত্র ২০ দিনের মধ্যে। ঘটনার আঁচ পেয়ে শান্তিনিকেতনের তদানীন্তন উপাচার্য দৌড়ে গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে, তিনি সামন্তর নৃশংসতা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী, বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার আসামী, আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরীর পুত্র ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, অমিয় সামন্তর রোষানলে পড়েছিলেন। ভারতজ্যোতির লেখা 'সাতচল্লিশ থেকে সত্তর, আগে এবং পরে' বই থেকে উদ্ধৃতি দিই।

'... লর্ড সিনহা থেকে এলেন অমিয় সামন্ত। স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট, স্পেশাল

ব্রাঞ্চ। দিনটা ২রা বা ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৩। আমাকে হাজির করা হোল সামন্ত সমীপে। একটা সামন্ত এবং অনেক সামন্ত। একটা সামন্তর হাতে লাঠি, অন্য সামন্তদের কোমরে চেম্বার কিন্তু হাত খালি। আমার হাতে হ্যান্ডক্যাপ ও কোমরে দড়ি। শুরু হোল মিঃ সামন্তর জিজ্ঞাসাবাদ। এই প্রথম কোনো পুলিশ অফিসার দু-চারটে প্রশ্ন করলেন। মজার ব্যাপার এই যে, উত্তরটা উনিই দিয়ে দিলেন। ওনার হাতে ছোট একটা লাঠি। লাঠিটা দিয়ে মাঝে মাঝে মারছেন আর প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন করছেন আর উত্তর দিচ্ছেন। পুলিশ আর আই বিরা গোল করে দাঁড়িয়ে আছেন। যেমন,

'অশোক সেনাপতিকে চিনতিস?'

'চিনতাম যে, সে তো আমার চিঠিতেই আছে।' আমি এও জানতাম যে ২২ নভেম্বর ১৯৭১ রাজনগর থানার লাউজোড় গ্রামের নিকড়া বাঁধের কাছে পুলিশ তাকে হত্যা করে। সামন্তই তখন এস পি বীরভূম। rabi দত্ত সেনাপতির স্ত্রী আধঘন্টা আগে গ্রেপ্তার হন পড়সিয়া গ্রাম থেকে। আমি কিছু বলার আগেই উনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন,

'সে এখন কোথায় জানিস?'

আমি উত্তর দেবার আগেই উনিই উত্তর দিয়ে দিলেন,

'আমরা তাকে মেরে দিয়েছি।' উত্তরের সাথে দুটো লাঠির ঘা। সার্কাসের রিং লিডারের মতো। লাঠিটা খুব জোরে চালাচ্ছিলেন না। মনে হচ্ছিল মারটা প্রধান নয়, মারের ডেমানোস্ট্রেশানটা প্রধান। উনি মেরে অধস্তনদের মারের ছাড়পত্র দিচ্ছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন,

'সিদ্ধার্থ মিত্রকে জানতিস?'

আমি 'হ্যাঁ' বলায় (১৯৭১ এর ১৮ অক্টোবর সিধুকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করে পুলিশ। সামন্তই তখন এস পি বীরভূম) উনি প্রশ্ন করলেন,

'সে এখন কোথায় জানিস?'

আমি বললাম, 'আপনারা তাকে মেরে দিয়েছেন।' উনি খুব জোরের সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ।' আবার লাঠির দুঘা।

এ রকম বহু ঘটনার উল্লেখ অমিয় সামন্ত সম্পর্কে।

ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরীকে শেষে বলেছিলেন, 'ইউ আর বর্ন টেরোরিস্ট।' যেহেতু ভারতজ্যোতির পিতা প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। এ কথা বলে অমিয় সামন্ত প্রমাণ করলেন, তিনি যতোই স্বাধীন ভারতের একজন আই পি এস পুলিশ অফিসার হোন না কেন, আসলে মনে প্রাণে অত্যাচারী ব্রিটিশ পুলিশের একজন উত্তরাধিকারী।

আসলে অমিয়কুমার সামন্ত সম্পর্কে এতোসব কথা বলার প্রয়োজন হোত না

যদিনা তিনি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের পর 'মানবাধিকার কর্মীর নামাবলীটা' না পরতেন। এবং মরিচঝাঁপি নিয়ে তার নিজের এবং জ্যোতি বসুর বামফ্রন্ট সরকারের সাফাই না গাইতেন।

তমলুক থানার পাশে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি' প্রতিষ্ঠা করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায়। মূর্তির নিচে লেখা ছিল গীতার শ্লোক— 'যথা নিযুক্তোইস্মি তথা করোমি।' ঠিক তার নীচে উল্লেখ আছে তৎকালীন পুলিশ কর্তা রণজিৎ গুপ্তের নাম। খবরটি পেয়েছিলাম সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছ থেকে। অমিয় সামন্ত গীতার ঐ শ্লোকটি আউড়ে নিজের পাপস্খলন করতে পারতেন। না তিনি করেন নি। অমিয় সামন্ত সুচতুরভাবে বিরাট নিবন্ধে মিথ্যার জাল বিছিয়ে নন্দীগ্রামের পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা করেছেন। মানবতার পূজারী হয়েছেন। আড়ালে সেটি চাপা দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন জ্যোতি বসুর পুলিশ প্রগতিশীল আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ প্রতিক্রিয়াশীল। জ্যোতি বসুর আমলে যতোগুলো গণহত্যা ঘটেছে, এমনকি মরিচঝাঁপিতে তার অধস্তন যে পুলিশ অফিসার সফলভাবে উদ্বাস্তুদের নৌকা ভেঙে ডুবিয়ে মেরে লাশ পাচার করেছিলেন সেই গোসাবার সি আই গঙ্গাধর ভট্টাচার্য যখন তিলজলায় খুন হয়ে গেলেন তার সম্পর্কে একটা শব্দও কি খরচ করেছেন কোথাও? অথবা সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে যে অত্যাচার হয়েছিল বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময়ে— কোথাও কি লিখেছেন কখনো? সিদ্ধার্থ রায় তাকে পুরস্কৃত করে যেতে পারেন নি, তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। সেই সার্টিফিকেটের কল্যাণে জ্যোতি বসু তাকে মরিচঝাঁপিতে পাঠিয়েছিলেন উদ্বাস্তু নিধনের জন্য। জ্যোতি বসু অমিয়বাবুর পদোন্নতি ঘটিয়েছিলেন। হয়তো তার আশা ছিল আরও কিছু, সেটা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেননি। তাই বুদ্ধবাবুর পুলিশের প্রতি তাঁর এত গোঁসা।

তিনি রস মল্লিকের গবেষণাকে আক্রমণ করতে গিয়ে যেটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন— সত্য জানার এবং বলার একমাত্র সূত্র হচ্ছে সরকারি নথিপত্র এবং প্রশাসকের বক্তব্য। বিরোধী বক্তব্য তো ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি, উপরন্তু আক্রমণকে লঘু করে দেখিয়েছেন অমিয়বাবু। তিনি লিখছেন, 'প্রশাসন চলে যাবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু বলপ্রয়োগ করে তাদের লঞ্চে তুলে দেয়নি বা লাঠি-গুলি মেরে তাড়ায়নি।'

অমিয় সামন্ত কোথাও কিন্তু লেখেননি প্রশাসন কী ধরনের 'চাপ' সৃষ্টি করেছিল। তিনি লিখছেন,

'বেআইনিভাবে সংরক্ষিত অরণ্যের গাছ কেটে, মাছ ধরে বা অন্য দ্বীপে দিনমজুরি করে জীবিকানির্বাহ করতেন। পুলিশ এই সমস্ত বেআইনি কাজ বন্ধ করলে

ভলান্টিয়ার বাহিনি ও আগন্তুকরা মরিচঝাঁপির অপর পাড়ে কুমিরমারিতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করে। পুলিশ গুলি চালালে কুমিরমারির দুজন আদিবাসী মহিলা নিহত হন। মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী আগন্তুকরা কেউই নিহত হন নি।'

লক্ষ্যণীয় 'নদীতে মাছ ধরা', 'অন্য দ্বীপে দিন মজুরি করে জীবিকানির্বাহ' করাটাও অমিয় সামন্ত বেআইনি কাজ বলে চিহ্নিত করেছেন। মরিচঝাঁপির 'ভলান্টিয়ার বাহিনী ও আগন্তুকরা' মরিচঝাঁপি ছেড়ে কুমিরমারিতে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ করেছিল, উদ্বাস্তুরা সশস্ত্র পুলিশের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিল? পুলিশ গুলি চালালে তাতে স্থানীয় ২ জন মানুষ মারা যায় কি করে? তাহলে কি ধরে নেব— স্থানীয় মানুষেরা তাদের সহযোগিতা করেছিল? ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে গুলি চলেছিল। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯, ১৪৪ ধারা জারি করে অন্যান্য দ্বীপ থেকে খাদ্য ও পানীয় জল আনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন মরিচঝাঁপি দ্বীপের শিশু ও বৃদ্ধদের মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়ে যায়। তখন মরিয়া কিছু যুবক খাদ্য আনতে কুমিরমারি গেলে তাদের গুলি করে মারা হয়। গুলিতে আদিবাসী মহিলা মেনি মুণ্ডার মৃতদেহটিকেও লঞ্চে তোলা হয়। কিন্তু যেহেতু মেনি মুণ্ডা স্থানীয়, তাই তার দেহটি লোপাট করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়। ধামাচাপা দিতে বিডিও মারফৎ মাত্র ৫ হাজার টাকা কুমিরমারি পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয় মেনি মুণ্ডার পরিবারকে দেবার জন্য। পঞ্চায়েত সেই টাকায় মেনি মুণ্ডার পরিবারকে জমি কিনে দেয়।

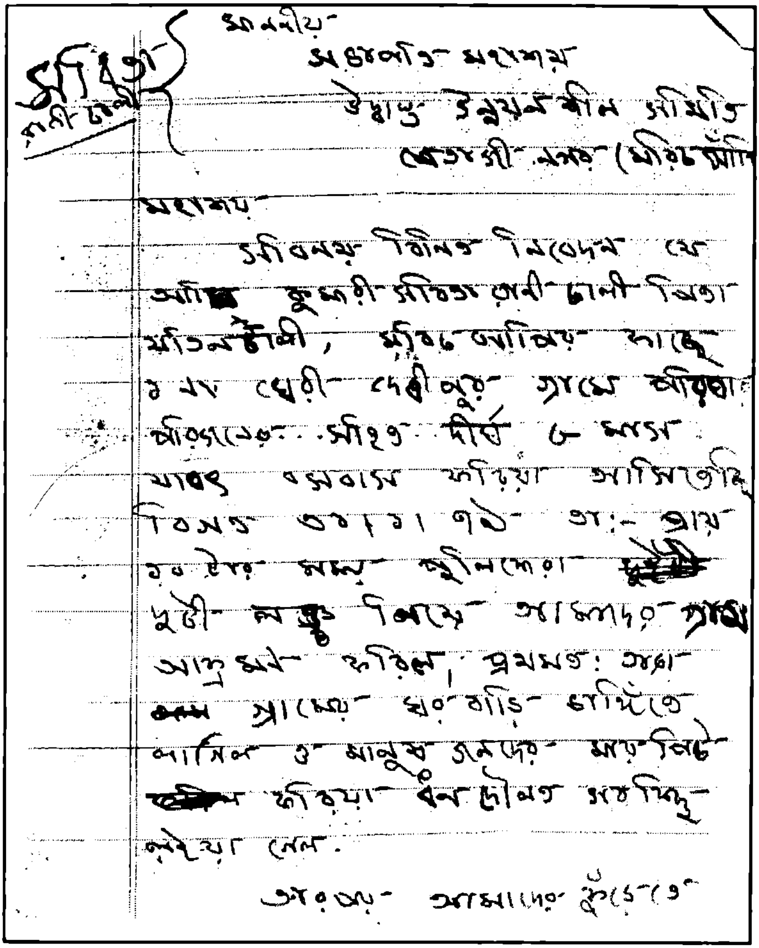
অমিয় সামন্ত দুজন স্থানীয় আদিবাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে স্থানীয় একজনই পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন— সে ঐ মেনি মুণ্ডা।

অমিয় সামন্ত লিখছেন,

'এই সব কাহিনির রচয়িতারা বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার সীমা বেপরোয়াভাবে অতিক্রম করে গিয়েছেন। যেহেতু কোনো প্রতিবাদ হয়নি, তাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পনা লাগামহীন।'

'যেহেতু কোনো প্রতিবাদ হয়নি' তাই তিনি প্রতিবাদের ইতিহাস রচনা করতে শুরু করেছেন। অমিয়বাবু তো কোলকাতা হাইকোর্টে দাঁড়িয়ে সরকারের পক্ষে হলফনামা দিয়েছিলেন— সে কথা উল্লেখ করেনি কেন? সুন্দরবনে যাত্রীবাহী লঞ্চগুলোকে সিজ করেছিলেন— যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জল আইন বিরোধী— তার ধারপাশ দিয়েও গেলেন না কেন? 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কল্পনা লাগামবিহীন' এর বিরুদ্ধে নতুন করে নিরপেক্ষ তদন্ত চাইছেন না কেন?

অমিয়বাবু নিজেই যে মিথ্যার জাল অতি কৌশলে বুনতে পারেন তার কয়েকটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে।

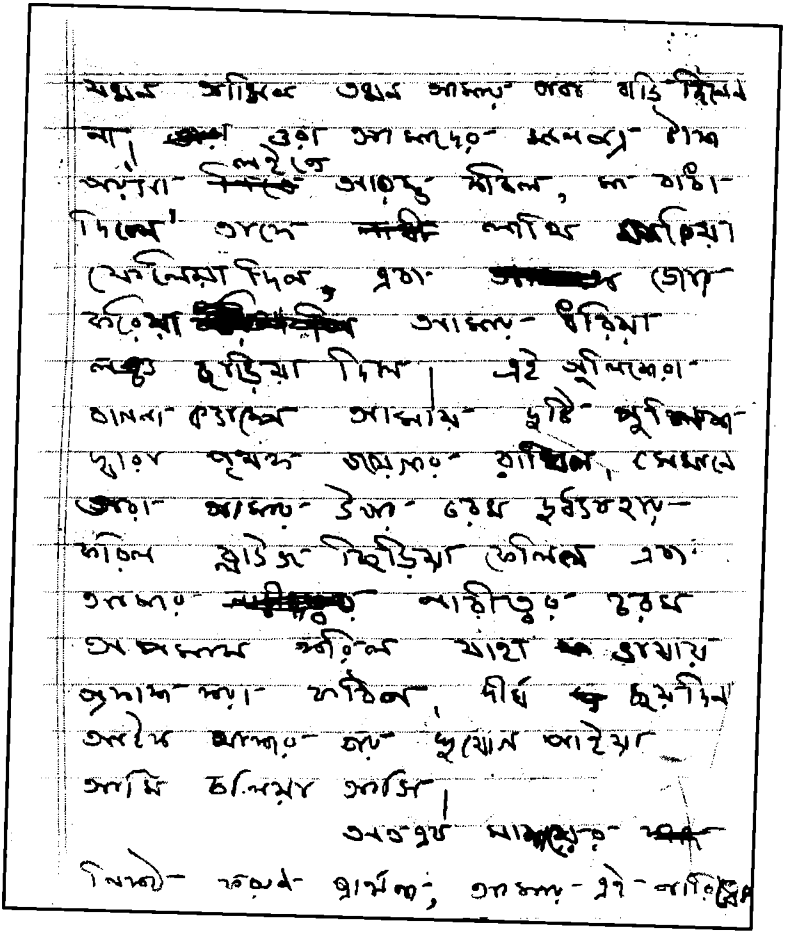


মাননীয়
সভাপতি মহাশয়
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
কেন্দ্রীয় [illegible] (মরিচঝাঁপি)
মহাশয়
সবিনয় বিনীত নিবেদন যে
আমি কুমারী [illegible] রানী ঢালী পিতা
[illegible] ঢালী, মরিচঝাঁপি [illegible]
১ নং শ্রেণী দেবীপুর গ্রামে [illegible]
[illegible] দীর্ঘ ৮ মাস
যাবৎ বসবাস করিয়া আসিতেছি
[illegible]
[illegible] পুলিশেরা
দুটী লঞ্চ নিয়ে আমাদের গ্রামে
আক্রমণ করিল, [illegible]
[illegible] ঘর বাড়ি ভাঙিতে
লাগিল ও মানুষ জনের [illegible]
[illegible] করিয়া [illegible]
লইয়া গেল.
[illegible] আমাদের [illegible]

অমিয়বাবু লিখছেন,

'সম্প্রতি মরিচঝাঁপির উপর যে সিডিটি প্রকাশিত হয়েছে, সিডিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি অংশ দেখানো হয়েছে। সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি দেখানো হয়নি ; সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ২০০৬-২০০৭ সালের শীতকালে কোনো এক সময়।'

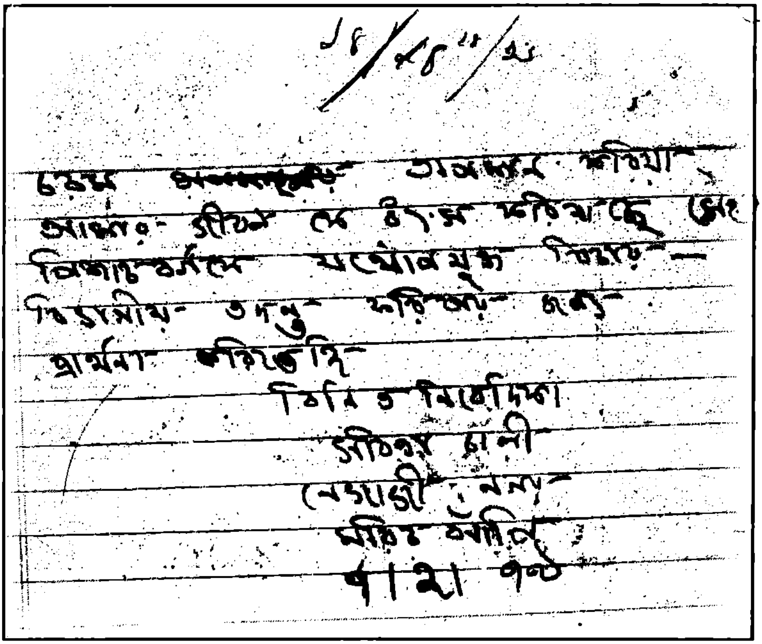
সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বর ২০০৬-এ। ৪২ মিনিট ২ সেকেন্ডের সাক্ষাৎকার ছিল। সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ৮৮ জনের ৪০ ঘণ্টার ভিডিও রেকর্ডিং ছিল। তথ্যচিত্র ছিল ১ ঘণ্টার। স্বভাবতই ৪০ ঘণ্টা ধরে কেউ তথ্যচিত্র



দেখে না নির্মাণও করেন না নির্মাতারা। নির্বাচিত অংশ দেখানো হয়। অমিয়বাবুর যে অংশ দেখানো হয় সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ নয়? খাদ্যে অবরোধ যে হয়েছিল সে কথাতো তিনি স্বীকার করেছেন। মানবিকতার কোন দোহাই দিয়ে মানুষকে না খাইয়ে মারার চক্রান্ত করা যায়? হাজতেও তো আসামীকে না খাইয়ে রাখার কোনো আইন নেই।

তিনি লিখছেন,

'এরপর নিরঞ্জনবাবু জানালেন যে, মরিচঝাঁপি নিয়ে সাক্ষাৎকার নিতে কয়েকজন আসবেন। আমি সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হলাম। যথারীতি সাজসরঞ্জাম নিয়ে কয়েকজন এসেছিলেন। তারা সাক্ষাৎকারটি ভিডিও টেপ করেছিল।'



ধর্ষিতা মহিলা সবিতা ঢালীর চিঠি। এরকম তিনজন ধর্ষিতা মহিলার চিঠি আমরা উদ্ধার করেছি।

সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারের গল্পটি অমিয়বাবু সাজিয়েছেন। 'মাসুম' রোটারি সদনে 'নির্যাতনের' উপর একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। মরিচঝাঁপির তথ্যচিত্র নির্মাতা ঐ সেমিনার কভার করতে গিয়ে দেখেন অমিয়বাবুর সেখানে উপস্থিত। সেখানে অমিয়বাবু নিজের হাতে তার বাড়ির ল্যান্ড এবং মোবাইল নম্বর তথ্যচিত্র নির্মাতার ডাইরিতে লিখে দেন। তার বাড়িতে তিনি একাই ক্যামেরা চালিয়েছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন গাড়ির ড্রাইভার। এখানে নিরঞ্জনবাবুর কোনো ভূমিকা ছিল না। অমিয়বাবু আরও লিখেছেন,

'সাম্প্রতিককালে টিভিতে যে সিডিটি দেখানো হয়েছে, তাতে ঐ সাক্ষাৎকারের সামান্য অংশ আছে, কিন্তু বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে তাদের সাক্ষাৎকার— যারা নাকি নির্যাতনের শিকার। আর কলাকৌশলের সাহায্যে দেখানো হয়েছে, শোনানো হয়েছে গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ।'

আরও অনেক কিছু লিখেছেন, তবে আপত্তি হচ্ছে— এ্যানিমেশনের সাহায্যে ছবি দেখানোকে। 'পুলিশ' প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান শুনে 'আসামী'র ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুর সাক্ষ্যর উপর ছবি আঁকা যাবে না— কোন যুক্তিতে?

অমিয়বাবুরা কজন সাংবাদিককে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে দিয়েছিলেন মরিচঝাঁপিতে?

মরিচঝাঁপিতে সাংবাদিকদের লুকিয়ে যেতে হয়েছিল কেন? সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত, দিলীপ চক্রবর্তী, সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, শশী মুখার্জিকে পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াতে হয় কেন? অমিয়বাবুদের অপারেশন যদি এতই সহজ স্বাভাবিক ছিল তবে তাদের ভয়টা কিসের ছিল?

বিচারপতি ভি কে তারাকুণ্ডের সংস্থা 'সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসি'কে মরিচঝাঁপির তদন্ত আটকাতে জ্যোতি বসুকে তার বাড়িতে ছুটতে হোল কেন? কেন সংসদীয় তদন্ত কমিটিকে বার বার নদীপথে পুলিশ তাদের বাধা দিয়ে সময় নষ্ট করেছিল?

অমিয় সামন্ত, জ্যোতি বসু ও তার বামফ্রন্টকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জালে নিজেই জড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, উদ্বাস্তুরা বাংলাদেশে চাল পাচার করতো। তিনি লিখছেন— 'বাংলাদেশ থেকে আসতো তামাক ও বিড়ি। খুলনা যশোরের বিড়ি বিখ্যাত।' অমিয়বাবু গল্প লিখতে গিয়ে সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছেন। বাংলাদেশে পাতার বিড়ি পাওয়া যায় না। তৈরি হয় কাগজের বিড়ি। পশ্চিমবঙ্গের বিড়ির চাহিদা বাংলাদেশে প্রচুর। সেই কারণে মুর্শিদাবাদের বিড়ি চোরাচালানকারীদের এতো রমরমা।

তিনি ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ গুলি চালানোর কথা বলেছেন সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। খাদ্য অবরোধের বিরুদ্ধে যে রায় কোলকাতা হাইকোর্ট দিয়েছিল— সে প্রসঙ্গেই অমিয়বাবু নিশ্চুপ। মরিচঝাঁপিতে প্রফুল্ল সেনকে আটকাতে জ্যোতি বসুর নির্দেশ 'throughout him'। বিরোধী নেতা কাশীকান্ত মৈত্রকে কেন গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল? সব উদ্বাস্তু যদি স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল তবে অমিয়বাবুর রাইটার্সে এতো ঘন ঘন বৈঠক করতে হয়েছিল কেন?

ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য পুলিশি বয়ান, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, আক্রান্তদের সাক্ষ্য এবং ফটোগ্রাফ ও ফরেনসিক রিপোর্ট দরকার। অমিয় সামন্ত একতরফাভাবে সরকারি বয়ানকেই হাতিয়ার করছেন। কেননা তিনিই তার রচয়িতা।

আই সি এস শৈবাল গুপ্তও প্রশাসক ছিলেন, আই পি এস অমিয়কুমার সামন্তও প্রশাসক। শৈবাল গুপ্ত মানবিকতাকে উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন বলেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ কারেননি। সরকারের দাসত্ব করেননি বলেই ১০ মাসে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করতে পেরেছিলেন। মরিচঝাঁপিতে সরকারের অন্যায় অত্যাচারকে ক্ষমা করেননি। অমিয় সামন্ত রস মল্লিকের পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়ে তার দেওয়া তথ্যকে আক্রমণ করেছেন কিন্তু শৈবাল গুপ্তর লেখা সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি। শৈবাল গুপ্তর লেখাতো বহুল প্রচারিত। সর্বভারতীয় দৈনিক ছাড়াও আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল। শৈবাল গুপ্তর বিশ্লেষণ তথ্যভিত্তিক তো বটেই তাছাড়া তিনি নিজেও একজন দক্ষ প্রশাসক

ছিলেন। সেই শক্ত জায়গায় হাত দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাননি অমিয়বাবু।

ইতিহাস টেনে বার করছে মরিচঝাঁপিকে। অমিয়বাবু ভয় পেয়েছেন। সেই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই তিনি হয়তো মরিচঝাঁপি নিয়ে আরও গল্প লিখবেন।

সাধারণ মানুষকে প্রকৃত শিক্ষার অন্ধকারে যতোদিন রেখে দেওয়া যায় ততোদিন তাদের উপর নিপীড়ন চালানো এবং ভুল বোঝানোটা সহজ হয়। তাই প্রকৃত শিক্ষা, যে শিক্ষা যে কোনো বিষয়কে, ঘটনাকে মৌলিকভাবে বিশ্লেষণ করতে শেখায়— সেই শিক্ষা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার কাজটা কমবেশি বিশ্বের সব সরকার করে থাকে। এক সময় সমষ্টিগত প্রগতির স্বার্থের সমর্থকদের 'জনগণ' হিসেবে দেখা হোত। রাজনৈতিক পার্টিগুলোও 'জনগণ' বলতে অজ্ঞান ছিলো। সেই 'জনগণ' শব্দটি এখন বিলুপ্ত হয়ে 'মানুষ' হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। টাটা, বিড়লা, জিন্দাল, সালেম, আমবানিও মানুষ। আবার কৃষক-শ্রমিক সাধারণ শ্রমজীবীরাও মানুষ। একই পঙক্তিতে ফেললে উন্নয়নের ধারায় কারোর পার্থক্যের প্রয়োজন পড়ে না। সম্প্রতি কয়েকটি লেখায় দেখলাম 'মিথ্যা এবং তথ্যগুলো' জ্ঞানের আধার নিয়ে সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে লেখা হয়েছে। 'মরিচঝাঁপির ঘটনার পর বাঘ যে আরও হিংস্র এবং বেশি মানুষখেকো হয়েছে'— এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে একটি গবেষণাপত্র থেকে। সেই গবেষণাকে আক্রমণ করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে প্রকাশিত না হতে দেওয়া।

জিম করবেট (Jim Corbett) ছিলেন বিখ্যাত শিকারী এবং ব্যাঘ্র গবেষক। কেনিয়া, নাইজেরিয়া থেকে বিশ্বের সমস্ত বাঘের দেশে গবেষণা করেছেন। ভারতবর্ষে ছিলেন ২৭ বছর। তার নামে উত্তরাঞ্চলে 'জিম করবেট ন্যাশানাল পার্ক' তৈরি হওয়া ছাড়াও তার নামাঙ্কিত অসংখ্য সংস্থা আছে আমাদের দেশে। তার লেখা ৬টি বই আছে। ১৯৭৯ সালে ডি সি কালা জিম সম্পর্কে তার বিখ্যাত বই লিখেছেন 'Jim Corbett of Kumaon'। জিম বাঘ সম্পর্কে লিখেছেন— বাঘ 'মানুষখেকো নয়'। পরিস্থিতি তাকে 'মানুষখেকো' করে তোলে। বিশ্বে সুন্দরবনেই বাঘের সংখ্যা সব থেকে বেশি। বৃদ্ধ বাঘেরা যখন শিকার করতে পারে না তখনই তারা মানুষ ধরতে যায়।'

সুন্দরবনের ঝড়খালিতে যখন বাঘের উপদ্রব বাড়ে '৭০ দশকের শেষ দিক থেকে, তখন আমি এবং ৩ জন মাঝি সহ ৭ জন একটি হাতে টানা নৌকো নিয়ে কোলকাতা থেকে সুন্দরবনের ঝড়খালি হয়ে নফরগঞ্জ যাই। পথে মাতলা নদী থেকে যখন খাড়িতে ঢুকতে যাই তখন দেখতে পাই 'বিধবা পল্লী'। যদিও 'বিধবা পল্লী' নামে জায়গা নেই। গ্রাম বাঘের আক্রমণে পুরুষ শূন্য হওয়াতে নাম হয়ে যায় বিধবা

পল্লী। গ্রামে বেশ কয়েকটি ঘরের বাঁশের খুঁটি দেখলাম, জনশূন্য। এরপর ১৯৮৪ তে শুনলাম দয়াপুর, জেমসপুর, লাহিড়পুরের লোকালয়ে বাঘ মাঝে মাঝেই আক্রমণ করছে। আমি এবং অনিমেষ সিনহা ঐ অঞ্চলে চলে যাই। যার বাড়িতে উঠলাম তার স্ত্রী বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন দিন পাঁচেক আগে। ১০, ৬, ৩ বছরের ৩টি মেয়ের মাথা ন্যাড়া মায়ের পারলৌকিক কাজ করেছে ওরা। আমাদের সামনেই বাবাকে মেয়ে ৩টি বলছে— 'তুমি আর মিন ধরতে যেও না।' ভদ্রলোক বললেন, 'মিন না ধরলে খাবো কি!'

শয়ে শয়ে পুরুষ-মহিলা-ছোটরাও নদীতে বাগদা পোনার মিন ধরতে নেমে পড়ে। বনদপ্তরের লাগানো নদীর তীর ধরে বনসৃজন প্রকল্পের ঝোপের মধ্যে বাঘ লুকিয়ে থাকে। সন্ধে নাগাদ বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভদ্রমহিলার উপর। ভদ্রলোক পাশেই ছিলেন— তার মিন ধরার জাল তেকাঠা নিয়ে বাঘকে আঘাত করাতে, বাঘ চলে যায়। আহত স্ত্রীকে রিক্সা ভ্যানে করে চিকিৎসকের কাছে আর নিয়ে পৌঁছতে পারেন নি। আমরা এরপর গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনায় বসি এবং রেকর্ড করি। আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে—

১. বাঘ অনেক বেড়ে গেছে।

২. বাঘের খাদ্য বলতে সজনেখালির পিগারী থেকে দু-একটা শুয়োর দেওয়া হয়। তাতে এতো বাঘের ক্ষিধে মেটে না।

৩. বাঘের পক্ষে হরিণ শিকার করা খুব শক্ত। হরিণের ক্ষিপ্রতা অনেক বেশি।

৪. বাঘের প্রথম পছন্দ কুকুর। এরপর বাছুর গরু।

৫. বাঘের প্রথম পছন্দ যদি মানুষই হবে তাহলে সুন্দরবনে একটি মানুষও এতদিনে থাকতো না।

৬. সুন্দরবনের ৩ অংশ বাংলাদেশ। মানুষের তৈরি দেশভাগের ওরা পরোয়া করে না। ভিসা, পাসপোর্ট ছাড়াই ওরা দু দেশে যাতায়াত করে।

৭. পেটের দায়ে বনদপ্তরের অনুমতি ছাড়া অনেকেই যায় গভীর অরণ্যে মধু এবং কাঠ সংগ্রহ করার জন্য। বাঘের রাজত্বে প্রবেশ করার অপরাধে অনেকে বাঘের শিকার হয়। কিন্তু বাড়িতে সে খবর পৌঁছলে বাড়ির লোক কাঁদতে পারে না বন আধিকারীকদের ভয়ে। কিন্তু মধু নিয়ে ফেরার পথে তাদের নজরে পড়লে অর্ধেক বন দপ্তরের কর্মীদেরকে দিতে হয়।

৮. বনদপ্তর বাঘের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন না। কিন্তু বাঘ যাতে লোকালয়ে না ঢোকে তার জন্য নদীর তীর ধরে ১২ ভোল্টের তড়িৎ প্রবাহের তার দিয়ে হাস্যকর ব্যবস্থা করে রেখেছে কোথাও কোথাও।

বাঘ তার পর্যাপ্ত খাদ্য না পেলেই কেবল মানুষ শিকার করতে যায়। জন্ম থেকেই বাঘ মানুষখেকো, অথবা জন্ম থেকেই শুনে আসছি বাঘ মানুষ খায়, তাই সেটাই

সত্য— এই ধারণাটা মানুষের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়াটা একটা অপরাধ। যেমন সাপ সম্পর্কে এখনও অনেকের ভুল ধারণা আছে। গল্পে, গাথায়, পৌরাণিক যা এতোদিন বলা হয়েছে সত্য তো সেটা নয়। সত্য তো ছিল না 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে'। সত্য এটাই ছিল 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।' এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে কতোদিন লেগেছিল? গোয়েবেলস এর তথ্য এখানে কাজ করেনি। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে। আসলে মরিচঝাঁপিতে মানুষের রক্তের স্বাদ বাঘ এতো বেশি করে পায় যা তার ভাগ্যে আগে জোটেনি। ক্ষুধার্ত বাঘ তাই মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই ১৯৭৯-এর পর লোকালয়ে বাঘের আক্রমণ আরও বেড়ে যায়— এ কথা বুঝতে বিশেষজ্ঞের তত্ত্ব অথবা মিথ্যার ফুলঝুড়ি দিয়ে সাজাতে হয় না, ভুক্তভোগীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

বামফ্রন্টের পুনর্বাসনমন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছিলেন ১৯৭৬-এর পর আর কোনো উদ্বাস্তু কলোনীকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। উদ্বাস্তু নেতা ডাঃ সন্মথনাথ ঘোষ সাক্ষাৎকার জানিয়েছেন তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনায় ১৯৭৯র পর ১১টি উদ্বাস্তু কলোনী বসিয়েছেন এবং তার সরকারি স্বীকৃতি আছে। কিন্তু মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা যারা সংখ্যায় প্রায় ৩ হাজার, পশ্চিমবাংলায় রেল লাইনের পাশে ঝুপড়িতে এবং অন্যান্য জায়গায় নারকীয় অবস্থায় জীবনযাপন করছেন তাদের পুনর্বাসন হয় না।

পশ্চিমবাংলায় যারা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু আছেন তারা গঠন করেছেন 'মরিচঝাঁপি সংগ্রাম সমিতি'। তারা '৩১ জানুয়ারিকে মরিচঝাঁপি দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। ২০১০ সালে ঐ দিনটিতে তারা কোলকাতায় একটি সভা করেন। উদ্দেশ্য ছিল বামফ্রন্ট পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচারের আতঙ্কে যারা আজও আত্মগোপন করে আছেন, ৩০ বছর পর তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং মৃত সাথীদের স্মরণ করা। এরা কেউ সুদূর মালকানগিরি থেকে কোলকাতার বইমেলায় বই উদ্বোধন করতে আসেননি। এসেছিলেন পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে তাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছিল সে খবর জানাতে। সভা সংগঠিত হবার জন্য অনেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর ওপথ মাড়াননি কয়েকজন, কিছু পদ্ধতিগত কারণ দেখিয়ে নিশ্চুপ থেকেছেন। কিছু মানুষ, যারা ভাবেন উপলব্ধি করেন এবং জানেন মানুষের জন্যই পদ্ধতি, আইন, কানুন। আইনকানুনের জন্য মানুষ সৃষ্টি হয়নি। তারা এগিয়ে এসেছিলেন বলেই '৩০ বছর পর দেখা পরস্পর উদ্বাস্তু সাথীদের চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল।' ওরা বলেছিলেন।

'আমরা যারা আজও দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারিনি তাদের আপনারা একটু আপন করে কি নিতে পারবেন? এরপর বাঙ্গালি জাতটাই আর থাকবে না। অবলুপ্তি ঘটবে তার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সবকিছু।'

লেখা যখন মাঝপথে তখন দেবব্রত বিশ্বাসের ফোন। দেবব্রত বিশ্বাস, যে বামফ্রন্টের জারি করা খাদ্য অবরোধের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। সেই দেবব্রত কোলকাতার সাংবাদিকদের নিয়মিত মরিচঝাঁপি নিয়ে যেতেন। সেই দেবব্রত বহু উদ্বাস্তু মৃত শিশুদের হাতে করে জলে ভাসিয়েছেন। ফোনে শুনলাম সেই দেবব্রত বিশ্বাসের ছেলে ২২ বছরের রথীন আত্মহত্যা করেছে। তারিখ ছিল ২০ জুলাই ২০১০। রথীন অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ ছেলে। বহুবার ওর সাথে কথা হয়েছে। মৃগী রোগে আক্রান্ত রথীনের চিকিৎসার জন্য পিতা রাজমিস্ত্রি দেবব্রত ঠিকাদারের অধীনে উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, আসানসোল, শেষে মাসখানেক আগে গিয়েছিলেন ভূপাল। সবটুকু সঞ্চয় খরচ করেছেন ছেলের জন্য। কপর্দকশূন্য পিতাকে ২০ জুলাই সরকারি হাসপাতাল থেকে ফিরে ফোন করেছিল রথীন, 'বাবা অনেক টাকার দরকার চিকিৎসার জন্য।' উত্তরে দেবব্রত বলেছিল, 'আমি পুজোর সময় যাবো, এই টাকাটা যোগাড় করে নিয়ে যাবো, একটু কষ্ট করে থাক।' রথীন বাবাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে আত্মহত্যা করে ঐ দিনই।



সুভাষচন্দ্র তরফদার কলেজে পড়া শিক্ষিত, কথা সাহিত্যিক গবেষক নন। তার প্রতিদিনের সকাল শুরু হয় দণ্ডকারণ্যের এক মোটর গ্যারেজে হাতুড়ি-ওয়েল্ডিং মেসিন হাতে নিয়ে। কাজ করতে করতেই মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, সময় পেলে গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি লেখেন, অভিনয় করেন। এ লেখা তিনি কলম দিয়ে লেখেননি— স্বাধীন ভারতে সভ্য সমাজের মাথায় হাতুড়ির ঘা বসিয়েছেন।

পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারারা কেমন ছিলেন, কেমন আছেন ?

সুভাষচন্দ্র তরফদার

পরাধীন ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই স্বাধীনতার অমৃতকুম্ভ নিয়ে ভীষণভাবে টানাহ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যায়। ক্ষমতালোভীদের বেদম টানাটানিতে কুম্ভ ভেঙে তিন খণ্ডে পরিণত হয়। যে যার খণ্ড হাতের মুঠোয় ধরে মহা সুখে স্বাধীনতারূপ অমৃতের স্বাদ আস্বাদন করে চলেছে। আর সেই ভগ্নকুম্ভের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা বাঙালিরা। তারা আজ যাযাবরের মতো জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অস্তিত্বহীন অবস্থায় সারা ভারতময় লাঞ্ছিত হয়ে বেড়াচ্ছে। একটা জাতিকে বিচ্ছিন্নতার ভয়ঙ্কর ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ফেলে নির্দয়ের মতো তাদের ললাটে 'শরণার্থী' নামক এক মসিরেখা এঁকে দিয়ে সেই সমস্ত গদিভুকের দল তাদের উত্তরসূরীদের হাতে গদি সঁপে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে হারিয়ে গেছে। তারা এবং তাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে গদির রদবদল হলেও ভাগ্যহীন বাঙালি উদ্বাস্তুদের ভাগ্যের কোন রদবদল আজও হল না।

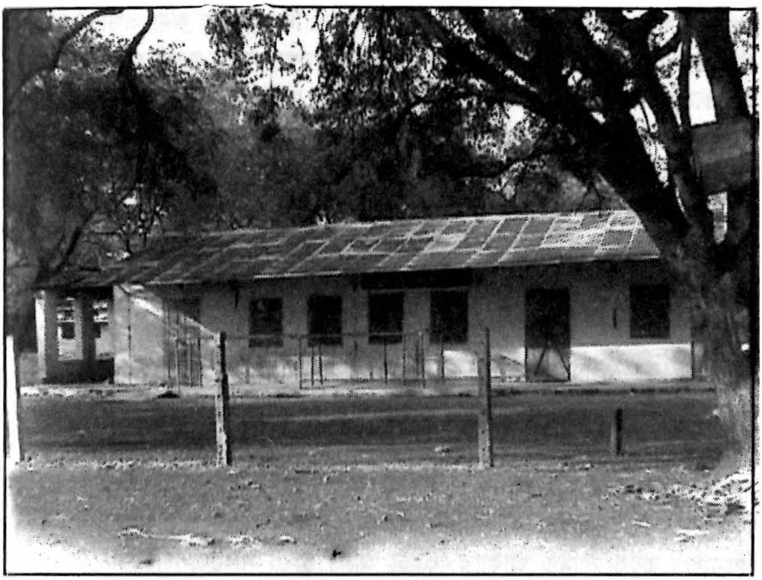
বাংলা বিভাজনের পরের থেকেই প্রাণের ভয়ে, আত্মসম্মানের ভয়ে, দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা অধুনা বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসতে

শুরু করল ভারতের মাটিতে। কারণ ভারতের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশভাগের শিকার হবে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে সম্মানের সহিত ভারত সরকার সুষ্ঠ পুনর্বাসন দিয়ে নাগরিক অধিকার প্রদান করবেন। সেই ভরসায় পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি পরিত্যাগ করে নিঃসম্বল হয়ে পথে নেমে পড়েছিল এই হতভাগ্যের দল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সকল কিছু উপেক্ষা করে এক হাতে সন্তান অন্য হাতে মাথায় মোট ধরে ভাগ্যের ভরসায় পাড়ি দিয়েছিল এ দেশের পথে। সেই থেকে এদের ভাগ্যের ইতিহাস এক নজিরবিহীন করুণ কাহিনির রূপ নিয়েছে। বাস্তুহারার এমন করুণ প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর কোন ইতিহাসের পাতায় আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার করুণ কাহিনি বলতে গেলে বুকটার মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। সে কি নিদারুণ প্রতিচ্ছবি!

সদ্যপ্রসূত শিশুকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে সাথী হারানোর ভয়ে মা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সাথীদের পিছু পিছু। সদ্যজাত কচি শিশু দুর্গম পথের ঝাঁকুনি সহ্য করতে না পেরে মায়ের স্তন মুখে নিয়ে পথি মাঝে কখন যে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে, মমতাময়ী মা তার বিন্দুমাত্র বুঝতে পারেনি। বিরামহীন পথ চলতে চলতে কোনো এক সময় ঘন অন্ধকারে পথের রেখা হারিয়ে সকলে মিলে বসে পড়েছে কোনো এক ঝোপের আড়ে কিংবা বিশাল বাঁশ বাগানের মাঝে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তিতে অসাড় অবস্থায় মাটির উপর বসে মা যখন তার সন্তানের মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, চেয়ে দেখে স্পন্দনহীন সদ্যজাত শিশুর নিথর করুণ চোখ দুটি অসহায় মায়ের মুখপানে স্থির হয়ে আছে। মুহূর্তে শিউরে উঠেছে মায়ের মন। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তীব্র বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো গগনভেদী চিৎকার করে উঠেছে। সেই মাতৃবক্ষ উজাড় করে দেওয়া এই প্রাণফাটা চিৎকারকে প্রতিরোধ করা বিধিরও ক্ষমতার বাইরে। তাই মায়ের মনকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পিতা ভাষাহীন হয়ে নীরবে মায়ের কোল থেকে পুত্রের শবদেহ নিয়ে কোনো ঝোপের আড়ালে ফেলে দিয়েছে।

কখনো বা অপরিণত বয়সের বালক, যে পদভারে নিজের ভার বহন করতে অক্ষম, নিরুপায় পিতা নিষ্ঠুর হয়ে তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে বিশ কেজি ওজনের একটা বৃহৎ মোট। পিতামাতার অসহায় মুখপানে চেয়ে কোমল কিশোর ভুলে গেছে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তির কথা। শুধু অসহনীয় বোঝার ভারে তার সদ্য ফোটা পদ্মের মতো দুটি কমল-নয়নে অবিরল ধারায় ঝরে চলেছে শ্রাবণের ধারা।

কেউ বা বার্ধক্যের ভারে ভারাক্রান্ত দেহটাকে নিয়ে চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, তবুও সন্তানের অদূর ভবিষ্যতের মঙ্গল মানসে পিতৃ-পিতৃব্যের পদধূলি অঙ্কিত বাস্তুভিটে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে চলেছে পরিবারের পিছু পিছু। কিন্তু ভাগ্যের কি কঠোর পরিহাস! বিরামহীন পথের রেখা শেষ হতে না হতেই জরাজীর্ণ



মানা ট্রানজিট ক্যাম্প অফিস। এখান থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কর্নেল এস পি নন্দী এবং বিগ্রেডিয়ার দাস আন্দোলনরত উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পুরানো শরীরটায় আর সঙ্গদান করতে না পেরে মাঝ পথেই জীবন লীলার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে পতিত হল। পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ দিতে ফেলতে পারল না দুফোঁটা চোখের জল, পারল না দেহটা অন্তিম-শয্যা শ্মশান ভূমিতে পৌছে দিতে। অন্ধকার পথিমাঝে জন্মদাতা পিতার শবদেহ ফেলে রেখে ছুটতে হয়েছে এক অজানা আস্তানার সন্ধানে। না জানি কোন মমতাহীন কঠোর হাতে লিখেছিল এই বাঙালি উদ্বাস্তুর ভাগ্যলিপি।

এমনি করে কেউবা হাঁটা পথে, কেউবা নদীপথে সীমানা পেরিয়ে চলে এল ভারতের মাটিতে। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার ভিড়ে কে কোথায় হারিয়ে গেছে কেউ তার হিসাব রাখেনি। মা হারিয়েছে তার বুকের নিধি, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামী, সন্তান হারিয়েছে পিতা-মাতাকে, কত আত্মীয় তার পরমাত্মীয়কে আজও খুঁজে ফিরছে দেশ দেশান্তরে।

সীমানা এলাকা দিয়ে সরকার ক্যাম্প করেছিল বটে, কিন্তু সেখানে না ছিল কোন থাকার ব্যবস্থা, না প্রস্রাব-পায়খানার ব্যবস্থা। নিয়ন্ত্রণহীন অব্যবস্থার কারণে যেখানে খাওয়া সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা। রাস্তাঘাটে রেললাইনের পাশে যে যেখানে যেমন ভাবে একটু জায়গা সংগ্রহ করতে পেরেছে সেখানেই সামান্য পলিথিনের আচ্ছাদন দিয়ে নিজেদের সামান্য মোট বোঁচকা রেখে হন্যে হয়ে খুঁজে বেরিয়েছে

তাকে, যার কাছে গেলে একটু সাহায্য পাবে। এক দিকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা, অন্যদিকে ময়লা আবর্জনা, দুর্গন্ধময় পরিবেশে মশা, মাছি জন্মে রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে লাগল অগণিত প্রাণ। সেকি দুর্বিষহ নরক যন্ত্রণা! এই ভয়ঙ্কর নরক যারা দর্শন করেছে তাদের কাছে কাল্পনিক নরক বর্ণনাকারদের বর্ণিত নরককে স্বর্গ বলে মনে হবে।

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে ওঠা সেই বাস্তব চিত্র কলমের ভাষা দিয়ে প্রতিচ্ছবি এঁকে দেখানো অসম্ভব ব্যাপার। তাই সেই অবর্ণনীয় নরক যন্ত্রণার করুণ কাহিনি আমার কলমের ভাষায় বর্ণনা করতে আমি ব্যর্থ।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের উদ্বাস্তু নামে নামাঙ্কিত করে ভারতে প্রবেশ অধিকার ও তার প্রমাণপত্র দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ট্রানজিট ক্যাম্প করে সমস্ত বাস্তুহারাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। সেই সকল ব্যবস্থার মধ্যে যে কত বড় অব্যবস্থা লুকিয়ে ছিল তার খোঁজ কেউ কখনো নিতে আসেনি। সেই সকল দুরবস্থার বর্ণনা আজ কাগজের পাতায় দিতে গেলে কতগুলি মহাভারতের আকৃতি ধারণ করবে তার হিসেবে দেওয়া কষ্টসাধ্য। তবুও সীমিত আকারে কিছুটা আঁচড় কেটে না গেলে বিষয়টা উহ্য রয়ে যাবে।

ভারতবর্ষে পূর্ববঙ্গের বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য সব থেকে যে বড় ট্রানজিট ক্যাম্প খোলা হয়েছিল তা তখনকার সময়ের মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার 'মানা ক্যাম্প'। তার আশেপাশে মানার অন্তর্ভুক্ত আরও কতগুলি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল, যেমন কেন্দ্রি ক্যাম্প, মানাভাটা ক্যাম্প, বরদা ক্যাম্প, নোয়াগাঁও ক্যাম্প, কুরুদ ক্যাম্প। এই সমস্ত ক্যাম্পগুলি খোলা হয়েছিল মুরাম বিছানো মরুর বুকে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা ময়দানে। দুরন্ত তাপদাহে যে লাল-কালো লৌহ সদৃশ্য মুরাম খনিতে কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে সাহস করে না, সেই নিষ্ঠুর বন্ধ্যা ভূমিতে অসংখ্য তাঁবু ফেলে শস্য-শ্যামল সোনার বাংলার মানুষগুলিকে এনে ছেড়ে দিল।

তাঁবুগুলি মোটা সুতির কাপড়ের উপর মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি করা, কাঠের খুঁটি ওই মুরাম খনি ভেদ করে প্রবেশ করানো অসম্ভব। তাই লোহার রড গেড়ে দিয়ে তাঁবু খাটানো হয়েছে। এই তাঁবুগুলির সঙ্গে উদ্বাস্তুদের জীবনের একটা সাদৃশ্য ছিল। এই তাঁবুগুলিতে একবার সূর্যের তাপে পতিত হলে আর কখনো শীতল হত না। উদ্বাস্তুরা ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবন সূর্য অস্তাচলে যায় বটে, কিন্তু বুকের মাঝে জ্বেলে দিয়ে যায় এক দুরন্ত আগ্নেয়গিরি, যার তাপ দাহ উদ্বাস্তুদের বুকের মাঝে সদা সর্বদা রি রি করে দহন করে চলেছে।

এই উত্তপ্ত মরু বক্ষে গ্রীষ্ম আর বর্ষা ভিন্ন কোনো ঋতুই অনুভূত হত না। শকুন ভিন্ন অন্য কোনো পাখির চেহারা সেখানে দেখা যায় না। জলের সন্ধানে মেসিন

দিয়ে চার-পাঁচশো ফুট গভীরে গিয়ে জলের সন্ধান পেলেও সেই জল হাঁড়ি-বালতিতে আনতে হলে তিন-চারজন শক্তিশালী মানুষে টিউবওয়েলে হ্যান্ডেল মারলে তবে আসত। এই সমস্ত টিউবওয়েল গুলিতে দিবারাত্র কয়েকশো বালতি লাইনে পড়ে থাকত। এবং লাইন বদলে না যায় তার জন্য প্রহরী হয়ে থাকতে হত। খাদ্য হিসাবে প্রতি পরিণত বয়স্কদের প্রতিদিন ৫০০ গ্রাম বোল্ডার চাউল, অপ্রাপ্তবয়সীদের ২৫০ গ্রাম করে চাউল দেওয়া হত। তখনকার সময় ৫৭ পয়সা প্রতি কেজি দরে এই চাউলগুলি দেওয়া হত। চাউল সমেত সকল পণ্য বাবদ মাসে জন প্রতি (প্রাপ্তবয়স্ক) ১০ টাকা দেওয়া হলেও পরিবারের জনসংখ্যা যতই বেশি হোক সর্বাধিক ৭৮ টাকার ওপরে দেওয়া হত না। ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে রায়পুর শহরে খাদ্যদ্রব্য সকল কিছু পাওয়া গেলেও অর্থাভাবে এদের খেতে হত কপির ডাঁটা, বুনো ওল, ওলের ডগা, কচু শাক, হেলেঞ্চা শাক, কলমি শাক ইত্যাদি। জ্বালানীর কোনো ব্যবস্থা সরকার করেনি। কিছু বেসরকারি ব্যবসায়ীরা পাথর গুঁড়ো কয়লা বিক্রি করত। কিন্তু তা দুর্মূল্যের কারণে সবার পক্ষে কেনা সম্ভব হত না। যার ফলে সমস্ত পরিবারের কোনো না কোনো সদস্যকে প্রতিদিন সকালে মুখে কিছু দিয়ে জ্বালানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরোতে হত। আর এটা ছিল অপরিসীম কষ্টসাধ্য কাজ। দীর্ঘ দশ-পনেরো কিলোমিটার মরুপ্রান্তর পাড়ি দিয়ে খুঁজে বের করতে হত কোথায় আছে বেওয়ারিস ঢোলকমলী বাগান। সেখান থেকে শুকনো ডাল সংগ্রহ করে বোঝা বেঁধে মাথায় নিয়ে ফিরতে হত। সেই অসহনীয় জীবনযন্ত্রণার কথা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। দীর্ঘ পার্বত্য প্রান্তর প্রখর রৌদ্রের তাপে তাপিত হয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বন্ধুর পর্বতরাশি। মুক্ত আকাশে অগ্নিপিণ্ডের অগ্নিবর্ষণে বন্ধ্যা ভূমির মুরাম যেন লৌহ কর্মকারের জ্বলন্ত চুল্লি থেকে টেনে আনা লৌহ খণ্ডের রূপ নিয়েছে। তার উপর দিয়ে কেউবা নগ্নপদে, কেউবা টায়ার নির্মিত চটি পরে চলতে গিয়ে পায়ের তলায় বড় বড় ফোসকা পড়ে যেত। দুরন্ত তেষ্টায় বুকটা ফেটে যেতে চাইত। সেই সঙ্গে অদূরে মরীচিকার অলীক স্বপ্ন নিয়ে খেলা, তৃষিত বুকের তৃষা শতগুণ বৃদ্ধি করে তুলত। ওই মায়া মরীচিকার অলীক স্বপ্ন সাগর দেখে মনে হত, 'এই বুঝি অফুরন্ত জলরাশি। আর একটুখানি ধৈর্য্য ধরে চলো মন, ওখানে পৌছাতে পারলে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হবে।'

মন তার সকল শক্তি প্রয়োগ করে চলতে চলতে নয়ন দুটিকে পুনঃ সুধায় 'ওহে নয়ন, চেয়ে দেখ আর কত দূরে সেই জলরাশি?' অসহায় নিরুপায় নয়ন বুঝতে পারে যে সে প্রবঞ্চিত, প্রতারিত। মায়াবিনী মরীচিকা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বটে কিন্তু তার দূরত্বের ব্যবধান বিন্দুমাত্র কমছে না। নয়নের মিথ্যা প্রবোধে দুর্বল মন ধৈর্য্য ধরার ক্ষমতা হারিয়ে দেহখানা নিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ওই তপ্ত মরু-'শয্যা' 'পরে। কত যে তৃষিত প্রাণ দুরন্ত তাপদাহ সহ্য করতে না পেরে নাসিকা দিয়ে

দরদর করে তাজা রক্ত ঝ'রে অকালে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছে, তার কোনো হিসাব আজ আর কোথাও লেখা নেই।

একদিন ভরদুপুরবেলা বরদা ক্যাম্পের এক কোণের দিকে হঠাৎ শোনা গেল এক কিশোরীর প্রাণফাটা চিৎকার। সন্ত্রস্ত অবস্থায় আশেপাশের সকল তাঁবুর লোক জড়ো হয়ে দেখল কিশোরীকে এক মহিলা বেদম ভাবে প্রহার করছে, আর বলছে, 'তুই আর চুরি করবি? ওর থেকে তুই আমার প্রাণটা নিলি না কেন?'

সকলে মিলে মহিলাকে শান্ত করে জানতে চাইল মেয়েটা কি চুরি করেছে? মহিলা মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'কাল রাতের থেকে লাইন দিয়ে এইমাত্র এক বালতি জল পেয়েছি, জলের অভাবে বাচ্চাদের খাবার দিতে পারিনি। এই মেয়ে তার থেকে এক গ্লাস জল চুরি করে খেয়েছে।'

করুণ চোখে কিশোরীর মহিলার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'কাকিমা গো, কাঠ আনতে গিয়ে তেষ্টায় আমার প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, তোমার বালতিতে জল দেখে আমি সইতে পারলাম না। প্রাণ বাঁচাতে তোমাকে না বলে এক গ্লাস জল আমি খেয়েছি, আমায় ক্ষমা করো।'

পৃথিবীর কোনো ইতিহাসকেই বোধ হয় এমন মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হতে হয়নি।

ইতিপূর্বে বাস্তুহারাদের মানা অন্তর্ভুক্ত ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিতে থাকাকালীন তাদের খাদ্য জ্বালানী সংগ্রহের বিষয়ে সামান্য কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সভ্য জগতে বসবাস করে লজ্জা নিবারণের জন্যে তাদের ভাগ্যে যে প্রাপ্তি ঘটেছিল সে বিষয়ে দু'চারটি কথা না বললে নতুন প্রজন্ম বা এ বিষয়ক অজ্ঞাত পাঠক পাঠিকাদের প্রতি অবিচার করা হবে।

সরকারি অনুদান স্বরূপ প্রাপ্তবয়স্কদের ধুতি, কোর্তা (পাঞ্জাবি), মহিলাদের শাড়ি সায়া ব্লাউজ, কিশোর-কিশোরীদের প্যান্ট সার্ট ফ্রক দেওয়া হত। সেই সমস্ত কাপড়গুলি এত নিম্নমানের ছিল যা বর্ণনা করা দুষ্কর। কোর্তা নামক পাঞ্জাবীগুলি পরিধান করলে দূর থেকে মনে হত, কোনো ক্ষেতে কাক বাবুই তাড়ানোর জন্যে বাঁশের আগায় জামা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ধুতির দৈর্ঘ্য ছ'হাত। শাড়িগুলি আট হাত, সায়া ব্লাউজ ফ্রক সার্ট প্যান্ট যাবতীয় সকল বসনের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ত জলে ভেজানোর সঙ্গে সঙ্গে। কারণ মশারীর কাপড়ের উপর মোটা মাড় দিয়ে কাপড়গুলির বড় বড় ফাঁকা লুকানো হয়েছে। এ হেন উৎকৃষ্ট মানের কাপড় দিয়ে যে কলে ফেলে বাস্তুহারাদের অঙ্গের বসন সৃজন করা হয়েছিল, সেই কলের ও কারিগরদের মহিমাও অপরাম্পার। কারণ পোশাকগুলি পরিধান করতে গেলে দেখা গেছে ব্লাউজ কিংবা অঙ্গের বসন যা তার একটা হাত, হাতার মধ্যে প্রবেশ করানোর পরেও আরও দু'একটা হাত প্রবেশের পথ প্রশস্ত। অপর হাতখানা প্রবেশ করাতে

গিয়ে দেখা যাচ্ছে শরীরের ঘর্ম নির্গত হচ্ছে। জলের ছোয়ায় লজ্জাবনত মুখে খিলখিল করে হেসে ওঠা বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রীর বর্ণনা দিয়ে এক বাস্তুহারা মরমি কবি তার গানের ভাষায় প্রতিবাদের সুরে গেয়ে উঠেছিলেন—

কন্ট্রোলেতে যাইগো দিদি দাঁড়াবার যো নাই,
কোলের ছেলে আইছি ফেলে, ক্ষুদার জ্বালায় ছাড়ছে ছাই।।
কন্ট্রোলেতে দিতেছে লবণ, দানা মোটা কয়লারি মতন,
ও সে ঢেকি পেড়ে না কুটিলে খাওয়া যায়না কোনো ছাই।।
কাপড়ের যা দেখলাম অবস্থা, চেনা যায় না
কাপড় না সে পেয়াজের বস্তা,
যে মিনসেরা করে ব্যবস্থা, তাদের কি নেই মা বোন ভাই।।

কবির ভাষায় তীব্র প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হলেও সে প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাত করেনি।

চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতাল ছিল বটে, কিন্তু সেই হাসপাতাল কর্মীদের অবহেলার অন্ত ছিল না। সারাদিন ধরে কয়েকশো রোগী ডাক্তারখানার সামনে প্রখর রৌদ্র তাপে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। যন্ত্রণাকাতর অসুস্থ মানুষের কি ভয়ঙ্কর পরিণতি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অনুভূতিশীল মানুষ ভিন্ন তার অনুমান করা সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ সকলকেই জীবন সংশয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানোর জন্য এক অফুরন্ত প্রতীক্ষায় মরণপণ সংগ্রাম চালাতে হত। বলে রাখা ভালো, মানা অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ক্যাম্পগুলির মধ্যে এক মাত্র ডি কে হাসপাতাল ভিন্ন অন্য কোনো হাসপাতালে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীদের ভর্তি হওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অতএব প্রাণ সংশয় অবস্থার রোগীদের ক্ষেত্রে ডি কে হাসপাতালে পৌঁছানোর ভাগ্য সকলের হত না। বেশির ভাগ রোগীদের এম্বুলেন্সের মধ্যে কিম্বা পায়ে চলা পথে ঝোড়ার মধ্যে দেহ রেখে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

অন্যান্য ক্যাম্পগুলির মধ্যে চাটাইয়ের বেড়া কিংবা গোলাকার তাঁবুর হাসপাতালে রোগীদের জন্যে কম্পাউন্ডার মহাশয় ব্যারেল খানেক লাল রঙের মিক্সচার ওষুধ তৈরি করে রাখতেন। যে কোনো রোগের রোগীই হোক না কেন ওই মিক্সচার রূপে মৃত সঞ্জীবনী নেওয়ার জন্যে সকলকে অবশ্যই একটা করে শিশি হাতে ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এর ব্যতিক্রম হলেই কম্পাউন্ডার সাহেবের ত্রেতাযুগের স্বভাব প্রসূত বিকট দন্ত কড়মড়ি সহযোগে ভর্ৎসনার হাত থেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবও রক্ষা করতে পারতেন না। এছাড়া যে সমস্ত মায়েদের খাদ্যাভাবে, অপুষ্টিজনিত দোষে, দুর্বল ক্ষীণাঙ্গী শিশুদের জন্ম দিতে হয়েছে, জন্মের পর কৃশকায় শিশু বিভিন্ন প্রকার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, সেই সমস্ত মায়েদের প্রতি চিকিৎসকরা যে সমস্ত অশ্লীল

মন্তব্য করে গালিগালাজ করেছেন সেগুলি রুচির প্রসাদে কলমের ফলায় আনতে পারলাম না। তবুও বিপদগ্রস্থ অসহায় দুঃখিনী মা সন্তানের মঙ্গল মানসে সকল প্রকার অশ্লীলতার বাক্যবাণ নীরবে বুক পেতে সহ্য করেছেন। কখনো ভুলেও কোনো মায়ের অন্তর থেকে বেরিয়ে আসেনি একটি প্রতিবাদের শব্দ। শুধু কাতর স্বরে অসহায় নিরুপায় জননী তার সদ্যপ্রসূত শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে তপ্ত অশ্রুধারে ধুইয়ে দিয়েছেন নিষ্ঠুর চিকিৎসকের চরণ দু'খানি।

মানা ডি কে হাসপাতালের একটি বড় শবগৃহ ছিল (ডেড বডি স্টোর)। সেই শব গৃহে অনেক সময় চিকিৎসকদের অবহেলায় ভুল নির্ণয় গ্রহণ করার ফলে রোগ যন্ত্রণায় মূর্চ্ছাগত রোগীদের মৃত ঘোষণা করে ফেলে রেখে আসা হত। এমন ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ অনেক মানুষ আজও জীবিত আছে।

শবগৃহ থেকে জীবন্ত ফিরে আসা একজন শিশুর মর্মান্তিক ঘটনার কথা প্রসঙ্গক্রমে এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুটির বয়স তখন বছর খানেকের মতো হবে। বেশ কয়েকদিন যাবৎ মরমর হওয়ার ফলে মা তাকে হাসপাতালে চিকিসা করাতে এনেছিলেন। অজস্র রোগীর দীর্ঘ সারির প্রতীক্ষার অন্ত হলে মা সন্তানকে নিয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে চিকিৎসকের কাছে। ডাক্তার শিশুটির হাত ধরে দেখলেন। অন্যমনস্ক ভাবে শিশুটির চোখের পাতা টেনে দেখে কি বুঝলেন সে কথা অবশ্য অন্য কারো জানার কথা নয়। ডাক দিলেন বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষারত এক সুইপারকে। সুইপার যথারীতি ডাক্তার সাহেবের আদেশ পালন করতে নীরবে এসে দাঁড়ালেন। ডাক্তার কালবিলম্ব না করে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে শবগৃহে রেখে আসার নির্দেশ জারি করলেন। ডাক্তারের আদেশ শোনা মাত্রেই মায়ের মনে গগনভেদী বিস্ফোরণ শুরু হল। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ভীষণ যন্ত্রণা সইতে না পেরে প্রাণ ফাটা চিৎকার করে সাজোরে নিজ বক্ষে শিশু সন্তানকে জাপটে ধরে বারবার পুনঃ পরীক্ষা করার অনুরোধ করতে লাগলেন। কোনো ফল হল না। ডাক্তারের নির্দেশে সুইপার জোর পূর্বক শিশুটিকে মাতৃ ক্রোড় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মাতৃ মন কিছুতেই স্বীকার করতে পারল না তার সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে। সন্তান হারানোর দুরন্ত ব্যথার বহ্নি তার বুকের মাঝে ভীষণ আগ্নেয়গিরির তাপে তাপিত হতে লাগল। সেই উত্তপ্ত বক্ষে সজোরে চপেটাঘাত করতে করতে ছুটে চলল সন্তান ছিনিয়ে নেওয়া সুইপারের পিছু পিছু। হাসপাতাল নিয়ন্ত্রকদের নির্দেশে দুজন নার্স এসে সদ্য সন্তান হারা মাকে জোর পূর্বক হাসপাতালের বাইরে বহিষ্কৃত করলেন।

সেদিন দেখতে দেখতে নির্মল নীল আকাশের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে আচ্ছাদিত করে ফেলল নিকষ কালো ঘন মেঘমালায়। ভীষণ গর্জন করে সারা আকাশময় চলল বিদ্যুতের প্রবল তাণ্ডব। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুষলধারায় ঝর ঝর করে পড়ল শ্রাবণের ধারা। ভীষণ দুর্যোগের কারণে শবরাশি যাত্রা করতে পারল না শ্মশানভূমিতে।

পরদিন যথারীতি নির্মল স্বচ্ছ আকাশ। শবগুলিকে শ্মশান ভূমিতে পৌছানোর জন্যে শববাহক এসে দাঁড়াল শবগৃহের দ্বার প্রান্তে। দ্বার রক্ষক দ্বার উন্মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার। না, ভূত নয়। গত দিনের সেই শিশুটি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে একটা মহিলা শবের স্তনে মুখ লাগিয়ে টানছে কিন্তু মৃতের বক্ষে জীবন ধারণের অমৃতসুধা না পেয়ে তার বুকের উপর চপেটাঘাত করে সজোরে চিৎকার করছে।

জানিনা নবাগত শিশুর জীবন নিয়ে খেলার অপরাধে সেই জীবনঘাতক চিকিৎসকের কোনো সাজা হয়েছিল কিনা। কিন্তু এদের ভুলের মাশুল গুনতে হয়েছে উদ্বাস্তুদের অসংখ্য জীবন দিয়ে।

বসন্তের বাসন্তী রঙে যখন বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত বৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় স্নিগ্ধ সমীরণে ছড়িয়ে দিত কচি পাতার গন্ধ। ফুলে ফুলে মুকুলে মুকুলে শুরু হত ভ্রমরের গুঞ্জন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার মনাঙ্গনে মধুর সুরে বেজে উঠত বাসন্তী দেবীর আলতা পরা রাঙ্গা পায়ে নূপুরের রুণুঝুণু ঝঙ্কার। ঠিক সেই আনন্দমুখর মুহূর্তে মানা অন্তর্ভুক্ত ক্যাম্পগুলির মানুষের মনে নেমে আসত ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছায়া। প্রখর তাপদাহে তাপিত মোমের তাঁবুর নিচে থাকা অর্দ্ধসেদ্ধ মানুষগুলিকে অকস্মাৎ আক্রমণ করতো প্রলয়ঙ্কর জীবনঘাতী ঘূর্ণাবাতে। দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা ময়দানে কোথা থেকে হঠাৎ দমকা হাওয়া গোলাকার হয়ে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে ছুটে আসত। সেই ঘূর্ণাবাত ধীরে ধীরে বিশাল আকার ধারণ করে ময়দানের ধুলোবালি মুরাম পাথর মহাশূন্যের পানে টেনে তুলে সমস্ত আকাশ বাতাস আচ্ছাদিত করে ফেলত। সেই কাল-গ্রাসী ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীবাত যখন ক্যাম্পের সীমানায় এসে পৌছাত, ভয়ে আতঙ্কে ক্যাম্পের মানুষগুলো পরিত্রাহি রবে যে যার সন্তান-সন্ততিদের বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে দিশেহারা হয়ে নিরুদ্দেশের পথে ছুটে পালাত। কেউবা মহাশূন্যের অদৃশ্য লোকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে, 'কোথা প্রভু রক্ষা করো, প্রভু', বলে পাহাড় ফাটা চিৎকার করত। কেউবা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মুরাম বিছানো ময়দানের উপর মাথা ঠুকে পাগলের ন্যায় ছটফট করত। কেউবা আপন আপন ইষ্ট দেবতার বিগ্রহ বুকের মাঝে জাপটে ধরে কাঁকরময় ধুলির উপর গড়াগড়ি দিয়েছে। না, তাতেও ওই প্রলয় সৃষ্টিকারী ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবাতের কবল থেকে রেহাই পায়নি। তড়িৎ গতির প্রবল প্রবাহ নিয়ে বিশালাকার ঘূর্ণীবায়ু ভূমি আকাশ আচ্ছাদিত করে অন্ধকারময় মৃত্যুর বিভীষিকা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহায় নিঃসম্বল মানুষের আশ্রয় নামক তাঁবুগুলির উপর। নির্দয়ের মতো মুহূর্তের মধ্যে তাঁবুগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে মহাশূন্যের অদৃশ্য লোকে। শুধু কি তাই? সেই সঙ্গে বাঁচার শেষ সম্বল অশন আসন বসন বাসন সকল কিছু উড়িয়ে নিয়ে এক লহমায় বাস্তুহারাদের সর্বহারা করে ছেড়েছে।

এছাড়া ওই মৃত্যুদূতের গতি-পথ থেকে যে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে সে মহাসৌভাগ্যবান। যে পারেনি তাঁকে ওই ঘূর্ণীবাত রূপ ভয়ঙ্কর অসুর নির্দয়ের মতো মহাশূন্য থেকে আছড়ে ফেলে তাঁর প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে। অনেককে যাত্রাপথে পথিমাঝে প্রাণ হারাতে হয়েছে, তার আত্মীয়-পরিজনদের সাথে অন্তিম সাক্ষাৎ করার সুযোগটুকুও পায়নি।

এরপর আছে বর্ষাকাল। সমতল ভূমির উপর দিয়ে একের পর এক তাঁবুগুলি পেতে ব্লক তৈরি করা হয়েছিল। একটা তাঁবুর থেকে আর একটা তাঁবুর সম্মুখ ভাগের ব্যবধান মাত্র দু'তিন হাত। ওই ফাঁকা জায়গাটুকুর মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চুল্লি তৈরি করে রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত। তাঁবুর ভেতর দিকটায় আসবাবপত্র ও বিশ্রামের ব্যবস্থা। এমতবস্থায় প্রবল বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর জল গড়িয়ে চুল্লি থেকে আরম্ভ করে সকল আসবাবপত্র ভিজে জলের উপর থৈ থৈ করে ভাসত। অগত্যা যার যার শিশু সন্তানদের বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে অথৈ জলের উপর অনাহারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। নিরুপায় পিতামাতার কোলের উপর অবোধ শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে এক সময় অসাড় অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ত। অভাগিনী নারী তার স্বামী সন্তানের মুখে এক মুঠো ক্ষুধার অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যে সে কি প্রাণপণ প্রচেষ্টা। জল ভরা চুল্লির 'পরে উপচে পড়া জল সিঞ্চন করে ভিজে কাষ্ঠে অগ্নি সঞ্চার করার বৃথা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভে দুঃখে হাউ হাউ করে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। ওই অভাগীর প্রাণ নিঙড়ানো নীরব অশ্রু বর্ষণের গোপন কাহিনি কি চির গোপন হয়ে থাকবে? পৌঁছাবে না কি কোনোদিন কোনো মানবপ্রেমীর অন্তর-দুয়ারে?

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠান সেনার অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পরিত্রাহি রবে ছুটতে থাকে ভারতাভিমুখে। এই সময় প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে ভারত সরকারের শরণাপন্ন হয়। ভারত সরকার তাদের শরণ দেওয়ার জন্যে মানা ক্যাম্পের আশেপাশে বেশ কয়েকটি শরণার্থী শিবির রচনা করেন। পূর্বেই সেখানকার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলির দুরবস্থার সীমা ছিল না। উপরন্তু শরণার্থী শিবির খোলায় ক্যাম্পগুলিতে শুরু হয় অকালমৃত্যুর ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নৃত্য। অজস্র জনভীড়ে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় পৃথিবীর সমস্ত প্রকার রোগ জীবাণু সংক্রামিত হয়ে দৈনন্দিন শত শত মানুষের প্রাণ মৃত্যু মুখে পতিত হতে লাগল। নিষ্পাপ শিশু যুবা বৃদ্ধের ভয়ানক অকাল মৃত্যুর করুণ দৃশ্য যে কত নির্মম, কত ভয়ঙ্কর, কত মর্মবিদারক, এ দৃশ্যের বাস্তব দর্শক ভিন্ন অন্য কারো পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব ব্যাপার।

এই ভয়ানক মরণযজ্ঞের আহুতি দিতে মানা এরোড্রামের সংলগ্ন প্রায় সাত একর জায়গা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এক মহাশ্মশান। সেই মহাশ্মশানে একের পর এক

মৃতদেহ সাজিয়ে রচনা করা হত এক আকাশচুম্বী বিশাল চিতা। দিবারাত্র কখনই ওই মহাশ্মশানের চিতার আগুন নিভত না। মৃত শবগুলির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর কোনো অবকাশই ছিল না, বলা বাহুল্য শিশু শবগুলিকে অবজ্ঞায় জ্বলন্ত চিতার উপর ছুঁড়ে মারতেও কসুর করেনি।

কখনো এই সমস্ত শবগুলিকে পূর্ণ ভস্মীভূত করা হত না। যার পরিণাম স্বরূপ অর্ধদগ্ধ দেহাবশিষ্ট নিয়ে শেয়াল শকুন আর অগণিত কুকুরের দল ভয়াল কণ্ঠে চিৎকার করে টানা হেঁচড়া করত। সেই নৃশংস মৃত্যুর চরম পরিণতির বীভৎস দৃশ্য কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

এই সকল ভয়াবহ দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শীরা এক এক করে ফুরিয়ে আসছে। এর পর হয়তো এই বাস্তব কাহিনির প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে এ সকল ঘটনা গেঁজাখুরে গল্পে পরিণত হবে। বিশ্বের কোনো মানব দরদী বাস্তুহারাদের মর্মান্তিক জীবনকাহিনিকে স্মরণ করে ঝরাতে আসবে না দু'ফোঁটা চোখের জল। হতভাগ্য পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষগুলোর জীবনযন্ত্রণার করুণ কাহিনি ভেসে উঠবে না কোনো স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের কলমের ফলায়। নিঃশব্দে প্রকৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাবে দুর্ভাগাদের মর্মভেদী কান্নার ধ্বনি।

জগৎমাতা সীতা পারেনি তার শ্বশুর দশরথের প্রতি শ্রাদ্ধর পিণ্ডদানের কথা স্বামী রামকে বোঝাতে। প্রত্যক্ষদর্শীরাও মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে সীতাকে প্রতারিকা সাজিয়েছিল। আর আজ সেই মহাশ্মশান, বাস্তুহারাদের স্মৃতি বিজড়িত মরু প্রান্তর এই বাস্তব কাহিনির সত্য সাক্ষ্য না দিলেও সীতার ন্যায় অভিসম্পাৎ কাউকে করব না। শুধু পৃথিবীরূপ অতিথিশালার নিয়ন্ত্রণ কর্তার কাছে জানিয়ে যেতে চাই তার সৃষ্ট সুন্দর সুসজ্জিত অতিথিশালায় আমরা কেমনভাবে আপ্যায়িত হলাম।

অনেকে হয়তো আমার এই অদৃশ্য পান্থশালার কর্তার প্রতি শিথিল প্রার্থনা সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা হয়তো প্রকাশিত এই প্রবন্ধের ঘটনাবলীকে মাথায় রেখে মুখে কিছু না বললেও অন্তরের উদ্বেগে আমায় বলতে ছাড়ছেন না, 'তুই ব্যাটা আহাম্মক, এত সব অত্যাচারের পরেও তুই কেমন করে ভাবিস কাউকে কিছু বলব না? তুই কি জ্যান্ত না মরা? ব্যাটা কাপুরুষ কোথাকার!'

দেখুন যে যা ভাবুন না কেন অতি দুঃখের সহিত ভাগ্য বিধাতার কাছে জানানো ছাড়া উপায়ই বা কি আছে? কারণ ভারত বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সময়ের স্বাধীনতা সংগ্রামী বা রাজনেতাগণ যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশার কথা ভেবে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তার কতটা কার্যকরী করা হয়েছে তা সুধী জ্ঞানীজন, বিদগ্ধজন, চিন্তাশীল পাঠকবর্গ বিচার করুন। আমি সকলের জ্ঞাতার্থে ভারত বিভাজনকারী কয়েকজন প্রতিনিধি ও রাজনেতাগণের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরলাম। শিরোনামে— 'ভারত বিভাজনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের আটকা পড়া

ওখানকার সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি।' গান্ধীজির প্রতিশ্রুতি (১) 'হিন্দু এবং শিখ যারা আটকে আছেন তারা যদি আর (ওখানে) থাকতে ইচ্ছুক না হন তা হলে সম্ভাব্য যে কোনো উপায় এখানে চলে আসতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে তাদের জীবিকার জন্য কর্মসংস্থান করা যাতে তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়।'

(From : the collected works of Mahatma Gandhi Vol. 89 page 246. The Publication Division, Govt of India.)

পণ্ডিত নেহরুর প্রতিশ্রুতি (২) 'রাজনৈতিক সীমারেখা যাদেরকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যারা সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না, আমরা সেই ভাই-বোনদের কথাও স্মরণ করছি। ঘটনা যাই ঘটুক তারা আমাদের এবং আমাদেরই থাকবেন। আমরা অবশ্যই তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হব।'

(From : Independence and after, (1949) page-5, the publication division, Govt, of India.)

(৩) 'পুনর্বাসনের কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতেই হবে। এর কারণ শুধু এই নয় যে, এটা আমাদের করণীয় কাজ, বরং তাদেরকে কর্মবিহীন এবং দুর্ভোগ রত অবস্থায় ফেলে রাখা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। তাই আমাদেরকে এ কাজ করতেই হবে।' (Ibid, p-5)

(৪) আমি আগেও বলেছি এবং এখনো বলছি, পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করছেন এবং এর জন্যই ওখানে থাকতে পারছেন না। যারা এখানে চলে আসতে চান, যদি তারা ওখানে থাকতে চান, তারা জানেন না যে, কতদিন ওখানে থাকতে পারবেন। (Ibid, p. 29)

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিশ্রুতি :

'যে সকল বাস্তুচ্যুত মানুষ আর্থিক অনটনের মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন এবং এখনও করছেন আমরা তাদের সকলকে পুনর্বাসন দেবার জন্য উদ্বিগ্ন।

(Speeches of Dr. Rajendra Prasad Vol.-1, p-2, The publication Division, Govt of India)

সরদার পটেলের প্রতিশ্রুতি :

(৬) 'যাদের সঙ্গে আমাদের রক্তমাংসের সম্পর্ক, যারা একত্রে আমাদের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, যেহেতু তারা এখন একটা সীমারেখার ওপারে, সেই জন্যই হঠাৎ তারা আমাদের কাছে বিদেশি হয়ে যেতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসরত ভারতীয় বা বংশোদ্ভুত ব্যক্তিরা আফ্রিকার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনো তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। তাদের যদি আমাদের কাছে দাবি করার অধিকার থাকে, তাহলে বাংলার অপর অংশে যারা আটকে আছেন তাদেরও সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে দাবি করার অধিকার আছে।'

[Speeches of Sardar Patel, p-121, the Publication Division, Govt of India]

এ আই সি সি-র ১৫-১১-৪৭ তারিখের সিদ্ধান্ত :

(৭) 'যারা এখনো তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করেননি (অর্থাৎ এখনো ভারতে আসেননি) তাদেরকে সেখানে থাকার জন্য উৎসাহিত করা উচিত, যদি না তারা নিজেরাই সেখান থেকে চলে আসতে চান। কিন্তু যখনই তারা আসতে চাইবেন, তখনই তাদের চলে আসার জন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে। তাদেরকে অন্যের জায়গায় অনুপ্রবেশকারী বলে এবং অপরের দয়ার উপর নির্ভরশীল বলে গণ্য করা যাবে না। তারা অপর যে কোনো ভারতীয় নাগরিকের মতোই অধিকার ভোগ করবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন।'

(From the collected works of Mahatma Gandhi, Vol. 90 page 539. The Publication Division, Govt. of India)

উদ্ধৃত মহান মহান ব্যক্তিদের প্রতিশ্রুতিগুলির কোনো তোয়াক্কা না করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাঠান সেনার অত্যাচারে অত্যাচারিত অপমানিত দগ্ধিভূত-গৃহ পরিত্যাগ করে ভারত অভিমুখে ইং ১৯৭১ সালে প্রাণ বাঁচাতে ছুটে আসা হাজার হাজার শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ভারত সরকার ইং ২৯-১১-১৯৭১ সালে নির্দেশ দিলেন এক বিশেষ পত্র মাধ্যমে।

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখের পর বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের প্রতি ভারত সরকারের পত্র' এক্সপ্রেস লেটার নং ২৬০১১/১৬/৭১-১০ তাং-২৯-১১-১৯৭১ নিউদিল্লি।

'সমস্ত রাজ্যসমূহ, কেন্দ্রশাসিত রাজ্যসমূহের মুখ্য সচিবগণ ও প্রশাসনের প্রতি।'

বিষয় : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না বলে নির্দেশ।

যে সব উদ্বাস্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে এসেছে তাঁদের ভারতের অধিবাসী বলে গণ্য করা যায় না। সুযোগ হলেই তাদের জন্মস্থানে তাদেরকে ফিরে যেতে বলা হল। ১৯৫৫ সালের ভারতের নাগরিকত্বের আইনের ৫/১/(এ) নং ধারা এবং ১৯৫৬ সালের নাগরিকত্ব নিয়মাবলী অনুসারে ভারতের নাগরিক হিসাবে তাদের নাম আর তালিকাভুক্ত হবে না। তারা যদি তাদের নাম ভারতের নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য ভারতের নাগরিকত্ব আইনের ৫/১/(এ) ধারা অনুসারে আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করে তবে তাদের সেই দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। নাগরিকত্ব আইনের ৫/১/(এ) ধারায় দরখাস্তের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান বিষয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে যে ভারতের নাগরিক হিসাবে নাম রেজিস্ট্রি করার অযোগ্য। কেহ মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে এবং আগেকার তারিখ দিয়ে দরখাস্ত করল কিনা তা বিশেষভাবে

অনুসন্ধানযোগ্য। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে আপনার অধীনস্থ সমস্ত নাম নথীভুক্তকারী কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে জানিয়ে দিতে হবে।

স্বাঃ সি এল গোয়াল

আন্ডার সেক্রেটারি, ভারত সরকার।

ইং ১৯৭২ সালে স্বাধীন হল মুজিবের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভারত সরকারের উপরোক্ত নির্দেশনামার উপর সমস্ত শরণার্থীদের সদ্যপ্রসূত বাংলাদশে ফেরত পাঠানো হল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৫ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং প্রজাতন্ত্রী ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি হয়। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই চুক্তিনামায় বারোটি অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদায়, কিংবা ভারতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কোনো কথাই উল্লেখ নেই। এবার বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশার কথা শ্রবণ করে তাদের ব্যথাহত প্রাণে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে দৃশ্যমান কোনো সুহৃদ আছে কিনা?

১৯৭৪ সাল থেকে সরকার তৎকালীন সময়ের ক্যাম্পগুলির উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সেন্টারে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই উদ্যোগে অসম্মতি প্রকাশ করে ক্যাম্পগুলিতে ওঠে বিরাট প্রতিবাদের ঝড়। কারণ, শস্য শ্যামলা সোনার বাংলার মানুষগুলিকে পুনর্বাসন নির্বাচকমণ্ডলী যে সমস্ত জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, সে জায়গাগুলি ভারতবর্ষের সর্বোপরি অশিক্ষিত অনুন্নত অঞ্চল। যেমন— ইংরেজ কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নির্বাসন স্থানে কালাপানী আন্দামান, রাজস্থানের ধূসর মরুপ্রান্তর, মধ্যপ্রদেশের অনুর্বর বন্ধ্যাভূমি, দণ্ডকারণ্যের নিশ্ছিদ্র অরণ্য ছাড়াও ভারতের বরফাবৃত বিপদশঙ্কুল দেশসমূহে। এমনি করে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ভাগ্য নিয়ন্তাগণ যেভাবে ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন, তার মধ্যে দুর্ভাগ্যের এমনি সংকেত পেয়ে ক্যাম্পগুলিতে উঠেছিল প্রবলভাবে প্রতিবাদের ঝড়। এই প্রতিবাদে সমস্ত ক্যাম্পের মানুষগুলি সমস্বরে বলে ওঠেন, 'আমরা বাংলা মায়ের সন্তান। আমাদেরকে আমাদের মাতৃক্রোড় বঙ্গভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হোক।'

এই দাবিতে সমস্ত উদ্বাস্তুদের নিয়ে গড়ে ওঠে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'। এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রীসতীশ মণ্ডল, শ্রী রঙ্গলাল গোলদার, শ্রী রাইচরণ বাড়ই, শ্রী অরবিন্দ মিস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তখনকার সময় ক্যাম্পগুলির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বময় কর্তা ছিলেন কর্নেল নন্দীসাহেব। সমিতির পক্ষ থেকে নন্দী সাহেবের কাছে বঙ্গভূমিতে পুনর্বাসনের আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। শুরু হয় বিশাল বিশাল মিছিল, অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট, আমরণ অনশন।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে নেওয়ার জন্য বারবার গাড়ি ব্লকের সামনে গিয়ে ফিরে আসার ফলে সরকার পক্ষ থেকে সরকারি নির্দেশ অবমাননা করার অপরাধে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সরকারি সমস্ত প্রকার অনুদান থেকে বঞ্চিত করে। ডোল রেশন বন্ধ হওয়ায় ক্যাম্পগুলিতে খাদ্য অভাবে পরিত্রাহি রব উঠে যায়। অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকেও প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করেও বাংলায় পুনর্বাসনের দাবিতে অটল অবিচল হয়ে পড়ে থাকেন সকলে। এরপর গাড়িতে তোলার জন্য শুরু হয় অমানবিকভাবে লাঠি চার্জ। ফলে ডাকের গাড়ি দেখলেই প্রাণ ভয়ে পালাতে শুরু করে সকলে, কিছুতেই যেতে রাজি হলেন না পুনর্বাসন নির্বাচকমণ্ডলীদের নির্বাচিত স্থানে। নন্দী সাহেব বহু প্রচেষ্টার পরেও এ সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারলেন না।

বদলী হলেন কর্নাল নন্দীসাহেব। হয়তো উদ্বাস্তুদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ, কিংবা ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য মনে করে সরকার নন্দী সাহেবকে বদলী করে দিলেন। তার জায়গায় নিয়ে আসেন বিগ্রেডিয়ার দাস সাহেবকে। তিনি এসেই কোনোরূপ বাদ্-প্রতিবাদের পরোয়া না করেই এক বাক্যে সামরিক শক্তির প্রয়োগ করেন। প্রথমে টিয়ার গ্যাস তারপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে ধর্মঘট, মিছিল, অনশন ভেঙ্গে চুরমার করলেন। তাতেও প্রতিবাদের সুর বন্ধ করতে না পেরে জারি করলেন ১৪৪ ধারা। এই ১৪৪ ধারার অনুশাসনে ক্যাম্পের রাস্তাঘাট জনমানবশূন্য হয়ে গেল। এবার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সেন্টারে নেওয়ার জন্য ট্রাক গিয়ে দাঁড়াল ব্লকগুলির সামনে। সঙ্গে থ্রী নট থ্রী রাইফেলধারী সি আর পি এফ জওয়ান।

উদ্বাস্তুরা তাতেও ভীত হলেন না। নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তারস্বরে জানাতে লাগলেন নিজেদের ন্যায্য দাবীর কথা। 'আমরা বাংলার মানুষ, আমাদের বাংলায় পুনর্বাসন দেওয়া হোক।'

কিন্তু সে কথা কেউ কি শুনেছিলেন? না। বাস্তুহারা নিরীহ নিঃসম্বল অসহায় মানুষগুলির পাঁজর ভাঙ্গা চিৎকারেও কিছুতেই কর্ণপাত করলেন না। বিনিময়ে বিগ্রেডিয়ারের নির্দেশে কুরুদ ও মানা ভাটা ক্যাম্পে সি আর পি এফ জওয়ানরা শুরু করেছিল এক অভাবনীয় ভয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম।

মহাভারতের পাতায় কিংবা রামায়ণের পাতায় যে মহাসমর আমরা দেখতে পাই, সেটা রক্তক্ষয়ী মরণযজ্ঞের রূপমাত্র কল্পনা করে অনেকে শিউরে ওঠেন। তবুও তা কল্পনা মাত্র। কিন্তু মানা ভাটা এবং কুরুদ ক্যাম্পের সেই রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রামের বাস্তব রূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আজো বহু সংখ্যায় জীবিত। সেই ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনের আগ্নেয় অস্ত্রে ক্ষত শরীর নিয়ে আজো ঘুরে বেড়াচ্ছেন অসংখ্য মানুষ।

আজো মানুষের আকাশে ভয়ঙ্কর বিভীষিকা বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় গর্জে ওঠে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সালের সেই দিনটির কথা। যে দিনটি মানা ভাটাকে করেছিল শহীদ ভাটা।

বিগ্রেডিয়ার দাস একজন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ার সুবাদে অনেক প্রতিপক্ষের সঙ্গে হয়তো সংঘর্ষ করেছেন, কিন্তু শহীদ ভাটার রণাঙ্গণের মতো অশ্রুঅস্ত্র সম্বলকারী কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে আগ্নেয়শাস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ করতে হয়েছে কি-না আমার জানা নেই।

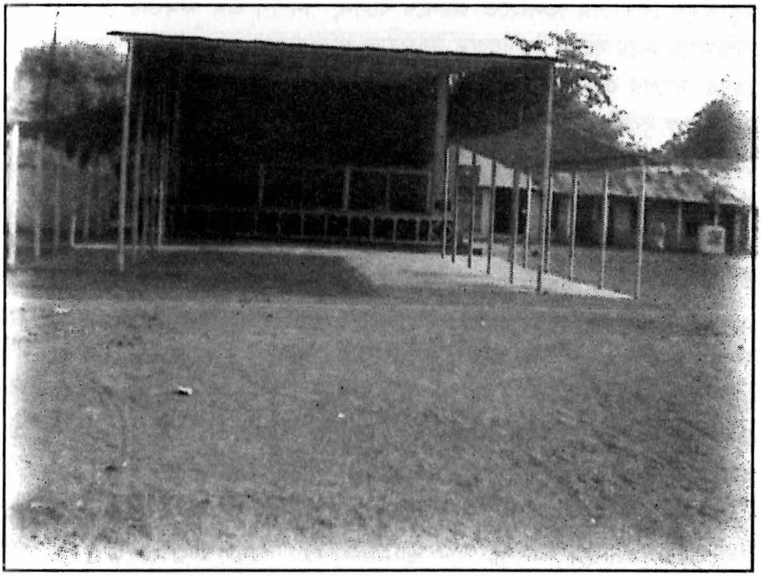
প্রাণ নামক পদার্থ যার মধ্যে অবস্থান করে তার পক্ষে একদল অনাহারে অর্দ্ধমৃত মানুষের উপর প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করার মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে এ কথা কোনো সভ্য জগতের চিন্তাশীল মানব ভাবতে পারে কি-না কে জানে।

বিগ্রেডিয়ার দাস সাহেব কিন্তু অক্লেশে সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন। প্রথমে করেছিলেন নির্দয় ভাবে লাঠি চার্জ। তারপর বিষাক্ত টিয়ার গ্যাস ক্ষেপন করলেন। সেই গ্যাসের বিষক্রিয়ায় মাতৃক্রোড়ে সদ্যজাত শিশু থেকে কিশোর-কিশোরী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। তাতেও তিনি তৃপ্তি বোধ করলেন না। মনের জ্বালা মেটাতে নিষ্ঠুর স্বরে হুকুম জারি করলেন— ফায়ার! নির্দেশ পেতেই বজ্রনিনাদে গর্জে উঠেছিল সেদিন সি আর পি এফ জওয়ানের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল।

বিশাল জনকল্লোলের মধ্যে মুহুর্মুহু বুলেটের গুলি বর্ষণে অবারিত স্রোতধারায় ভেসে যেতে লাগল নিরুপায় নিষ্পাপ বাস্তুহারাদের রক্ত। ভীষণ প্রাণঘাতী ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের বিকট শব্দে, আর তড়িৎ গতিতে ছুটে আসা তীক্ষ্ণ বুলেটের ভয়ে ছুটতে ছুটতে কেউবা পালাতে সক্ষম হয়েছে, কেউবা মাঝ পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছট ফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। এই ভয়ানক রণক্ষেত্র থেকে শিশু বৃদ্ধ মহিলারা পালাতে না পেরে টিনের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া লম্বা ব্যারাক গুলির মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরাও সেখানে রেহাই পায়নি। তীব্র বুলেট চাটাইয়ের বেড়া ভেদ করে উপরের টিন নিয়ে মহাশূন্যে ছুটতে লাগল। বুলেটের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ঘরগুলির সঙ্গে হারিয়ে গেল কত অবলার প্রাণ। যারা বেঁচে ছিল তারা চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ হারিয়ে ভয়ে আতঙ্কে বিকলাঙ্গ বধির উন্মাদ হয়ে রইল।

সে দিনের কুরুদ এবং শহীদ ভাটার সর্বনাশা মরণযজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড নেভাতে অসংখ্য উদ্বাস্তুদের প্রাণ আহুতি দিলেও সরকারি সূত্রে জানান হয়েছিল মৃত তিন ও আহত বারো। 'পথ সংকেত' পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে— ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মানার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শিবিরগুলির উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এরই মধ্যে গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি, ইউ সি আর সি, সি পি এম ও মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারাই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ১৯৭৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মানার শহীদ ভাটার উদ্বাস্তু শিবিরে সি আর পি-র গুলিতে তিন জন প্রাণ দেয়। আহত ১২ জন। ইউ সি আর সি-র সাধারণ সম্পাদক সমর মুখার্জী (এম পি), প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী ৬

এবং ৭ নভেম্বর, ১৯৭৪ মানা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। সমর মুখার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা আরও দুটি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে নিয়ে পৃথক সভা করেন। কুড়ি হাজার মানুষের উপস্থিতিতে একটা কেন্দ্রীয় জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার সভাপতিত্ব করেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, তাছাড়া সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী,



মানা উদ্বাস্তুদের দুর্গামণ্ডপ। এখানে উদ্বাস্তুরা বাংলার বাইরে পাঠানোর বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করেছিলেন।

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি সতীশ মণ্ডল এবং কালীপদ বসু বক্তৃতা করেন। প্রধান বক্তা সমর মুখার্জী উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। ইউ সি আর সি নেতাদের মানা ক্যাম্প সফরের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সমর মুখার্জী কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী খাদিলকরকে এক পত্র লেখেন। পত্রে বলা হয় পুনর্বাসন প্রশ্নটি আমরা সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁরা পুনর্বাসনে প্রস্তুত। কিন্তু জমির গুণাগুণ সেচ ব্যবস্থার সুবিধা, আবহাওয়া সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষেই তাঁরা সন্দিগ্ধ। কারণ, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পুনর্বাসনের এসব সুবিধা মেলেনি। ফলে পুনর্বাসনের পর উদ্বাস্তুরা ব্যাপক হারে চলে এসেছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি তাঁরা চান না। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে পুনর্বাসন পাওয়ার তাদের একান্ত ইচ্ছা। (পথ সংকেত, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫, পৃ. ৭৩)।

এ ছাড়াও মানা অন্তর্ভুক্ত শিবিরগুলিতে পুনর্বাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে উদ্বাস্তুদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার-লাঞ্ছনা নারী ধর্ষণ চলেছে তার সাক্ষী হয়ে আছে বিভিন্ন

পত্রপত্রিকা। (সূত্র— মরিচঝাঁপিঃ নৈঃশব্দ্যের অন্তরালে। জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল। পৃ. ৪০-৫০)

জ্যোতি বসু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি ভিলাইতে সভা করতে যান। তিনি খবর দিয়ে উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার, রাইহরণ বাড়ৈ, কালী বসু প্রমুখ নেতাদের ভিলাইতে আনিয়ে বলেন, 'সি পি এম ক্ষমতায় এলে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাবেন। সুন্দরবনে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবি অবশ্যই পূরণ করবো।' ১৯৭৫ সালের জুন মাসে কুরুদ ক্যাম্পে গুলি চলে। সি আর পি এফ রাত্রে শিবির থেকে এক যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে একাধিক ব্যক্তি মিলে বলাৎকারের পর ভোরে ফেরৎ দিয়ে যায়। উদ্বাস্তুরা দলবদ্ধভাবে পশ্চিমবাংলা তথা কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ২৬ জুন, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় তাদের শ্লোগান ছাপা হয়। 'চল কলকাতা, চল সুন্দরবন'। রায়পুরে পাওয়া এক হ্যান্ডবিলে লেখা ছিল, মানা উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির প্রতিনিধি দল মে মাসে হাসনাবাদ থেকে লঞ্চে করে গোসাবা থানার মরিচঝাঁপি যান। ১২৫ মাইল বিরাট চরের বিপরীত দিকে একশো বছর পুরোনো একটা গ্রাম আছে। সেখানকার মানুষ তাদের বলেছেন, এখানে ৫ ফুটের বেশি উঁচু জোয়ার আসে না। আমরা যদি ৫ ফুট উঁচু বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকিয়ে ১০০ বছর ধরে চাষ করতে পারি তোমরা পারবে না কেন ?... ওখানে মাছ ধরারও সুযোগ আছে। এখানেই ১৬ হাজার পরিবার অর্থাৎ মানার সব লোকের পুনর্বাসন সম্ভব। এই সুন্দর বনের দণ্ড পাসুরেও আরও ৩০ হাজারের পুনর্বাসন সম্ভব। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ জুন, ১৯৭৫)

এদিকে কলকাতার খবর, রাজ্যের বিরোধী নেতারা বিভিন্ন রাজ্যের এম পিদের নিয়ে চলতি মাসের শেষে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাদিলকরের কাছে একটা ডেপুটেশন যাচ্ছেন। এই প্রতিনিধি দলে ত্রিদিব চৌধুরি, জ্যোতি বসু, জ্যোতির্ময় বসু, সমর গুহ, ডাঃ কানাই ভট্টাচার্য, যতীন চক্রবর্তী ও মহারাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ব্লকের এম পি শ্রী ধৌতে থাকছেন। এই প্রতিনিধি দল দাবি করবেন যে, এখনো পূর্ব বঙ্গাগত যে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা হয়নি, তাদের পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২ জুন, ১৯৭৫)

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে সকলই হয়ে দাঁড়াল প্রবঞ্চনা মাত্র। রক্তের বিনিময়ে প্রাণের বিনিময়ে অভাগা বাস্তুহারার দল ফিরে পেল না তাদর বঞ্চিত বঙ্গভূমি। শেষমেষ ভাগ্যের উপর ভরসা করে স্ত্রী পুত্র পরিজনদের ভবিষ্যৎ কামনায় তাদের হাত ধরে চড়ে বসল পুনর্বাসন কেন্দ্রে পৌছানোর ট্রাকে 'হায়রে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জীবন।' যে বলেছিল সে কি কখনো পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের কথা ভেবে বলেছিল ?

ক্যাম্প নিয়ন্ত্রকের সংকেত পেতেই মানা ক্যাম্প থেকে প্রায় আটশো/হাজার

কিলোমিটার দূরত্বের পথ মালবাহী ট্রাকগুলি উদ্বাস্তু নামক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব লোড করে স্বমহিমায় উদন্ত নৃত্য করতে করতে পাহাড়-পর্বত ঘাট-পথ পেরিয়ে আনলোড করল পুনর্বাসন কেন্দ্রের ক্যাম্পগুলিতে। কোথাও বা জল জাহাজ ভর্তি করে অফুরন্ত জলরাশির বুক চিরে দীর্ঘ দুই তিন দিন পরে নিয়ে ফেলে এল জনমানবহীন সাগর দ্বীপে। কেউবা পতিত হল দিগন্ত প্রসারী তপ্ত বালুকাময় রাজস্থানের মরু প্রান্তরে।

এমনি করে বঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গের অসহায় উদ্বাস্তুদের সারা ভারতময় ১৬৪ জায়গায় (সরকারি হিসাবে) তিল তিল করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হল।

বিশেষ করে দণ্ডকারণ্যের ঘন অন্ধকারময় অরণ্য মাঝে, যেখানে তৎকালীন সময় সূর্যের আলো পর্যন্ত প্রবেশ করতে সাহস করেনি। বাঘ, ভাল্লুক, শেয়াল ইত্যাদি হিংস্র বন্যপশুর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। তারই মাঝে জংলী গাছের এক দেড় হাত উপর দিয়ে কেটে কিছুটা জায়গা ফাঁকা করে তারই মাঝে নির্মাণ করা হয়েছিল উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প। সেই সমস্ত জায়গা দেখিয়ে দিয়ে কিবা রাত্রে, কিবা দিনে, সন্ধ্যা সকাল যখন পেরেছে ফেলে দিয়েছে দু'তিন ট্রাক করে অর্দ্ধমৃত মানুষ।

হঠাৎ সভ্যতার আলোক থেকে কতগুলি সভ্যজাতির মানুষদের অন্ধকারময় নির্জন অরণ্য মাঝে যার চারদিকে আকাশ ছোঁয়া গিরিমালায় পরিবেষ্টিত, সেই উদাস বনভূমিতে ফেলে দিলে তাদের মানসিক অবস্থা কোথায় গিয়ে অবস্থান করতে পারে। কোনো সভ্য জগতের শিক্ষিত মানুষ এ অবস্থার কথা কল্পনা করলে জ্ঞান হারিয়ে বসবে।

প্রবাদ বাক্যে বলে, 'যার কেউ নেই তার ভগবান সহায়' কথাটা অবশ্য শহরের আলোক ঝলমল স্বর্গলোকের দিব্য সিংহাসনে বসে অস্বীকার করলেও, বিপদসঙ্কুল গিরি-কন্দরে বন্ধু-বান্ধব বিহীন অসহায় অবস্থায় ঘোর কাননে দিশেহারা উদ্বাস্তু নামক মানুষগুলির স্বীকার না করে কোনো উপায় ছিল না। সেই অবর্ণনীয় কঠিন মুহূর্তে ভয়ে প্রকম্পিত অন্তরের করুণ আর্তনাদ শোনার মতো এক পরমেশ্বর ভিন্ন তাদের পাশে আর কোনো সুহৃদ ছিল না।

অতএব যে যার পরিবারবর্গ নিয়ে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করে 'হা ভগবান-কোথা ভগবান' বলে পরিত্রাহি রবে ডাকতে লাগল। 'অদৃশ্য ভাগ্য বিধাতার নিষ্ঠুর কলমের রেখা কোন পরিণতিতে নিয়ে ইতি রেখা টেনেছে কেউ তা বলতে পারে না। শুধু তার রেখাপাতের শেষ পরিণতির মুখাপেক্ষী হয়ে প্রতীক্ষা করা ভিন্ন কারো কোনো উপায় থাকে না।' এদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। মালবাহী ট্রাক দীর্ঘ আটশো কিলোমিটার উঁচু-নীচু, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি ঘাটীপথে বেদম ঝাঁকানি ঝাঁকতে ঝাঁকতে এনে ফেলার পরেও ভয়ে-শঙ্কায় না ছিল কারো পেটে ক্ষুধা, না ছিল চোখে ঘুম। সদা সর্বদা সকলের মনের মাঝে বেজে চলত এক ভয়ানক আতঙ্কের সুর। কখন বুঝি এই অরণ্যের হিংস্র পশু দলের উদর গহ্বরে অকালে প্রাণটা হারায়। 'কাল রাত্রের করাল ছবির স্বপ্ন অনেকে দেখেছে, যার স্মরণে দিবালোকে সমস্ত শরীরে

শিহরণ জাগে। সেই ভয়ঙ্কর কালরাত্রির কবলে পড়ার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল সেদিন দণ্ডকবাসী উদ্বাস্তুর দল।'

মনে পড়ে সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সর্বগ্রাসী রাক্ষসীর ন্যায় ধীরে ধীরে রাতের নিকষ কালো আঁধার প্রগাঢ় হয়ে ঘিরে ধরতে লাগল। শুরু হল নির্জন বনভূমিতে কর্কশ সুরে বিরামহীন ঝিঁ-ঝিঁ পোকার কর্ণবিদারক ধ্বনি। চারিদিক থেকে মড়মড় শব্দে আঁধার ঘেরা শান্ত বনানীর সবুজ লতা-গুল্ম চূর্ণবিচূর্ণ করে ছুটে আসা হিংস্র বন্যপশুর পদধ্বনি। তাদের গুরু-গম্ভীর কণ্ঠের চিৎকারে পরিস্থিতি ভীষণ ভয়াবহ করে তুলতে লাগল। ভয়ে পরাণ দুরু দুরু করছে সকলের। এমন প্রাণ সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে কে-ই বা সুখের নিদ্রায় যামিনী যাপন করতে পারে। ভয়ে-শঙ্কায়-আতঙ্কে অসাড় অবস্থায় যে যার তাঁবুর মুখ-বন্ধ বেঁধে নিয়ে প্রাণপণে ইষ্ট দেবতাকে ডাকতে আরম্ভ করল।

বন্য পশুর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ওই নির্জন অরণ্য। হঠাৎ তাদের অবর্তমানে তাদের স্বর্গরাজ্যের মধ্যে দিবালোকে নিশাচরদের দিবা-নিদ্রার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে কখন এসে এই উদ্বাস্তু নামক নতুন প্রজাতির জীব এসে বাসা গেড়েছে তারা আর সংকেত পায়নি। তাই সন্ধ্যারানির আঁচল বিছাতেই ধীরে ধীরে গাত্র উত্থান করতে লাগলেন অরণ্য প্রদেশের ভূস্বামীগণ। বিরাট বিরাট বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণী মানব-শরীরের গন্ধ পেয়ে তাদের উদর গহ্বর শূন্য হয়ে ক্ষুধার তাড়না বৃদ্ধি পেতে লাগল। তারা শশব্যস্তে সপরিবারে ছুটে আসতে লাগল তাঁবুগুলির দিকে। তাঁবুর কাছে এসে একসাথে মহাভোজনের আয়োজন দেখে তাদের মুখের লালাগ্রন্থির বাঁধ ভেঙে দর দর করে লালা ঝরতে আরম্ভ করল। আনন্দে উত্তেজনায় গম্ভীর স্বরে গর্জন করে আশিস জানাতে লাগল তাদের, যারা অযাচিতভাবে তাদের কাছে এই ভোজন সামগ্রী প্রেরণ করেছেন।

ক্ষুধিত উদর নিয়ে আর কতক্ষণই বা ভজন-কীর্তন সম্ভব। এবার সকলে মিলে বিকট হুঙ্কার ছেড়ে দুর্বল তাঁবুগুলির উপর সজোরে থাবা হানতে শুরু করল। বিশাল শক্তিশালী ভাল্লুকের তীক্ষ্ণ নখাঘাতে ফর ফর শব্দে তাঁবু চিরে ফেঁড়ে ফেলতে আরম্ভ করল। না, আর কারো রক্ষে নেই। 'বাঁচাও-বাঁচাও'— বলে প্রাণভয়ে উদ্বাস্তুরা সমস্বরে আকাশভেদী মরণ চিৎকার করে উঠল। পরিণত বয়েসের সকলেই দা কুড়ুল শাবল কোদাল লাঠি যে যার হাতের কাছে পেয়েছে তাই দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে রুখে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। অতগুলি কণ্ঠের সমবেত চিৎকারে তখনকার মতো পশুদল কিছুটা সরে গিয়ে ওদের প্রাণ ভিক্ষা দিলেও নরমাংস ভোজনের লিপ্সা মন থেকে একেবারে পরিত্যাগ করেনি। পরবর্তীকালে সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে উদ্বাস্তুদের তাজা দেহ তারা উদরস্থ করেছে।

এই প্রবন্ধে মানা অন্তর্ভুক্ত ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি থেকে দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসন কেন্দ্রে

পৌঁছানোর কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরের ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার পূর্বে দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্ম রহস্য সম্পর্কে কিছু তথ্যমূলক ঘটনার অবতারণা আবশ্যক বলে মনে করছি।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ ভাগ হলেও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অবাধ যাতায়াত চলতে থাকে ১৯৫২ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। তখনো মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সাড়া জাগেনি 'এ দেশ আমার নয়গো বন্ধু, এ দেশ আমার নয়।' ১৯৫২ সালের ১৫ অক্টোবর দুই দেশের মধ্যে সরকার পাসপোর্ট প্রথার ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষগুলি সর্বতোভাবে অনাথ অসহায় হয়ে পড়ে। মুসলিম লীগের নির্মম অত্যাচার পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়কে অতিষ্ঠ করে তোলে। ধর্মীয় পীড়ন, অর্থনীতি, সামাজিক পীড়ন, নারীর শ্লীলতার নিরাপত্তা হারিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রবল জনস্রোতের রূপ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মাইগ্রেশান সার্টিফিকেট নিয়ে ভারতে আসার সুযোগ পায়। ওই সময়ের মধ্যে সরকারি হিসাবে ৫০ লক্ষের অধিক মানুষ বাস্তুভিটে সহ স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এঁদেরকে আশ্রয় দিতে ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়— চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, ঘুঘুড়ি, সোনারপুর, হুগলি, শিয়ালদহ, হাওড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মাধবপুর, বাগজোলা, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে ক্যাম্প নির্মাণ করে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেন। এই সকল ক্যাম্পগুলিতে স্থান পায় মাত্র তিন লক্ষ উদ্বাস্তু। বাকিরা যার যার মত করে আস্তানা করে নেয়।

সরকারি নেতৃত্ব এদেরকে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিলেও ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যার ফলে সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও উদ্বাস্তুদের সুবিধা অসুবিধা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে কয়েকটি উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে ওঠে। যেমন— সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদ, ইউনাইটেড পিপলস অর্গানাইজেশন, ইউ সি আর সি ইত্যাদি। এই সকল সংগঠনগুলি সরকার পক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় বোঝাপড়া করতে থাকে।

১৯৫৭ সালে ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলার বাইরে পাঠানোর নীতি সরকার গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে বাংলার সমস্ত ক্যাম্পগুলিতে ওঠে প্রবল প্রতিবাদের ঝড়। সরকারের এই ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে ১৯৫৮ সালের ১১ ও ১২ জানুয়ারি কলিকাতার উপকণ্ঠে বাগজোলা ক্যাম্পে সারা বাংলা বাস্তুহারা সংসদের উদ্যোগে এক বিশাল সভা আহুত হয়। ওই সভায় উদ্বাস্তু আন্দোলনে সর্বপ্রথম শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল আহুত হন এবং সক্রিয়ভাবে উদ্বাস্তু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ওই সভার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে শ্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল উদ্বাস্তুদের বহির্বাংলায় প্রেরণের প্রতিবাদে ভাষণ দান করেন।

১১ আগস্ট ১৯৫৮ সালে ইউ সি আর সি (ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল) এর পক্ষ থেকে তৎকালীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে যে দাবিসনদ পেশ করা হয় তা নিম্নরূপ— '... সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৬২.৫ বর্গমাইল জায়গায় ৬,৮৭৫টি এবং মাছের ভেড়ি থেকে ১২ হাজার একরে ৩,০০০টি উদ্বাস্তু কৃষি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে।'

অপরদিকে সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন তার দাবি সনদে বলেন— 'দণ্ডকারণ্যের বরাদ্দ অর্থে সুন্দরবনের সমস্যা ও গঙ্গা ব্যারেজ সফল করা সম্ভব।'

১৯৫৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর যাদবপুর বাপুজী কলোনিতে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের যে সম্মেলন হয় তাতে ঘোষণা করা হয়— 'পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুনর্বাসনের সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকিতে উদ্বাস্তুদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডকারণ্যে ও পশ্চিমবাংলার বাহিরে পুনর্বাসনের জন্যে পাঠাইবার কোনো যুক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সম্মেলন সরকারের এইরূপ প্রচেষ্টা সর্বশক্তি দিয়া প্রতিরোধ করিবার সিদ্ধান্ত করিতেছে। এই সম্মেলন আরও মনে করে যে... সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ ও অপর উদ্বাস্তু সংগঠনের পক্ষ হইতে পুনর্বাসন সম্পর্কে যে সকল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সরকারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে, সেগুলি কার্যকর করা হইলে পশ্চিমবাংলার মধ্যেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সমস্যা সমাধানের পথে বিপুল অগ্রগতি হইবে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার অযৌক্তিকভাবে এই সকল পরিকল্পনা কার্যকর করিতে অস্বীকার করিতেছেন। ইহার ফলে উদ্বাস্তুদের জীবনে এবং পশ্চিমবাংলার জাতীয় জীবনেও দুঃখ ও সংকট বৃদ্ধি পাইয়াছে। উদ্বাস্তুদের দুর্বিষহ অবস্থা লাঘব করিবার জন্য পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য সরকারের বর্তমান নীতি পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই সম্মেলন মনে করে যে, প্রবল গণ আন্দোলন ভিন্ন সরকারির নীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে সরকার যদি তাহার নীতি পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার মধ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন নীতি ঘোষণা না করেন, তাহা হইতে চরম পত্র দিয়া আগামী ১৪ নভেম্বর হইতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। এই সম্মেলন আরও সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, ১) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ অর্থ এবং উদ্বাস্তুদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের ভিত্তিতে পশ্চিমবাংলার মধ্যে পুনর্বাসনের দাবিতে সর্বস্তরের দেশবাসীর সাক্ষর অভিযান।

২) বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং উদ্বাস্তু গণতান্ত্রিক জনতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।'

সারা বাংলার উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি একত্রিত হয়ে (সূত্র : মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দের

অন্তরালে) এক বিশাল ভয়ঙ্কর আন্দোলনের রূপ নেয়। এই আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হয়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্নার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

লোক সেবক পত্রিকার রিপোর্ট— 'কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্নার অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা ও উদ্বাস্তু বিরোধী নীতিতে পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণির উদ্বাস্তু ও জনসাধারণ কিভাবে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহা অদ্য ২২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১০ সহস্র উদ্বাস্তু ও জনতার জনসভা ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলন ও পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদের যুক্ত উদ্যোগে অদ্য বেলা ৩ ঘটিকায় বিরাট উদ্বাস্তু সমাবেশ হয়। সভাশেষে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা পুনর্বাসন মন্ত্রীর আবাসের পথে গিয়া তাঁহার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।'

সভায় যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সভাপতিত্ব করেন। সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী হরিদাস মিত্র (এম এল এ) প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন। পি এস পি নেতা শ্রী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সারা বাংলা বাস্তুহারা সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক পি এস পি নেতা শ্রী ধীরেন্দ্র ভৌমিক, জনসংঘ নেতা শ্রী সত্যেন বসু, শ্রী হরিপদ ভারতী, পূর্ব ভারত বাস্তুহারা সংসদের সম্পাদক শ্রী মনোরঞ্জন বসু, শ্রী সুধাংশু গাঙ্গুলী প্রমুখ বক্তাগণ সভায় বক্তৃতা করেন। (লোক সেবক, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৯)।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা কলিকাতায় ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে অনুমোদিত হয় এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকার ১ লক্ষ একর জমি দান করার প্রতিশ্রুতি দান করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে— 'পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের ব্যাপকভাবে পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা মঙ্গলবার কলিকাতায় ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে অনুমোদিত হয়।'

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার কালে তাঁহার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্তব্য সমর্থন করিয়া বলেন যে, এই রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আর কোনো অবকাশ নাই।

যে সকল পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তু বর্তমান বিভিন্ন শিবিরে রহিয়াছেন তাঁহাদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার প্রায় ১ লক্ষ একর জমি দানের প্রতিশ্রুতি প্রাথমিকভাবে দিয়াছেন। রাজ্য সরকারগণ আরও বেশি জমি জরিপ ও উদ্ধার করিবেন। উহার ব্যয় ভার বহন করিবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

আজ এখানে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের সভাপতিত্বে বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশুর, উড়িষ্যা, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী

শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর সংসদীয় সচিব শ্রী পূর্ণেন্দু শেখর নস্কর উপস্থিত ছিলেন।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, বুধবার জানুয়ারি ২২, ১৯৫৮)

বাংলার বাইরে পুনর্বাসনকে অস্বীকার করে সমস্ত ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি ভীষণভাবে আন্দোলন শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের সবশ্রেণির উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠ অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের দাবিতে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে স্মারকলিপি দেন। সেই স্মারকলিপির ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাস্তুহারা সম্মেলনের পক্ষ থেকে সর্বশ্রী যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল, হরিদাস মিত্র, মহাদেব ভট্টাচার্য, হেমন্ত বিশ্বাস ও ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ সাক্ষাৎ করেন। সেই সঙ্গে থাকেন ইউ সি আর সি-র পক্ষ থেকে শ্রী হেমন্ত কুমার বসু, শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তী, শ্রী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সুধা রায়।

সরকার পক্ষে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, পশ্চিমবঙ্গ পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন ও সহকারী পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী ও পুনর্বাসন দপ্তরের কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার।

এই সভায় সরকার পক্ষ অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন 'পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসন যোগ্য কোনো স্থান নেই।'

এর পরিপ্রেক্ষিতে সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের পক্ষ থেকে জানান, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন জেলায় কিছু সংস্কারের দ্বারা পুনর্বাসন যোগ্য জায়গা পেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরে বলেন যে সে সব কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে নেই।

এরপর সারা বাংলার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিতে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে চলতে থাকে অনশন সত্যাগ্রহ। হাজার হাজার উদ্বাস্তু বিভিন্ন জেলে বন্দী হয়ে থাকেন। বহু উদ্বাস্তুদের প্রাণহানি হয়। দণ্ডাকারণ্যকে বসবাসের উপযোগী করে পুনর্বাসন দেওয়ার আশ্বাস দান করে পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না রাজ্য সভার সংসদদের প্রতি ঘোষণা করেন। 'আজ পুনর্বসতি দপ্তরের মন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্না রাজ্য সভার সদস্যদের আশ্বাস দেন যে, দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সেখানে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের লইয়া যাইবেন না।' (লোক সেবকের রিপোর্ট : নয়াদিল্লি, ১৪ মার্চ)

কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রী ভূপেশ গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমি আছে বলিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন শ্রী খান্না তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, 'পুনর্বসতি সমস্যাটি মানবতার দৃষ্টিতে বিচার করিতে হইবে। দণ্ডকারণ্যে হাসপাতাল ও বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এবং সেগুলি বাঙালিদের দ্বারাই যাহাতে পরিচালিত হয় তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।' তিনি বলেন যে, 'উড়িষ্যা,

বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী এই অরণ্য ভূমি পরিষ্কার করিয়া প্রায় ৮০ হাজার বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্বটি আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই কার্যকারী হইবে এবং এই সময়ের মধ্যে এক লক্ষ নরনারী এই স্থানটিতে বসবাস করিতে শুরু করিবে।' (লোক সেবক, শনিবার। মার্চ ১৫, ১৯৫৮)

এর পরে আরও ব্যাপকভাবে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। তিন হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহীদের প্রতি নির্দয়ভাবে শুরু হয় পুলিশের অত্যাচার। এই প্রসঙ্গে শ্রী জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের লেখা 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের একটা উদ্ধৃতি— '১৭ মার্চ, ১৯৫৮ : অদ্য সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের ডাকে সর্বশ্রেণির উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে গণসত্যাগ্রহ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রজা সোস্যালিস্ট দলের উপনায়ক ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী হরিদাস মিত্র (এম এল এ) মহাশয় দ্বয়ের নেতৃত্বে তিন হাজার উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহী মহাকরণ অভিমুখে অগ্রসর হয় ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া গ্রেপ্তার বরণ করে।

বেলা দুইটায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে উদ্বাস্তুরা জমায়েত হয়। জমায়েতে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। পরে বেলা ৪টায় উদ্বাস্তুরা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার হইতে মিছিল হইয়া ধর্মতলা স্ট্রিট হইয়া রাজভবনের সম্মুখে আসিলে পুলিশ তাহাদের গতি রোধ করে। সেখানে একটি পথ সভা হয়। সেখানে সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, সুনীল দাস, দেবেশ সেন, ডাঃ পবিত্র রায় প্রমুখ বক্তাগণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর ডাঃ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে শ্রী হরিদাস মিত্র সহ উদ্বাস্তুরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন।'

উদ্বাস্তু সমস্যা ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সরকারি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া— 'জীবিকা সংস্থানের প্রশ্নকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গৃহ নির্মাণ, ব্যবসায় বা চাষের জন্য সামান্য টাকা ঋণ দিয়া সরকারের পুনর্বাসন দপ্তর এই সব হতভাগ্য উদ্বাস্তুদিগকে খামখেয়ালীভাবে পরিকল্পনাহীন ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিতে যত্র তত্র পাঠাইয়া তাহাদের কার্যের ফিরিস্তি দিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বাস্তব অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা এখনো সমস্যার আকারেই ঝুলিতেছে। সরকার পাঞ্জাবের ৯ লক্ষ বাস্তুহারার জন্য ৩৫০ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন, আর পশ্চিমবঙ্গে আগত ৫০ লক্ষ বাস্তুহারার মধ্যে ২০ লক্ষ বাস্তুহারার জন্য মাত্র ৪০ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের বাস্তুহারাদের জন্য সরকারের এক রকম নীতি আর বাংলার বেলায় অন্যরূপ। পাঞ্জাব তথা পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে লোক-বিনিময়ের আদর্শ গ্রহণ করাতে কংগ্রেসের আদর্শে আঘাত লাগে নাই, কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের ও

সংখ্যালঘুদের বেলায়-ই অন্য রকম নীতি। সম্প্রতি মাইগ্রেশান সার্টিফিকেটের এত কড়াকড়ি করা হইয়াছে যার ফলে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা বিরাট বিপর্যয়ের মুখে পড়িলেও আর দেশত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তদুপরি সম্প্রতি দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের আগমনের ও তাহাদের সম্পর্কে সরকারি দায়িত্বের একটি শেষ তারিখ নির্দিষ্ট করিবার সীমারেখা টানিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের বাংলার বাহিরে লইয়া যাওয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তের পরই উদ্বাস্তুদের বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং ইতস্তত বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিকূল পরিবেশে নিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। এমন কি অনাথা উদ্বাস্তু মহিলাদেরও পি এল ক্যাম্পের বাহিরে সৌরাষ্ট্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের ক্যাশ-ডোল বন্ধ করিয়া বাংলার বাহিরে যাওয়ার চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে। সরকারের এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে গভীর উদ্বেগ ও হতাশার সঞ্চার হইয়াছে; আর পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিরাট বিক্ষোভ-সংগ্রাম দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। সরকারি সিদ্ধান্তে ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তুরাই বেশি বিপর্যস্ত হইবে।'

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি হয়েছিল উড়িষ্যার কোরাপুট জেলা ও মধ্যপ্রদেশের (বর্তমান ছত্রিশগড়) বস্তার জেলার ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গমাইল অবহেলিত বন নিয়ে ইং ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ সালে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের এনে প্রথম পুনর্বাসন দেওয়া হয় বস্তার জেলার ফরাসগাঁও অঞ্চলে তিনটি গ্রামে ইং ১৯৫৮ সালে। ওখানে কৃষিজমিতে দেওয়া হয় ১০৫ পরিবার ও ক্ষুদ্র শিল্পে ৪৫ পরিবার। দ্বিতীয় পত্তন হয় উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার উমরকোট অঞ্চলে। ১৪টি গ্রামে ১২৪০টি পরিবার বসানো হয়। ওখানেই কাছাকাছি রায়পুর অঞ্চলে বসানো হয় আরও ২৪টি গ্রামে ১৫৪৫টি পরিবার। তৃতীয় পাখানজোড় জোনে বসানো হয় ৪৫টি গ্রামে ২২৩৯টি পরিবার। কোন্ডাগাঁও = ৫টি গ্রামে ১০২৭ পরিবার। সবশেষে পত্তন হয় মালকানগিরি ২৩ টি গ্রামে ১০২৩ পরিবার। এখানের এই জোনটি একপ্রকার পরিকল্পনা বিহীন ছিল। কোনো রাস্তাঘাট যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। মালকানগিরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি এ ই ও সেন্টার ছিল। ইং ১৯৭৫-৭৬ সালে মানা ট্রানজিট ক্যাম্পে ১৯৬৪ সাল থেকে জমে থাকা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে নিয়ে এসে যে সমস্ত কর্মী শিবিরে রাখা হয় সে গুলি ছিল এ ই ও সেন্টার থেকে প্রায় দশ বার পনের কিলোমিটার দূরে পুরনো পত্তন করা গ্রামগুলিতে। সেখান থেকে দুর্গম অরণ্য ভেদ করে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হত। তখন গ্রামসংখ্যা MV১৩৪টি RV৬৪টি PV১৩৩টি, কোন্ডাগাঁও ১৫টি।

আমি মানা ক্যাম্প থেকে দণ্ডকারণ্য মালকানগিরিতে যাই ইং ১৯৭৫ সালের

প্রথম দিকে। কর্মী শিবিরে পৌঁছোবার আগে জয়পুর মটু রাস্তার পাশে মালকানগিরি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার আগে পান্ড্রিপানি নামক স্থানে সাময়িক শিবিরে দুই রাত থাকতে হয়। সেখান থেকে দু মিলোমিটার জঙ্গলের ভিতরের দিকে একটা গ্রাম আছে M V ৯২ নম্বর। বাঙালি উদ্বাস্তুদের গ্রামগুলি সব জেলখানার কয়েদীদের মতো নম্বর দেওয়া। নম্বরের আগে যে M V মানে মালকানগিরি ভিলেজ। P V মানে পারল্লকোট ভিলেজ। U V মানে উমরকোট ভিলেজ। R V মানে রায়গঞ্জ ভিলেজ।

ওই গ্রামটির সন্ধান পেয়ে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠল ওদের খবর নেওয়ার জন্যে। বড় জানতে ইচ্ছে করছিল এই দুর্গম গিরিমাঝে শস্যশ্যামলা সোনার বাংলার বঙ্গজননীর উপেক্ষিত সন্তানরা কেমন আছে? আমার সঙ্গে আরও ৮-১০ জন সঙ্গী নিয়ে বেলা দ্বিপ্রহরের পর গিয়েছিলাম গ্রাম পরিদর্শন করতে। ঘণ্টা দু তিন ঘুরে ঘুরে যা দেখলাম তাতে মনটা বিষাদে ভরে উঠল। প্রত্যেকটা মানুষ শীর্ণকায় মলিন বসনাবৃত। প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে করোগেটেড টিনের ঘর। অপরিচ্ছন্ন মাটির দেওয়াল, কোন ঘরে বারান্দা আছে সেখানে রান্নাবান্না হয়। কোন ঘরে সেটুকুও নেই। সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে একটা প্রচণ্ড রকমের দরিদ্রতার ছাপ।

গ্রামবাসী একজন আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা নতুন আসছেন নাকি?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' বড় চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল একজন গ্রামবাসীর কাছে জানতে চাইলাম, 'এখানে চায়ের দোকান আছে?' জবাবে বললেন, 'চায়ের দোকান এহানে কোহানে পাবা। ওই তুষারের এট্টা মুদির দোহান আছে, কিছু নাগলি দ্যাহো গিয়ে।' আমরা একটু এগিয়ে তুষার বাবুর দোকানের সামনে উপস্থিত হলাম। দোকানটাও অপুষ্টিতে ভুগছে। বাঁশের চটা দিয়ে র‍্যাক তৈরি করা তার উপর কয়েকটা অতি নিম্নমানের সস্তা বিস্কুট প্যাকেট। কাপড় ধোয়ার সাবান, কাঁচের বয়ামের মধ্যে কিছু খোলা চকলেট লজেন্স। তেলের টিনের মাঝখান দিয়ে কেটে দুখণ্ড করে তাতে নীচে রাখা হয়েছে ডাল আলু জিরে ধনে ইত্যাদি। আমি তুষারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দোকান কেমন চলে?' তুষার বাবু বললেন, 'যেখানে আয় ইনকামের কোনো রাস্তা খোলা থাকে না সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য কি চলে? ওই গ্রামের লোকে যা একটু নুন তেল ঝাল সময় অসময় নেয়, তাও বাকীতে বেশি, আয় না থাকলে দিতেও পারে না। আমারও দোকান শূন্য হয়ে আসছে।' আমরা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সব নিলাম। তুষার বাবু বললেন, 'আপনারা লাল চা খাবেন? তাহলে একটু ব্যবস্থা করি।' আমরা স্বীকৃতি দেওয়ায় উনি ভেতরে চলে গেলেন। আমাদের দেখে দোকানের সামনে বেশ কয়েকজন লোক ও বাচ্চারা এসে জমায়েত হল। তাদের কাছে জানতে চাইলাম, তারা কেমন আছেন। কবে থেকে এই গ্রামে বসবাস করছেন, সরকার কতটা জমি দিয়েছে, তাতে ফসলাদি কেমন হয় ইত্যাদি।

জবাবে জানতে পারলাম, ইং ১৯৬৪ সালে ওই গ্রামে তারা পুনর্বাসন পেয়েছেন।

সরকার ছয় একর জমি দিয়েছে। তাতে যা ফসল তারা পান তাতে টেনে টুনে তিন মাস চলে। তার পর অনাহারের পালা। ক্ষুধার তাড়নায় জঙ্গলে যেতে হয় খাদ্যের সন্ধানে। বুনো ওল আলু কচু ঘাসের বীজ সেদ্ধ করে খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। গভীর বন থেকে বুনো খাদ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ নয়। হিংস্র বন্য পশুদের নজর এড়িয়ে দীর্ঘ পাহাড়ের উপরের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে চড়ে ওই সকল খাদ্য আনতে হয়। সেখানে প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেই ঘরে ফেরা যায় নচেৎ অগস্ত্য যাত্রা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের জমিতে কী কী ফসল লাগান?' একজন জবাবে বললেন, 'ধান মেস্তা তিল কলাই কুন্তি ডাল।' আবার জানতে চাইলাম, 'এত ফসল কোনটাই কি ভালো হয় না?' জবাব, পাহাড়ী অসমতল ঢালু জমি, তাতে জল দাঁড়ায় না। বর্ষা নির্ভর এই সকল জমিতে বীজ বোনার পর সপ্তাহে দু একবার বর্ষা হতে থাকলে তবেই সম্পূর্ণ ফসল পাওয়া সম্ভব। তেমন তো হয় না। এখানে বর্ষা শুরু হলে ফসল না পচিয়ে আর বর্ষা ছাড়ে না। আবার বন্ধ হলে শুকিয়ে না মরা পর্যন্ত বর্ষার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। একমাত্র শক্ত ফসল মেস্তা। বোনার পর তিন মাসের মধ্যে যেটুকু রস জমিতে থাকে তার মধ্যে দু আড়াই হাত লম্বা হয়। তখনি ওগুলিকে কেটে পচিয়ে পাট বের করে শুকিয়ে এখান থেকে পঁচিশ কিলোমিটার গরুর গাড়ি অথবা মাথায় করে বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হয়। সেই অর্থে ঋণ শোধ করে পরিবারের জন্যে বস্ত্রাদি কেনার জন্য খাদ্য বাবদ কিছুই হাতে থাকে না। অন্যান্য ফসল যা হয় তাতে মাস তিনেক চলে। কালীদাস নামে এক যুবক করুণ হাসিমুখে বলল, 'গৌর সরকারের গান শোনেনি?' বলে করুণ সুরে নিদারুণ বেদনার গীত গাইতে শুরু করল।

এমন দেশে বসত করে কোন শালা।
হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মেটে না পেটের জ্বালা।
যখন ক্ষুদায় জ্বলে গিয়ে নাড়ি, বিকিয়ে দেয় গরুর গাড়ি,
ঘরের টিন সম্বল আর সাইকেল ঘড়ি, হাতবেড়ি আর চেনবালা।
কালো বাজার ভালো চলে, লাল বাজারে চাল না মেলে
এসব চোরা কারবার ধরতে হলে, ধরতে হয় সাপের গলা।
দণ্ডকের হয় এই অবস্থা, ফসল ফলে ভুট্টা মেস্তা
দরের বেলায় সবার সস্তা চাষীর গায় মনের জ্বালা।
শেষ করে সব বেচাকেনা, শোধ হয় না ঋণের দেনা
মহাজনে সুদ ছাড়ে না হাতে থাকে ক্যাঁচ কলা॥

কালিদাসের কণ্ঠমাধুর্য এক অনিন্দনীয় প্রতিভা। আর মরমি কবি গৌরপদ সরকার, যিনি পুনর্বাসন পেয়েছিলেন PV ৩৫ নম্বরে। তাঁর মর্মান্তিক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার

ফসল গানের মাঝে তুলে ধরে আমাদের সকলকে অশ্রুসজল করে তুলল। ইতিমধ্যে তুষার বাবু চা পরিবেশন করলেন। আর একটা থালায় করে ডাল ভাজার মতো কিছু খাওয়ার জন্যে দিলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে থালার থেকে দুচারটে ভাজা তুলে চিবুতেই বুঝতে পারলাম ওটা ডাল ভাজা নয়। স্বাদটা কেমন যেন অপরিচিত, কশায় যুক্ত। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওটা কি বস্তু?' লজ্জাবনত মুখে তুষার বাবু বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আসলে ওগুলি কোনো অতিথির সামনে উপস্থিত করা উচিত নয়। বিশ্বের কোথাও ওগুলি খাদ্য বলে পরিগণিত না হলেও এই দণ্ডকের ঘরে ঘরে মেস্তাবীজ মুখ্য খাদ্য। জানতে চাইলেন আমরা কেমন আছি কি খাই, তাই দিলাম।' তখন মেস্তাকে ভালো করে চিনতে না পারলেও পরে চিনেছিলাম মেস্তা এক ধরনের পাট। আমি দেখেছি দুরকমের, একটা লাল ও অপরটা সবুজ। এই পাটের সারা গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ কাঁটা। ফলগুলি হয় আমলকীর মতো বড় বড়। ফলের উপরে ফুলের মোটা পাপড়ির মতো। ওর ভেতরের বীজগুলি ঠিক ডালের মতো। খাদ্যের অনটনে অভাবের তাড়নায় পেটের দায়ে সুস্বাদু না হলেও, বাঁচার তাগিদে মেস্তার বীজকে 'দণ্ডকবাসীরা খাদ্য' বলে আবিষ্কার করেছিল।

দণ্ডকের উদ্বাস্তুদের ভবিষ্যৎ ভেবে নানা কথা বলতে বেলা ডুবু ডুবু হয়ে এল। কালীদাস আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনারা এই বেলা ক্যাম্পে ফিরে যান। এরপর আঁধার রাস্তায় ভাল্লুকের সাথে দেখা হলে বিপদ হতে পারে।' ভাল্লুকের নাম শুনতেই আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। একবার রায়পুর শহরে দেখেছিলাম ভাল্লুকের লম্বা মুখে লোহার বলয় আর হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে এক বাজীকর ফুটপাতে নাচাচ্ছে। কী ভয়ঙ্কর সেই চেহারা। এখানে মুক্ত ভূমে বিচরণ করে সেই ভয়ঙ্কর জীব? পাশে থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, 'শুধু মাঠে ঘাটে জংগলে নয়। সাঁজের বেলা আমাদের গ্রামের মধ্যে ঢুকে বাড়ি থেকে মুরগির ঘর ভেঙে হাঁস মুরগি নিয়ে পালায়।' তুষার বাবুর বাড়িতে একটা মুরগির ঘর দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে দেখছেন না বড় বড় গাছের গুড়ি বসিয়ে মুরগির ঘর তৈরি হয়েছে। ওই গাছ উপড়ে ফেলে ভাল্লুকে মুরগি ধরে নিয়ে যায়।' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ১০-১২ বছর বয়সের মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে ফুলমতী, ও ওর বাপের সাথে গিয়েছিল মৌফুল (মহুয়া ফুল) খুঁজতে, ওর পেছন দিয়ে ভাল্লুক আসে হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর বাবা দেখতে পেয়ে ফুলমতী 'ভালুক' বলে অজ্ঞান হয়ে গেল। ফুলমতী পিছন ফিরে ভাল্লুক দেখে চ্যাঁচাতে লাগল। ওর চিৎকারে আমরা গ্রামশুদ্ধ লোক লাঠি সোটা নিয়ে এগিয়ে দেখি ভাল্লুক ওর মুখে থাবা মারে একটা চোখ তুলে নিল। আমরা হৈ হুল্লোড় করলে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বড় বড় পাথর ছুঁড়ে সেই ভাল্লুক তাড়াই। ওই দেখেন না মেয়েটা একটা চোখ নেই। আপনারা আর দেরী করবেন না, আঁধার হয়ে আইছে।'

এই সকল অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনে আমাদের সকলের গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, সত্যিই যদি ভাল্লুকের সাক্ষাৎ হয়ে যায় কী হবে তখন। আদৌ আমরা আমাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে পারব কিনা। আমাদের ভয়ার্ত মনের অবস্থা দেখে তুষার বাবু সহ গ্রামের দু-চারজন মিলে পাট কাঠি দিয়ে মশাল তৈরি করে দিলেন। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে বললেন, 'গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে মশালগুলি জ্বালিয়ে নেবেন। ভয় করবেন না ভাগ্যের ভরসায় আমরা সকলেই আছি, আপনারাও শ্রীহরি বলে বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক পৌঁছে যাবেন।' আমরা ভয়ে দুরু দুরু অবস্থায় বেরিয়ে পড়লাম। গ্রাম ছাড়তেই ভয়ানক ঘন আঁধারে আমাদের ঘিরে ধরল, মশাল জ্বালানো হল। ভয়ে হৃদপিণ্ড শীতল হতে লাগল। কেউ পেছনে হাঁটতে সাহস করছে না। এক প্রকার জড়াজড়ি করে হেঁটে চলেছি। আধাআধি রাস্তা পার হতেই সম্মুখে মশালের আলোয় চিক চিক করছে এক প্রকাণ্ড রকমের অজগর সাপ। একজনের হাত থেকে মশালটা খসে পড়ে গেল। মন্থর গতিতে চলা ওই বিশালকায় অজগর আমরা ইতিপূর্বে কেউ কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের শরীরে তখন একশত আট ডিগ্রি জ্বরের অবস্থা। সাহস করে একজন এগিয়ে গেল সাপটার লেজের থেকে বেশ খানিকটা দূর ঘুরে আমরা একপ্রকার চোখ বুজে ওর পেছনে পেছনে হেঁটে জড়াজড়ি করতে করতে ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছিলাম।

দুই রাত্র পরে আমাদের পৌঁছে দেওয়া হয় কর্মী শিবিরে, গদাগিরিতে। শিবির বলতে পাহাড়তলীতে একটা ফাঁকা জায়গায় ট্রাকে করে নিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। বাবু বললেন, 'আপনাদের এখানে হয়তো বছর খানেক থাকতে হতে পারে। আপনারা পাহাড় থেকে বাঁশ বল্লি লতাপাতা এনে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে নিন। এখানে সরকার আপনাদের কাজকর্ম দেবে। প্রত্যেক পরিবারের কর্মক্ষম ব্যক্তিরা এ ই ও সেন্টারে গিয়ে আপনাদের কাজকর্মের যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবেন।'

গৃহহারা মানুষের গৃহবাসীর স্বপ্ন যে কত প্রবল কত আকর্ষণীয়, যারা গৃহ হারায়নি তাদেরকে ভাষা দিয়ে বোঝানো কঠিন। ঘর বাঁধার অনুমতি পেয়ে প্রত্যেক পরিবারের যুবকগণ দা কুড়লি হাতে নিয়ে দল বেঁধে কোমরে গামছা বেঁধে উঁচু পাহাড়ে চড়ে বাঁশ বল্লি হেতাল পাতা (খেজুর পাতার মতো গাছগুলি লম্বা হয় না প্রায় মাটির লাগাওয়া) সংগ্রহ করে সপ্তাহ কালের মধ্যে সারি সারি ছবির মতো সুন্দর ঘর তৈরি করে ফেলল। দূর থেকে দেখলে মনে হত গভীর বনভূমিতে সারি দিয়ে ঋষিরা আশ্রম গড়ে তুলেছে।

আমাদের কর্মী শিবিরের কাছাকাছি কয়েকটা পুরোনো বসতির গ্রাম ছিল। M V৮৩ M V ৮৪ MV১০১-১০২। এই ১০২ গ্রামের এক বিশাল পাট পচানো পুকুর খননের কাজ আমরা করেছিলাম। ওই সকল গ্রামগুলির আর্থিক অবস্থাও ছিল পূর্বের

বর্ণনা মাফিক। দরিদ্রতা আর উদাসীনতা সকলের মধ্যে সমান ভাবে ছিল। আমরা ওখানে পৌছলে পুরোনো গ্রামবাসীরা আমাদের দেখতে এসেছিলেন। এক বয়স্ক মহিলা খুব সম্ভব পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মানুষ। তিনি ঘরের দরজার কাছে এসে বললেন, 'দেহি বারও দেহি, কোন নতুন পাপিগে নির্বাসন দিতি আনলো। আ লো! আমরাতো আসে মরিচি, তোমরা বাংলার নদীতি ডুবে মরতি জল পাওনি? এইহেনে আইছ বাঘ ভাল্লুকির প্যাটে যাতি? কোন নির্বংশেরা যে দ্যাশ ভাগ করিছিল, হাটকুড়ের নাতিগো পালি মুই নাততাম।' আপন মনে নিদারুণ মর্মবেদনার বিষ বপন করতে করতে অশ্রুসজল নেত্রে কখন যেন কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

ওখানে আমাদের মানসিক অবস্থার সজীবতা বজায় রাখতে পুরোনো কয়েকটা গ্রামের যুবকদের নিয়ে MV ৮৩ গ্রামে একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট করেছিলাম। আমাদের পেয়ে পদ্মগিরি অঞ্চলের গ্রামবাসীরা বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্গীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার নতুন চেতনা ফিরে এসেছিল। একটা যাত্রাপালাও আমরা অনুষ্ঠিত করেছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন লোককবি ছিলেন। লোককবি নারায়ণ সরকার। তার সঙ্গে লোককবি ব্রহ্মচরণ সরকারকে এনে কয়েক আসর কবিগানের অনুষ্ঠানও করেছিলাম। হাজার হাজার পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মানুষের ভিড় জমেছিল ওই আসরে। কবিদের কণ্ঠে যখন বেজে উঠেছিল বাংলার ভাটির সুরের মনমাতানো গান, 'ভাটির নদী বয়ে যায়রে— কয়ে যায় তার শূন্য বুকের ব্যথারে— ও ভাটার নদী বয়ে যায়রে'। বঙ্গজননীর বক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানুষগুলির অন্তর-গভীরে শুরু হয়েছিল ক্ষিপ্ত সুপ্ত সমুদ্রের উথাল পাতাল ঢেউ। বাধভাঙা প্রলঙ্কর জলস্রোতের ন্যায় দুচোখে নেমেছিল অশ্রুধারা।

দণ্ডকের প্রাকৃতিক পরিবেশ কখনো পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষের অনুকূল ছিল না। প্রতি ক্ষেত্রে 'ব্যর্থতা'র এই ছিল মুখ্য কারণ। আমাদের কর্মীশিবির থেকে সাপ্তাহিক বাজার করতে হত কুট্রিপালি। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শিবির থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। আমার বাবা আমায় সাপ্তাহিক বাজারের দিন বললেন, 'তুমি কাজে বেরিয়ে যাও, আমি অন্য লোকজনের সঙ্গে গিয়ে বাজারটা করে আসব।' আমার সন্দেহ ছিল বাবা অতটা পথ হেঁটে বাজার সদায় নিয়ে ফিরতে পারবেন কিনা। আমি বাবাকে বাজারে যেতে নিষেধ করলে বাবা বললেন, 'আমি তো কাজকর্ম কিছুই করিনা, খাটুনির মানুষ তুমি একাই। তোমার দিনমজুরটা বন্ধ হলে এতগুলো মানুষ খাবে কী? তুমি চিন্তা করো না, বাজার থেকে কিছু ভারী জিনিস আমি কিনব না। শুনেছি ভাল মাগুর মাছ ওই বাজারে পাওয়া যায়। তাই পেলে কিছুটা নিয়ে আসব।' যথারীতি বাবার কথামতো আমি পুকুর খননের কর্মীদের সঙ্গে কাজে বেরিয়ে পড়লাম। বাবা কুট্রি পালির বাজারে সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, কিছু বড় বড় মাগুর মাছও কিনেছিলেন। ফেরার পথে প্রচণ্ড তাপদাহে পাহাড়ি-

প্রস্তর বিছানো পথে চলতে চলতে হঠাৎ বাবার পেটে ব্যথা শুরু হয়। যন্ত্রণা কাতর হয়ে বাবা চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। পথে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। সঙ্গীসাথীরা নিরুপায় হয়ে জঙ্গল থেকে বাঁশ পাতা দিয়ে দোলা তৈরি করে সন্ধের কিছু পূর্বে বাড়িতে পৌছান। শিবিরবাসী সকলে জমায়েত হয়ে বাবাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে যার যা তুক তাক তন্ত্র মন্ত্র টোটকা আদি জানা আছে সবই প্রায়োগ করছেন। কোনো কিছুতে কাজ হচ্ছে না। বাবা যন্ত্রণায় বেহুঁশ বিবস্ত্র হয়ে ছটফট করছেন। আমি শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে বাবার অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে পড়ি। আমাদের শিবিরবাসীদের মধ্যে কোনো ডাক্তার ছিল না। ছুটলাম পুরোনো গ্রামের দিকে। না সেখানেও কোনো ডাক্তারের খোঁজ পেলাম না। এক ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তার পেতে হলে মালকানগিরি যেতে হবে।' মালকানগিরি দণ্ডকারণ্যের হাসপাতাল, কিন্তু আমাদের শিবির থেকে দূরত্ব তিরিশ কিলোমিটার, পথঘাট নেই। অরণ্য জঙ্গলের মধ্যে একপেয়ে পথ সেও আমার অচেনা। রাত আট নটা হবে তখন একজন বললেন 'এই রাত্রি ডাক্তার না খুঁজে চুরাশিতি জগা পাগোলের কাছে যাও। পাগল এট্টা ব্যবস্থা করে দেবেন।'

পাগলের ন্যায় ছুটলাম ওই রাত্রে MV ৮৪ নম্বর জগা পাগলের খোঁজে। গ্রামে গিয়ে জানতে পারলাম উপেন মাঝির বাড়িতে আছেন। মতুয়া গোঁসাই জগা পাগল। উপেন মাঝি পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার মানুষ। তার কাছে পাগলের সাক্ষাৎ পাওয়ার প্রার্থনা জানালে তিনি বললেন, 'ওই যে পাগল বারান্দার কোনায় শুয়ে আছে। একটা টাকা দিয়া পাগলরে প্রণাম করগা, সগল কথা কও যাইয়া।' পাগোলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বাবা একটু ওডেন, এই কেডা যেন আপনের লগে দেখা করতে আইছে।'

মতুয়াচার্য্য জগা পাগলও পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার মানুষ। ছোট্ট খাট বিনয়ী স্বভাবের নির্মল পবিত্র পরোপকারী মানুষ। মাঝি মহাশয়ের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন। আঁধারের মধ্যে শুয়ে ছিলেন সাধক। বলতে লাগলেন 'কারা আবার কোন বিপদ লইয়া আমার কাছে আইলে।' ইতিমধ্যে মাঝি মহাশয় একটা কেরোসিনের বাতি এনে সামনে রাখলেন। আমি পাগলের সামনে একটা টাকা রেখে প্রণাম করে বাবার সুস্থতার প্রার্থনা জানালাম। পাগল তাঁর প্রভু হরি গুরুচাঁদের কাছে পরিষ্কার তার মাতৃভাষায় প্রার্থনা করতে লাগলেন। 'ও বাবা হরিচাঁদ, তুমি তোমার সন্তানগো এই জংলা দ্যাশে লইয়া আইছ। এহানে ডাক্তার নাই কবিরাজ নাই হ্যাগো দ্যাহে কেডা হেয়া বোঝ? তুমি না দ্যাখলে হ্যারা আর কারডে যাইয়া কবে। কোহানে যাইয়া দাঁড়াবে?' বারান্দা থেকে নিচে খোলা জায়গায় বসে হাত দিয়ে ধুলি কুড়িয়ে বললেন, 'এই যে বাবা হরিচাঁদ, তোমার পায়ের ধুলি লইয়া ওয়ার হাতে দিলাম, এতেই ওর বাপের প্যাডের ব্যথা তুমি লইয়া লইও।' বলে ধুলি মুষ্টি ললাটে স্পর্শ করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'গরম লাগছে বোধহয়। এই লও বাবার নাম

লইয়া প্যাডে লাগাইয়া দেও গিয়া। বাবা হরিচাঁদ বাবা গুরুচাঁদ বড় দয়াল! ভালো করবে হানে। আর কালকে একবার আমার কাছ লইয়া আসকো, যাও।'

আমি অসহায় নিরুপায়, পাগলের ওই সরল প্রার্থনার মন্ত্রপুত ধুলির উপর আস্থা রাখা ছাড়া কোনো উপায় আমার সেই মুহূর্তে ছিল না। তাই পাগলকে আর একবার প্রণাম করে অশ্রুসিক্ত নয়নে শিবিরে ফিরে যন্ত্রণাকাতর পিতার পেটে, সর্বাঙ্গে ধুলি লেপন করতে লাগলাম আর চোখ মুছতে লাগলাম। ঘণ্টা খানেকের পর বাবার যন্ত্রণা অনেকটা লাঘব হয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাবা। সারা রাত্রি ধরে ভেবেছিলাম এইভাবে কতদিন চলবে। যেখানে মানুষের জীবনের কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই সেখানে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা কোথায়?

পরদিন সকল কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে সাইকেলে করে বাবাকে নিয়ে মালকানগিরির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। পথে পাগলের সঙ্গে দেখা করলাম। পাগল বাবার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'যাও ডাক্তার দেহায়ে লইয়া আসো।'

দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ উঁচুনিচু পাহাড়ি এক পেয়ে পথ, কোথাও একটু সমতল ভূমি নেই। তার ভেতর দিয়ে কখনো হেঁটে কখনো সাইকেল চেপে অসুস্থ বাবাকে নিয়ে চলেছি। আমাদের শিবির থেকে AEO সেন্টার পনের কিলোমিটার দূরে MV ৮৭ নং। সেখানে গিয়ে AEO সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'অন্তত চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের কিছু ব্যবস্থা না করলে আমরা বাঁচব কেমন করে?' AEO সাহেব বললেন, 'দণ্ডকারণ্য সরকারের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই, আমরা কি করতে পারি। তবে ইমারজেন্সিতে আমাদের খবর দিলে জীপে করে মালকানগিরি হাসপাতালে পৌঁছে দেব।' আমি বললাম, 'পনের বিশ কিলোমিটার দূরত্বের জংলা পথে রাত্রে কোনো কঠিন বিপদ হলে খবর পৌঁছতেই তো রোগী মারা যাবে।' জবাব এল 'কিছু করার নেই।'

দীর্ঘ তিরিশ কিলোমিটার দুর্গম পথ অতিক্রম করে মালকানগিরি হাসপাতালে পৌঁছে দেখি সেখানে তিল ধারণের অবস্থা নেই। খোলা ময়দানে যন্ত্রণাকাতর বিভিন্ন রোগের রোগী শুয়ে বসে যন্ত্রণা ভোগ করছে। এ যেন এক জীবন্ত নরক। কাউকে ভাল্লুকে ধরেছে কাউকে সাপে কেটেছে কারোর গাছ, পাথর পড়ে হাত পা ভেঙেছে কারো প্রসব যন্ত্রণার দৃশ্য দেখে আমার সর্বাঙ্গ শীতল হতে লাগল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা আমায় বললেন, 'চলো ডাক্তার কোথায় দেখি।' ভেতরে যেতে না যেতেই একজন বললেন, 'বিনা লাইনে কোথায় যাচ্ছেন? আমরা দেড় ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, যান লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান।' অগত্যা বাবাকে ছায়ায় বসিয়ে রেখে এক দেড়শো লোকর দীর্ঘ লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘণ্টা দুইয়েক পরে বাবাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে সুযোগ পেলাম। ডাক্তার বাবার দিকে তাকিয়ে ইশারায় বললেন, 'কি হয়েছে?' বাবা বাজারের পথে যেতে হঠাৎ পেটে ব্যথার কথা

বলতে চাইলে ডাক্তার বললেন, 'অত কেচ্ছা শোনার সময় নেই, অসুবিধা কি তাই বল।' ধমকের সুর শুনে বাবা শুধু বললেন, 'পেটে ব্যথা।' ব্যাস কোনো দেখাশোনা চেক আপ নেই খচাখচ স্লিপ লিখে বাবার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বাবা বেরিয়ে এলেন। আমি স্লিপ নিয়ে কম্পাউন্ডারের কাছে দিলাম। তিনি পঞ্চাশ গ্রামের একটা Gelusel এর শিশি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দিনে তিনবার দু চামচ করে খাবে।'

ইং ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে আমাদের পদ্মগিরি থেকে তুলে এনে রাখা হয় গুমকা নামক এক আদিবাসী বস্তি থেকে এক মাইল দূরে এক বিশাল সেগুন বাগানের মধ্যে। সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে একটা বাঙালি গ্রাম ছিল MV ৬৫ নম্বর। আদিবাসী ও বাঙালি গ্রামের মাঝে ওই সেগুন বাগানে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাঁবু ফেলে অস্থায়ী শিবির করে সেখানে রাখা হয়েছিল তিন মাস। ওখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পটেরু সেচ পরিকল্পনায় যে নতুন গ্রাম পত্তন করা হবে সেই সকল স্থানে।

মালকানগিরি জোনে ইং ১৯৬২ সাল পর্যন্ত গ্রাম পত্তন করা হয় ৪৭টি। এই সাতচল্লিশটি গ্রাম নিয়ে দণ্ডকারণ্য কর্মকর্তাদের পরামর্শে এক জোনাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। এই কমিটি MV ৭ নম্বর তাঁবুর মধ্যে অস্থায়ী শিবিরে গঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন অন্নদা হালদার। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত গ্রামসংখ্যা হয় ৭০। তখন এই কমিটি পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি থাকেন শ্রী হরেন মজুমদার, সম্পাদক শ্রী নিখিল বিশ্বাস। এই নিখিল বিশ্বাস মহাশয় পরবর্তী কালে খুব সম্ভবত ১৯৮৫ সালের দিকে এম এল এ হয়েছিলেন (নির্দলীয়)। ইং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত মালকানগিরি গ্রামসংখ্যা ১৩৪, উমরকোট ৬৪, পারুলকোট ১৩৩, কোন্ডাগাঁও ১৬টি। ১৯৬৪ সালের পরে যে গ্রামগুলি পত্তন করা হয়েছিল তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল ৫ একর। ১৯৬৮ থেকে ৮০ এর মধ্যে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের চার একর। ১৯৭৫ সালে পটেরু নদীতে বাঁধ দিয়ে বৃহৎ আকার সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পটেরু সেচ পরিকল্পনার গ্রামগুলির নাম দেওয়া হয় 'মালকানগিরি পটেরু ভিলেজ' MPV. এই সকল গ্রামে যারা পুনর্বাসন পেয়েছেন তাদের জমির পরিমাণ তিন একর। ভিটে বাড়ি ১৫ ডেসিমিল। MPV গ্রাম বসানো হয় মোট ৮৩টি। সব মিলিয়ে মালকানগিরি গ্রামসংখ্যা ২১৭, তার মধ্যে দুটি গ্রাম ক্ষুদ্র শিল্পীদের। আমাকে যে গ্রামে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসা হয় সেই গ্রামের নম্বর MPV ৩৪। শুধু নম্বরটাই মুখে বলা হয়েছিল। গ্রামের কোনো নামগন্ধ ছিল না সেখানে। ফাঁকা ময়দানে অর্থাৎ আগে কোনো কর্মী শিবিরে কর্মীরা ওই স্থানের বন পরিষ্কার করে খোলা ময়দান তৈরি করেছিল। সেখানে তাঁবু ফেলে বিভিন্ন কর্মীশিবির থেকে ন দশটি করে মোট পঁয়ষট্টিটি পরিবারকে ওই গ্রামে পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল। বিভিন্ন শিবির থেকে দু দশটি পরিবার এনে গ্রাম নির্মাণের মধ্যে

একটা চাতুর্য্য কাজ করেছিল। ইচ্ছে করলে প্রত্যেকটা কর্মী শিবিরের মানুষগুলিকে এক একটা গ্রামে পুনর্বাসন দেওয়া যেত। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। কারণ এরা মানা ক্যাম্পে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৫-৭৬ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে পুনর্বাসনের কার্যকারিতা নিয়ে ভীষণ আন্দোলন করতে করতে এখানে এসে পৌছেছে। বর্তমান পুনর্বাসনের যে দুর্গতি তাতে দীর্ঘদিনের জোট বাঁধা লোকগুলিকে এক জায়গায় দিলে তুমুল লড়াই বাধার সম্ভাবনা বেশি। যার কারণে শিবিরবাসীরা শত অনুরোধ অনুনয় বিনয় করা সত্ত্বেও বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁবুতে রেখেই আমাদের হাতে জংগল পরিষ্কার করার যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হয়। তখনও বাড়ির প্লট নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এক বছর যাবৎ জঙ্গল টেন্ডার নেওয়া কন্ট্রাক্টারদের নির্দেশে বিনা প্রতিবাদে উদয় অস্ত খাটতে হয়েছে অমানুষিক খাটুনি। অচেনা অজানা গভীর ঘন বনাঞ্চলের মধ্যে ছিল অসংখ্য জীবনঘাতি বন্য তরুলতা। যাদের ছোঁয়া লেগে শরীরের সমস্ত চর্ম দগ্ধিভূত হয়ে সর্বাঙ্গে পচনক্রিয়া শুরু হত। ছিল অগণিত বিষাক্ত পোকামাকড়, যাদের দংশনে সমস্ত শরীর ফুলে চেহারার বিকৃতি ঘটে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণবায়ু বহির্গত হত। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন প্রজাতির বিষধর সাপ। গাছের লতাপাতায় জড়িয়ে থাকা একপ্রকার সবুজ রঙের সাপ হেঁটে চলা মানুষের মাথায় ছোবল মেরে সেখানেই তাকে নিঃশেষ করে ফেলত। ছিল অসংখ্য বন্য হিংস্র পশু, বন্য ভাল্লুক, শেয়াল ইত্যাদি। যাদের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে জীবন সংশয়ে থাকতে হ'ত। সকল উদ্বাস্তুদের বলা হয়েছিল ওই জংলা পরিষ্কার করে জমি তৈরি হলে তাদের জমির সীমারেখা নির্ণয় করে দেওয়া হবে। তাইতো অকূল পাথারে অবলম্বনহীন নিরুদ্দেশের পথে ভাসমান মানুষগুলি একটুখানি অস্তিত্বের আশায় কূল পাওয়ার ভরসায় পূর্ববঙ্গের কত সম্মানীয়, শিক্ষিত, চাকরীজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষিজীবী, ভাস্কর, কর্মকার, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, সঙ্গীতকার শিক্ষক, মৎস্যজীবী, যাঁরা কঠিন শ্রমে অনভিজ্ঞ, সকলেই নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে জীবনবাজি রেখে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সকলেই কী কূল পেয়েছিলেন ? না। ভোর বেলা যারা খাবারের থালা জলের পাত্র আর জঙ্গল উপড়ানোর যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। সকলেই যে সন্ধেয় নিরাপদে আস্তানায় ফিরে আসতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

নিরাপদ হালদার, বছর পঁচিশেক বয়সের বেশ শক্ত যুবক। মানা থেকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসার আগে লতিকার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। পরিবারে মাকে নিয়ে ওরা তিন প্রাণী। প্রতি দিনের মতো সেদিনও নিরাপদ থালায় বেঁধে সাত আট খানা আটার রুটি আর জলের ঘটি গাঁইতি শাবল কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার গ্রুপের সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার করতে। ঘরে থাকা সকল পরিবারের সদস্যগণ বিকেল হতেই কর্মীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে প্রহর কাটাত। লতিকা ও তার

শাশুড়ি সেই অপেক্ষায় পথপানে চেয়ে বসে আছে। এক এক করে সন্ধে নাগাদ সকলে ফিরে এলেও নিরাপদ ফিরল না। সন্ধ্যার আঁধার যত প্রগাঢ় হতে লাগল নিরাপদর মায়ের ও স্ত্রীর উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছেলের মুখ দর্শন করার জন্যে মা পাগলিনীর ন্যায় ছুটে জঙ্গলের পথে কিছুদূর এগিয়ে গেল। না, কোথাও তার সাড়াশব্দ নেই। আবার দ্রুত বেগে ফিরে এসে অন্যান্য কর্মীদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে লাগল। না, সঠিক খবর কেউ দিতে পারল না। উন্মাদিনীর ন্যায় নিরাপদর মা সকলের হাতে পায়ে ধরে তার কোলের সন্তানকে খুঁজতে যাওয়ার অনুরোধ করে আর হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। তাদের অনুরোধে ও সহকর্মীকে খোঁজার দায়িত্ব অনুভব করে ক্যাম্পের যুবকেরা সারাদিনের দেহের শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে মশাল তৈরি করে কেউবা হাতে দা কুড়লি শাবল নিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাতের আঁধারে নির্জন বনভূমিতে।

প্রায় দু-তিন কিলোমিটার আঁধার ঘেরা ঘন লতা গুল্ম কন্টকাকীর্ণ বৃক্ষরাজির ফাঁকে ফাঁকে প্রাণফাটা চিৎকার করতে করতে নিরাপদকে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে চলে দুর্ভেদ্য বনভূমি বিদীর্ণ করে। এদের আকাশফাটা ভয়ানক মর্মভেদী চিৎকারে সমস্ত বন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। অদূরে পাহাড়ের গায়ে বার বার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, 'নিরাপদ—' 'নিরাপদ—' 'নিরাপদ'। মশালের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আর সমবেত কণ্ঠের প্রতিধ্বনিতে বন্য পশুদল ভয়ে চড় চড় শব্দে অরণ্য বিদীর্ণ করে ছুটে পালাতে আরম্ভ করে। অচেনা অজানা কঠিন জঙ্গলে প্রতি মুহূর্তে পথ হারানোর ভয়। যে পথ দিয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করেছে সেই পথে পুনরায় ফেরার জন্যে মাঝে মাঝে জঙ্গলের শুকনো জল পাতা সংগ্রহ করে এক এক জায়গায় অগ্নি সংযোগ করে রাখা হচ্ছিল।

মশালের আলোয় প্রায় ঘণ্টাখানেক পথ হাঁটার পর পৌছানো গেল যেখানে বন পরিষ্কার করার কাজ চলছিল। কিন্তু নিরাপদর কোনো সাড়াশব্দ নেই। উচ্চস্বরে 'নিরাপদ' বলে সকলে চিৎকার করতেই হঠাৎ শোনা গেল ভাল্লুকের ভয়ঙ্কর চীৎকার। সেই দিকে সকলে লক্ষ্য করতেই দেখা গেল বৃক্ষাদি তরু লতা চূর্ণ বিচূর্ণ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে এক বিশালকায় কালো রঙের ভাল্লুক। সকলে প্রচণ্ড চিৎকার করে সেইদিকে ছুটে যেতেই দেখা গেল এক প্রকাণ্ড কেন্দুগাছের নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে নিরাপদ। কালবিলম্ব না করে সকলে মিলে ধরে তুললেন নিরাপদকে। না, তার দেহে প্রাণ আছে। শুধু দর দর করে তার গ্রীবা থেকে তাজা রক্তের স্রোত বইছে। সদ্য পালিয়ে যাওয়া ভীমকায় ভাল্লুকটি তার নিটল গ্রীবা থেকে এক থাবা মাংস নিয়ে পালিয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় যন্ত্রণা কাতর নিরাপদ জীবন মৃত্যুর সীমারেখায় পড়ে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে শুধু গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সঙ্গে সঙ্গে গামছা দিয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া

জল, এই মুহূর্তে মৃত্যুদুতের করাল কবল থেকে নিরাপদকে বাঁচাতে ; চাই একটু জল। কিন্তু কোথায় সেই জীবনদায়ী অমৃত সুধা! নিরাপদর জলের ঘটি দূরে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। নিকশ কালো আঁধারময় ভয়ঙ্কর অরণ্যে কোথাও এক ফোঁটা জল জোটাতে না পেরে লতাপাতার বাঁধনে বাঁশের দোলা করে অর্দ্ধমৃত নিরাপদকে নিয়ে প্রায় মধ্যরাতে ক্যাম্পে ফিরে আসে সকলে।

আস্তানায় ফিরে নিরাপদর চোখে মুখে জল দিয়ে টুকিটাকি টোটকা চিকিৎসা করার পর জ্ঞান ফিরে আসে। পরদিন দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণী ওর কাছ থেকে জানা গিয়েছিল। নিরাপদর ভাষায়— 'আমি দুপুরবেলা রুটি কয়খান খায়ে ওই কেন্দুগাছটার গোড়ায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। ক্লান্ত শরীরে ঠাণ্ডা বাতাস লাগে আমার ঘুম আসে গিছিল। ভাল্লুকটা আমার উল্টোদিক দিয়ে আসে মাথায় থাবাতি লাগলো। আমি ভাবলাম মানুষ। পরে আবার থাবালি চায়ে দেখি ভাল্লুক গাছের দুই ধারে দুই হাত দিয়ে দাঁড়ায়ে পড়ে আমার মাথায় থাবাচ্ছে। আমি দাঁড়ায়ে খপ করে দুই হাত দিয়ে গাছের এপাশে দাঁড়ায়ে ওর দুই হাত ধরে বসলাম। হাত ছাড়লি ভাল্লুক আমারে জ্যান্ত রাখপেনা জানে গাছে পা বাধায়ে, 'বাবা হরিচাঁদ বাঁচাও' বলে জোরে টানে ধরে রাখলাম। ভাল্লুক হাত ছাড়ানোর জন্যে খুব চেষ্টা করিল। আমি বললাম, 'আমি বাঁচে থাকতি তুই হাত ছাড়াতি পারবিনে।' চারদিক তাকায়ে দেখি তোমরা সব চলে গেছ। আমি আর কী করব, ভাবলাম মরিচি তো, তোরে ভাল্লুক ছাড়ব না। এর পরে তোমাগে চ্যাচানি শুনে তোমাগে দিক তাকাতিই ভাল্লুকটা এক টানে হাত ছাড়ায়ে নিয়ে আমার পিঠি থাবা মারল আর জানিনে।'

এই নিরাপদর ঘটনাই প্রথম এবং শেষ ঘটনা নয়। এমন অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যার বর্ণনা করতে গেলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির মতো মনে হবে। কয়েকখানা মহাভারতেও তা শেষ হবে না। অতএব পুঁথি না বাড়িয়ে পরবর্তী ঘটনায় আসি।

১৯৭৭ সালের জুলাই মাসের দিকে আমাদের বাড়ির প্লট ১৬ ডেসিমিল মেপে দেখিয়ে দেওয়া হয়। আমরা সকলেই যার যার প্লটে জঙ্গলের গাছ বল্লি লতাপাতা দিয়ে ঘর বেঁধে নিই। প্রত্যেক পরিবারকে দিয়েছিল এক জোড়া হাঁটা চলা করতে পারে এমন হালের বলদ। পরে বদলে দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে অনেককে ঠ্যাং ভাঙা বলদও দিয়েছিলেন। পরে আর কখনো তারা ভালো বলদ পায়নি। একখানা লাঙলের ফাল দিয়ে লাঙল তৈরি করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিছু ধানের বীজ মেস্তার বীজ তিন কলাইয়ের বীজ দিয়ে পাঁচ সাতটি পরিবারকে গ্রুপ করে যে যতটা পারে চাষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অনাবাদি পতিত জমি আর অশিক্ষিত বলদ নিয়ে সদ্য গাছের বড় বড় শেকড় আর পাথর বিছানো অনন্ত কালের নিষ্ঠুর বন্ধ্যা জমিতে হাল ফোটায় কার সাধ্য! ব্যর্থ হয়ে দণ্ডকারণ্য কর্তৃপক্ষকে জানালে সরকারি ট্রাক্টর দিয়ে হ্যারো ফালে একবার

করে চাষ করে দেয়। এই চাষে বিপদ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। হ্যারোর বড় গোলাকার তালাগুলি যেখান দিয়ে গেছে সেখানে খাল করে মাঝে বড় আলের মতো উঁচু করে রেখে গেছে। তার উপর দিয়ে অশিক্ষিত বলদ নিয়ে হাল চালানো যেমন দুষ্কর তেমনি ধান বুনলে সেখানে খাল জলে পচে, যেখানে উঁচু, শুকিয়ে মরে, এমনি করে সারা বছর হাড়ভাঙা খাটুনির যা ফলাফল, অনেকে কিছু কিছু ফসল পেলেও অনেকের ভাগ্যে নবান্নও জোটেনি।

১৯৭৮ সালে সরকার দণ্ডকের উদ্বাস্তুদের সকল প্রকার অনুদান বন্ধ করে দেয়। তখন প্রত্যেক পরিবারকে খুঁটির উপর এস্‌বেস্টার দিয়ে ঘর খাড়া করে তাতে কাদা মাটির দেওয়াল নিজেদেরকে বানিয়ে নিতে বলে। নবাগত MPV গ্রামের বাসিন্দাদের সরকারি গৃহপ্রবেশ তখনও হয়নি। সেচ ব্যবস্থার কোনো নামগন্ধও কোথাও নেই, উদ্বাস্তুদের জমিজমাও চিহ্নিত করে দেওয়া হয়নি। কাজ কর্ম বলতে যারা নিজেদের ঘরের দেওয়াল নিজেরা তৈরি করতে অক্ষম তাদের ঘরের দেওয়াল তৈরি করা। সারা দণ্ডকারণ্যে খাদ্য সমস্যা প্রবলরূপ ধারণ করে। আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার আট দশটা উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের ডংকরাই গিয়ে অল্প পয়সায় খুদ কিনে মাথায় করে দুদিন পরে বাড়িতে ফিরতে হত। রাস্তায় জনমানব শূন্য বন্যফল পাহাড়ি ঝরনার জল খেয়ে জীবন বাঁচাতে হয়েছে। দণ্ডকে প্রচুর পরিমাণে মহুয়া ফুল এবং ফল ফলে। মহুয়া ফুল থেকে মদ তৈরি হয়, ফল থেকে তেল হয়। যার কারণে এগুলির বাজার মূল্য কম বেশি হলেও বিক্রী হয়। বাঙালিদের জন্যে জঙ্গল সাফ করে জমি তৈরির সময় সকল প্রকার মূল্যবান গাছ, যেমন শাল, সেগুন, মুণ্ডি, বিজা, শিরীষ কেটে সাফ করলেও মহুয়া গাছ কাটার অনুমতি ছিল না। সেই সকল মহুয়ার ফল ফুল বাঙালিরা সংগ্রহ করে বিক্রী করতে পারত। আদিবাসীদের এলাকায় তীরবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় কেউ মহুয়া কুড়াতে যেত না।

দণ্ডকের আদিম বাসিন্দাদের সঙ্গে, দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট শুরু থেকে তখন পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রে ভালোবাসাবাসীর সূত্রপাত হয়নি। কারণ তারা কোনো কারণেই বাংলা ভাষাভাষীদের সংস্রবে আসত না। ১৯৬৫ পর্যন্ত এরা বস্ত্রের ব্যবহার শেখেনি। রন্ধনযুক্ত খাবার তৈরি জানত না। তীর ধনুক হাতে নিয়ে সারাদিন বনে বনে শিকার খুঁজে ফিরত। পোশাক পরিচ্ছদ পরা মানুষ দেখলে ভয়ে গভীর বনে লুকিয়ে থাকত। নিজেদের থাকার ঘরে কোথাও কোনো আসবাবপত্রের চিহ্নমাত্র ছিল না, মেটে বাসন ব্যবহার করত। জলের পাত্র হিসেবে লাউর বস ব্যবহার করত। এদের গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ছিল প্রচুর। কিন্তু তাদের থাকার জন্যে কোনো গোয়াল ছিল না। দুধও এরা খেত না। গাভিদের দোহন করত না। চাষ আবাদের ক্ষেত্রে পাহাড়তলিতে কোথাও সমতল ফাঁকা জায়গা দেখে, কিংবা পাতলা জঙ্গল দেখে সেখানের ছোট ছোট গাছগুলির এক দেড় হাত উপর দিয়ে কেটে তার মধ্যে

কোনোপ্রকার লাঙ্গল চালিয়ে বীজ বুনে দিত। ধান, মান্ডিয়া, কোদো, ভুট্টা, জোয়ার বর্ষাকালে বুনে রেখে আসত আর ফসল কাটার সময় সেই ক্ষেতে যেত। অসংখ্য আগাছার মধ্যে বন্য পশু নষ্ট করার পরেও যা অবশিষ্ট থাকত তাতেই সন্তুষ্ট থাকত। [illegible] বা টাকাপয়সা মুদ্রার ব্যবহার বুঝত না। ওদের জীবিকার জন্যে প্রয়োজনও ছিল খুব সামান্য। সেগুলি প্রায় সব বনজ সম্পদে মিটে যেত। একমাত্র লবণটা ওরা আবিষ্কার করতে পারত না ; ওটাই ওদের কাছে ছিল বহুমূল্য সম্পদ। বেজেংওয়াড়া শিখাপল্লি, পড়িয়া ওদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের হাট বসত। সেই সকল হাটে জিনিসপত্রের বিনিময় হত। কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা ওই হাটে লবণ, শুকনো মাছ নিয়ে আসত। তারা এক ডোল লবণের বিনিময়ে এক ডোল চাল মহুয়া ইত্যাদি নিয়ে যেত। উদ্বাস্তুরা ওই সকল হাটে কেনাবেচা করতে পারত না। কারণ কোনো কিছুর বিনিময়ে মুদ্রা দিলে ছি ছি বলে ছুঁড়ে ফেলে দিত। উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাবেচা করতে হলে মালকানগিরি থেকে মটু, নব্বই কিলোমিটার ; অথবা মটু জয়পুর, দুশো কিলোমিটার যেতে হত। যানবাহন বলতে সরকারের দেওয়া গরুর গাড়ি। ১৯৬৯ সালে জয়পুর মটু ও জয়পুর পড়িয়া ; এই দুখানা বাস সারা দিনে একবার করে চলাচল করত। রাস্তায় বিকল্প হলে দু তিন দিন লাগত পুনঃগমন করতে।

১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ওরা কিছু কিছু বস্ত্রের ব্যবহার শিখতে থাকে। যুবতী মেয়েরা একটা লুঙ্গি দুখণ্ড করে একখানা কোমরে পেঁচিয়ে রাখত ও অপর খানা গলার উপর দিয়ে বুকটাকে ঢেকে রাখত। (একমাত্র বাঙালি গ্রামের পাশাপাশি যারা বসবাস করত) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা লেংটি পরত। কারো সঙ্গে কোনো ভাষার আদানপ্রদান হ'ত না। উভয়ের পক্ষেই উভয়ের ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। অবশ্য ১৯৬৪ সালের আগে যারা পুনর্বাসন পেয়েছিল তাদের নতুন প্রজন্ম আদিবাসীদের ভাষা(কয়া) কিছু কিছু রপ্ত করে ফেলেছিল। আমার গ্রামের লাগোয়া একটা আদিবাসী গ্রাম আছে, নাম পালেমারি কুণ্ডা। আমি মানা থেকে আসার সময় একটা সাইকেল ও একটা রেডিও নিয়ে এসেছিলাম। সাইকেলটা যখন ওই গ্রামের উপর দিয়ে প্রথম চালিয়ে গেছি তখন গ্রামের যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে ভয়ে পড়িমড়ি করে লুকিয়ে পড়েছিল। ওই গ্রামের উপর দিয়ে আমাদের এ ই ও সেন্টারে যেতে হত। ফেরার সময় দেখি একদল তীরন্দাজ গাছের আড়ালে ধনুকে তীর যোজনা করে ব'সে আছে। আমার ওই সাইকেল নামক অদ্ভুত যন্ত্রটি কোনো অঘটন ঘটালে আত্মরক্ষা করতে তীর ছুঁড়বে। অবস্থা বুঝে ওদের সঙ্গে আমাদের চলাফেরা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমি সাইকেলটাকে আর ঘর থেকে নামাইনি।

পালেমারি কুণ্ডা আদিবাসিন্দাদের মধ্যে 'মোকা' নামক একজন বছর-পঞ্চাশেক গোছের মানুষ ছিল, সে ওই গ্রামের সকলের থেকে ব্যতিক্রম। তাকে প্রথম থেকে

দেখেছি একখানা তোয়ালে সবসময় পরে থাকতে। মাঝে মাঝে একটা ফুল গেঞ্জিও পরত। আমি তখন উড়িয়া ভাষাটা ভালো করে আয়ত্তে আনতে পারিনি। দীর্ঘ ৫ বছর মধ্যপ্রদেশের মানা ক্যাম্পে থাকায় হিন্দি ভাষাটা বেশ আয়ত্ত করেছিলাম। যার ফলে বাঙালি ভিন্ন অন্য কোনো ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতে গেলে হিন্দি ভাষাটা বেরিয়ে আসে। ওই মোকা ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন পথে দেখা হয়ে গেল। আমি হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাহা যা রহেহো ভাই! কেয়্যা নাম হ্যায় তোমহারা?' ও আমাকে হিন্দিতে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'ম্যায় মোকাহু, ক্ষেতমে যা রাহাহু।' আমি ওর কথা শুনে মুহূর্তের জন্যে হতবাক। এই দুর্গম গিরিকন্দরে শিক্ষাদীক্ষার গন্ধবিহীন আদিম পুরুষের মুখে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি! আমি ঔৎসুক্যের সহিত আবার বললাম, 'আপতো হিন্দি আচ্ছা বোল লেতে হো।' জবাবে বলল, 'কিউ নেহি, হিন্দি মে ক্যাহা রাখা হে। ম্যায়তো ইংলিশ ভি থোড়া বহুত বোল লেতা হু।' আমি আরো আশ্চর্য হয়ে পড়লাম। আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আপকো লিখাই পড়াই আতা হে?' জবাবে, 'জী নেহি।' 'তো আপনে হিন্দি ইংলিশ ক্যায়সে শিখা?' এবার কেমন যেন উদাস হয়ে বলল, 'ও তো বহুতই লম্বী দুখ্‌ভরি কাহানি হে।' আমি উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম ঘটনাটা। ওর দুঃখের কাহিনি যা বলল তার বঙ্গানুবাদ এইরূপ। 'এখান থেকে পঁচিশ তিরিশ মাইল দূরে একটা বড় নদী আছে যার নাম সবরী নদী। নদীর ওপার মধ্যপ্রদেশ। ওই দেশের বয়লাডিলা নামক স্থানে লোহা পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের থেকে ইংরেজরা লোহা নেওয়ার জন্যে বিশাখাপত্তনম পর্যন্ত পাহাড় কেটে রেললাইন তৈরি করেছে। সেই রাস্তায় কাজ করানোর জন্যে লোক না পেয়ে আমাদের আদিবাসীদের যেখানে পেত ধরে নিয়ে পাথর ভাঙার কাজে লাগাত। এই যে জয়পুর মটু রাস্তা, কাঠ নেওয়ার জন্যে আর আদিবাসীদের ধরে নেওয়ার জন্যে ওরাই তৈরি করে গাড়িঘোড়া চালাত। একদিন আমি শিকার করতে জঙ্গলে ঘুরছিলাম। আমার সঙ্গে আমার আশেপাশে অনেক আদিবাসী গ্রামের লোক মিলে একটা বুনো শুয়োর তাড়া করছিলাম। হঠাৎ ইংরেজদের গাড়ি থেকে বন্দুকধারীরা নেমে আমাদের অনেককে ধরে ফ্যালে। অনেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। আমাদের নিয়ে রাস্তায় পাহাড় কাটার কাজে লাগায়। কাজ করতে অস্বীকার করলে চাবুক দিয়ে বেদম পেটাতো। পাঁউরুটি খেতে দিত। প্রায় দশ বছর ওদের সঙ্গে আমায় থাকতে বাধ্য করেছিল। তারপর একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসি। ওদের লোক হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলত। যার ফলে আমি ইংরেজিটা ভালো বলতে না পারলেও হিন্দিটা ভালো বলতে পারি।'

আমিও বললাম, 'আমাদের দুর্ভাগ্যবশত ভারত ভাগ হওয়ায় আমাদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ভারত সরকারের শরণাপন্ন হয়েছি। ভারত সরকার তাদের সুবিধেমতো তোমাদের জন্মভূমিতে আমাদের পুনর্বাসন দিয়েছে। এরপর তোমাদের

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্মভূমি এখানেই হবে। বাঁচা বাড়ার ক্ষেত্রে তোমাদের আমাদের উভয়ের হাত ধরাধরি করে এগোতে হবে। সেই সুবাদে আদিবাসী ও বাঙালিদের মধ্যে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু আদিবাসী ভাইয়েরা বাঙালি ভাইদের দেখলে পালায় কেন বলোতো? এইভাবে তো একে অপরের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে উঠতে পারে না।' মোকা বলল, 'ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু আমাদের লোকেদের ধারণা পোশাক পরিচ্ছদ পরা মানুষগুলি ভালো নয়; ওরা নিষ্ঠুর, হিংস্র। আমাদের ফাঁকা পেলে ধরে নেবে আর কখনো ছাড়বে না। প্রথম প্রথম তো বদ্ধমূল ধারণা ছিল আদিবাসীদের ধরে নিতেই এই লোকগুলোকে এখানে আনা হয়েছে। তোমরা ইংরেজদের মতো পোশাক পর। তোমাদের খাদ্য খাবার চলাবলা আমাদের থেকে ভিন্ন, তাই তোমাদের সঙ্গে আমাদের বিশ্বস্ত ভালো সম্পর্ক গড়তে পারে না।'

এছাড়াও আদিবাসীদের সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থা পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা বাঙালিদের পক্ষেও খুবই কঠিন ছিল। ১৯৬৫ সালের এক ঘটনার কথা। MV 68 নম্বরে এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমায় বললেন, 'এক নিরীহ দম্পতি ওই বছর পুনর্বাসন পেয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভালো ধরনের ফসল ফলিয়ে ছিলেন। ধানের শীষে সোনালী রং ধরলে দিন রাত্র ক্ষেতে উঁচু মাচা বেঁধে সেখানে বসে পাহারা দিতেন। একদিন ভোরবেলা ক্ষেত রেখে বাড়িতে চলে আসেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে গিয়ে দেখতে পান এক আদিবাসী মহিলা কাঁখে বাঁশের ডোল নিয়ে তাদের ক্ষেতের ধান ছিঁড়ে ডোল ভর্তি করছে। এবার যথারীতি আদিবাসী মহিলার হাত ধরে গ্রামে এনে সবাইকে দেখাল। গ্রামবাসীরা মহিলার ডোল থেকে ধান রেখে তাকে ছেড়ে দেয়।

সন্ধ্যার আগে ওই মহিলা তার গ্রামবাসী আদিবাসীদের তীরধনুক সহ এনে গ্রামবাসীদের উপর হামলা করতে থাকে। এই পরিস্থিতির মধ্যে বাঙালি গ্রামবাসীগণ তাদের কাছে এসে জানতে চাইলেন তাঁদের অপরাধ কী? কেন তারা জোট বেঁধে এসেছে? ওরা বলল, 'ওদের মেয়ের হাত ধরার অপরাধে শাস্তি নিতে হবে। অথবা একটা বড় ছাগল জরিমানা দিতে হবে।' গ্রামবাসীরা জানালেন, 'তাদের মেয়ে নগেনের ক্ষেতের ধান চুরি করেছে।' আদিবাসীরা বলল, 'তার ঘরে খাবার না থাকলে সে না করবে। তাই বলে মেয়েদের হাত ধরবে?'

ওদের বিচার অনুযায়ী নগেনের ছাগল দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় থানায় নগেনের নামে মানহানির এফ আই আর করা হয়। যথারীতি নগেনকে থানায় ডাকা হল। নগেন যথাসময়ে থানায় হাজিরা দিতে এলে প্রথমে বড়বাবু তার দুই গালে কষে চড় মারল। চড়ের আঘাতে নগেনের মুখাবয়ব রক্তিম হয়ে দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর উত্তপ্ত হয়ে বড়বাবু বলল, এই শালা, আদিবাসী মেয়েদের হাত ধরেছিস কেন? নগেন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'সে আমার ক্ষেতের ধান চুরি করেছে।

তাই গ্রামবাসীদের দেখানোর জন্যে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম।' বড়বাবু বললেন,'ওরা অবুঝ জাতি আপন পর না ভেবে হয়তো ধান নিয়ে বসেছে। তাই বলে তুই ওর হাত ধরতে গেলি কেন?' নগেন কোনো জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল, 'ভুল হয়ে গেছে।' বড়বাবু বললেন, 'ভুল হয়েছে বললে সেরে যাবে। ওদের আমি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়েছি। দে ১০ টাকা দে। নইলে হাজতে পুরব।' হাজতের নাম শুনে নগেনের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, কম্পিত কণ্ঠে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'বাবু টাকা তো আমি আনিনি। ঘরে গিয়ে জোগাড় করে আনতে হবে।' বড়বাবু বললেন, 'যা বিকেলের মধ্যে টাকা নিয়ে না এলে ধরে এনে হাজতে পুরব।'

ছাড়া পেয়ে নগেন ঘরে এসে কোথাও টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে ঘরে মুরগিগুলি সস্তা দামে বিক্রি করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বড়বাবুর টাকা দিতে গেল। স্ত্রীকে রাস্তায় বসিয়ে রেখে বড়বাবুকে গিয়ে টাকা দিলে বড়বাবু খুশী মনে বলল, 'যা আর কখনো আদিবাসী মেয়েদের হাত ধরবি না।'

নগেন বাইরে এলে প্রতীক্ষারত স্ত্রী জানতে চাইল, মিটেছে তো? নগেন বলল, 'হ্যাঁ।' স্ত্রী বলল, 'অতগুলো টাকা তো দিয়ে এলে, এবার চুরি করলে কোথায় ধরে আনতে হবে শুনেছ?' নগেন বলল, 'না।' স্ত্রী বলল, 'যাও শুনে এসো।' নগেন আবার গিয়ে বড়বাবুর সামনে দাঁড়াল। বড়বাবু জানতে চাইল ফিরে আসার কারণ। নগেন বলল, 'বউ বলছে এবার চুরি করলে কোথায় ধরে আনতে হবে?'

শিক্ষা ব্যবস্থাটা ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত ছিলনা বল্লেই চলে। প্রত্যেকটা এ ই ও সেন্টারে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত একটা করে স্কুল, মালকানগিরিতে একটা হাইস্কুল, আর কয়েকটা পুরোনো গ্রামে প্রাইমারি স্কুল করা হয়েছিল। সেই সকল স্কুলে বাচ্চাদের পড়ানো, বা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দণ্ডকে আদৌ স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতো মানসিক অবস্থাই কারোর গড়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট' সরকার গদিতে আসে। ইং ২৮/১১/৭৭ সালে রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জী ও বিধানসভার সদস্য রবিশঙ্কর পাণ্ডে ও কিরণময় নন্দ দণ্ডকারণ্য সরেজমিনে তদন্ত করতে আসেন। রাম চ্যাটার্জীর মুখখানা মানা ট্রানজিস্ট ক্যাম্প থেকে দণ্ডকে আসা সকল উদ্বাস্তুরাই চিনতেন। কারণ মানায় ১৯৭৫ সালে মে মাসে তিনদিন ব্যাপী সর্বভারতীয় উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রামবাবু দীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের সুখদুঃখের কথা বলেন এবং এও বলেন, 'আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে আপনাদের বাংলায় নিয়ে পুনর্বাসন দেব।' এবার বলেন, 'আমি ঘুরে ঘুরে দণ্ডকে যা দেখলাম, তাতে সরকার আপনাদের পুনর্বাসনের নামে নির্বাসন দিয়েছে। আমার সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে একথা জানাবই এবং এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে।'

রামবাবুর কথায় সারা দণ্ডকারণ্য উত্তাল হয়ে অপেক্ষায় থাকে। কবে এসে পরম বান্ধব রামবাবু আমাদের বাংলায় নিয়ে পুনর্বাসন দেবেন। ভেতরে ভেতরে সকলেই

গোছগাছ করে বাংলায় যাওয়ার গভীর প্রত্যাশা বুকে বেঁধে বসে থাকে। ইং ১৯৭৮ সালের ১৬ জানুয়ারি রামবাবু ও সঙ্গে বামফ্রন্ট কমিটির সম্পাদক অশোক ঘোষকে নিয়ে পুনঃ আসেন। এবার শুধু রাম বাবু নন, অশোক বাবুও বলেন, 'আপনারা যদি পশ্চিমবঙ্গে যেতে চান তাহলে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত আপনাদের সমর্থনে এগিয়ে আসবে।' রামবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'দিন আপনাদের আসবেই, আপনারা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। আমি অতীতেও আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আজও আছি ভবিষ্যতেও থাকব।' এম পি ভি তেইশ নম্বর বিশাল ময়দানে বিপুল জনসমাবেশের মাঝে রামবাবুদের এই বক্তব্যে বিপুল উল্লাসে মুগ্ধ জনতা আনন্দচিত্তে মহাশব্দে করতালি দিয়ে রামবাবুদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন 'জয় রাম চ্যাটার্জীর জয়', বলে মহাউল্লাসে দুহাত তুলে নৃত্য করতে থাকে অগণিত সর্বহারার দল।

শুধু MPV 23 নম্বরেই নয় তিনি বিশাল বিশাল সভা করেন মালকানগিরি ড্যামসাইট ১১০ নং, MV 79, MPV 81, কোনো কোনো সভায় রামবাবু বল্লেন, 'আপনারা ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন সেখান থেকেই বাংলায় নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে মরিচঝাঁপি দ্বীপে পুনর্বাসন দেব।' আমি নিজে এই সকল সভায় রামবাবুদের উত্তপ্ত ভাষণ শুনেছি, ড্যাম সাইডসভায় তিনি বলেন, 'আমরা পূর্বের প্রতিশ্রুতির কথা আমি ভুলিনি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এসেছে। এবার আপনাদের ভাগ্যের চাকা বদলে গেছে। আপনাদের ভাগ্যাকাশের দুর্যোগের ঘনঘটা কাটিয়ে আমি এসেছি আপানদের বাংলার মানুষ বাংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত উঁচু করে আপনাদের ডাকছে আপনারা ফিরে চলুন বাংলার মানুষ বাংলার মাটিতে।'

বামফ্রন্টের শক্তিশালী নেতা, রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জীর মুক্তকণ্ঠে প্রাণখোলা আহ্বানে সমগ্র দণ্ডকের উদ্বাস্তু তাদের বহু আকাঙ্খিত নিত্যস্মরণীয় শস্যশ্যামলা সোনার বাংলায় স্থায়ী পুনর্বাসনের আশায় দণ্ডকারণ্য সরকারের দেওয়া শ্বাপদসঙ্কুল রুক্ষ অরণ্যভূমি পরিত্যাগ করে সকল বাধা উপেক্ষা করে প্রাণপণে ছুটে চলে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন মরিচঝাঁপি অভিমুখে ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস থেকে।

কেউবা বিশাখাপত্তনম, কেউ কোরাপুট, কেউ রায়পুর। পশ্চিমবাংলা অভিমুখে গরু গাড়ি, বাস, লরি, ট্রেন সব কিছুতে শুধু উদ্বাস্তু আর উদ্বাস্তু। পড়িয়া থেকে পুনরী নদী পার হলে দ্রোণাপাল মধ্যপ্রদেশ। দ্রোণাপালের নদীঘাট থেকে সুন্দর রাস্তা (রায়পুর অভিমুখি) দেড় কিলোমিটার। এই দেড় কিলোমিটার বিশাল খোলা ময়দানে রায়পুর যাওয়ার গাড়ির অপেক্ষায় প্রায় এক মাস যাবৎ হাজার হাজার উদ্বাস্তু জমা হয়ে থাকত। সেখানকার কয়েকটা মাড়োয়াড়ি মুদি দোকানে প্রতিদিন কয়েক লরি খাদ্যসামগ্রী জগদলপুর থেকে আমদানি হত, তথাপি সন্ধ্যার মধ্যে সব দোকান শূন্য

হয়ে পড়ত। সবরী নদীতে পারাপারের মাঝির চির-দরিদ্রতা ঘুচিয়ে তাকে কোঠা বাড়ি করে দিয়েছিল উদ্বাস্তুরা।

রায়পুর রেলস্টেশন থেকে আরম্ভ করে রেল গুদামের বারান্দা কোথাও একটু তিল ধারণের জায়গা তো ছিলই না উপরন্তু সমস্ত রায়পুর শহরে যেখানে যতটুকু ফাঁকা জায়গা পেয়েছে সেখানেই অপেক্ষায় আছে কখন ট্রেনে চড়ার সুযোগ পাবে। অকল্পনীয় মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে পায়খানা প্রস্রাব ; মশা-মাছি ময়লা নর্দমার ঘোর অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে, অবোধ শিশুদের ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কাগজ কুড়িয়ে, কেউ এক মুঠো চাল ফুটিয়ে নিয়েছে, কেউবা এক খণ্ড পাঁউরুটি, কেউ শুকনো চিড়ে চিবিয়ে, কেউবা অনাহারে দিনযাপন করতে করতে হাসনাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে এসে পৌছেছে। এই কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে মানুষগুলির চেহারা যে কোন পর্যায় এসে পৌছেছে তা নিজে চোখে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। সাধারণের দৃষ্টিতে এদের মান সম্মান বলে কিছুই ছিল না। সাধারণ মানুষ এদের কাছ দিয়ে হাঁটতে গেলে নাকে রুমাল দিয়ে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলত। ঘৃণ্য কুকুরের মর্যাদা থেকেও এরা বঞ্চিত হয়েছিল।

আমি যে ট্রেনটাতে উঠেছিলাম, সেই ট্রেনের উদ্বাস্তু যাত্রীদের পুলিশ লাঠি দেখিয়ে খড়গপুর স্টেশনে নামিয়ে রাখে। এবং অন্য কোনো ট্রেনে চেপে হাওড়ার দিকে কেউ যাতে যেতে না পারে সে দিকে সজাগ প্রহরা চলছিল। খড়গপুর স্টেশনে নেমে চেয়ে দেখি চার নম্বর প্লাটফর্মে এক জায়গায় গোলাকার হয়ে প্রচণ্ড রকমের ভদ্রলোকের ভিড় জমেছে। উদ্বাস্তুদের সময় ছিলনা কোথায় কি ঘটেছে সেদিকে লক্ষ্য করার। সকলের লক্ষ্য ছিল কোন কৌশলে মরিচঝাঁপি পৌছানো যায়। লক্ষে পৌছানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের বহুমূল্য মোট বোচকা এমনকি বৃদ্ধ বৃদ্ধা কোলের শিশু সন্তান অসুস্থ হয়ে মারা গেলেও তাঁদের প্রতি শোক ব্যক্ত করার অবকাশ ছিল না। পথে ফেলে উন্মাদের প্রায় ছুটে চলেছে সুন্দরবন মরিচঝাঁপি।

আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ভিড়ের মাঝে ব্যাপারটা কী আবিষ্কার করার জন্যে। কাছে যেতেই শুনতে পেলাম ওই ভদ্রলোকের ভীড়ের কোলাহল নিস্তব্ধ করে ভেসে আসছে এক মহিলা কণ্ঠের তীব্র চিৎকার। ভদ্রলোকেরা ভেতরের ব্যাপারটা দেখার জন্যে এতই উৎসুক ত্বর না সইতে পেরে একে অপরের কাঁধে ভর করে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ওই প্রচণ্ড ঠেলাঠেলির মধ্যে ভিড় কাটিয়ে ভেতরের বিষয় উদ্ধার করা আমরা সাধ্যের বাইরে বুঝে আমি ব্যর্থ মনে ফেরার উদ্যোগ করতে দেখি দুজন মহিলা পুলিশ বেতের লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। মহিলাদ্বয় মুখে হাত রেখে ভিতরের বিষয়টা নিয়ে কি যেন বলছে আর উচ্চৈস্বরে খিল খিল করে হাসছে। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম ভীড়ের ভেতর ঘটনাটা কী? একজন বলল, 'এক রিফুজী বউ এর ডেলিভারি হচ্ছে।' অপরজন তার পিঠে একটা হাল্কা চড় মেরে

বলল, 'ধ্যাৎ বোকা কোথাকার ! ডেলিভারি বলছিস ! ওই দাদু বুঝবে বুঝি ! সে আমায় বাংলা করে বলল, এক উদ্বাস্তু সন্তান প্রসব করছে। তাই সবাই দেখার জন্যে ভীড় জমিয়েছে। বলে আবার দুজনে খিল খিল করে হেসে উঠল।

ওদের হাসিতে আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লাগল। নিজের অবস্থা, পরিস্থিতির কথা ভেবে সংযত মনে বললাম, 'আপনারা তো মহিলা। এভাবে একজন অসহায় নিরুপায় মহিলার মা হওয়ার লজ্জা হাজার হাজার পুরুষের সামনে নিলাম হচ্ছে দেখে আপনাদের বিবেক কি ঘুমিয়ে আছে ? সে কী একটুও দংশন করছে না ? মাতৃ উদর থেকে কোন পথে কেমন ভাবে পৃথিবীর বুকে এসে পড়েছিল, সে দৃশ্য সজ্ঞানে দেখার অতৃপ্ত বাসনা মেটাবার প্রতিযোগিতায় ভিড় জমিয়ে কামান্ধ লোলুপের দল, উপহাস করছে এক অসহায় করুণ বেদনার্ত মায়ের। আর আপনারা মহিলা শান্তিরক্ষক হয়ে বড় বড় দুখানা বেত হাতে নিয়ে খিল খিল করে হাসছেন। আর তামাশা দেখছেন ? যদি একটুও নারীত্ব মাতৃত্ববোধ আপনাদের মধ্যে থেকে থাকে তবে ওই বেত কাজে লাগান। বিপদগ্রস্ত মহিলাকে কোনো বিশ্রামগৃহে অথবা রেলওয়ে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।'

আমার কথায় শান্তিবাহিনীর জননীদ্বয় তপ্ত তেলে শীতল জলের ছিটে পড়ার ন্যায় জ্বলে উঠলেন। মুহূর্তের মধ্যে মুখের আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রাণখোলা হাসি মিলিয়ে গিয়ে ক্ষিপ্ত বাহিনীর ন্যায় বলে উঠলেন, 'আপনাকে এখানে ভাষণবাদী করতে কেউ ডেকে আনেনি। রিফুজীদের লম্বা ভাষণ মানায় না। যাদের চাল চুলোর পাত্তা নেই, পোকামাকড়ের মতো সারা দেশময় কিলবিল করছে, তাদের জন্যে আবার ওয়েটিং রুম, হাসপাতাল ব্যবস্থা করতে হবে ! যান এখান থেকে, নইলে বিনা টিকিটে যাত্রা করার অপরাধে হাজতে পুরব।'

যদিও আমি বিনা টিকিটের যাত্রী নই, তবুও আমি উদ্বাস্তু এটা আমার অপরাধ। আমি টিকিট করে যাত্রা করলেও আমার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ভাইদের সকলের সে ক্ষমতা ছিল না। তাই বিশিষ্ট লোক কবি গৌরপদ সরকারের গানটি আবার স্মরণ হল 'প্রতিবাদ করতে গেলে ধরতে হয় সাপের গলা'। অতএব ওই সকল কালনাগ নাগিণীদের গলায় হাত দেওয়ার মতো শক্তিসামর্থ সাহস কোনোটাই আমার ছিল না। শুধু অশ্রুসিক্ত নয়নে বিষণ্ণ বদনে দুর্বল ব্যথাতুর চিত্তে বঙ্গমাতার ধুলি মাথায় নিয়ে মুক্ত আকাশের পানে তাকিয়ে নিঃশব্দে বলেছিলাম, 'ওমা বঙ্গজননী ! এই বুঝি তোর পাঁচ কোটি সন্তান দশ কোটি হাত উঁচু করে গৃহহারা সর্বহারা এই অনাথ অসহায় সন্তানদের আহ্বান করছে ! সুখে থাক তুই তোর সুখী সন্তানদের নিয়ে, আমি চললাম নির্বাসনে বনবাসের পথে।'

খড়গপুর থেকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার পুলিশের গুঁতো দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার পর আর কোনো উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপিতে যেতে পারেনি। জনশূন্য গ্রামে ফিরে এসে

দেখলাম যাওয়ার সময় মুক্তমাঠে ছেড়ে যাওয়া গুরু বাছুর গুলি সারাদিন মুক্তমাঠে চরে বেড়ায়। সন্ধেয় ফিরে আসে যে যার মানবশূন্য চালাঘরে। শ্মশানের মতো গ্রাম গুলি প্রখর রৌদ্র-তাপে দিনের বেলা খাঁ খাঁ করতে থাকে। রাতের আঁধারে জনমানবহীন ভুতুড়ে বাড়ির মতো মনে হয়। সঙ্গী সাথী পরিজন বিহীন একলা ঘরে বসে। সকলের স্মৃতিতে পরাণ জুড়ে ওঠা অবারিত অশ্রুনীর বাঁধ মানে না তখন। মনের মাঝে বেজে ওঠে 'প্রীতির বাঁধন ছিঁড়ে গেছে তবু স্মৃতি আছে আঁকা। ও বঁধুয়া পরাণ পোড়ে রইতে নারি একা।' এর পরের ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার দণ্ডকের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের টোপ দিয়ে মরিচঝাঁপি ডেকে নিয়ে কেমন ভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন, এ ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। আছে ঘটনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ভুক্তভোগীদের অশ্রু ভেজা নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠের সাক্ষাৎকার। আর আছে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাড়ই মহাশয়ের স্বাক্ষরিত মর্মান্তিক কিছু হস্তলিপি। সেই কাগজপত্রগুলিতে রয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের ১৯৭৮-৭৯ সালের আয়োজিত নরমেধ যজ্ঞের চিত্র অঙ্কন। এছাড়া মানবধ্বংসী যজ্ঞের নায়ক ও পুরোহিতদের পাপের সিংহাসন শক্ত করে চির কায়েম রাখার হাতিয়ার তৈরির ষড়যন্ত্রের অন্য কোনো গোপন তথ্য আমার কাছে নেই।

সুনীল হালদার, সিদ্ধার্থ রায়ের সময় দণ্ডকারণ্য থেকে তখন যে উদ্বাস্তু দলটি আসে তার সদস্য ছিলেন। জ্যোতি বসুর সঙ্গে প্রতিটি আলোচনার টেবিলে তিনি ছিলেন। তিনি দেখেছেন 'বিশ্বাসঘাতকতা' শব্দটির নির্মমতা, কতোদূর কিভাবে প্রয়োগ হয়েছিল উদ্বাস্তুদের সঙ্গে।

বিশ্বাসঘাতকতা

সুনীল হালদার

সারা ভারত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি গঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। রায়পুরের মানাতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল। বিমল চক্রবর্তী ছিলেন প্রথম সভাপতি। দীর্ঘদিন ক্যাম্প জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে মানা ট্রানজিট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা সংগঠিত হতে বাধ্য হন।

কর্নেল এস পি নন্দী ছিলেন প্রশাসনিক প্রধান। তিনি কোনো ক্যাম্পবাসীর কোনো অনিয়ম দেখলেই তাকে ক্যাম্প আউট করে দিতেন। রাইহরণ বাড়ৈ তখন বিয়ে করেননি। তার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল। বিচার বুদ্ধি প্রখর ছিল। তাকে ক্যাম্প আউট করে ১৯৬৮ সালে। তিনি ভলান্টিয়ারদের সংগঠন করতে শুরু করেন। লোকবল অর্থবল না হলে যে সংগঠন করা যাবে না একথা মাথায় রেখে সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তুলতে লাগলেন। ১৯৭০-৭১ সালে সংগঠনের সভাপতি হন সতীশ মণ্ডল, সহ সভাপতি রবিন চক্রবর্তী, সেক্রেটারি হন রাইহরণ বাড়ৈ।

মানাতে কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট অথরিটির ব্যবস্থাপনায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হত। ১৯৭০ সাল প্রথম উদ্বাস্তুদের উদ্যোগে আলাদা করে

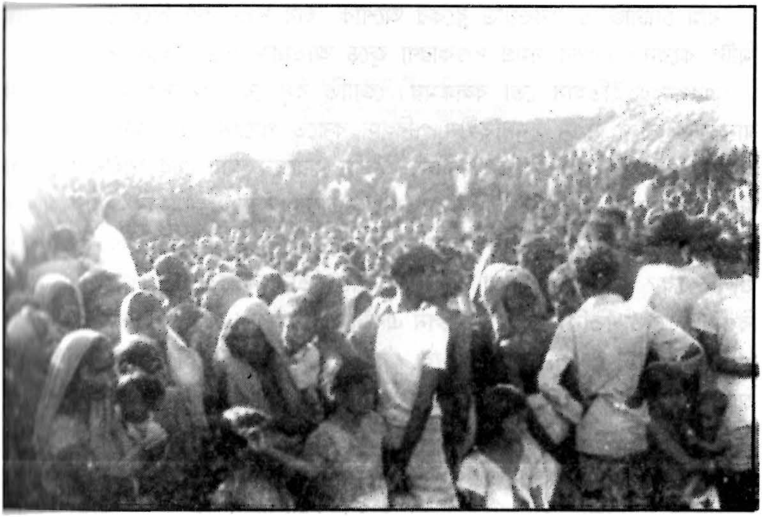
দুর্গাপুজো হল সরকারি সহযোগিতা ছাড়া। ১৯৭০ সাল থেকেই সরকারি পরিচালকমণ্ডলীর সঙ্গে উদ্বাস্তুদের বৈষম্য বাড়তে থাকে। ক্যাপ্টেন নন্দী উদ্বাস্তুদের যে কোনো দাবীদাওয়াকে দমন করার জন্য বন্দুকের গুলি আর টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে গেছেন যথেচ্ছভাবে। ক্যাম্পবাসীদের একটাই প্রধান দাবি ছিল বাংলাতে পুনর্বাসন দিতে হবে। সমর গুহ প্রথম মানাতে আসেন ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফসল বাঙালি তার স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে অস্তিত্বহীন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে নারকীয় জীবনযাপন করছেন— তা দেখে গেলেন সমর গুহ।

আমি তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। যেখানে অস্তিত্বের সংকট-খাদ্য সংকট সেখানে পড়াশোনাটা গৌণ হয়ে গেল।

সি. পি এম-এর উদ্বাস্তু সংগঠন ইউ সি আর সি তখন আমাদের উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে ডেকে আনেন আলোচনার জন্য। আমিও তখন ঐ দলের সদস্য ছিলাম। আমাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গেই আমরা থাকতে চাই, দণ্ডকারণ্য যে মনুষ্যবাসের উপযুক্ত নয় সে কথাও আমরা জানাই। এবার উই সি আর সির দুই প্রধান নেতা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী আমাদের কয়েকজন উদ্বাস্তু নেতা সতীশ মণ্ডল, রাইহরণ বাড়ৈ, রঙ্গলাল গোলদারকে নিয়ে সুন্দরবনে নৌকা করে ৪টি দ্বীপ দেখান। তার মধ্যে মরিচঝাঁপি দ্বীপটি উদ্বাস্তু নেতাদের পছন্দ হয়। এ সব খবর তখন কোলকাতার সত্যযুগ পত্রিকায় বেরোত।

ঐ ১৯৭৫ সালেই জ্যোতি বসু ভিলাইতে যান বক্তৃতা করতে। আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে সেখানে আলোচনা করেন। আমি সেই আলোচনায় ছিলাম। উনি জানালেন, আমরা ক্ষমতায় এলে আপনাদের সব পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে যাব। এ খবর তখন রায়পুরের 'নয়া দুনিয়া' ও 'নবভারত টাইমস' দৈনিক পত্রিকাতে ছাপা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে এমারেজন্সির ঠিক আগে পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থ রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় আমরা পশ্চিমবঙ্গে আসার চেষ্টা করি। আমরা আড়াই হাজার লোক চলে আসি কলকাতার ময়দানে মনুমেন্টের সামনে। বাকি যারা আসার চেষ্টা করছিল তাদের খড়গপুর স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে মেরে ধরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অন্যদের রায়পুর স্টেশনেই আটকে দেওয়া হয়।

আমরা ৪ দিন ময়দানে থাকার পর আমাদের এ্যারেস্ট করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। এই চারদিন আমাদের ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে খাবারদাবারও পানীয় জল দেওয়া হয়। এরপরই এমারজেন্সি ডিক্লেয়ার হয়ে যায়। আমাদের নেতারা বেশিরভাগই আন্ডারগ্রাউন্ড-এ চলে যান। বাকিরা এ্যারেস্ট হয়ে যান। এই সময় সি পি এম-এর ইউ সি আর সি-র কোনো নেতা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেননি এবং কোনো সাহায্যও করেননি। আমরা যারা এ্যারেস্ট হই তাদের মধ্যে আমি ছিলাম, সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার, রবীন চক্রবর্তী, শ্যামল পাত্র, হরেকৃষ্ণ পাল, অমর দে



মরিচঝাঁপিতে জনসভা

ও রতন শীল ছিলাম। এমারজেন্সি উঠে যাবার পর আমরা জেল থেকে ছাড়া পাই। এরপর আবার রায়পুর ফিরে যাই। তখন রাম চ্যাটার্জি এবং সি পি এম-এর সমর মুখার্জি দণ্ডকারণ্য গিয়ে আমাদের পরিস্থিতি দেখে আসেন।

১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর আমরা ১৮ জন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসি জ্যোতি বসুর সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমাদের মধ্যে সতীশ মণ্ডল, রাইহরণ বাড়ৈ, রঙ্গলাল গোলদার, রবীন চক্রবর্তী, সমীর হালদার, আশা সাহা, ময়নামাসী সহ আরও তিনজন মহিলা ও আমাকে সহ রাম চ্যাটার্জি রাইটার্সে জ্যোতি বসুর ঘরে আমাদের নিয়ে যান।

অনেকক্ষণ ধরে আলোচনায় জ্যোতি বসু বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীন চাষিদের এখনও জমি দিতে পারিনি আপনাদের কি করে দেব? আমরা তখন ভিলাইতে উনি যা বলেছিলেন সেই খবর কাগজ 'নয়া দুনিয়া' ও 'নবভারত টাইমস'- ওনাকে দেখাই। ২০ মিনিট আলোচনা হয়। আলোচনার শেষে উনি বলেন— 'আপনারা যদি নিজেরা এসে সুন্দরবনে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে পারেন করুন, আমার পুলিশ কংগ্রেস সরকারের পুলিশের মতো বাধা দেবে না।' এরপর আমরা আরও একদিন রাইটার্সে গিয়ে জ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তখনও তিনি ঐ কথাই বলেন। কলকাতা থেকে আমরা সবাই রাম চ্যাটার্জির বাড়িতে গিয়ে উঠি। তখন ওনার সঙ্গে বহু আলোচনা হল। উনি তখন বললেন, 'তোরা সবাই চলে আয়।'

রাম চ্যাটার্জি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ দণ্ডকারণ্য গিয়ে চার জায়গায় মিটিং করেন। এরপর সমগ্র দণ্ডকারণ্য জুড়ে আওয়াজ ওঠে, 'চলো সুন্দরবন'।

এরপরের ইতিহাস তো কলঙ্কময়। জ্যোতি বসু যে আমাদের মতো সর্বহারা মানুষদের সাথে এমন মনুষ্যত্বহীন পরিহাস করতে পারেন তা আমরা ধারণাতেও আনতে পারিনি। ওনারা তো স্বাধীনতা ভোগ করছেন আর সেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হচ্ছে আজও স্বজাতি স্বাধীনতাভোগী নেতাদের হাতে। কমিউনিস্ট তো অনেক বড়ো ব্যাপার, সামান্যতম মনুষ্যবোধ যদি থাকতো, তাহলে আমাদের এনে এইভাবে গুলি করে, না খাইয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত তিনি করতে পারতেন না। এমন বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করতে পারলেন একটা মাত্র কারণে আমরা নিম্নবর্গের লোক, শ্রমজীবী খেটে খাওয়া চাষি, জেলে, কামার, কুমোর, বেশিরভাগই অশিক্ষিত। আমরা পশুরও অধম। আমাদের নিয়ে যা খুশি করা যায়। এতো বছরেও সেই বীভৎসতা মনে আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। আজও আমরা এমন বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে করলেও কেঁপে উঠি। এরা গরিবের বন্ধু। আমাদের ইতিহাস আর এই বেইমানির ইতিহাস কোনোদিন লেখা হবে? কোনোদিন কি শাস্তি হবে এইসব নরপশুদের?

সাক্ষাৎকার : ১০ জুন ২০১০



সমাজসেবী অশোকা গুপ্ত ছিলেন দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি আই সি এস শৈবাল গুপ্তের স্ত্রী। তার চোখে দেখা 'মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু' সম্পর্কে শেষ সাক্ষাৎকার।

ওরা কতবার উদ্বাস্তু হবে ?

অশোকা গুপ্ত

প্রশ্ন : বলুন দিদি, দণ্ডকারণ্যের অভিজ্ঞতা, মরিচঝাঁপির অভিজ্ঞতা, দাদার সাথে আপনি সব সময় ছিলেন এবং আপনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিলেন যেটা বিরল।

অশোকা গুপ্ত : সে তো অনেকদিন আগেকার কথা, তা সব গুছিয়ে বলাও কঠিন। সেটা হচ্ছে ১৯৬৩/৬৪ সাল, দণ্ডকারণ্যে আমরা ছিলাম। মরিচঝাঁপিতে তার পরে, যখন ঘটনা হয়, দণ্ডকারণ্যে যখন ছিলাম প্রায় ১০ মাস, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে আমরা গিয়েছি। অমরকোট, পারুলকোট, তারপরে মালকানগিরি এবং এসব জায়গায় গিয়ে আমরা দেখেছি, উদ্বাস্তুরা যাঁরা আছেন, তাঁরা যে আনন্দে আছেন তা নয়। তার কারণ অনেক অব্যবস্থা। যত অব্যবস্থাই থাক, একটা জায়গায় গিয়ে স্থিতু হয়ে থাকত তো তাঁরা। সে রকম সময়ে তাদের সঙ্গে গিয়ে অনেকের সঙ্গে আমার নোয়াখালিতেও দেখা হয়েছিল। কাজেই এটা interesting যে, যাদের সঙ্গে আমার নোয়াখালিতে দেখা হয়েছিল, তাদের আমি দণ্ডকারণ্যে দেখলাম, যাদের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে দেখা হয়েছিল তাদের আমি কলকাতার ক্যাম্পে দেখলাম। কাজেই মনে হয় এই যে জনস্রোত, একবার করে ছিন্নমূল হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য

জায়গায় যাচ্ছে, আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে। এদের কিছু কি করার আমাদের রাস্তা ছিল না? এবং কেনই বা এরা ছিন্নমূল হয়ে চলে গেছে? সত্যিকারের সরকারি বা বেসরকারি চেষ্টায় নিশ্চয় ওদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হত। আমার যেটা মনে হয়েছে, দণ্ডকারণ্যে আমরা যখন গ্রামে গ্রামে গেছি, তারা সত্যিকারের আপ্রাণ চেষ্টা করছে চাষবাস করে থাকবে, কিন্তু প্রথম ৬ মাস চাষ করার পরে ওরা মনে করেছে ওদের বুঝি আর লাগবে না কিছু। কিন্তু সত্যি সত্যি যারা কাজ করছিলেন তাদের আমরা দেখেছি যে ৬ মাসে এতো ফসল হয় না যে আরও ৬ মাস চলতে পারে, কিন্তু ওদের রেশন বন্ধ করে দিল। ওদের যা খাবারদাবার ছিল, তার স্টকও বন্ধ করে দিল। কাজেই এদের common স্বার্থে যে সরকারি উদ্যোগ ছিল, সেই সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট ছিল না। সরকারি উদ্যোগটা যথেষ্ট না থাকার ফলে, এমনও হয়েছে যে মানুষের খুব কষ্ট হয়েছে। মানুষের কষ্টটা দূর করার জন্যই তো মানুষের পুনর্বাসন! মানুষের এই যে কষ্টটা দূর করতে পারি নি আমরা। সে জন্যে বিশেষ করে যারা সরকারী কর্মচারী ছিল তারা অধিকাংশ অবাঙালি, আমাদের উদ্বাস্তুরা পকেট থেকে দরখাস্ত বার করে দিত সেগুলি সব বাংলায় লেখা, কাজেই সেগুলি put up করতে করতে কয়েক মাস কেটে যেত। এই জন্য ব্যবস্থা এমন, কি বলব, un-practical ছিল। যে কারণে আমার মনে হয় যে দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যটা, সত্যিকারের কার্যকরী হয় নি। তাছাড়া, মরিচঝাঁপির কথাটা, হল মরিচঝাঁপিতে কেন মানুষ দণ্ডকারণ্য থেকে ফেরত আসছে, এটা নিয়েই কথা তো? আর মরিচঝাঁপি যেটা হয়েছিল, মরিচঝাঁপিতে যখন মানুষ এল তখন তাঁরা মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন স্বচেষ্টায় নিজের ইচ্ছাতে, কারোর সাহায্য না নিয়ে চাষবাস করে, মাছের চাষ করে, নৌকা বানিয়ে ওখানে স্থায়ীভাবে বসতি করবেন। কিন্তু কিছুতেই সরকার থাকতে দিল না, বন্দুকের গুলি চালালো এবং আমরা দেখি যে নানান ভাবে সরকারি অত্যাচার, সেটা কীরকম অবস্থা হতে পারে, সেটা সত্যি সত্যি, আমার নিজের এখনও মনে হয়, যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল এদের উপর, সেই অমানুষিক অত্যাচার করার জন্যেই মরিচঝাঁপিতে যে পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিল, এরা, উদ্বাস্তুরা নিজে, সেটা তারা সার্থক করতে পারেনি, আর এতে সহানুভূতি সিমপ্যাথির অভাব ছিল আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের। এটা আমাদের সম্প্রতিকালে ঘটেছে বলে, আমার মনে হয় এটা নিয়ে বারবার আলোচনা করা উচিত এবং এটা দেখা উচিত যে মরিচঝাঁপির উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল সেটা কিন্তু সত্যিকার ভাবতে পারা যায় না যে একটা সরকার থেকে এমন অত্যাচার হতে পারে। যাদের সাজ নেই, সরঞ্জাম নেই, তাদের উপর অত্যাচার হতে পারে এবং তারা যে এই অত্যাচার সহ্য করেও ছিল সেটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে।

প্র : আপনার কি মনে হয় এর একটা বিচার করা উচিত?

অ : এরকম অত্যাচার হওয়া উচিত না।

প্র : অত্যাচার যে করেছে মর্মান্তিক ভাবে, তারাই তো মরিচঝাঁপিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ওখানে, তারপর উৎখাত করেছে...

অ : না, সেকথা ঠিক না, দণ্ডকারণ্য থেকে যারা এসেছিল তারা নিজেরা উদ্যোগ করে ভেবেছিল যে একটা ছোট দ্বীপ রয়েছে সুন্দরবনে, এখানে আমরা নিশ্চয়ই পুনর্বাসনের জন্য করে মাছের চাষ করতে পারি। এবং আমরা নিজেদের চেষ্টায় আবার আমরা বসে যাব। বসতি করতে পারব এবং সেই বসতির মধ্যেও আমরা গিয়েছি। ঝুপড়ি করেছিল ছোট ছোট, আর চরের উপর ছোট ছোট ঝুপড়ির মধ্যে থাকছিল ওরা, আর দুপুরবেলা ভাত রান্না করছে, হঠাৎ পুলিশের থেকে গোলাগুলি চলল। এরকম অমানুষিক অত্যাচার, সম্প্রতি ইদানীং আমরা নন্দীগ্রামে দেখছি অমানুষিক, সেই রকম জিনিসটা ঘটেছিল তখন মরিচঝাঁপিতে।

প্র : এর কি একটা বিচার হওয়া উচিত কি না, আপনার কি মনে হয়?

অ : উচিত তো ছিলই। As a matter, একজন একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থেকে কয়েকজন এসেছিলেন, এবং আমার বাড়িতেই উঠেছিলেন। ওরা বলেছিলেন যে আমরা এটা দেখতে চাই কিভাবে ওদের উপর অত্যাচার হয়েছিল এবং তারা কিভাবে চেষ্টা করেছিল কাজের। কোনো ইন্টারভিউ পেল না তারা, সরকারি সহযোগিতা কেন পেল না তারা এবং এরকম হওয়ার ফলে আমার মনে হয় যে যেটুকু চেষ্টা করেছিল লোকে, সেটুকু সাফল্যলাভ তাদের করল না। এইটে মোটামুটি মরিচঝাঁপি সম্পর্কে আমার কথা, কেন ওরা আসছে, কি জন্য চলে এসেছিল এ নিয়ে, কিভাবে চলে গিয়েছিল এ নিয়ে তো অনেক বুলেটিন লেখা হয়েছে। মরিচঝাঁপি বুলেটিন ছিল, তাছাড়া আমার স্বামীর লেখা তিনটে article আছে, তা পুনর্মুদ্রিত হতে পারে। এছাড়া মরিচঝাঁপি লোক ফিরে গিয়ে এখন কে কোথায় আছে তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমরা এটুকু জানি যে যখন দণ্ডকারণ্যে লোকেরা গিয়েছিল তখনও খুব অব্যবস্থা হয়েছিল। মানা ক্যাম্পে যে ওরা গিয়েছিল, আমার পরিষ্কার মনে আছে যে মানা ক্যাম্পের উপর একটা পুরো লেখা আমি লিখেছিলাম, মানা ক্যাম্পে আমি দিনের পর দিন ছিলাম, তাতে আমি দেখেছি যে আমাদের যে কর্মীরা বা যারা সিমপ্যাথি নিয়ে কাজ করে, সরকারি নয়, বেসরকারি কর্মীরা খুবই চেষ্টা করেছে যাতে মানা ক্যাম্পে বসতিটা ভালোভাবে হয়। ওখানে একটা টাউনশিপ যদি হয়ে যেত তাহলে ফরিদাবাদের মতো শহর হয়ে উঠতে পারত। সে পরিকল্পনা আমার স্বামী তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কার্যকরী হয়নি। এই মোটামুটি আমার ধারণা আপনারা ইচ্ছা করলে সেই পুরানো লেখাগুলো থেকে পড়তে পারেন, তবে আমার মনে হয় যে আপনারা দেখবেন যে যারা NGO বা বেসরকারি

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারা যে কাজটা করেছে আর যারা সরকারি সংগঠন তাদের কাজের মধ্যে অ্যাপ্রোচটাই আলাদা ছিল। যারা সরকারি সংস্থা তাদের ছিল যে আমরা যা করছি, খুব করছি। আর বেসরকারি সংস্থারা চাইছিল যারা করছে, তারা অন্তত এদের সরকারি সাহায্যটা, আনুকুল্যটা যেটা আসছে ওটা ভালোভাবে ওদের কাছে পৌঁছয়নি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রচুর জিনিস তারা পেয়েছিল। মানা ক্যাম্পের উপর লেখাটা দণ্ডকারণ্য বইটার মধ্যে আছে দেখলে আপনারা দেখবেন কি পরিমাণে জিনিসপত্র তারা পেয়েছিল এবং একটা শহর ভালোভাবে গড়ে উঠতে পারত, যদি মানা ক্যাম্পের অত্যাচারটা না হত। মানা ক্যাম্পের উপর অত্যাচারটা হচ্ছে এটা অমানুষিক বটে, কিন্তু সেখানে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল, মরিচঝাঁপিতে কিছু ছিল না। মরিচঝাঁপিতে যা ঘটেছিল তা যে কোনো সভ্য সমাজে ঘটতে পারে আমার মনে হয় না। আর কিছু আমার মনে পড়ছে না। আর দণ্ডকারণ্য প্রপার জায়গাটা বড় সুন্দর, প্রচুর লোক গেছে, সেখানে গিয়ে তারা বসবার চেষ্টা করেছে। এখন তো ওখান থেকে যারা জমির দলিল পেয়েছে তারা ওখানে ঘরবাড়ি করেছে, এমনকি ওখানে এম পি, হয়েছে এম এল এ-ও হয়েছে। তবে যারা দলিল পায়নি এবং যারা মরিচঝাঁপি থেকে দেরী করে গেছে তারাও আর জমি পায় নি, লোনও পায়নি আর একটা জিনিসও হয় নি যে মরিচঝাঁপিতে বলুন কি দণ্ডকারণ্যেই বলুন, যেখান থেকে যারা গিয়েছে, যারা দলিল বা পর্চা পায়নি, তারা ওখানে কাজ করবার সময়, সেকাজ করার জন্য যে record থাকা দরকার, recordটা ওদের কাছে না থাকায়, তাদের কাছে document নেই আর document না থাকলে কাজ করতে, জীবিকা নির্বাহ করতে অসুবিধা হয়। তবু যারা দাঁড়িয়ে গেছে, সেটা নিতান্তই অমানুষিক শক্তির দ্বারা, একটা অদ্ভুত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষের মতো থাকবার চেষ্টা করেছে। এবং সেটা আশা করি এখনও যদি কেউ লেখালেখি করে তারা বুঝতে পারবে যে আমাদের যারা কষ্ট করে পার্টিশনের পরে চলে গেলেন তারা গিয়ে সেখানে কত চেষ্টা করেছিলেন যে যাতে ভালোভাবে পুনর্বাসনটা হয় এবং যাতে সেখানে তারা মানুষের মতো থাকতে পারে। এটাই হচ্ছে আমার কথা।

সাক্ষাৎকার : ১০ জুন ২০০৭



মরিচঝাঁপির সময় মানুষের এত তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। সেই জন্যে সম্ভবত মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের পিছনে সমস্ত লোক এসে দাঁড়ায়নি। আজ কিন্তু সমস্ত দেশ এসে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের ঘুম ভেঙেছে

মহাশ্বেতা দেবী

মহাশ্বেতা : পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবাংলায় যখন উদ্বাস্তুরা চলে আসেন, তখন তাঁদের ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় জায়গা দেওয়া হবে, বসতি করে দেয়া হবে, এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল এবং তাদের যে পাঠানো হয়েছিল দণ্ডকারণ্যে, যেখানে যেখানেই পাঠানো হোক, আমার মনে আছে পাঞ্জাবের কোথাও পাঠানো হয়েছিল...

প্র : পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীদের পাঠানো হয়েছিল...

ম : পাঞ্জাবে পাঞ্জাবীরা গিয়েছিল, এদের বিভিন্ন জায়গায় যে পাঠানো হয়েছিল, আন্দামানেও কিছু গিয়েছিল। সব জায়গাই হচ্ছে মানুষকে উদ্বাস্তু করে দেবার ইতিহাস। কেননা আন্দামানে যখন তাদের পাঠানো হয়, আন্দামানের যারা আদিম অধিবাসী তাদের উপরে চূড়ান্ত অবিচার হয়েছিল। একটা জায়গায় গেলেই তাদের উপরে অবিচার হয়ে যায়, তারাও দুর্বল এরাও দুর্বল। কাজেই সেটা সেইভাবেই হয়। তবে তাদের যে পশ্চিমবাংলায় মরিচঝাঁপিতে পাঠানো হয় তার আগে জানলাম জ্যোতি বসু কথা দিয়েছিলেন, আমরা যদি ক্ষমতায় ফিরে আসি, আপনারা সব

পশ্চিমবাংলাতেই থাকবেন। এই রকম অন্যান্য মন্ত্রীরা বলেছিলেন। তারা সবাই বেঁচে নেই, অন্তত রাম চ্যাটার্জি তো নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। কিন্তু মরিচঝাঁপিতে নিয়ে যাবার পর, তারপর যেভাবে তাদের সেখান থেকে অত্যাচার করে, জঘন্য সরকারি অত্যাচার করে সেখান থেকে আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং আবার তারা যেভাবে মালকানগিরিতে যেতে বাধ্য হন, সেখানে তারা, জল নেই, চাষ হয় না, ধান হয় না, সেই রকম একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে, একেবারে চাষীবাসী মানুষদের রেখে দিল, আজকে এদের ট্রাজিডিটা খুব বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে আসছে, কারণ হচ্ছে পশ্চিমবাংলার একেবারে, তারা পূর্ববাংলা থেকে আসেনি, কিন্তু পশ্চিমবাংলা অত্যন্ত শস্যশ্যামল হুগলির সিঙ্গুর অথবা পূর্ব মেদিনরপুরের নন্দীগ্রাম, খেজুরি এইসব জায়গা থেকে রাজ্য সরকার একইভাবে একই কাজ করছে। এবং তার পটভূমিতে আজকে মরিচঝাঁপি থেকে যারা সেদিন চলে গিয়েছিল, তাদের সমস্ত ট্রাজিডিটা আরও বেশি, অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেশি লোকের বিবেকে ঘা দিচ্ছে। বামফ্রন্ট তখন সবে পাওয়ারে এসেছিল... এসেই তারা এই ভূমিকাটা নিয়েছিল। বাচ্চাদের না খাইয়ে মারা, তাদের জলে বিষ মিশিয়ে মারা, হাজারে হাজারে শিশু মারা গেছে। তাদের না খেতে দেওয়া, কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার দেওয়া সত্ত্বেও 'এদের জলবন্ধ করা যাবে না, এদের খাওয়া বন্ধ করা যাবে না,' তা সত্ত্বেও সমস্ত লঞ্চগুলোকে সিজ করে নেওয়া হয়েছিল সেই সময়ে এবং একপ্রকার তাদের না খাইয়ে মারা হয়েছিল, ঘাস খেয়ে, ডায়েরিয়া হয়ে মারা গেছে বহু হাজার মানুষ। এইভাবে অত্যাচারটা করেছিল সেই দিনকে।

কাজেই তারা যে পরে কি হবে, বামফ্রন্টের পরের চেহারা কি হবে, মরিচঝাঁপি দিয়েই বোঝা গিয়েছিল। সে দিনও তারা একই রকম অন্যায় করেছিল। আজকে তারা একইভাবে সব জায়গা থেকে শস্যশ্যামল জায়গা থেকে মানুষকে উপড়ে ফেলছে, বের করে দিচ্ছে।... চোদ্দপুরুষের ভিটে থেকে তাদের উৎখাত করা হচ্ছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে তখন (১৯৬৭) যে সংযুক্ত যুক্তফ্রন্ট ছিল, যে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ছিল, সেই সময়েও যখন বামফ্রন্ট, 'বামফ্রন্ট' নাম নিয়ে পাওয়ারে আসেনি, তখনও সেদিনও জ্যোতি বসু মন্ত্রী এবং তার সময় এইসব হয়েছিল। নকশালবাড়িতে গুলি করে যে আদিবাসী মহিলাদের মারা হয় এইসব ঘটেছিল, আর একচ্ছত্রভাবে আধিপত্য করতে করতে তারা আজকে যেখানে এসে পৌঁছেচে সেখানে প্রত্যেকদিন তাদের মুখোশ খুলে যাচ্ছে। প্রত্যেকদিনই তারা অত্যাচার বাড়িয়ে চলেছে। আমি তো মনে করি, বামফ্রন্ট নাম নিয়ে রাজ্য চালাবার আর কোনো অধিকার নেই। এটা সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যে গ্লোবাইলাইজেশন বা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া চলেছে এটা তারই part।

সাধারণ মানুষকে তো শেষ করা যায় না, আর এখানকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে সাধারণ মানুষ নিজে থেকে প্রতিবাদী হয়ে এগিয়ে এসেছে। হিন্দু-

মুসলিম নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছে। নন্দীগ্রামে হিন্দু মেয়েরা শাঁখ বাজিয়েছে তো মুসলমানরা আজান দিয়েছে, দিয়ে শত্রু সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে। এবং নন্দীগ্রামে এটা প্রমাণিত যারা গুলি চালিয়েছিল সি পি এম-এর গুণ্ডাবাহিনী, পুলিশের পোশাকে তারাই গুলি করে, হিন্দুও মেরেছে, মুসলিমও মেরেছে। আজকে তারাই বলছে যে মুসলমান জামাতে-উলেমা, তারা সাম্প্রদায়িক। একটা রাজ্য সরকার এগিয়ে এসে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে। কাজেই এদের কাছে কোনো আশা করারও কিছু নেই, এরা যত তাড়াতাড়ি নিপাত যায় ততই ভালো।

প্র : দিদি একটা কথা বলি, আজকে বিক্ষিপ্তভাবে যেটা হচ্ছে কানোরিয়া জুট মিলের মতো হয়ে যাবে না তো! একটা নেতৃত্ব সেটা মেধা পাটকার হোক যাই হোক যাকে সামনে রেখে এগোনো যেতে পারত? কোন নেতৃত্ব ছাড়া লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কি সম্ভব?

ম : এখানে সেইভাবে হচ্ছে না বলেই এটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সিঙ্গুর শুধু মমতার জন্য ওখানে প্রতিবাদ হয়েছে, তা নয়। সিঙ্গুরের সাধারণ লোক প্রতিবাদ করেছে, বিশেষ করে মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে এসেছে। নন্দীগ্রামে সাধারণ লোক এগিয়ে এসেছে, হরিপুরে যখন প্রথম যায় ওরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়বে বলে, সব থেকে আগে মহিলারা এসে, তারা শাঁখ বাজিয়ে লোককে সতর্ক করেছে। তারা এসে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, তারপর তারা আক্রমণ করেছে পুলিশকে। পুলিশের ভয়, কয়েক হাজার পুলিশ নিয়েও রাজ্য সরকার হরিপুরে ঢুকতে পারেনি। হরিপুরও পূর্ব মেদিনীপুরে। হরিপুরে কোনো বাইরের লোক ঢোকেনি। আমি প্রথম লোক যে ঢুকেছিলাম, কারণ আমি গিয়েছিলাম সেখানে। কাজেই একজন নেতা বা নেতৃত্ব বা কোনো একটা রাজনৈতিক দল এভাবে ভাবার আর দরকার নেই। সাধারণ লোক এগিয়ে এসেছে তারা নিজেরা চিৎকার করে বলছে এ রকম হতে দেব না, সেটাকে সম্মান করা উচিত। মরিচঝাঁপির মানুষের এতো তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। সেই জন্য সম্ভবত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পিছনে সমস্ত লোক এসে দাঁড়ায়নি। আজকে কিন্তু সমস্ত দেশ এসে দাঁড়িয়েছে।

সাক্ষাৎকার : ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

পুস্তকমেলার সংখ্যাটি প্রকাশের দিনই তুলকালাম অবস্থা। গিল্ড সদস্য ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগের হুমকি দিয়ে বললেন, 'এ লেখা বাইরে বেরুলে তার নাকি গর্দান চলে যাবে।'

আইটেম মরিচঝাঁপি

শৈলেন চক্রবর্তী

মরিচঝাঁপিতে যখন গণহত্যা সংঘটিত হচ্ছে (১৯৭৯), তখন আমরা নতুন বইপত্র নিয়ে নতুন স্কুলে রওনা দিয়েছি। নিতান্তই বালক, বাঁকুড়াতে প্রত্যন্ত গ্রামে তখন সংবাদমাধ্যম বলতে কেবল রেডিও। তাও সংবাদে ছোটদের মন নেই। তাই আমাদের কৈশোরবেলায় বাংলারই এক প্রান্তে এমন বীভৎস হত্যাকাণ্ড চলল সরকারি উদ্যোগে, তা বাংলার আর এক প্রান্তে বসে আমরা জানতে পারিনি। সে কী আশীর্বাদ ছিল? এখন যেমন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-জঙ্গলমহলের রক্তছবি ঘরে বসে দেখতে দেখতে রক্তাক্ত হচ্ছে শৈশব! সময়ের এই ক্ষতস্মৃতি সারা জীবন বহন করতে হবে। সেদিক থেকে আমরা বোধহয় সৌভাগ্যবান।

হত্যাকাণ্ড ঘটল মরিচঝাঁপিতে। প্রত্যক্ষ আক্রমণে যত মানুষ মারা গেলেন, পরবর্তীতে মারা গেলেন আরও বেশি। অথচ আমরা তার কিছুই জানতে পারলাম না। এর ফলে বাম সরকার বা জ্যোতি বসু সম্পর্কে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মানুষের বিশেষ কোনো বীতরাগ তৈরি হয়নি। এমনিতেই রাঢ়ের মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট। দু-মুঠো খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকাটাই তাঁরা জীবন বলে মনে করেন। স্বপ্ন বলতে

সকলে মিলেমিশে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা। ফলে আমরাও সেই তৃপ্তির মধ্যে বড় হয়েছি।

দেশ কীভাবে চলছে রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, সেই নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাঢ়বঙ্গের মানুষের বিশেষ কোনো ভূমিকা অন্তত গত তিন দশকে ছিল না। বাম শাসনে যে-কজন নেতা-মন্ত্রী বাঁকুড়া-পুরুলিয়া থেকে মহাকরণে আসার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সবাই 'জো হুজুর'-এর দল। কলকাতায় থেকে কীভাবে নিজের এবং নিজের পরিবারের জীবন গোছাবেন, ব্যস্ত থেকেছেন তাই নিয়েই। আর এলাকায় গিয়ে কথায় কথায় 'কলকাতা' দেখিয়েছেন। ফলে এলাকার হা-ভেতে মানুষের কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছেন বিস্ময়প্রভু!

ইস্কুল যাবার পথে তিনটি গ্রাম পেরিয়ে যেতে হত। বাড়ি থেকে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। বাঁকুড়ার চুয়াল্লিশ ডিগ্রি তাতে খালি পায়ে কাঁকুরে পথে হাঁটতাম দলবেঁধে। ইস্কুল যাচ্ছি, ব্যস। এই ইস্কুল যাওয়ায় কোন স্বপ্ন থাকত আমাদের! কোনো কোনো দিন দেখতাম, তিনি চলে গেলেন মোটরবাইকে ধুলো উড়িয়ে। তখন তাঁর মোটরবাইকে চালক থাকত। রাস্তার পথচলতি লোককে দুহাত তুলে প্রণাম করতে দেখেছি। 'লোক'ই বললাম, কেননা এলাকার গামছা-পরা সাধারণ মানুষজন নিজেদের মানুষই ভাবতেন না, ভাবতেন 'ছোটলোক'। এইসব ছোটলোকদের গ্রামে কখনও তাঁর পদার্পণ ঘটলে লোকজনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেও দেখেছি। পান চিবোতে চিবোতে তিনি হাঁটতেন উদাসীন, 'ধন্য' করার ভঙ্গিমায়। গাঁয়ের লোক ভাবত, এ যে ঈশ্বরের আবির্ভাব! এবার তাহলে সব পাব।

এই 'তিনি' হলেন এলাকার বিধায়ক। নিরঙ্কুশ বাম।

এই পরিবেশে আমাদের বেড়ে-ওঠা। এবং দু-এক বিঘা পাট্টা জমি পেয়ে দু-বেলা ভাতের নিশ্চিন্তি দেখে অপার স্বস্তি। ফলে বামশাসক, বাম-বিধায়ক আমাদের 'প্রভু' এটা মেনে চলতে এলাকার মানুষ বেশ খুশিই হয়েছেন। বাঁকুড়ার কলেজে পড়ার সময় আমরা ভেবেছি, এর বাইরে কিছু হতেই পারে না। তামলিবাঁধ ময়দানে জ্যোতি বসুর সমাবেশে সাঁওতালরা আসত খাতড়া কিংবা শুশুনিয়া থেকে হেঁটে। সে কী উন্মাদনা! তিরিশ-চল্লিশ কিলোমিটার পথ হাঁটা তো জলভাত। বুকের ব্যাজে যার জ্যোতি বসুর ছবি, সে-ই ভাগ্যবান। কী কাড়াকাড়ি! এ আর এক ঈশ্বর-দর্শন।

তো গত শতকের আটের দশকে রাঢ়ের এক অতি-সাধারণ কলেজ-পড়ুয়ার এই হল সমকাল-দর্শন। ফলে মুগ্ধতা আর বিস্ময়! প্রায় সব শেয়ালের এক রা। এলাকার প্রভুরা কলকাতায় বগল বাজিয়ে নিশ্চয়ই বলতেন, এবারও নিরঙ্কুশ, স্যার। বিরোধীশূন্য করে দিয়েছি। কেবল বাঁকুড়া টাউন মাঝেমাঝে বেগড়বাই করত। ওখানে তো সবাই 'লোক' ছিল না, কিছু 'মানুষ'ও থাকতেন।

ওহ্, টাউনের মানুষগুলোর উপর আমাদের কী রাগ! এ নিশ্চয়ই

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। কেননা আমরা জানতাম, অথবা আমরা শিখেছিলাম প্রভুরাই প্রগতিশীল!

তাহলে মোহভঙ্গ ঘটল কখন?

যখন কলেজের পড়া শেষ করে পাকাপাকি গ্রামে থাকলাম সব সময়ের জন্য। পদার্থবিদ্যায় সম্মানসহ স্নাতক যুবকের কাছে গাঁয়ের আবদার অনেক। আবেদনপত্র লিখে দাও, ব্যাঙ্ক-লোনের জন্য দরখাস্ত করো, হাসপাতালে রক্তের ব্যবস্থা করো ইত্যাদি নানান ফরমায়েস। হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে বুঝি, গ্রাম-পঞ্চায়েত, সমিতি, জেলা পরিষদ সব চোরে ভরে গিয়েছে। বিধবাভাতা বা বার্ধক্যভাতা থেকেও পঞ্চায়েত সদস্য কাম 'পার্টিবাবু' অনায়াসে কেটে নিচ্ছেন পঞ্চাশ টাকা। আর ভাতা পেয়ে অনুগৃহীত লোকটি ভাবছেন, তবু তো এরা দিচ্ছে! এতদিন ত বাপ এটুকুনও কেউ দেয় নাই। দিনের পর দিন ভুখে মরেছি, কেউ দেখে নাই বাপ। জ্যোতি বসু আমাদে ভগবান। লাল পার্টি ঝিঙাভাত।

ফলত আবার নিরঙ্কুশ স্যার!

গাঁয়ে-পাড়ায় ক্রমশ 'একা' হতে থাকি। হা-ভেতে লোকজন প্রতিবাদের কথা ভাবতেই পারে না। ওই যে, তবু তো এরা কিছু দিচ্ছে!

বাঁকুড়া এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে কল এল ইস্কুলে ইন্টারভিউ। সারা এক্সচেঞ্জে মোটে কয়েকজন ফিজিক্স অনার্স। ভ্যাকেন্সি পরপর অনেকগুলি স্কুলে।

ইন্টারভিউ বোর্ডে সরাসরি 'ডোনেশন' চাওয়া হল। অর্থাৎ 'ঘুষ' দিলে তবে ইস্কুলের মাস্টার হতে পারব। কলেজে পড়ে পাশ করলেও এলাকার যুবক-যুবতীরা প্রায় অধিকাংশই তখনও প্রতিবাদহীন 'লোক'। বিরোধীশূন্য বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের অনেকাংশে শিক্ষিত সব যুবক-যুবতীই তখন 'পার্টিকর্মী'। সুতরাং লোকাল কমিটির চিঠিতে তখন আর চাকরি হচ্ছে না। কেননা সব জায়গাতেই একাধিক পার্টি-ক্যান্ডিডেট। তাই চালু হয়েছে 'ডোনেশন'। আটের দশকের শেষ থেকে নয়ের দশকের শেষ পর্যন্ত স্কুল সার্ভিস কমিশন হওয়ার আগে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর তিন জেলায় 'ঘুষ' ছাড়া শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। আমার সতীর্থ বা পরিচিত যাঁরা এখন ইস্কুলে পড়াচ্ছেন তাঁরা প্রায় সবাই ঘুষের মাস্টার।

প্রতিবাদ করে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। একা হয়েছি। পরিবারের সব আশায় জল ঢেলে, গুছিয়ে নিতে না পেরে 'বোকা' হয়েছি। আক্রান্ত হয়েছি। অবশেষে এলাকা থেকে বিতাড়িত। ওহ, সে কী স্বস্তি!

হাতে থাকল কলম আর প্রতিবাদের জেদ। বোহেমিয়ান ভেসে-বেড়ানো জীবন। ভাসতে ভাসতে সুন্দরবন। গোসাবা-সাতজেলিয়া-কুমিরমারি। মরিচঝাঁপি! প্রায়-বৃদ্ধ মানুষগুলি খুলে খুলে দেখাচ্ছেন আড়াই দশক আগেকার খুনের ইতিহাস। এত

বছরেও নদীর জোয়ার-ভাঁটা মুছে ফেলতে পারেনি মরিচঝাঁপির রক্তের দাগ। জানছি দেখছি আর শিউরে উঠছি।

এতবড় হত্যাকাণ্ডের নায়ক নিরঙ্কুশ রাঢ়ের 'ভগবান' জ্যোতি বসু!

মূলত রাঢ়বঙ্গের লোকেদের কাছে জ্যোতি বসুর স্বরূপ পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই মরিচঝাঁপি নিয়ে নাড়াচাড়া।

কলকাতায় এসে হাতে পেলাম জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি : নৈঃশব্দের অন্তরালে' বইটি। পড়ে বাক্‌রুদ্ধ আমি। বইটি সম্পর্কে মানুষকে জানানো দরকার। রিভিউ লিখলাম। প্রগতিশীল-প্রতিবাদী-স্বচ্ছ চরিত্রের মানুষ বলে সমাজ যাঁদের



মালকানগিরি, দণ্ডকারণ্য

বিজ্ঞাপন দেখে, তাঁদের অনেকের কাছেই লেখাটি নিয়ে গেলাম। কেউ ছাপতে বা ছাপিয়ে দিতে রাজি হলেন না।

অগত্যা কলকাতা বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড-এর মুখপত্র 'পুস্তকমেলা'য় (ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৯) ছাপলাম 'ঝিনুক চক্রবর্তী' ছদ্মনামে। শিরোনাম 'লজ্জা ও ঘৃণার কালো ইতিহাস'।

কেন ছদ্মনামে?

খুঁটে খাওয়ার তাগিদে তখন আমি পুস্তকমেলা-র সহযোগী সম্পাদক। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স-এর সবিতেন্দ্রনাথ রায় (ভানুদা) তখন সম্পাদক। ভানুদা বললেন, লেখাটা প্রকাশ হলেই হল, স্বনামে ছেপো না। তবে ঝড় উঠলে তৈরি থেকো।

আমি তো তৈরিই। তখন প্রতিদিন শূন্য থেকে শুরু করার তেজ।

পুস্তকমেলার সংখ্যাটি প্রকাশের দিনই তুলকালাম অবস্থা। গিল্ড-সদস্য ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগের হুমকি দিয়ে বললেন, এ লেখা বাইরে বেরোলে তাঁর নাকি গর্দান চলে যাবে! গিল্ড-সদস্যরা দু-ভাগ হয়ে গেলেন। গোপন বৈঠক। বলা হল, বইটির নিন্দা করে, ভুল তথ্যে ভরা এসব বলে আমাকেই একটি অন্য লেখা লিখে দিতে হবে। সেই লেখাটি পূর্বতন লেখাটির জায়গায় ছাপানো হবে।

পুস্তকমেলা-র সমস্ত কপি 'সিল' করে দেওয়া হল। ভাগ্যিস পাঁচটি কপি আগেই সরিয়ে রেখেছিলাম।

আমার উপর চাপ বাড়তেই লাগল। নানা ধরনের হুমকি। কোনো কোনো শুভানুধ্যায়ী আমার ভবিষ্যৎ ভেবে কম্প্রোমাইজ করতে বললেন। বোঝালেন, এই কম্প্রোমাইজ না-করাটা হবে আর একটা বোকামি।

মনে মনে বলি, আমি তো বোকার বেহদ্দ।

গিল্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

মরিচঝাঁপি লেখাটি বাতিল করে সেখানে অন্য একটি লেখা পেস্টিং করে পুস্তকমেলা আবার বেরুল। আর 'লজ্জা ও ঘৃণার কালো ইতিহাস'-সহ সেই পাঁচকপি পুস্তকমেলা জেরক্স হতে থাকল প্রতিদিন। কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল। ইংরেজি, হিন্দিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হল বাংলার বাইরে।

আর দেখলাম মরিচঝাঁপি জেগে উঠছে। সেই রক্তাক্ত ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন অনেকেই। রীতিমতো গবেষণায় মগ্ন কেউ কেউ। যোগাযোগ হতে থাকল সেই সময়ের প্রত্যক্ষ 'ভিকটিম'দের সঙ্গে। কী বীভৎস অভিজ্ঞতা।

জেদ বাড়তে থাকল। মানুষকে সমকালকে জানাতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের নায়কদের আসল পরিচয় সমকালের তরুণ প্রজন্মকে জানাতে হবে। দেখলাম অনেক জেদি মানুষ রয়েছেন, যাঁরা দাঁতে দাঁত চেপে কাজটা করতে চান।

আলাপ হল তুষার ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ছোট্ট ঘরে চেষ্টা চলছে মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্র গড়ে তোলার। স্ক্রিপ্ট-ভয়েস-এডিটিং।

তখনই ঘটল নন্দীগ্রাম হত্যাকাণ্ড (২০০৮, ১৪ মার্চ)। সংবাদমাধ্যমে নন্দীগ্রামের তুলনা করতে গিয়ে উঠে আসতে থাকল চাপা-পড়া মরিচঝাঁপি।

ব্যস, খেয়ে গেল। ক্রমশ মরিচঝাঁপি হয়ে উঠল মিডিয়া আইটেম। যে তথ্যচিত্র তৈরি হয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন, তাই বারবার দেখানো হল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়। ডিভিডি আকারে বিক্রিও হতে থাকল।

এখন 'সেল'-এর যুগ। আইটেমকে ঠিকঠাক মতো প্যাকেজিং করতে পারলে বাণিজ্য হয়। ফলে মরিচঝাঁপিকে নিয়ে আগ্রহী হলেন 'আদর্শবাদী' ব্যবসায়ীরা। এঁদের আলখাল্লাটা আদর্শের, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটা ব্যাবসা। ফলে ব্যাবসার কাজে

লাগল মরিচঝাঁপি। বইপাড়ায় কিছু সংকলক আছেন, টুকরো-টাকরা দিয়ে কাঁথা সেলাই করা যাঁদের কাজ, তাঁরা নিজেদের বিজ্ঞাপন দেন 'সম্পাদক'-'গবেষক (!) বলে। তেমনই এক 'সম্পাদক' মরিচঝাঁপিকে বেঁধে ফেললেন দুই মলাটে এবং প্রকাশকের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে ব্যবসাও করলেন নিশ্চয়ই। সেখানে দেখলাম ঝিনুক চক্রবর্তীর সেই 'নিষিদ্ধ' লেখাটিও মুদ্রিত হয়েছে। সংকলিত 'মরিচঝাঁপি' বিক্রি করে এখন বেশ মুদ্রা আসে, গ্ল্যামার আসে, মিডিয়া-হাইপ আসে। কিন্তু মরিচঝাঁপি-র 'বোকা' লেখকরা বা মরিচঝাঁপির 'ভিকটিম'রা মুদ্রা পান না, মূল্যও পান না। ভাবখানা এই যে, সংকলন করে তোমাদের জাতে তুলে দিলাম হে!

বজ্জাতিরও সীমা থাকে।

এই অশালীন ছিঁচকে বাণিজ্যমনস্কতা আমাদের আহত করে। সেই আঘাত থেকেই হয়তো আবার লিখতে বসি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ের ধাক্কায় বাংলায় বামশাসনের স্বরূপ খানিকটা প্রকাশিত হয়েছে। পরিবর্তনের হাওয়ায় মরিচঝাঁপি আবার উঠে এসেছে ইতিহাসের আবর্তনের সূত্র ধরেই। নিশ্চয়ই রাঢ়ের নিরঙ্কুশ জমানার চিত্রবদল ঘটছে এখন। সেই 'ঘুষ-মাস্টার'রাও এখন জীবনের মধ্যসীমায় ভাববার মতো অবকাশ পাচ্ছেন। অর্থই কি জীবনের একমাত্র প্রাপ্তি!

বলতে দ্বিধা নেই, আজও বেশিরভাগ মানুষই তো অর্থসন্ধানী। আর অর্থপ্রাপ্তি হয়ে গেলে পড়িমরি করে ক্ষমতা, খ্যাতি আর যশের সন্ধান। বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়ায় এই দলটা আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। অর্থ আর খ্যাতির ব্যবসায়ী। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধান্দা।

মরিচঝাঁপি নয়, ভণ্ড প্রগতিশীল বা ভণ্ড পরিবর্তনপন্থী যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আত্মসেবা-আত্মপ্রচার, তাঁদের মুখোশ সম্বন্ধে সতর্ক থাকার জন্যই আজকের এই লেখা।

নেতিবাচক কিংবা হতাশ মনে হচ্ছে?

সত্যি কথা বলতে কী, খুব যে আশার আলো দেখছি তা নয়। তবে হতাশও নই। জানি, ধান্দাবাজ বহুরূপী সরীসৃপের সংখ্যা বেশি হলেও সৎ-দৃঢ় মেরুদণ্ডের সাহসী মানুষও আছেন। আমার কুর্নিশ তাঁদেরকেই।

প্রিয় পাঠক, মনে হচ্ছে একবার মুখোমুখি বসতে পারলে ভালো হত?

নিশ্চয়ই হবে কোনো একদিন।

যোগাযোগ হবে কীভাবে?

আমি বিশ্বাস করি, যোগাযোগ-ব্যবস্থাটা এখন সত্যিই বেশ উন্নত।

কোলকাতা বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড এর মুখপত্র 'পুস্তক মেলা'য় প্রকাশিত এই লেখাটিকে লোপাট করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা কেটে সেখানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্য বইয়ের সমালোচনা। 'পুস্তক মেলা'র একই সংখ্যার (ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৯) দুটি কপিই আমাদের হাতে আছে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে।

লজ্জা ও ঘৃণার কালো ইতিহাস

ঝিনুক চক্রবর্তী

'এই উদ্বাস্তুরা অন্য রাজ্য থেকে আসা অবাঙালি অধিবাসীদের মতো কলকাতার ফুটপাথ বা রেলস্টেশন দখল করতে চাননি, তাঁরা সত্যি সত্যিই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েই সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসনাবাদে না যেতে দিয়ে, বর্ধমানের কাশীপুরে গুলি চালিয়ে ৬ জনকে মেরে, জোর করে অনেক উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠান। বামফ্রন্ট নেতারা ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, মাদার টেরেসা, লুথারিয়ান চার্চ— কাউকে সেবাকাজ করতে দেননি। এমন কী শিশু বৃদ্ধদের দুধ দিতে দেননি। ফলে হাসনাবাদে প্রায় দেড় হাজার শিশু ও বৃদ্ধ বিনা চিকিৎসায় মারা যান।'— শক্তি সরকার (সুন্দরবনের প্রাক্তন সাংসদ)। সূত্র : নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'মরিচঝাঁপি', পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

'পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় উদ্বাস্তুদের থামানো হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশকে বেশ সফলভাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইরকম একটি দলকে আমি হাসনাবাদ স্টেশনে দেখি, যারা ফেরত ট্রেনে ওঠার জন্য সরকারি অফিসে লাইন দিয়েছে স্বেচ্ছায়। তারা প্রায় প্রত্যেকেই তিন-চার দিন খায়নি। তাদের মনোবল ভেঙে

দেওয়া গেছে স্রেফ ক্ষুধার অস্ত্রে। তারা গোটা পশ্চিমবাংলাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে ফিরে গেল।'— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সূত্র : 'মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জরুরি কথা— আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.৯.১৯৭৮।

'যে সমস্ত পরিবার আজ ওখানে (দণ্ডকারণ্যে) ফিরে আসছেন, তাঁদের প্রায় সকল পরিবার থেকে শিশু অথবা বৃদ্ধ অথবা দুই-ই তাঁরা পথে পথে চিরদিনের মতো হারিয়ে এসেছেন। তাঁদের শোক, দুঃখবোধও এই প্রচণ্ড আঘাতে ও প্রতারণায় বিফল। ফেরতগামী ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে ২-৩ জন করে অফিসার পাঠানো হচ্ছে শরণার্থীদের তদারকি করার জন্য। তাঁদেরই মুখে শুনলাম, ফিরবার পথে মৃত শিশুদের ও বৃদ্ধদের তাঁরা ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছেন। পরবর্তী কোনো স্টেশনে তাদের সদ্গতি করার অপেক্ষা করেনি।' পান্নালাল দাশগুপ্ত। সূত্র : যুগান্তর, ২৫ জুলাই ১৯৭৮।

ইতিহাস দাগ রেখে যায়। সে-দাগ মোছে না কখনও। একদিন না-একদিন তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। করেই। আপাতভাবে আড়াল করে রাখলেও সময়ই তাকে টেনে খুঁড়ে বের করে আনে। মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে, আঁচড় কাটে। চাপা পড়ে থাকা ক্ষত উঠে আসে যখন, শিউরে উঠতে হয়। এমনও হয় তাহলে! অস্বীকার করা যায় না কিছুতেই। হয়েছে তো এমনই।

সময়ের পরিবর্তনে মানুষ হয়তো অবস্থান বদলায়, কিন্তু ইতিহাস বদলায় না। মানুষ লজ্জিত হয়। ইতিহাসই মানুষকে ধিক্কার দেয় কখনও কখনও। একটি করে পৃষ্ঠা উল্টেছি আর লজ্জায় ধিক্কারে ঘৃণায় ক্ষোভে শোকে অবনত করেছ মুখ। প্রগতিশীল বামপন্থার আড়ালে তবে এত অন্ধকার।

'সমস্ত সরকারি বাধা অতিক্রম করে ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে ৩০ হাজারের মতো নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ মরিচঝাঁপি দ্বীপে পৌছান। নিজেদের শ্রম ও সামর্থ্যে তারা ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত থাকতে পারেন। ...দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যে-ভাবে বন্দীদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, সেইভাবে মরিচঝাঁপির মানুষদের মেরে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়। ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে ঝড় বন্যার মধ্যেও ৬, ৭, ৮ সেপ্টেম্বর জ্যোতি বসুর সরকার পুলিশ লঞ্চের সাহায্যে উদ্বাস্তুদের নৌকাগুলি ডুবিয়ে দেয়।... ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি ব্লকেড করে পাশের দ্বীপ থেকে খাদ্য ও পানীয় জল আনা বন্ধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজত্বে ৩১ জানুয়ারি (১৯৭৯) প্রথম গুলি চলে মরিচঝাঁপির লোকদের ছাপানো এই অক্ষরমালাকে 'মিথ্যে বানানো পরিকল্পিত কুৎসা' বলে উড়িয়ে দিতে পারলে কোনো কষ্ট হত না। কিন্তু ওই যে ইতিহাস! অমোঘ শক্তি তার। নির্মম সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে সে। গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও মনে মনে সত্যের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়।

আমরা তাহলে পেরেছিলাম!

আবাল্য স্বপ্নভূমি-বীজভূমি নিজস্ব উঠোনটুকু কেড়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে 'উদ্বাস্তু করেছিল যে-স্বাধীনতা, তার সব দায় তবে ওই হতভাগ্য মানুষগুলোর! সাতজন্মের পাপের ফল, নাকি দুর্ভাগ্য ওঁদের! আমরা যারা স্বাধীনতার ক্ষীরটুকু চাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, স্বাধীন গদিতে আপ্লুত হলাম, তাদের কাছে ওই সবহারানো নেই-মানুষগুলো রাতারাতি শরণার্থী হয়ে গেল!

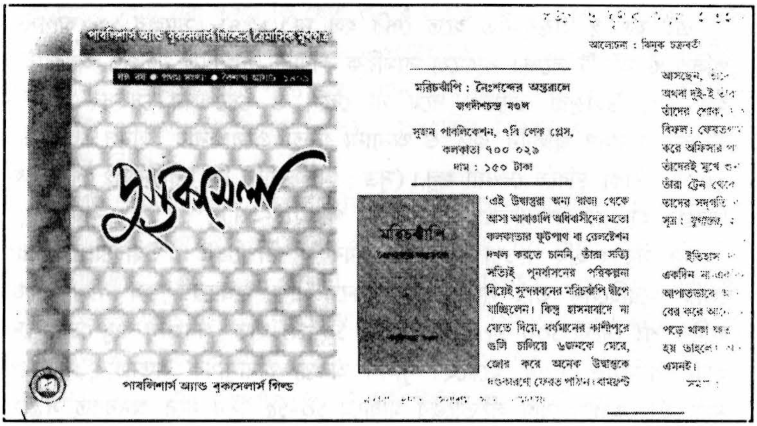
দাঙ্গা-কাটাকাটি সে না-হয় হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র তো পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য। সুজলা-সুফলা-সবুজ নদীমাতৃক ভূমিপুত্রদের খুলনা যশোর ফরিদপুর জেলার নমঃশূদ্র-পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়া তো হল পাথর-কাঁকর-টিলা-অধ্যুষিত দণ্ডকারণ্যে।

অহো, সরকার যে করেনি তা-তো নয়।

কিন্তু দণ্ডকারণ্যের এই পুনর্বাসন বাঙালি কৃষক উদ্বাস্তুদের কাছে হয়ে উঠেছিল 'নির্বাসন'। পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী এইসব উদ্বাস্তুদের ১৯৬১ সালে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ডোল বন্ধ করে দিলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের দাবিতে অনশন করে। ১৯৬১ সালের ১৩ জুলাই উদ্বাস্তুদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে জ্যোতি বসু অনিচ্ছুক উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো বন্ধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্য পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : ...although it was stated by the Government that West Bengal has reached a saturation point. I feel, therefore, that the rest may be found rehabilitation here provided there is willingness on the part of the Govt. (যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বারবার বলেছেন যে, এ রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একতিলও জমি নেই, তথাপি মনে করি সরকারের অভিপ্রায় থাকলে অবশিষ্ট উদ্বাস্তুরা এ রাজ্যে পুনর্বাসন পেতে পারে।)

সে-সময় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি বন্ধ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারও বদ্ধপরিকর। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কলকাতায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'যদি মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কলকাতার পথে পথে দাঙ্গাও শুরু হয়, তাহা হইলেও আমরা উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি বন্ধ করিয়া দিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।' (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২.১০.১৯৫৯)।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সেদিন জ্যোতি বসু উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২১ জুন কলকাতার জ্যোতি বসুর সভাপতিত্বে বামপন্থী দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল : 'তাদের (উদ্বাস্তুদের) পুনর্বাসনের সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিতে হবে।' (সূত্র : মরিচঝাঁপি— নিরঞ্জন হালদার, পৃ. ৩৩)।


পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

পুস্তকমেলা

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড

আলোচনা : ঝিনুক চক্রবর্তী

মরিচঝাঁপি : নৈঃশব্দের অন্তরালে
জগদীশচন্দ্র মণ্ডল
সুজন পাবলিকেশন, ৭বি লেক প্লেস,
কলকাতা ৭০০ ০২৯
দাম : ১৫০ টাকা

মরিচঝাঁপি

'এই উদ্বাস্তুরা অন্য রাজ্য থেকে আসা আবাওদি অধিবাসীদের মতো কলকাতার ফুটপাথ বা রেলস্টেশন দখল করতে চাননি, তাঁরা সত্যি সত্যিই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েই সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসনাবাদে না যেতে দিয়ে, বর্ধমানের কাশীপুরে গুলি চালিয়ে ৬জনকে মেরে, জোর করে অনেক উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠান। বামফ্রন্ট

২০০২ সালে কোলকাতা বইমেলার 'পুস্তকমেলা'য় জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি নৈঃশব্দের অন্তরালে' বইটির সমালোচনাটি নিষিদ্ধ হয়। 'পুস্তক মেলা' তুলে নিয়ে সেখানে অন্য বইয়ের সমালোচনা জুড়ে দেয়। একই সংখ্যার ২টি মূল কপি আমাদের কাছে আছে।

জ্যোতি বসুর এই দরদ(!)-এর কথা মাথায় রেখেই বোধহয় ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত উদ্বাস্তু মানুষজন পুনর্বাসিত হবার আকাঙ্ক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দিকে রওনা দেন।

হায় রে আশা ! গদিতে বসলে নেতাকে যে রাজার মতোই আচরণ করতে হয়। এই বুঝি গণতন্ত্রের নিয়ম !

১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল ১০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার সুন্দরবনের কুমিরমারি পার হয়ে মরিচঝাঁপিতে আশ্রয় নেন। তাঁরা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের কাছে কোনো সাহায্য চাননি। তাঁদের দাবি ছিল, 'আমাদের শুধু মরিচঝাঁপিতে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে থাকতে দাও'। তাঁদের ভরসা ছিল, এখানে পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু জোয়ার আসে না। এখানকার কাছাকাছি গ্রামের লোকজন যদি পাঁচ ফুট বাঁধ দিয়ে নোনাজল ঠেকিয়ে একশো বছর ধরে চাষ করতে পারেন, তাহলে তাঁরা পারবেন না কেন ? তাছাড়া মাছ ধরার সুযোগও তো আছে।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন, তাঁরা তখন জানতেন না, হায়।

সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটি তখন রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'দণ্ডকারণ্যের যে-সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, প্রয়োজন হলে, তাদের বল প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে দিন।' কমিটির তিন দিনের অধিবেশনের পর দলের সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'এইসব উদ্বাস্তুদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে'। (সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২.৭.১৯৭৮)।

এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হতে দেরি হল না। ১৯৭৮ সালের ১৯ আগস্ট বহু পুলিশ ও কুড়িটি লঞ্চের সাহায্যে সামরিক কায়দায় সাময়িক নদীপথ অবরোধ করা হল এবং উদ্বাস্তুরা তাতেও দমে না দেখে ৬ সেপ্টেম্বর সেইসব লঞ্চ নিয়ে উদ্বাস্তুদের রসদ জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বোঝাই করা ২০০টি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হল। (সূত্র : মরিচঝাঁপি কি মরীচিকা? শৈবাল গুপ্ত। নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত 'মরিচঝাঁপি', পৃ. ২৬-২৭)।

নৃশংসতার ছবি পাওয়া যায় সমসাময়িক সংবাদপত্রেও : 'উদ্বাস্তুরা যে ঘরগুলি তৈরি করেছিলেন তার সংখ্যা কোনোক্রমে এক হাজারের কম নয়। ঘরগুলির অধিকাংশই দৈর্ঘ্যে ১০০-১৫০ হাত, প্রস্থে ১২-১৪ হাত। ঘরগুলি শুধু ভেঙে দেওয়া হয়নি পুড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অকথ্য অমানুষিক অত্যাচার, লাঠিপেটা, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ লুঠতাজের মাধ্যমে ১০-১৫ দিন ধরে অনবরত সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শন করেও উদ্বাস্তুদের সম্পূর্ণ উৎখাত করতে সক্ষম হয়নি।' (যুগান্তর, ২০ ফাল্গুন, ১৩৮৪)।

'যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছি। অথবা শত্রুদেশের সীমানায়। মাঠে মাঠে সশস্ত্র পুলিশের ছাউনি, পুলিশ চাইলেই আপনাকে হাত উঁচু করে হাঁটতে হবে। খানাতল্লাসি করবে। ক্যাম্পে নিয়ে আটক করবে। জেরা করবে। অথচ জায়গাটি সরকার-ঘোষিত বনাঞ্চল নয়। এই জায়গার নাম কুমিরমারি। মরিচঝাঁপির লাগোয়া এক জনবহুল দ্বীপ।' বামপন্থী সিপিআইয়ের মুখপত্র 'কালান্তর' পত্রিকায় 'চার ভাঁটার পথ : নিষিদ্ধ দ্বীপ' শিরোনামে দিলীপ চক্রবর্তী ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে যে বর্ণনা দেন তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়।

'...ওখানকার মানুষরা চৌদ্দ দিন এপারে আসেনি। ভাত খেতে পারেনি। জলও পায়নি। পুলিশ ঘিরে রেখেছে দ্বীপ। প্রথম প্রথম ২-৩ দিন বেশি শব্দ হয়নি। এরূপ কান্না শোনা যেত রোজ। কুমির আর কামট-ভরা নদী পার হয়ে কিছু লোক লুকিয়ে আসত রাতে— চাল ইত্যাদি খোঁজে। জলের খোঁজে। এরপর তাও বন্ধ হল। জালিপাতা আর যদু পালং খেয়ে থেকেছে ওরা, মরেছেও অনেক। ওদের কান্না এখান থেকে রোজই শুনতে পাই।

'...২৪ জানুয়ারি থেকে সরকার দ্বীপ অবরোধ করে। ৩১ জানুয়ারি গুলি চলে। ৭ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টের ইনজংশন অনুযায়ী জল-অন্ন আনার উপর থেকে বাধা প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু এর পরেও কড়াকড়ি চলছে।... একমাত্র ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখেই চাল আনতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন অনন্ত মণ্ডল, অরবিন্দ রায়, নিরঞ্জন বাড়ৈ, কার্তিক সরকার, রণজিৎ মণ্ডল, কৃষ্ণদুলাল বিশ্বাস।... ২৪ জানুারি সরকারের পক্ষ থেকে দ্বীপ অবরোধ করার পর ওখানে অনাহারে মারা গিয়েছেন ৪৩ জন।' (সূত্র : কালান্তর, ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯)।

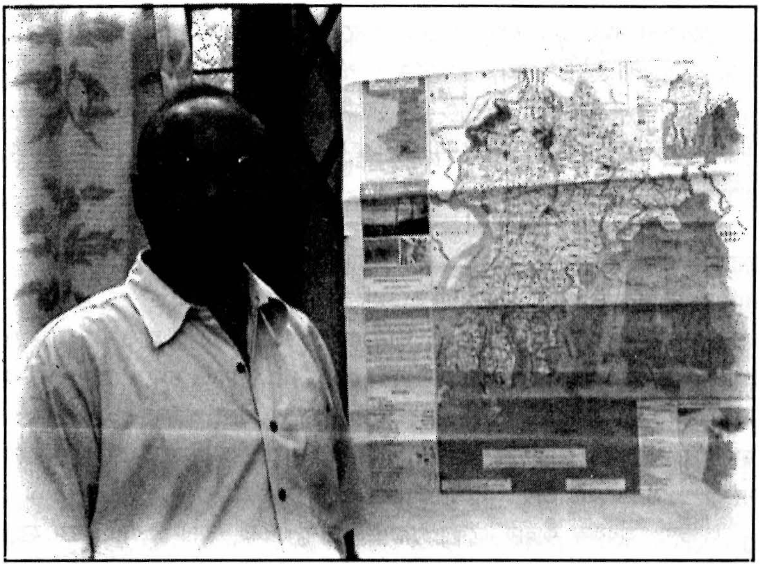
'ব্লকেডের সময় ওরা তখন কি খেত শুনবে? এক ধরনের ঘাস সেদ্ধ করে তাই দিয়ে সবাই পেট ভরায়। ঘাসের নামটা মনে পড়ছে না— ওখানে ওটা নাকি অপর্যাপ্ত জন্মায়। তখন কাশীকান্ত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন, তাঁকে ঘাসটা দেখাতে পেরেছিলাম।' (সূত্র : সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদারকে লিখিত কমলা বসুর চিঠি)।

২৪ জানু ১৯৭৯ থেকে মরিচঝাঁপির নেতাজীনগরে অনাহারে মৃত ব্যক্তিদের নামের তালিকায় রয়েছেন ১৩৬ জন। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত ব্যক্তির তালিকায় ২৩৯ জন। ধর্ষিতা মহিলাদের তালিকায় ২৩ জন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকায় ১২৮ জন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ গ্রেফতার হয়ে বসিরহাট ও আলিপুর জেলে আটক ব্যক্তিদের তালিকায় ৫২ জন। পরবর্তী সময়ে জেলে আটক ১৩০ জন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৯ জল সংগ্রহ করতে গিয়ে আটক ৩০ জন। ২৪ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৯) পর্যন্ত পুলিশ-কর্তৃক ছিনতাই-হওয়া নৌকার সংখ্যা ১৬৩ ৷— এজাতীয় অসংখ্য প্রামাণ্য তথ্য।

লজ্জায়, অবরুদ্ধ কান্নায় একের পর এক পৃষ্ঠা ওল্টাই, আর কেবলই মনে হয়, কেউ এসে চিৎকার করে বলুক— এ মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে।

মানুষের অমানবিক প্রবৃত্তিতেই সংঘঠিত হয় গণহত্যা। সেই কালো ইতিহাস একদিন উঠে আসে সাদা আলোয়। চব্বিশ বছর পরে এভাবে সমস্ত প্রামাণ্য বিশ্বাস্য নথি-সহ উঠে এল মরিচঝাঁপি!

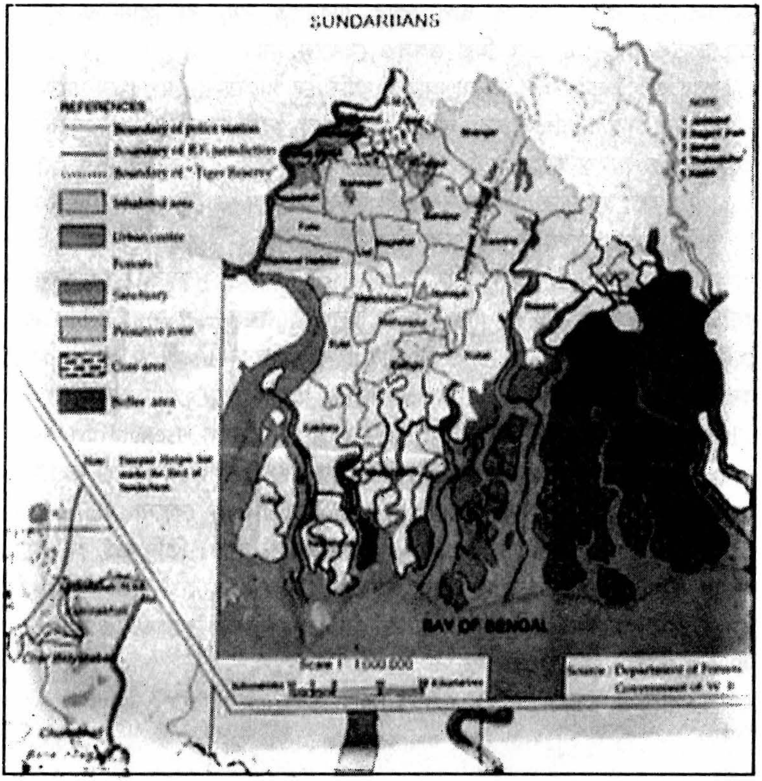
এ লজ্জা কোথায় লুকোব! ইস! আমি যে ভারতীয়, এই বাংলারই একজন। আর কী আশ্চর্য, মরিচঝাঁপি এই বাংলাতেই। প্রগতিশীল বাংলায় 'মরিচঝাঁপি' নিয়ে একটা ঝড় উঠবে না!



মিথ্যা অভিযোগ, মরিচঝাঁপি ওদের

ড: উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আমরা এই যে মানচিত্রটা দেখছি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মানচিত্র। মানচিত্র তৈরি করেছেন ভারত সরকারের NATMO সংস্থা এবং তারা হচ্ছে আবার সার্ভে অব ইন্ডিয়ার যারা অরিজিন্যাল অর্গানাইজেশন তার উপরে নির্ভর করে এই ম্যাপটা তৈরি করে এবং এই NATMOই হচ্ছে আমাদের ভারত সরকারের মানচিত্র তৈরি করার সংস্থা। এই মানচিত্র যারা তৈরি করেছে দেখানো হচ্ছে এই ২৪ পরগনার বনাঞ্চল সুন্দরবন এলাকাটা ধরি তাহলে প্রথম আমাদের দেখতে হবে যে তারা আবার এই এলাকাটা কোত্থেকে এবং কীভাবে তৈরি করেছে। সেখানে আবার ছোট্ট insert ম্যাপ আছে বাঁদিকে। এই বাঁদিকের ম্যাপটাতে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বা বনবিভাগ তারা এই ম্যাপটাতে লাগিয়েছে। সেখানে কি বলা আছে? যেখানে মানুষের বসতি সেটা হচ্ছে হলুদ, যেখানে একটু শহর অঞ্চল সেটা পিঙ্ক কালারের, যেখানে স্যাংচুয়ারী আছে সেটা আবার জালের মতো রয়েছে প্রিমিটিভ জোন যেটা, সেটা ভাগ করা হয়েছে, ডট-ডট-ডট যেগুলি আছে, এটা প্রিমিটিভ জোন, এগুলি হচ্ছে কোর এরিয়া, বাফার এরিয়া হচ্ছে সবুজ, এখানেও বাফার এরিয়া রয়েছে।



পুবদিকে আছে এখানেও আছে। এটাকে যদি বড় করে দেখতে চাই এই ম্যাপটাতে তাহলে এই জায়গাটায় আমাদের আসতে হবে। সেখানে দেখুন কুমিরমারি জায়গাটা, এই হচ্ছে কুমিরমারি, এই কুমিরমারিতে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা তারা মরিচঝাঁপিতে যাওয়ার আগে ১৫/২০ দিন এই কুমিরমারিতে ছিল। এইটুকু জায়গা নিয়ে এই দ্বীপটি। যার একদিকে ঝিল্লা রিজার্ভ ফরেস্ট, ঝিল্লা নদী বা ঝিল্লা রীভার তারপরে টুকা এবং আরো দুটো নদী পেরিয়ে একটা নদীর পাশে হচ্ছে বাংলাদেশ। এটা কোনো টাইগার রিজার্ভের মধ্যে নাই, না আছে কোর এরিয়ার মধ্যে, না আছে প্রিমিটিভ জোনের মধ্যে, না আছে স্যাংচুয়ারির মধ্যে, অতএব এই জায়গাকে বলা হয় যে তারা একটা সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকেছে বা ব্যাঘ্র প্রকল্পে ঢুকেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। অতএব এই কথাটা তো আমাদের কোন উপন্যাস লিখে বলতে হবে না। সরকারি ম্যাপ, সরকারি ম্যাপ যেটা ২০০০ সালে তৈরি সেই ম্যাপই বলে দিচ্ছে সেই মরিচঝাঁপি দ্বীপ ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে নেই, মরিচঝাঁপি দ্বীপ সংরক্ষিত

বনাঞ্চল নয় বা মরিচঝাঁপি দ্বীপ কোর এরিয়াতে নয়, বা প্রিমিটিভ পুরানো জায়গাতেও নয়, ঘন এবং মিশ্র জঙ্গলও সেখানে নয়।

আর একটি ভূগোলের কথায় আমরা আসি যে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের যে একেবারে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত হচ্ছে সুন্দরবন। এই সুন্দরবনটি বহুকাল ধরে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ যদি আমরা ধরি, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে বলা হয় তার পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে গঙ্গা এর মধ্যে যে ভূমি, তাকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বলা হয়। এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের একেবারে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রের কাছাকাছি যে অংশ তাকেই বলা হয় সুন্দরবন। এই সুন্দরবন আদিম কাল থেকে, বহুদিন ধরে পতিত ছিল এই জঙ্গল এবং এখানে বিল এবং ছোট ছোট দ্বীপের মতো জায়গা যেখানে কিছুই হত না। এটি কারা পুনরুদ্ধার করলো? ভৌগোলিক, যাঁরা ভূগোল লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি বলব যে S P Chatterjee যিনি এখন আর নেই ওনার ১৯৪৮ সালে Bengali Maps যে মানচিত্র, এ্যাটলাসটি তিনি তৈরি করে গিয়েছেন এখনও সেটিকে অমূল্য বলা হয়। সেটি আবার আমাদের NATMO organisation তারা এটি কোনো compose না করে scan করে ২০০৩ সালে এটিকে আবার প্রকাশ করে। তিনি এই অংশটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন কারা এটাকে পুনরুদ্ধার করেছে। তিনি এই কথা বলতে গিয়ে বলছেন এই যে এখন যে জনগোষ্ঠীকে বলা হয় নমঃশূদ্র, যাদের মধ্যে 99% ও তারও বেশি লোক মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেছেন, অবশিষ্ট লোক তাদের নাম হয়েছে নমঃশূদ্র, এখনও নমঃশূদ্র বলে নাম আছে। তারা হচ্ছে এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের, তাদের পূর্বপুরুষরা হচ্ছে সবচেয়ে আদিমতম অধিবাসী। যাকে ইংরাজিতে বলা হয় autothon বা ভূমিপুত্র। ১৯৪৮ পর্যন্ত তারা এই সুন্দরবনের যে বনাঞ্চল বা জলাভূমি যেখানে মানুষের বসতি উপযোগ্য করা হয়েছে, তাদের উদ্যোগেই এই সুন্দরবনকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। অতএব আজকে যখন তাদেরকে এখানে ডেকে নিয়ে আসা হল, বা তারা যখন মরিচঝাঁপিতে যেখানে বসতি স্থাপন করতে গেল, তারা তো নিজের জায়গায় সেখানে বেড়ে গেছে, যদি কেউ এর কোনো দাবিদার থাকে, আইন সঙ্গত, ইতিহাস নির্ভর, ভূগোল-নির্ভর কারোর দাবি যদি সঙ্গত হতে পারে, সে হচ্ছে এই জনগোষ্ঠী। এবং এই জনগোষ্ঠী সেই আমাদের কাছে বিভার্লি থেকে শুরু করে একেবারে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আমরা প্রায় ১০০ বছরের তথ্য যোগাড় করেছি। এরাই হচ্ছে এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ভূমিপুত্র। সেইখানটা আমাদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা, তাদের নিজের জায়গায় তারা গিয়েছিল বসতি করতে, সেখান থেকে তাদেরকে বার করে দেওয়া হল, তাদেরকে হত্যা করা হল, এই অন্যায় এই মানবিক অধিকার লঙ্ঘন পৃথিবীর ইতিহাসে কোথায় হয়েছে— আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।

একটি অভিযোগ করা হয় যে, মরিচঝাঁপিতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু তারা বসতি স্থাপন করতে গিয়েছিল, সেখানে বাংলাদেশ থেকে বিদেশি চর এখানে ঢুকে পড়ে এবং তাদের মদত দেয়। এই প্রশ্নটি তখন করেছিলেন আমাদের পার্লামেন্টে জ্যোতির্ময় বসু, সি পি এম-এর। তিনি এই অভিযোগ করেছিলেন যে, 'ওখানে বৈদেশিক গুপ্তচরেরা ঢুকেছে।' তার উত্তরে তদানীন্তন যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোম মিনিস্টার মিস্টার প্যাটেল কি উত্তর দিয়েছেন, প্রথমে ইংরাজিতে বলবো পরে বাংলায় ব্যাখ্যা করবো। 'Mr. Patel told Mr. Jyotirmoy Basu, that the Centre had enquired about foreign agents operating in the Sundarvans, 'we have no information that there are foreign agents.' " তার মানেটা পরিষ্কার যে, 'ভারত সরকার এই বিষয়ে অনসুন্ধান করেছেন এবং তারা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে এখানে কোনো বৈদেশিক গুপ্তচর নেই।' তাহলে এই যে অভিযোগটা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, এবং সেটি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালের পার্লামেন্টের যদি record দেখা হয়, তাহলে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

সাক্ষাৎকার : ১১মে ২০০৭



দণ্ডকারণ্যে আজ বিরাট অংশের জীবিকা বিড়ি বাঁধা



দেবব্রত বিশ্বাস উদ্বাস্তু যুবনেতা। কোলকাতার সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক নেতাদের গোপনে নিয়ে গেছেন মরিচঝাঁপিতে বারবার। বামফ্রন্টের খাদ্য অবরোধের বিরুদ্ধে কোলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার কৃতিত্বও তার। সেই দেবব্রত আজ অস্থায়ী রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে ছোটেন কলকাতা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশে।

এই উচ্ছেদ কেন?

দেবব্রত বিশ্বাস

'৭০ তে আসার পর হাসনাবাদ। রিফউজি হলাম। এখানে লাইন দিলাম, এই আমাদের মানা ক্যাম্প, মানা ক্যাম্প থেকে আমরা পুনর্বাসনে চলে যাই মধ্যপ্রদেশের বেতুল ডিস্ট্রিক্ট-এ। সেখানে আমাদের পুনর্বাসনের জায়গায় নিয়ে গেল, আমাদের চাষের জমি লাঙ্গল, চাষের যা যা লাগে সব দিল, সেখানে আমরা যে জমি পেয়েছিলাম তা অনুর্বর এবং পাহাড়ী, পাথর। এক ইঞ্চি কী দুই ইঞ্চি নীচে পাথর, চাষ হয় না।

প্রশ্ন : আন্দোলন করে যে মরিচঝাঁপিতে আসেন তা সংগঠিত হলো কী করে?

দেবব্রত : মানা ক্যাম্পে 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল কমিটি' গঠিত হল, যার যার পুনর্বাসন কেন্দ্রে চলে যাই সতীশ বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। এইভাবে সতীশ বাবুর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সতীশ বাবু তখন উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি, এখানে যে যেখানে আছি মানা ক্যাম্পে আমাদের একটা কেন্দ্র থাকুক। উনিও তখন বসে আছেন। যার যেখানে অসুবিধা সতীশবাবুর কাছে মেসেজ পাঠাই এই অবস্থায় রবীন চক্রবর্তীর সঙ্গে রঙ্গলাল গোলদার গেলেন বেতুলে ৭৮-এ



সংগঠনের কাজে। যাওয়ার পরে বাঙালি অফিসার মিলিতভাবে ওনাদের অ্যারেস্ট করেন। পুলিশ হাজতেই নিয়ে গেল, জনতার সরকার মোরারজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী। এটা হচ্ছে বেতুল ডিস্ট্রিক্ট। তখন রাত ১০টা নাগাদ রবীনবাবু ও গোলদার বাবু অ্যারেস্ট হয়ে যায়, সংবাদ আসলে আমি বলি এদের তো ছাড়াতে হবে তবে ছাড়াতে গেলে তো এদের কাছে হাতজোড় করলে চলবে না। আমরা তখন ভোরবেলায় ২৭টি গ্রামে সংবাদ দিয়ে দিলাম যে বেতুলে এসেছিল রবীন চক্রবর্তী ও রঙ্গলাল গোলদার আমাদের নেতা, এদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। '৭৮ এর ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখ কী ১৫/১৬ তারিখ হবে অনুমান। সকালবেলায় যে বাঙালি অফিসার মিস্টার সিনহা, অ্যারেস্ট করেছে দেখি উনি লোকাল বাজার দিয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছে। আমি বললাম, 'দাঁড়ান এখানে, আপনি অ্যারেস্ট।' তিনি বললেন, 'কেন ?' 'আপনি আমাদের নেতাদের অ্যারেস্ট করেছেন, আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম আমরা,' আমার তখন বল রয়েছে আমি তো জানি আমার পিছনে তো ৪০০/৫০০ লোক রয়েছে। ওনাকে এখানে নামায়ে আমাদের মাঝখানে মাটিতে বসাবো এখানে, 'আমাদের দাবি হল কী, যতক্ষণ রঙ্গলাল গোলদার আর রবীনবাবুকে ছাড়া না হবে, আপনাকে ছাড়া হবে না, আপনি DRO কে বলে দিন এবং ভূপালের মিনিস্টারকে সংবাদ দিন যে জনগণের মাঝে এখানে বসে আছেন।' থানায় মেসেজ গেল। থানায় মেসেজ গেলে ডেপুটি কালেক্টার আসল, ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। পিতা-পুত্রের মতো ব্যবহার, নন-বেঙ্গলী, মি: তেওয়ারি। ভদ্রলোক খুব ভালো। উনি বললেন, 'দেবব্রত, তুমি সিনহাকে ছেড়ে দাও আমি তোদের নেতাকে ছেড়ে দিচ্ছি।' বললাম, 'স্যার জনগণ তো বিশ্বাস করবে না। জনগণ তাদের হাতে দায়িত্ব চলে গেছে, ওরা বলছে আপনি রবীনবাবু ও গোলদার বাবুকে আমাদের হাতে দিন। এইখানে এনে দিন আমরা ওনাদের

যেইখানে পাঠানোর পাঠিয়ে দেব।' 'একবার অ্যারেস্ট কোর্টে উঠেছে, টাইম লাগবে।' এইভাবে চলতে চলতে বিকেল ৫টা হয়ে গেছে। ভোর থেকে আমি আর পাব্লিককে বোঝাতে পারছি না। পাব্লিক আমার হাত থেকে আউট অব কন্ট্রোল। আমাকে বলছেন, 'দেবব্রত তুমিতো পুনর্বাসনে এসে যত কিছু দাবি করছ আমি তো তোমার দাবি অপূর্ণ রাখিনি, এখানে যত গ্রামে যা বলছ তাই দিয়েছি— রাস্তাঘাট, পানীয় জল, রেশনের ব্যবস্থা যখন যে দাবি করেছ আমি তাই দিয়েছি। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস রাখ।' আমি বললাম, 'আপনার উপর আমার আস্থা আছে, আপনি যখন যা বলেছেন তাই করছেন। কিন্তু এখন তো আমি জনগণকে কন্ট্রোল করতে পারছি না, কী করি!' তখন বললেন, 'তুমি এক কাজ কর। তুমি বস ঐখানে, আমি জনগণকে হটিয়ে দিচ্ছি।' তখন উনি পুলিশ দিয়ে লাঠি চার্জ করলেন। পাব্লিক চলে গেল। পুলিশ দিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। যখন আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন, তখন একদল উৎসাহী যুবক বলল, 'স্যার দেবুদাকে আমরা একা ছাড়ব না। যখন দেবুদাকে গাড়িতে তুলে নিলেন তো আমরাও গাড়িতে উঠব।' এইসব বলে ৮/১০টা ছেলে আমার গাড়িতে উঠে গেল। আমাদের যখন থানায় নিয়ে হাজির তখন রাত ১০/১১টা হবে। ওখানে রবীন চক্রবর্তী ও রঙ্গলাল গোলদারকে আমার হাতে এনে বললেন, 'দেবব্রত! ওনাদের আমি এতো রাত্রে গ্রামে পাঠাবো না ওনারা যেখানে যেতে চান এই রাত্রে আমরা সেইখানে পাঠিয়ে দেব।' ওনারা বললেন, 'আমরা ভূপাল যাব।' তখন ঐ রাত্রে ওনাদের বেতুল ডিস্ট্রিক পার করে দিলেন। ওনারা চলে যাবার পর দেখি আমার নামে পুলিশ কেস হয়েছে, কি অভিযোগ, না, আমি সিনহা সাহেবকে ২৪ ঘণ্টা ঘেরোয়া [ঘেরাও] করে রেখেছি, জল খেতে দিই নাই এইসব। এইবার তো আমি ডেপুটি কালেক্টর সাহেব, কালেক্টার কারো সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারছি না, তখন ইয়ং বয়স। পুলিশ ডাকলেই চলে যেতাম, রাজনীতি তখন অত বুঝি না এখন যেমন বুঝি। আমি থানায় বললাম, 'স্যার আমার বাবাকে ডাকুন আমি আর এখানে থাকব না।' গ্রামের লোকদের বললাম, 'এখানে থাকবো না আমি বাংলায় চলে যাব।' এখন বাংলায় আসছি কোথায় আসছি তো জানি না, তখন আমার স্ত্রী বলল যে 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' আমি সে রওনা হয়ে গেলাম বাংলায়। ঐ যে হাসনাবাদে এসে পৌঁছলাম সেখানে ১১ ফ্যামিলি এসে জড়ো হয়ে গেছে মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে, ঐ ১১ ফ্যামিলি, আমি আর আমার স্ত্রী, এই ১২ ফ্যামিলি এসে জড়ো হলাম।

বস্তার ডিস্ট্রিক্টের ৫/৭ ফ্যামিলি, আমার নামগুলি মনে নাই আমি কাকেও চিনতাম না, মুখ চেনাও ছিল না, আমি আইসলাম। তার ৩/৪ দিন পরে এল আমার বন্ধু নির্মল দে। ও এসে হাজির হল, আমরা ঐ একই ডিস্ট্রিক্ট বেতুলের। তখন রাইহরণ বাংলায় আসেনি, সতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা করি হাসনাবাদের কাছে

হিঙ্গলগঞ্জের পাশের গ্রামে, শোলমারি নাকি একটা গ্রামে ওখানে সতীশবাবু আসে। আমরা গিয়া দেখা করলাম, তখন গোলদার বাবুও এসে পৌছায়নি, ৫ দিন পরে গোলদারবাবু ফ্যামিলি নিয়ে এসে পৌছলেন, তখন অরবিন্দ মিস্ত্রি, রাইহরণ বাবু এরা কেউ এসে উপস্থিত হন নি, শুধু সতীশবাবু। নির্মল দে আমরা আর কজন ছেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলে বলেন, 'তোরা এসে গিয়েছিস ভালো করেছিস।' তারপর মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে রওনা হই। এই প্রথম সূত্রপাত, তখন 'নিখিলবঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘ'-র বীরেনবাবু জীবিত, সুব্রতবাবু, কালিদাস বৈদ্য জীবিত, এরা সবাই। দেখি যে 'দণ্ডকারণ্যের বন্দী শিবিরে আর কেউ ফেরত যাবে না।' এই পোস্টারটা পেয়ে, ঐ ১৩৬ নং যোধপুর পার্কের ঠিকানায় পোস্টারটা দেখলাম, তখন দেখি আমাদের জন্য কে বলছে কথাটা, তখন দেখি সুব্রতদা। তখন থেকে সুব্রতদার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেল। উনি বললেন যে 'নিখিল বঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘে'র তরফ থেকে তোমাদের এক টিউবওয়েল দিতে চাই।' তখন আমরা হাসনাবাদে। তখন আমরা বললাম যে 'এখন টিউবওয়েল আপনার এখানে দিতে হবে না।' সতীশবাবু বললেন যে, 'সুব্রতবাবু বীরেনবাবুদের বলুন যে কালীদাসবাবুদের টিউবওয়েল যখন দরকার হবে তখন আমরা বলব যে টিউবওয়েল এখন আমাদের দরকার তখন আমাদের টিউবওয়েল দিন।' তখন আমরা চিন্তা করছি যে এইবার ইছামতী নদী পার হতে-হবে, আমাদের মরিচঝাঁপির দিকে রওনা হতে হবে, তখন ইছামতী নদীতে খুব স্রোত এবং গভর্নমেন্ট ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছে, খেয়া পারাপার বন্ধ, নৌকো যা ছিল টোটালি বন্ধ, রাত্রে তখন রাইহরণবাবু এসে গেছেন। রাইহরণবাবু আমরা চিন্তা করলাম। সতীশবাবু ছিলেন। এই নৌকা পারাপারে কি বন্দোবস্ত করা যায়। আমরা বললাম, ১৪৪ ধারা ভেঙে ঐ সব পারে বড় বড় যে নৌকা চরে আছে ঐ ২০০ মন ২৫০ মণ মাল ধরে ঐ সব নৌকাগুলি আমরা ছিনিয়ে নেব। তা পাবলিকের হোক কিংবা গভর্নমেন্টের হোক। সেই নৌকাগুলি অবশ্য হাসনাবাদের পালদের নৌকা, প্রায় ৭/৮ খানা নৌকা তখন দখল করে, নদীতে স্রোত, যেইভাবেই হোক ইছামতী পার হতে হবে। জোয়ারের জলে গতি ও সীমানা বেড়ে যাচ্ছে। তখন কী হবে। আমরা প্ল্যান করলাম যে মেয়েদের জড়ো করতে হবে, মেয়েরা উলুধ্বনী দেবে আর শাঁখ বাজাবে, উলুধ্বনি আর শাঁখ বাজালে মানুষের মনে একটা শক্তি সঞ্চার হয়, সেই যে শক্তি আসবে তাতে যুবক ছেলেরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়বেই এবং রাত্রে বসে যে চিন্তা করলাম এবং আমরা তখন মহিলাদের জড়ো করে দিলাম, কিছু কিছু মহিলাদের সঙ্গে শঙ্খ ছিল, তাদের শঙ্খগুলি আনতে বললাম। তো সেই শঙ্খ আর উলুধ্বনি দেওয়াতে যুবকরা বুঝে গেল আমাদের নদীপার হতে হবে। যে উলুধ্বনি আর শঙ্খের আওয়াজ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষের সৈন্যদের মনোবল বাড়িয়েছিল। ঠিক সেরকম শঙ্খধ্বনি আর

উলুধ্বনি মহিলাদের আওয়াজে আমাদের ১০টা যুবক ছেলে, আরও ছেলেপিলে ছিল এরা নদী সাঁতার দিয়ে ইছামতী নদী পার হয়ে গেল। একটা ছেলে কিনারে উঠতে পারল না, ও ভেসে গেল বাংলাদেশ বর্ডারে। ওকে BSF উদ্ধার করেছিল। আমরা গিয়ে পালদের ১০/১২ খানা বড় বড় নৌকা গিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে আসলাম। এগুলি আমাদের দখলে নিলাম। আমরা ঐ নৌকা বেয়ে ঐ সুন্দরবনে পৌঁছে গেলাম, মরিচঝাঁপিতে পৌঁছাবার একদিন আগে কুমিরমারিতে হল্ট করি। কুমিরমারির পাবলিক আমাদের কোনোরকম ডিস্টার্ব করেনি। তখন ছিল কুমিরমারিতে প্রদীপ বিশ্বাস। RSP-র জেলা পরিষদের সভাপতি ছিল, ওর বাবার সঙ্গে আমি পরিচয় করলাম। খোঁজ নিলাম যে প্রদীপ বিশ্বাস কোথাকার বিশ্বাস, পূর্ব বাংলায় বাড়ি ছিল কোথায়, এই যে প্রদীপ বিশ্বাসের বাবার সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারলাম যে আমাদের বংশজ এরাও খুলনা জেলার লোক এবং এরাও আমাদের পার্শ্ববর্তী থানার। ওর বাবাকে বললাম, বাবা আমাদের বংশ পরিচয় নিল এবং নেওয়ার পরে আমাদের সঙ্গে বংশগত একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল তখন প্রদীপদাকে বললাম, প্রদীপদা এখানে যারা এসেছে সকলে আপনার লোক। উনি এখানে Settle up হয়ে গিয়েছেন, স্কুলে মাস্টারী করেন, 'প্রদীপদা আপনি জেলা পরিষদের সদস্য RSR-র, সি পি এম বাধা দিলেও আপনি আমাদের বাধা দেবেন না, আপনি RSP-র আপনার সহযোগিতা চাই।' সহযোগিতা করেছিল এবং ও 'বলেছিল এখানে যারা আমি কাদের মারব? আমি কাদের তাড়িয়ে দেব সবাই আমার নিজের লোক।' যাই হোক সেইভাবে আমরা মরিচঝাঁপিতে পৌঁছে গেলাম, পৌঁছে আমরা জল পাচ্ছি না, মানুষগুলা হতাশাগ্রস্ত, চলে আসলাম আমি কলকাতা। ঐ যে নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘের ঠিকানাটা পেয়েছিলাম সেখানে আসার পরে সুব্রতদার কাছে আসলাম। বললাম, 'সুব্রতদা এক কাজ করুন। আমি বললাম সুব্রতদা অন্তত আপনি আর কলকাতা থেকে কয়েকজন লোক মিলে মরিচঝাঁপিতে যেতে হবে, মানুষের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে এখানে আমরা আর পারছি না এমতবস্থায়...' আমরা তখন সেকেন্ড ক্যাটাগরির নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম সতীশ গোলদার রাইহরণ বাড়ৈ এর পরে, আমি, সুনীল, পবিত্র ইয়ং ব্যাচ আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। বিশেষ করে আমি গোলদার বাবুর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই জন্য, ওর বাড়ি আর আমার বাড়ি এক জায়গায় খুলনা জেলা জলমা ভুটিয়ারি থানায়, অর্থাৎ মানুষ একটা ডিস্ট্রিক্ট হোক একই এলাকা হোক বা থানা হোক একজন আর একজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যেমন জগদীশদার বাড়ি যদি বরিশাল হয় আমার পাশের গ্রাম আমি ওনার বাড়িতে যাবই যাব। গোলদার বাবু আর আমার সম্পর্কটা এইরকম ছিল। তার পরে এসে সুব্রতদাকে বললাম। বলামাত্র সুব্রতদা বীরেনবাবুকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আমরা রওনা হবার পরে ওখানে জলের ব্যবস্থা নেই,

কুমিরমারি থেকে জল নিতে হচ্ছে, অবস্থা খুব ভয়াবহ, মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। বীরেনদা সুব্রতদা গিয়ে মানুষকে আশ্বাস দিল, 'আপনারা ধৈর্য্য হারাবেন না মনোবল হারাবেন না। আপনারা যে মনোবল নিয়ে দণ্ডকারণ্য থেকে এসেছেন, মনোবল হারাবেন না।' বামফ্রন্ট সরকারের দেখার একটা ইচ্ছা ছিল যে এরা কত দূর যাবে। যাক, সেই মরিচঝাঁপিতে যেতে দেওয়া হোক; ওরা ওখানে গিয়ে কি করবে? জল পাবে কোথায়? খাদ্য পাবে কোথায়? অটোমেটিক ব্যাক করবে। কিন্তু আমরা ওখানে যাবার পর যখন দেখল যে অটোমেটিকালি ব্যাক করলাম না। বীরেনবাবু চলে এসেছে, চলে আসার পরে জলের জন্য আসলাম। বীরেনবাবু তখন ওখানে বক্তৃতা দিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিলেন এবং ব্যাক করে আসলেন। রঙ্গলাল বাবু সবাই মিলিতভাবে বললেন, 'দেখুন সুব্রতবাবু! টিউবওয়েল দেয় না কেউ। নিখিলবঙ্গ নাগরিক সংঘ থেকে উনি বললেন দেবব্রত টিউবওয়েল যদি দিতে হয় তবে এখন কালেকশন নেই। কালীদাকেও বলিনি, বীরেনবাবুকে বলিনি, কালেকশন করে টিউবওয়েল দিতে গেলে তাতে ওখানকার লোক বাঁচবে না। আমার পার্সোনাল কিছু টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি যাও দেখ ওখানে গিয়ে কী করতে পার।' ১০০০ টাকা না কত দিলেন। সেই একহাজার টাকা নিয়ে হাসনাবাদ হয়ে টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতি— পাইপ, মিস্ত্রি সব যোগাড় করে একসঙ্গে ঢুকছি আমি। একটা টিউবওয়েল কেনা ছিল, তিন টাকা ফুট টাটা পাইপ কিনে আমি যাচ্ছি ডি আই বি-র লোকজন দেখছে, হাসনাবাদের পুলিশ অফিসারেরাও দেখেছে ওরা বাধা দেয়নি। কোথায় যাচ্ছে ওরা বাধা দেয় নাই CI ও জানছে। তখন থ্রু মরিচঝাঁপি রওনা দিলাম, হাসনাবাদ থেকে মিস্ত্রি নিয়ে গেলাম, ওদের কন্ট্রাক দিলাম তখন ওখানে গিয়ে আমি ৪০০ ফুট, ৪০০ কত ফুটের মাথায় জল পেয়ে গেলাম। বাংলায় এত ভালো জল নেই। অতি সুন্দর জল, ডিপটিউবওয়েলেও এত ভালো জল পাওয়া যায় না, তখন জল আনার পর উনি তো চিন্তা করেছেন যে টাকাটা তো দিলাম অজ্ঞাত পরিচয় দেবব্রতকে তো চিনি না জানি না, কি হয়েছে এই টাকাটা মেরে খেলো, না কাজের কাজ হল, উনি একটা দুশ্চিন্তায়, বলতে বলতে আমি চার পাঁচ দিনের মাথায় বোতল ভরে জল নিয়ে সুব্রতদার কাছে গিয়ে বলি, 'দাদা, এই মরিচঝাঁপির জন্য আপনার দেওয়া টাকায় এবং নিখিলবঙ্গ যেভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, সেই টাকার অপচয় হয়নি, এই টিউবওয়েলের জল এবং সেটাই প্রথম টিউবওয়েল।' এদিকে মরুভূমিতে জল পেলে যেমন হয়, মরিচঝাঁপি প্রথম জলের কল। মানুষের মনে আনন্দ এবং সুব্রতদা সেই জল পেয়ে আরও খুশী এবং বললেন 'আমি যে টাকা দিয়েছি তা সঠিকভাবে utilise হয়েছে।' তার পরে উনি প্রেস কনফারেন্স করে এই জলটা সাংবাদিকদের দেখালেন। প্রেসক্লাবে সবাই খেলেন এবং জলের নমুনা পরীক্ষা করে বললেন, 'কোনো অসুবিধা নেই। এই জল খেয়ে বাঁচা যায়। অনেকের

গ্যাস্ট্রিকও ভালো হয়ে গেল, পেটের ব্যথাও। এত সুন্দর জল।' তারপর বিধানসভায় হরিপদ ভারতী, কাশীকান্ত মৈত্র ঝড় তুলল, 'মরিচঝাঁপিতে জল দেওয়া হোক, জল দেওয়া হোক।' তখন জ্যোতিবাবু বললেন, 'আমি মরিচঝাঁপিতে টিউবওয়েল বসাতে পারিনা। ওটা সংরক্ষিত এলাকা, এই সংরক্ষিত এলাকায় আমি তো ওদের পিছনে চালের বস্তা জলের পাইপ নিয়ে ঢুকতে পারি না।' যাহোক ওরা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আমাদের দিল। হাসনাবাদের CI আমাদের ডেকে বলল, 'ওরা যন্ত্রপাতি পাইপ কল ইত্যাদি কুমিরমারিতে এনে ফেলল। মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য টিউবওয়েলের পাইপ এসেছে। আমরা মরিচঝাঁপিতে টিউবয়েল বসাতে পারি না। তোমরা এখন কী করবে?' তখন আমরা বললাম, 'আমরা ওটা তুলে নিয়ে আসি।' উনি বললেন, 'তোমরা তুলে নিয়ে আস, আমি তো এটাও বলতে পারি না', 'ঠিক আছে আপনি যান কি করতে হয় আমরা করছি।' আমি, নির্মল হালদার বারিশ বলে একটা ছেলে আরও ৫/৬টা ছেলে CIর কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার ঠিক আছে আমরা যন্ত্রপাতি, জলের পাইপ এইসব নিয়ে যাচ্ছি, আমরা জোর করে নিয়ে গেলাম।' উনি মৌন রইলেন এবং গভর্নমেন্ট যে পাইপগুলো দিয়েছিল তাও পালাম, এই তিনটা হল। এদিকে হাসনাবাদ বসিরহাট থেকে আরও দুটো টিউবওয়েলের যন্ত্রপাতি দিয়ে দিল RSS তরফ থেকে। ৫/৭টা টিউবওয়েল বসিয়ে দিলাম, আমাদের জলের প্রবলেম গেল, আমাদের এইবার বেঁচে থাকার অবস্থা। সতীশবাবু বললেন, 'দেখ বেঁচে থাকার জন্য চিন্তা করতে হবে না। জল যখন পেয়ে গেছি আর আমাদের ভয় নেই। প্রাথমিক ভাবে মাটির নিচে গাছ মুথগুলি খোঁজ তোমরা, যে যেখান থেকে পার বিক্রি কর আর মাছ ধরো, অসংখ্য মাছ! একদিন নৌকায় করে সতীশবাবু, আমি তখন ঐ পুরো নদীতে বেরিয়েছি জোয়ারের সময়। তখন একটা মিন মাছের ঝাঁক আসছে তখন একটা যেন মেঘ আসছে। দাদাকে ডেকে, সুব্রতবাবুকে, তখন সতীশবাবু বললেন, 'দেখ পাহাড় প্রমাণ কি সম্পদ আসছে জলের ভিতর দিয়ে! উনি দেখলেন যে পাহাড় প্রমাণ জায়গা নিয়ে এক ঝাঁক আসছে, পার্শে, ট্যাংরা মাছ, এইসব মাছের মীন, এইগুলি তখন সুব্রতদা নিরিখ করে দেখে বললেন যে, 'সতীশ বাবু! এখানে বাঁচা যাবে, লোকগুলো মরবে না।' উনি ব্যাক করলেন। প্রায় এক বেলা ধরে সমুদ্রের নদীপথ সতীশবাবু, সুব্রতদা, আমি তখন মনে হয় পবিত্রও ছিল আমাদের সাথে, আমরা ঘুরে আসলাম, তাতে করে আমাদের ওখানে যা অবস্থা ছিল তাতে করেও ওখানে আমরা প্রায় ১টা বছর ধরে বিনা হেল্পে, যে হেল্প আসছিল, নিখিলবঙ্গের মাধ্যম দিয়ে, ঐ সময় ৭৮ এ একটা বন্যা হয়, তখন উনি বংশীলাল ছিলেন RSS এর অফিসে। সুব্রতদা গিয়ে বলল যে, 'বংশী মরিচঝাঁপিতে এদের কিছু খাদ্য দাও,' তখন উনি ৫ বস্তা আটা দিল তখন আমি ঢাকুরিয়া স্টেশন থেকে ক্যানিং হয়ে মরিচঝাঁপিতে নিয়ে যাই।

বাইরে তখন '৭৮এর বন্যার হেলপ আর সব সময় আমরা রামবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকত, লঞ্চে যেত, প্রফুল্ল সেন হাসনাবাদে গেছিল, রামবাবুর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। গোলদার বাবুকে রামবাবু বলত যে, 'গোলদারবাবু দেবব্রতবাবুকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি, আমার নিজের মার পেটের ভাই,' জরুরী অবস্থার সময় তখন রামবাবুর বাড়ি কাটিয়েছি গোলদারবাবু কাটিয়েছে, অরবিন্দ মিস্ত্রিও তখন আমরা যখন মানা ক্যাম্পে থাকতাম, বেতুলে থাকতে পারতাম না তখন, পুলিশ হয়রানি চলছে থাকতে পারতাম না আমার নামে তো পুলিশী হুলিয়া জারি হয়েছে যে দেবব্রত বিশ্বাসকে ধরে দিতে পারলে ২৫,০০০টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে, তখন গা ঢাকা দিয়ে আছি তখন এই রামবাবুর বাড়িতে থাকতাম রাজমিস্ত্রি ড্রেস পরে। কাজ করি, বাড়ি ঝাড়ু দিচ্ছি সব। রামদা বলছে, 'আমার বাড়ির চারদিকে পুলিশ রয়েছে, সি আই ডি রয়েছে, তোরা যে ওখান থেকে এসে গা ঢাকা দিয়ে আছিস, খুব সাবধান তোরাও ধরা পড়বি আমিও বিপদে পড়ব,' সেই জরুরী অবস্থার সময়, রামবাবু, অটলবিহারী বাজপেয়ী, আদবানীজি বহু লোক, ধরা পড়ে গেল রঙ্গলাল অ্যারেস্ট হয়ে গেল সতীশবাবু অ্যারেস্ট হয়ে গেল, অরবিন্দ মিস্ত্রি, এইরকম অনেক... জরুরী অবস্থার সময় '৭৫ এ যে জরুরী অবস্থা। বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে তখন আমাদের মনের একটা ভাব আসল, বিশেষ করে খুলনা, যশোর, ফরিদপুরের বলব না, খুলনা, যশোহরের লোক ছিল কমিউনিস্টভাবাপন্ন, দক্ষিণ খুলনা দক্ষিণ বঙ্গটাই হল কমিউনিস্টভাবাপন্ন। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে জ্যোতিবাবুর প্রতি আমাদের পূর্বপুরুষের বাপ ঠাকুর্দার একটা দুর্বল মনোভাব ছিল জ্যোতি বাবুর উপর, আমাদের জ্যোতিবাবু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। তখন ওখানে ছিল খুলনার দাদার কাকা হচ্ছে বিষ্টু চ্যাটার্জি, এর ভূমিকা কমিউনিস্ট আন্দোলন হিসাবে আমাদের প্রভাব ফেলেছে। আমিও তখন বুঝি। তারপর এদের ভূমিকা দেখলাম, যেদিন আমি অ্যারেস্ট হয়ে যাই। তখন আমি '৭৮-তেই অ্যারেস্ট হই, রামবাবুর বাড়িতেই ছিলাম আমি, রাত তখন ৯টা বাজে। রাম চ্যাটার্জি আমাকে বলল, 'দেখ কাল দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় RSPর হয়ে যাবে। কারামন্ত্রী। ও যেন মরিচঝাঁপিতে ঢুকতে না পারে তুমি চেষ্টা কর। তখন আমি রামবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত্রে চলে আসি। আমি যোধপুরে, সুব্রতবাবুর সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার বা রামবাবুর আলাপ পরিচয় না হলেও, আমরা তখনও রামবাবুর বাড়িতে থাকছি, এখন আমরা যোধপুর পার্কে সুব্রতবাবুর বাড়িতে যাবো। এখন সুব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করছে, 'তোরা এখন কোথায় যাবি?' বললাম, 'রামবাবুর বাড়িতে চন্দননগরে যাব।' রামবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তোরা কোথায় যাবি?' বললাম, 'যোধপুর পার্কে সুব্রতদার বাড়ি।' এইরকম পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনতে পারে যে কেউ খারাপ লোক না। অ্যারেস্ট হবার পরে ওরা আমাকে জামিন

দিয়ে দেয়। আমি তখন হাইকোর্টে চলে যাই, হাইকোর্টে গিয়ে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, আমরা বাঙালির অমরেশ ভট্টাচার্য, সুব্রতদা আমি। এরা নিয়ে গিয়ে বলল যে খাদ্য জল বন্ধ হয়ে গেছে, এই খাদ্য জল যদি চালু করতে হয় মরিচঝাঁপিতে তবে আইনের আশ্রয় নেব। ৩ সপ্তাহ বন্ধ ছিল, এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তো পালিয়ে চলে আসলাম মরিচঝাঁপি থেকে রাত্রের অন্ধকারে ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে... আমি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সাতজেলে আসি ওখানে থেকে লঞ্চে ভোরে ক্যানিং দিয়ে আসি, ক্যানিং দিয়ে এসে যোধপুর পার্কে আসি, এসে শুনি তখন সুব্রতদা চলে গেছে উত্তরপ্রদেশে। ওখানে মকর সংক্রান্তি উৎসব উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষে একটা হিন্দু কনফারেন্স হয় সেখানে। এসে ওনাকে পাইনি এসে চলে গেলাম হরিপদ রায়ের কাছে। ক্যালকাটা কর্পোরেশনের হাসপাতালের চিপ ডাক্তার, দেরি করে দেখি সুব্রতদা আসল নাকি। ওখান থেকে আমি সন্তোষ মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, সবাই অপেক্ষায় সুব্রতবাবু বাড়ি আছে কিনা, তার দুদিন পর দাদা এসে গেল। আমার জামিন হয়ে গেল। তার পরদিন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বাড়িতে আলোচনা চলতে লাগল। মরিচঝাঁপিতে জল সরবরাহের ব্যাপারে যেটা বামফ্রন্ট বন্ধ করে দিয়েছে জ্যোতিবাবুর সরকার, এই নিয়ে কি করা যায়। তখন আমরা নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার, শাক্য সেন এদের নিয়ে হাইকোর্টে পিটিশান দাখিল করা হয় উদ্বাস্তুদের তরফ থেকে এবং মরিচঝাঁপির নাগরিক হিসাবে এবং দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি পিটিশান সাবমিট করি, পিটিশিন সাবমিট করার একদিন পর আমরা অর্ডারটা পেয়ে গেলাম। আমি অর্ডারের কপি নিয়ে জ্যোতির্ময় দত্ত তখন যুগান্তরের সাংবাদিক, আমরা বাঙালির দুটো তিনটে ছেলে, একসঙ্গে হয়ে আমরা মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মরিচঝাঁপিতে বাগনা ফরেস্ট অফিসে উঠেছি। জ্যোতির্ময় দত্তকে ঢুকতে দিল না। আমি বাগনা থেকে ঢুকলাম তখন এস পি ছিল অমিয় সামন্ত। অমিয় সামন্ত এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা মাইকে প্রচার করছে, 'আপনারা দেবব্রত বিশ্বাসের কথায় কান দেবেন না। আপনারা উঠে আসুন, হাইকোর্টের অর্ডার সঠিক নয়,' এইভাবে বিভ্রান্তিকর প্রচার, তখন হাইকোর্টের অর্ডার নিয়েই আমি একটা ডিঙি চেয়ে নিলাম, সে দেবে না ভয়েতে। আমি বললাম, 'তোমার ডিঙির দাম কত ৩০০ ? ছোট নৌকার দাম। তো এই নাও ৩০০ টাকা আর যদি ডিঙি বাঁচে তবে তুমি আমার ৩০০ টাকা ফেরৎ দেবে,' তিনশ টাকা দাম ধরে দিয়ে নিজে ডিঙি বেয়ে একাই মরিচঝাঁপিতে গেলাম, মরিচঝাঁপিতে উঠে যে বীভৎস রূপ দেখলাম, আমি '৭১ সালে দেখেছি আর এই মরিচঝাঁপিতে দেখলাম, অন্তত ২০/৩০টা শিশু মরে এক জায়গায় লাট দিয়ে রেখে দিয়েছে, তাদের কোনো সৎকার করা হয়নি। আমি বললাম, 'তোমরা এ করেছ কী! পুলিশ দেখলে, ঐ বামফ্রন্ট সরকারের মন কি গলবে ঐ বাচ্চা

শিশুদের মৃত্যু। তখন আমি ঐ মচিঝাঁপি চর থেকে দু বোতল জল, ১ বস্তা চাল, কটা দুধের কৌটো এগুলি দিয়ে সরবরাহ করে আমি বললাম, 'যাও সবাই পারাপার কর। জল নিয়ে এসো, বাজার কর, যাও।' পারাপার শুরু হয়ে গেল পুলিশ নীরব হয়ে গেল। আমি তখন এসে সতীশ বাবু রাইহরণ বাড়ৈ, গোলদারবাবু এরা সবাই আছে। কারো খাবার নেই ৮/১০ দিনের মধ্যে প্ল্যান্টেশনে যে নারকেল গাছ লাগানো হয়েছিল তার মাথি গুলি খাওয়া হয়ে গেছে যদুপালং ছিল যা খাওয়া যায় না, সেই



পালং সিদ্ধ করে খেয়ে খেয়ে মানুষগুলি কোনোরকমে বেঁচে আছে। মানুষের শ্রী দেখা যায় না। এই রকম অবস্থা হয়ে গেছে। আর ঐ ছেলেগুলিকে তখন আমি নিজে হাতে করে নদীতে ভাসিয়ে দিতে লাগলাম, কিছু কিছু মেয়েরা এসে কান্নাকাটি করতে লাগল, 'তুমি তোমার ছেলেরা মা বাবা বলে ডাকবে আমাদের কে মা বাবা বলে ডাকবে!' সেই বিরাট আর্তনাদ। আমি মাথা নিচু করে অফিসে বসলাম। সতীশবাবুর পাশে রাইহরণবাবু। গোলদারবাবু বলল, 'দেবব্রত তুমি আজ যা করলে খুব ভালোই হয়েছে।' রাত্রি পার হয়ে জ্যোতির্ময়দা ঢুকল, সাংবাদিক। দিনের বেলায় যেহেতু ঢুকতে দেয়নি। জ্যোতির্ময়দা সবার ইন্টারভিউ নিল। তারপর বলা হল যে পাবলিকদের ডেকে সকালে খাদ্যের উদ্দেশ্যে তোমরা বেরিয়ে পড়ো, আর কোনো ভয় নেই। আপাতত একটা ঝামেলার আক্রমণ থেকে আমরা বাঁচলাম। তারপর আমাদের জনসংযোগের জন্য বিভিন্ন ছেলে পেলে, সুনীল, আমি, পবিত্র, বারিশ, মধু আমরা ১৫/২০টা ছেলে ওয়ার্কিং ফোর্স, মানে প্রচার অভিযানে নেমে পড়লাম। যে আমাদের মরিচঝাঁপির এই রকম অবস্থা, সবাই ডোর টু ডোর যাবে যেখানে পার, এই উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে যাও। আমাকে ডেকে বললেন রাম চ্যাটার্জি, যে 'তোরা তো এখানে মিছিল বিক্ষোভ করছিস, একটা মুভমেন্ট দিল্লি-মুখী নিতে

পারতিস খুব কাজ হত, কাকু বলে আমরা ডাকতাম। বললাম, 'দিল্লি-মুখী অভিযান নিয়ে যাওয়ার আর সময় নাই, এখন আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আন্দোলনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর সংগঠিত করে দিল্লিমুখী নিতে পারছি না।' তা রামবাবু বলল, 'আমি এখন কী কর্‌ব বল, মামার বাড়ি যশোরে ছিল, পুর্ববাংলার মানুষের প্রতি আমার আগাগোড়া আন্তরিক টান ছিল, তোদের বাঙাল মিনিস্টার তোদের কথা ভাবে না আমি একা কী করতে পারি! আর যোধপুরের সুব্রত চ্যাটার্জি ওরা কী করবে।' এইভাবে রামবাবু আমাদের অনেক সান্ত্বনা দিল, 'আমার কথা শুনলি না তোরা, জ্যোতিবাবুকে রাগিয়ে দিয়েছিস, কাশীকান্ত মৈত্রকে নিয়ে তোরা কেন মরিচঝাঁপিতে গেলি কোন উদ্দেশ্যে, তোরা একে নিয়ে রাজনীতি করছিস।' আমাদের খুব বকলেন, অভিমানের সুরে। তারপর আমরা প্ল্যান করেছিলাম জ্যোতির্ময় দত্তর স্ত্রীর মাধ্যমে, জ্যোতিবাবুর পি এ আছে জয়কৃষ্ণ ঘোষ, ওনার স্ত্রীর মাধ্যমে, ওরা সাউথ পয়েন্টে শিক্ষকতা করতেন। কিছুদিন আগে, কয়েকমাস আগে রাইহরণবাবু অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, ক্যালকাটা থেকে অ্যারেস্ট করে ভূপাল পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এরা— বেঙ্গল পুলিশ। তখন আমি, সুব্রতদা, জ্যোতির্ময় দত্ত ঠিক করলাম জয়কৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে দেখা করে জ্যোতিবাবুকে আমন্ত্রণ করতে যাব, সেই মোমেন্টে রাইহরণদা উপস্থিত উনি ঘরে উঠেই বললেন, 'না জ্যোতিবাবুকে আমন্ত্রণ করতে যাওয়া যাবে না। একটু দেরি করতে হবে আমি এসে পড়েছি, আমি একটু বুঝে নিই।' রাইহরণ বাড়ে যখন বললেন, 'না জ্যোতিবাবুকে আমন্ত্রণ করা যাবে না মরিচঝাঁপি নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই কথা শুনে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি আর এগুতে পারলাম না। যেহেতু আমার টপ লিডার সে, ওনার কথা না শুনা ঠিক না। তখন সুব্রতদা বলল, 'দেখ তোমাদের ব্যাপার। রাইহরণ যা ভালো বুঝেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, জ্যোতিবাবুকে মরিচঝাঁপি এনে উদ্বাস্তুদের অবস্থাটা দেখিয়ে একটু সহানুভূতি আদায় করার দরকার ছিল এবং জ্যোতিবাবুকে নিলে ভালো হত।' রাইহরণ যেহেতু সম্মত দিল না, আমার আর কিছু করার রইল না। আমি গোলদার বাবুকে রিপোর্ট করলাম, 'জ্যেঠামশাই,' গোলদারবাবুকে আমি জ্যেঠামশাই বলে ডাকতাম, 'এই এই ব্যাপার।' রাইহরণ বাবু এসে নিষেধ করে দিল। জ্যোতির্ময় দত্ত, সুব্রতদা, জয়কৃষ্ণ ঘোষের কাছে জ্যোতিবাবুকে আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছিলাম মরিচঝাঁপিতে আসার জন্য এবং আমাদের সাথে বসে উনি খেতে চেয়েছেন কিন্তু রাইহরণ এসে বাধা দিয়েছে। গোলদারবাবু মাথায় হাত দিলেন, 'এই সুযোগে যদি রামদাকেও আনা যেত, জ্যোতিবাবু এসে আমাদের সঙ্গে খেলে আমরা তো বোঝাতে পারতাম জ্যোতিবাবুকে, জনগণ বোঝাতে পারত জ্যোতিবাবুকে আর উনিতো দৃশ্যটাতো দেখত।' যা হোক এর মধ্যে আমাকে আমলারা রথীন সেনগুপ্ত তখন চিপ সেক্রেটারি, অমিয় সামন্ত

তখন ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট আমাকে বলেছে, 'দেবব্রত মরিচঝাঁপি ছেড়ে দে। এক কাজ কর, তোরা তোদের লিডারদের বুঝা, ক্যানিং যে চরটা আছে ওখানে ৮/১০ হাজার লোক ধরে মরিচঝাঁপিতে যা তোরা আছিস, ক্যানিং চরটায় তোরা বসে যেতে পারবি।'

প্র : জ্যোতিবাবু আপনাদের মরিচঝাঁপি থেকে তুলে দেবার পিছনে রাজনৈতিক কারণটা কী?

দে : রাজনৈতিক কারণটা, কাগজে দেখেছিলাম, এরা যদি মরিচঝাঁপিতে বসতে পারে বাংলাদেশে কী একটা পার্টির নাম বলল ওদের সঙ্গে এরা যোগাযোগ করে দুই বাংলা একত্র করার জন্য মহা একটা আন্দোলনের ডাক দিতে পারে। অর্থাৎ আমরা সম্মতি দিতে পারি না। এটা মেনে নেওয়া যায় না যে পয়েন্টে বসেছে সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকায়, বাংলাদেশের সঙ্গে এদের যোগাযোগটা করা সুন্দর হয়ে যাবে।

প্র : আপনার কী মনে হয় জ্যোতিবাবু কি কেন্দ্রীয় সরকার কী বুঝিয়েছে, না কি কেন্দ্রীয় সরকার জ্যোতিবাবুকে বুঝিয়েছিলেন?

দে : জ্যোতিবাবু বুঝিয়েছিল, তখন মোরারজীর অবস্থা টলমল। মোরারজীর থেকে চরণ সিং বেরিয়ে আসছে, রাজনারায়ণ ভেঙে দিচ্ছে দল, মোরারজী দেশাই ভেবেছিলেন জ্যোতিবাবু আমাকে হেলপ করবেন আমার সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। জ্যোতিবাবু এই সুযোগটা নিল মরিচঝাঁপিকে উচ্ছেদ করার জন্য, ভেঙে দেওয়ার জন্য আমিও কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজে লাগাবো। ঠিক হল একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমাদের বিদায় দিতে হবে।

প্র : তা হলে কি এটা জ্যোতিবাবুরই মস্তিষ্কপ্রসূত?

দে : হ্যাঁ এটা জ্যোতিবাবুরই মস্তিষ্ক। জ্যোতিবাবু আমাদের ডেকে বলেছিলেন, 'তোমরা পশ্চিমবাংলার বাড়তি লোক, তোমাদের পশ্চিমবাংলায় জায়গা দিতে পারি না এবং পশ্চিমবাংলায় যদি থাকতে হয় তোমরা যার যার মতো জমি কিনে settle up হয়ে যাও, তোমরা ভারতবর্ষের নাগরিক, তোমাদের তো আমরা এইভাবে উৎখাত করতে পারি না। তোমরা থাক, তবে ঐভাবে তোমরা সংগঠিত হয়ে একটা দ্বীপ দখল নেবে, আমার সঙ্গে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে, এটা আমি মেনে নিতে পারি না।'

রামবাবু মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন কিন্তু দ্বীপে নামেন নি, রঙ্গলাল গোলদারকে লঞ্চে ডেকে নিয়েছিলেন। 'গোলদার তুই লঞ্চে আয় তোর সাথে কথা বলব।' উনি গেলেন কিন্তু ঐ খাওয়া দাওয়া দিল। এই রান্নাবান্না হয়েছে লঞ্চে, মিনিস্টার, 'তুই আমার সঙ্গে বসে আয় খাই তারপর কথা হবে।' গোলদার বললেন, 'দাদা তোমার সঙ্গে আমি এখানে বসে খাব না। এর একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে, যে গোলদার লঞ্চে বসে মিনিস্টারের সঙ্গে ভালো খাওয়া দাওয়া করছে, আমি খাব

না।' তো রামবাবু গোলদারকে বলল, 'তুই রাইটার্স-এ আয়। আমি থাকব। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে একবার আলোচনায় বস। তোরা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে আলোচনায় বস, তোরা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছিস কেন, এটা উনি বহুবার শুনিয়েছেন।..' না তখন সুভাষ চক্রবর্তী যায় নি, সুভাষ সম্পর্কে আমরা ভালো জানতামও না।

প্র : এই ব্যর্থতার পর এই নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল ?

দে : ছিল। এই যে গোলদার বাবুকে যে গ্রাম গড়ে দেওয়া হয়েছে 'পথের শেষ' না পথের দাবী কলোনী, গৌরকিশোর ঘোষ, সুব্রতদা তো আগাগোড়া... জ্যোতির্ময় দত্ত, গৌরী আইয়ুব এদের কাছ থেকে কালেকশন করে নিয়ে... ঐ গ্রাম তৈরি হয়।

প্র : আপনি এখন করছেন কী ?

দে : এখন আমি সেন্টারিং লাইনে কাজ করি। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন। এই যে বড় বড় মাল্টিপ্লেক্স বিল্ডিং হচ্ছে ১৪ তলা, ২৪ তলা, এইসব বিল্ডিং-এ আমি একজন ফিটার।

প্র : পবিত্র কী করে ?

দে : পবিত্র ঢালাই করে ও ঢালাইয়ের সর্দার ঐ যেসব বিল্ডিংগুলি হচ্ছে ঢালাই হয়... ওর সঙ্গে মাসখানেক আগে যোগাযোগ ছিল। এখন আর যোগাযোগ নেই। তখন নাগের বাজারে রডকলে একটা বিল্ডিং হচ্ছে, প্রায় ৪০০/৫০০ লেবার নিয়ে ঢালাইতে গিয়েছিল।

প্র : কোন কোন সাংবাদিক সেখানে গিয়েছিলেন ?

দে : নিরঞ্জন হালদার সাংবাদিক হিসাবে যেত, ওর সঙ্গে যেতাম, তবে জ্যোতির্ময় দত্ত বা অজিত চক্রবর্তী এদের সঙ্গে যে এক ভাব ছিল, অতোটা নিরঞ্জন হালদারের সঙ্গে ছিল না। শেষের দিকে স্টেটসম্যান-এর শশী মুখার্জী সুব্রতদার কাছ থেকে address নিয়ে মরিচঝাঁপিতে গেলেন তখন মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ঢুকে গেছে ম্যাসাকার শুরু হয়ে গেছে। গর্ভবতী মহিলাকে লাথি মেরেছে পুলিশ সেই ছবি স্টেটসম্যান দিয়েছিল, স্টেটসম্যান অনেক ছবি তুলেছিল, সেগুলি স্টেটসম্যান কোনোদিন প্রকাশও করেনি।

প্র : আপনাদের মরিচঝাঁপি থেকে যখন উৎখাত করা হয় তখন পুলিশের কী ভূমিকা ছিল ?

দে : পুলিশের নির্মম ভূমিকা ছিল, খুব নির্মম ভূমিকা ছিল, গর্ভবতী মহিলাকে যে লাথি মারছে বললাম। আর সি পি এম-এর ক্যাডার বাহিনীর সে যে কী great masacare না দেখে সে বলা যায় না। পুলিশ রেইড করছে ঘরবাড়ি ভেঙে দিচ্ছে, ওদের উগ্র বাঘের মতো মানসিকতা। পুলিশের সঙ্গে কুমিরমারি থেকে সি পি এম



মানা ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে দণ্ডকারণ্যের পথে

এর ক্যাডার বাহিনীও ঢুকেছিল এটা সত্য, তখন আমাদের আর কিছু করার নেই, প্রতিরোধ ভেঙে গেছে, আমাদের আর করার কিছু ছিল না, যুবক ছেলেরা বেরিয়ে গেছে, আছে কিছু বাড়িঘর, মেয়েছেলে বাধ্য হয়ে আমাদের নৌকায় উঠতে হচ্ছে। আমি সেই রাত্রে পৌঁছে যাই যেদিন আমাদের ভেঙে দিচ্ছে আমি সেই রাত্রেই পৌঁছে যাই মরিচঝাঁপি। কাশীকান্ত মৈত্র যখন আসে সেদিন আমি বাজার থেকে কলাপাতা নিয়ে যাচ্ছি কেননা ওনারা আমাদের সঙ্গে ভাত খাবেন। এরা বলল, আমি আগে পৌঁছে গেলাম, এক ঘণ্টা আগে। সতীশবাবুকে আগে জানিয়ে দিয়েছিল লোক পাঠিয়ে যে কাশীকান্ত মৈত্র আসছেন, হরিপদ ভারতী আসছে, শক্তি সরকার আসছে, কালীদাস বৈদ্য ছিল, অনেকেই ছিল কলকাতা থেকে। শৈবাল দাশগুপ্ত ছিল কিনা আমার স্মরণ নাই। সুব্রতদা তো ছিল। তারপর ওখানে গিয়ে রান্না হল, শোলমাছ, বাগদা চিংড়ি দিয়ে কচু দিয়ে রান্না হল, দেশে যে আইটেমের খাওয়ার সেই আইটেমে সবাই যেমন হয় বাংলাদেশের গ্রামে পংক্তিভোজ হচ্ছে, কাশীকান্ত মৈত্র, হরিপদ ভারতী তো বলেই ফেললেন, 'আমি যেন সেই পুরানো দিনে যাশোরে বসে ভাত খাচ্ছি।

মরিচঝাঁপিকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাই কোর্ট থেকে অর্ডার দিয়েছিলো দেখতে যাবার জন্যে। সুব্রতদা, আমি, শাক্য সেন, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মনোরঞ্জন হালদার নাম করে একজন ভদ্রলোক উনি আমাদের মরিচঝাঁপিরই লোক, ওনাকে কুমিরমারি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমরা ভিজিট করতে গেলাম। কিভাবে মরিচঝাঁপিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল। মহিলাদের হাতের ভাঙা শাখা, সিঁদুরের কৌটো পোড়া ছাই এই সবগুলো নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শাক্য সেন, সুব্রতদা, আমি এগুলো নিয়ে একটা পোটলায়

বেঁধে শাক্য সেনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম, মহান আদালতকে আপনি শুধু দেখান। হরিবালা মণ্ডল নামে এক মহিলা অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল বলে আমিও শুনেছিলাম। কিন্তু আমি তার কাছে যাবার সুযোগ পাইনি, সংবাদপত্রে ছবিও বেরিয়েছে। ওরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এইবার আমি ফ্যামিলির সঙ্গে থাকব, নাকি চারিদিকে ঘুরব, নাকি কলকাতা কি মেসেজ পাঠাবো। এত বড় এলাকা ২০,০০০/৩০,০০০ লোক তখন মরিচঝাঁপিতে। কোথায় কে ছড়িয়ে পড়ছে আমি একা আর কমিউনিকেশন রাখতে পারছি না, গোলদার বাবুকে রাত্রে বললাম, 'আপনি বেরিয়ে যান।...' শেখর কলকাতা পর্যন্ত এসেছিলেন। হ্যাঁ তিনি কলকাতায় এসেছিলেন জ্যোতিবাবুকে মরিচঝাঁপিতে যেতে নিষেধ করতে। এর পিছনে জ্যোতিবাবুর একটা সন্দেহের কথা আমাদের কানে এসেছিল এবং সেই সম্পর্কে আমাদের দোষারোপ করেছিল, বাংলাদেশে কি একটা মুসলিম সংগঠন যারা বৃহত্তর বাংলা চায়। নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ এবং উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি এরা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বাংলায় এসেছে এবং এরা এমন একটা পয়েন্টে এসে বসেছে যেখান থেকে সতীশ মণ্ডল নেতৃত্ব দিতে পারে বাংলাদেশে সিদ্দিকুল— আমার সঠিক মনে নেই। এরা মিলে দুই বাংলাকে একত্রিত করবে।

প্র : সমীর সমাদ্দার বলে কাউকে চিনতেন?

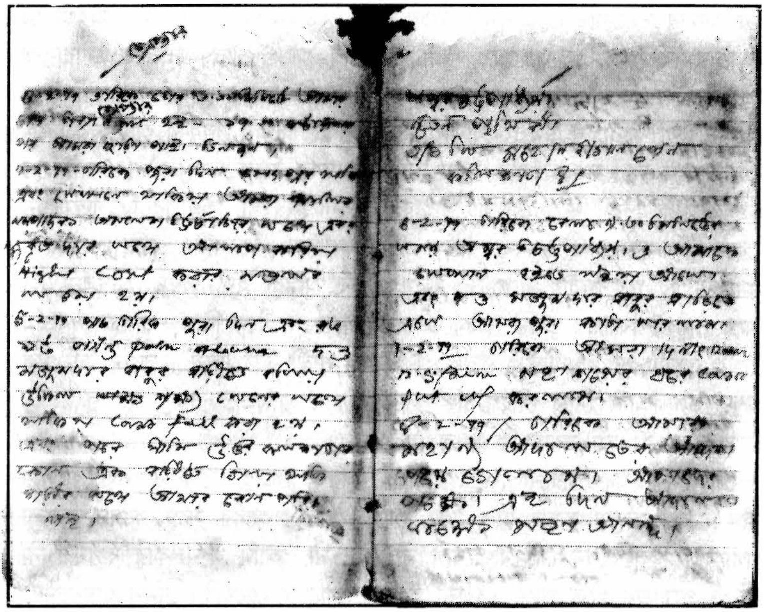
দে : সমীর ডাক্তার ছিলেন বাংলাদেশ থেকে নবাগত। এখানে ওখানে চিকিৎসা করে বেড়াত। মরিচঝাঁপিতে ও নবাগত। এসে দেখল মরিচঝাঁপিতে যখন এত মানুষ আছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই। আর এদিকে হরিপদদা বিভিন্ন ডাক্তার সংগ্রহ করে মরিচঝাঁপিতে যাবার জন্য অনুরোধ করতেন এবং পাঠাতেন সেই রকম তাকেও হরিপদদা বলেছিলেন, সমীর তুমি মরিচঝাঁপিতে যাও ওখানে ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। এইভাবে সমীর ডাক্তার মরিচঝাঁপিতে এসেছে। এবং সতীশ মণ্ডলকে ধর্মবাবা বলে ডাকত, রুগী দেখত পয়সা নিত না, কালেকশনের ওষুধগুলি দিতাম সমীরের হাত দিয়ে। ডাঃ কালিদাস বৈদ্য উনিও বৃহত্তম হোম ল্যান্ড গঠনের জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনিও একসময়ে মরিচঝাঁপিতে ছিলেন, তাঁর সম্পর্কে জ্যোতিবাবু অনেক অভিযোগ করেছিলেন বৃহত্তর হোমল্যান্ড গঠনের ষড়যন্ত্রের। এখন দেখুন আমরা অত বড় বিশ্লেষণে যাইনি তখন আমাদের মনোভাব ছিল যে যাদের কাছে আমরা সাহায্য পাব তাদের কাছে যাব এবং তারা যদি মরিচঝাঁপিতে যেতে চান আমরা তাদের নিয়ে গেছি। সুব্রতবাবু আমাকে নিয়ে মতুয়া সংঘের পি আর ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুব্রত বাবু তাঁকে বলেছিলেন, 'ঠাকুরমশাই মরিচঝাঁপির বেশির ভাগ খুলনা যশোরের, আপনি যদি এদের দেখেন তাহলে একটু কাজ হয়।' পি আর ঠাকুর বললেন, 'দেখুন সুব্রতবাবু, আমি ধার্মিক লোক, এদের নিয়ে আপনি লড়াই করুন। এদের জন্য আমার ভালোবাসা, এদের

জন্য আমার সহযোগিতা আপনার উপর রইল।' তখন আমাদের এমন অবস্থা যে আমাদের যে দুমুঠো ভাত দেবে আমরা তাদের কাছে গেছি। দিল্লিতে মোরারজি দেশাইয়ের সরকারের তখন পতনোন্মুখ অবস্থা, শক্তি সরকার কিন্তু আমাদের শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেছেন এম পি থাকা অবস্থায়। কিন্তু দিল্লির সরকার আমাদের দিকে আর তাকাল না। সামনে বলি দিয়ে আর আমাদের দিকে তাকাল না। কাশীকান্ত মৈত্র আর্থিক দিক দিয়ে কোনো সাহায্য করেন নি। যা কিছু বিবৃতি দিয়েছেন কাগজে। আমাদের ৫টা নয়া পয়সা দিয়ে সাহায্য করেননি। হরিপদ ভারতী আমাদের রিলিফ দেবার ব্যাপারে প্রথম যখন আমরা হাসনাবাদে আসলাম সে সময়ে তার উপকারের তুলনা নাই। তখন বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীকে নিয়ে, ভারত সেবাশ্রম সংঘের বিজয়ানন্দ মহারাজকে ডেকে, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী চিঠি দিয়ে... তখন চিঠিগুলি বেশির ভাগ আমি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতাম।

প্র : দণ্ডকারণ্যে সবাই কি ফিরে গেছেন?

দে : সবাই দণ্ডকারণ্যে ফিরে যায়নি, কয়েক হাজার লোক এখনও বাংলায় আছে। কে কোথায় আছে কিছু দিন আগে পর্যন্ত সকলের সঙ্গে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল এখন যে যোগাযোগ নাই তা না, আমি মনে করি কখনও না কখনও প্রয়োজন হতে পারে এইজন্য আমি যোগাযোগ রেখেছি। যেমন হাসনাবাদ, বসিরহাট, বারাসাতের কয়ড়া কদমগাছি এরা এখন এই আমার মতো অবস্থা, রাজমিস্ত্রি নয় সেনটারিং লাইনে।

সাক্ষাৎকার : ২৩ মে ২০০৬



দেবব্রত বিশ্বাসের ডাইরির পাতা থেকে

৫.২.৭৯

পাঁচ তারিখ পুরা দিন এবং রাত্র ১১.১৫ পর্যন্ত পাম এ্যাভিনিউ নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের বাড়িতে বসিয়া উকিল শাক্য সেনের সঙ্গে থাকিয়া case file করা হয়। এবং পরে আমি উত্তর কলকাতার কোন এক বাড়িতে গিয়া থাকি। বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নাই।

৬.২.৭৯

এই তারিখে বেলা ৯.৩০ মিনিটের সময় অম্বর চট্টোপাধ্যায় এসে আমাকে সেখান হইতে লইয়া আসে এবং দত্ত মজুমদারের বাড়িতে এসে আমরা পুরা কাজ করলাম।

৭.২.৭৯

এই তারিখে আমরা 14 নং রুমে R N Paine (আর এন পাইন) মহাশয়ের ঘরে case put up করলাম।

৮.২.৭৯

এই তারিখে আমরা মহামান্য আদালতের আদেশ পেয়ে গেলাম আমাদের পক্ষে।

এই দিন আদালত কক্ষে মহা আনন্দ। বিকালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভা। সভায় কলিকাতার সকল বুদ্ধিজীবী মানুষের সভাটা হয়। শৈবাল গুপ্ত, জ্যোতির্ময় দত্ত, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সভায় ভাষণ দেন। এবং দিনটি যেন আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক দিন।

৯.২.৭৯

এই তারিখে সংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত বাবুকে লইয়া আমি মরিচঝাঁপির দিকে রওনা হলাম। রাত্রি ৮.৩০টায় Nazat গিয়া পৌছালাম। সুন্দর এই ঐতিহাসিক মানুষটাকে যেন আমার হৃদয় দিয়া ভালোবাসতে ইচ্ছা হয়। এই মানুষটা হৃদয়ের একান্ত আপনজন। এই দিন খুব কষ্ট করিয়া বাগনায় পৌছিলাম।

১০.২.৭৯

ভোর ৩.৩০টা হতে শুরু করিয়া বেলা ১.৩০ মিনিট অবধি আমি মহামান্য আদালতের রায় হাতে করিয়া বাগনাতে দাঁড়িয়ে থাকি। এই দিনটা আমার জীবনের এক ঐতিহাসিক দিন— মানুষ মৃতপ্রায় সীমার আগমনে মরিচঝাঁপির মানুষগুলা যেন মৃত সঞ্জীবনী সুধা পেয়ে গেল। আমার পিছনে হাজার হাজার মানুষের ধ্বনি— আমরা সরব না। আমরা বাঁচব। বেলা তিনটায় নিজ হাতে করিয়া ছোট একটি তরী লইয়া নিজেই আমি পারাপার শুরু করি।... রাত্রে সতীশ বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়, আলোচনা হয়। সে সময় সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্ত, গোলদারবাবু, রাইহরণ বাড়ৈ উপস্থিত ছিল।

১১.২.৭৯

এই তারিখে বিরাট জয়ধ্বনি সকল নেতাজী নগরে। আমাকে বাজারে গোলদারবাবু বললেন, আজ তুমি আমাদের মিষ্টি খাওয়াবে। সেখানে জনগণের উদ্দেশে সকলকে ৫ কেজি মিষ্টি বিলি করলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জয় জয়ধ্বনি।

আমাদের দেখিয়ে উচ্চস্বরে অর্ডার দিচ্ছেন 'অ্যারেস্ট দেম'। উনি অ্যাসিসট্যান্ট ফিল্ড ডাইরেক্টার, টাইগার প্রজেক্ট, সমীর ব্যানার্জি।

হাইকোর্টের নির্দেশে মরিচঝাঁপি তদন্ত

শাক্য সেন

'আমি যে দেখেছি— প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উদ্ধৃতিই মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের উপর সঠিক মূল্যায়ণ। ৯ জুন ১৯৭৯ তারিখে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের রায় ও নির্দেশ হাতে নিয়ে ২৩ জুন ১৯৭৯ মরিচঝাঁপির উদ্দেশে রওনা হই। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু নেতা দেবব্রত বিশ্বাস সহ আরও কয়েকজন।

গত মাসে অর্থাৎ ১৬মে ১৯৭১ তারিখের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উৎখাত ও বিতাড়ন প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে অভিযোগকারীর তরফ থেকে সরকারি তাণ্ডবলীলার তদন্ত করতে সরকারি আইনজীবীদের উপর তদন্তাদেশ থাকলেও তারা যাননি।

হাসনবাদ থেকে লঞ্চ নিয়ে ইছামতি, সাহেবখালি, রায়মঙ্গল, পুঁইজালি ইত্যাদি পার হয়ে কুমিরমারি দ্বীপে যখন পৌঁছাই, তখন বিকালের পড়ন্ত রোদ। মরিচঝাঁপির অপর পারে কুমিরমারিতে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কুমিরমারির

বাসিন্দাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনায় জানা গেল ১৪ মে ১৯৬৯ তারিখে কী ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ঘটনা মরিচঝাঁপিতে ঘটেছিল। কীভাবে সেখানে পুলিশ এবং গুণ্ডাবাহিনী রাতারাতি আগুন লাগিয়ে এক বিভীষিকাময় তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল। তার লেলিহান শিখা কুমিরমারি থেকে অসহায়ভাবে তারা দেখতে পান। মরিচঝাঁপির বেশ কিছু উদ্বাস্তু বামফ্রন্ট সরকারের সন্ত্রাসের বলি হয়ে কুমিরমারিতে এসে আশ্রয় নেন। তাদের কাছ থেকেও ঐ সন্ত্রাস সম্পর্কিত শিউরে ওঠার মতো অনেক তথ্য জানা গেল।

২৪ জুন ১৯৬৯ : সকাল ৭টা নাগাদ আমাদের মরিচঝাঁপিতে নিয়ে যাবার জন্য নৌকোর ব্যবস্থা হয়। ঐ সময় একটি ছোট অথচ তাৎপর্য ঘটনার কথা না বলে পারছি না। আমাদের নৌকো যখন নদীর তীর বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ ৫/৬ বছরের একটি বাচ্চা ছেলে নদীর ধার দিয়ে নৌকোর গতি লক্ষ্য করে দৌড়ে আসছে, মনে হল আমাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নৌকা দাঁড় করে ছেলেটিকে প্রশ্ন করতে সে কাঁদতে কাঁদতে বলল যে, সে আমাদের সঙ্গে মরিচঝাঁপিতে তার ঘরে ফিরে যেতে চায়। তাই তাকে যেন নেওয়া হয়। তার অশ্রুকাতর আবেদন আমরা ফেলতে পারিনি, তাই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। যদিও আমরা জানতাম তার ঘর আমরা খুঁজে দিতে পারব না, সে তো জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। আজও মনে আছে ছেলেটির নাম বলেছিল 'জীবন'।

সকাল ৯টা নাগাদ আমাদের নৌকা মরিচঝাঁপিতে এসে পৌছায়। মরিচঝাঁপিতে কোনো বড় ধরনের গাছ আমরা দেখিনি। যে সব ঝোপ দেখলাম তার পরিচয় পেলাম, কোনটা ঝাঁপি গরান, গেয়ো আর যদু পালং। এই যদু পালং হচ্ছে এক প্রকার লম্বা ঘাস। বামফ্রন্ট সরকার যখন মরিচঝাঁপিতে ব্লকেড করে সমস্ত রকম খাদ্য অবরোধ করে দেয় তখন যদু পালং নামে ঘাস খেয়ে মরিচঝাঁপির মানুষ বাঁচতে চেষ্টা করেছিল।

লক্ষ্য করলাম মরিচঝাঁপি একটি ত্রিকোণ দ্বীপ। একদিকে করানখালি নদী। আর একদিকে গরাল নদী এবং তৃতীয় দিকের নদীটার নাম মনে পড়ছে না। এই করানখালির আর একটি নাম মরিচঝাঁপি নদী। নৌকা থেকে যতখানি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তাতেই মরিচঝাঁপিতে ধ্বংসলীলা অনুধাবন করা যাচ্ছিল। কাছাকাছি আমাদের দেখানো হল মরিচঝাঁপির শ্মশানঘাট, বনদেবীর মূর্তিটি দেখলাম অক্ষত অবস্থায় আছে। আরও কিছু এগিয়ে নদীর চরের কাছে নৌকা ভিড়লে আমরা মরিচঝাঁপির মাটিতে পা রাখি। আমাদের চোখের সামনে প্রথম দৃশ্যই ভয়াবহ, অমানুষিক এবং মর্মান্তিক। হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি, জীবনের সবটুকু সম্বল চারিদিকে ধূলিসাৎ হয়ে, ছিন্নভিন্ন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে

মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মনে হচ্ছে যেন অনেকগুলো বুলডোজার একসঙ্গে মানুষের বসতির উপর দিয়ে দানবের মতো চলে গেছে। ঘরের নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্রের মধ্যে আসবাবপত্র, হাঁড়ি, বাসন, কাপড়জামা, বইপত্র অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দানবীয় তাণ্ডবের সাক্ষী হয়ে হাহাকার করছে। এমনকি একখানি ভাঙা শাঁখা আমরা সংগ্রহ করেছিলাম হয়তো কোনো অভাগিনীর। নৌকো থেকে আমরা মরিচঝাঁপির শ্মশান দেখেছিলাম, মরিচঝাঁপিতে পা দিয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ দ্বীপটিই শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সব কিছু ঘটল মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তৎকালীন জ্যোতিবাবুর বামফ্রন্ট সরকারের উপর। মরিচঝাঁপিতে দেখলাম মহামান্য আদালতের নির্দেশ ভূলুণ্ঠিত হতে, সমস্ত মানবিকতা, মানুষের বাঁচবার প্রয়াস এবং অধিকার বিসর্জন হতে।

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা ওখানে থাকাকালীন চিংড়ি মাছের চাষ করেছিলেন। আমরা মরিচঝাঁপিতে ঘুরে দেখলাম সেইসব চিংড়ি চাষের ভেড়িগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত চিংড়ি মাছ লুট হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখ গেল বনদপ্তরের একটি নৌকো নদীর ধারে নোঙর করা রয়েছে এবং তাতে চিংড়ি ধরার জাল পাতা রয়েছে। আমরা কাছে যেতেই নৌকা থেকে একজন বেরিয়ে এলেন এবং আমাদের দেখে বেজায় অসন্তুষ্ট হলেন। আমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু জানালেন ওনার নাম 'শ্রী শীল', নামটা উহ্য রেখে।

ইতোমধ্যে আমরা চারিদিকটা দেখতে দেখতে আরও এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর যেতে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে বেশ কিছু খাকি উর্দীপরা লোক বেরিয়ে এসে পথ অবরোধ করে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করে। এবং ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। আমাদের বলা হল আমরা যেন মরিচঝাঁপি প্রদক্ষিণ, প্রদর্শন বন্ধ করে ফিরে যাই। আমরা যেন কোনো নোট না লিখি এবং ছবি না তুলি। এদের মধ্যে একজন অফিসার, নাম কার্তিকচন্দ্র সরকার। আমাকে সোজাসুজি জানালেন ছবি তোলা যাবে না। ছবি তুলতে গেলে ওরা তা রোধ করবেন। আমাদের সঙ্গে ওরা পিছু নিলেন। ঝামেলা এড়াবার জন্য আমি কোনো ছবি তুলতে পারিনি। ঐ কার্তিক চন্দ্র সরকার আমাদের জানালেন, মরিচঝাঁপি ঘুরে দেখতে গেলে ওনাদের বড় অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি নিতে হবে এবং সেই অফিসার মরিচঝাঁপি দ্বীপের অন্যপ্রান্তে সরকারি লঞ্চে বসে আছেন। এর মধ্যেই আরও কিছু খাকি উর্দীপরা অফিসার আমাদের কাছে চলে আসেন। তারা ভয় প্রদর্শন করার সাথে উচ্চস্বরে বলে যে আমাদের মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করতে দেওয়া হবে না। যতক্ষণ তাদের বড় অফিসারের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি না নিয়ে আসি। মহামান্য হাইকোর্টের রায়কে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে এবং সেই রায়ের বলে আমরা নিজেদের মতো দ্বীপটি



মরিচঝাঁপিতে ব্যারিস্টার প্রয়াত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার

পরিদর্শন করতে থাকি। কিন্তু বার বার এই অবরোধের ফলে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

যাই হোক মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করে আমরা যা দেখতে পাই তার কিছু বিবরণ তুলে দিচ্ছি :

১। নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ চত্বর, যেখানে ফুটবল খেলার মাঠ রয়েছে এবং ১৭০০ জন ছাত্রছাত্রী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করত। ঘরগুলি সব ভাঙাচোরা অবস্থায়, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি স্তূপীকৃত ভাবে এককোণায় ফেলে রাখা হয়েছে। একটি 'শহীদ বেদী' দেখলাম, তখনও রয়েছে। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির পতাকা বা নেতাজীর ছবি সব উধাও।

২। নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠের বাইরে খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি বিশ্রামাগারের ধ্বংসাবশেষ আমাদের দেখানো হল। বাইরের অতিথি এলে এখানে তাদের ঠাঁই মিলত।

৩। মরিচঝাঁপির হাসপাতাল— এটি নির্মাণ করতে প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছিল। দেখলাম, হ্যাঁ চাক্ষুষ দেখলাম। অগ্নিদগ্ধ হাসপাতালের কাঠামোটা কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। হাসপাতালের খাট, বিছানা, আসবাবপত্র সব উধাও।

৪। যে জায়গায় বাজার বসত, আমাদের সেই জায়গাটিও দেখানো হল। কিছু কিছু খড়ের ছাউনি দেওয়া যদিও রয়েছে দেখলাম, কিন্তু বেশির ভাগ ভেঙে পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বাজারটি করতে বহু অর্থব্যয় করেছিলেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা।

৬। 'মরিচঝাঁপি বিড়ি'— এই বিড়ি আর পাঁউরুটির কারখানা ভেঙে চুরে একাকার করে দেওয়া হয়েছে।

৭। কামারশালার ভগ্ন হাতিয়ার কিছু এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে।

৮। স্যাকরার দোকান দেখলাম— ভেঙে গুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে— ভাঙা ঘরের এবং যন্ত্রপাতির অংশ ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে।

৯। টিউবওয়েল দেখলাম অনেক, সবই ভাঙা অবস্থায়।

১০। আর দেখলাম নির্মমভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মাছের ভেড়ি। যেখানে চিংড়ি, পার্শে, ট্যাংরা ইত্যাদি বিভিন্ন মাছের চাষ করত মরিচঝাঁপির বাসিন্দারা এবং যে চাষ থেকে অন্ততপক্ষে বাৎসরিক পাঁচ থেকে ছ-কোটি টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা ছিল। সেই সমস্ত ভেড়ির মাছ লুটের মাল হিসেবে উধাও হয়ে গেছে।

১১। আরও খানিক এগিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলাম। ১৬মে পর্যন্ত মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের ঘর পুড়িয়ে, মেরে ধরে তাড়িয়ে যে সমস্ত মালপত্র লুট হয়েছিল, যেমন, আসবাবপত্র, হাঁড়ি, বাসন, টেবিল, চেয়ার, ছাউনি, বিছানাপত্র, কাপড়চোপড় ইত্যাদি সেগুলো সব একত্রে এক একটা লটে রাখা হয়েছে নিলাম করে বেচে দেবার জন্যে। প্রতিটি লটের গায়ে নম্বর লেখা রয়েছে। ঝিল নং ২৪, ঝিল নং ৮৫, ঝিল নং ১০০ ইত্যাদি আমরা এভাবে ঝিল নং ১২২ পর্যন্ত বান্ডিল দেখতে পেয়েছিলাম।

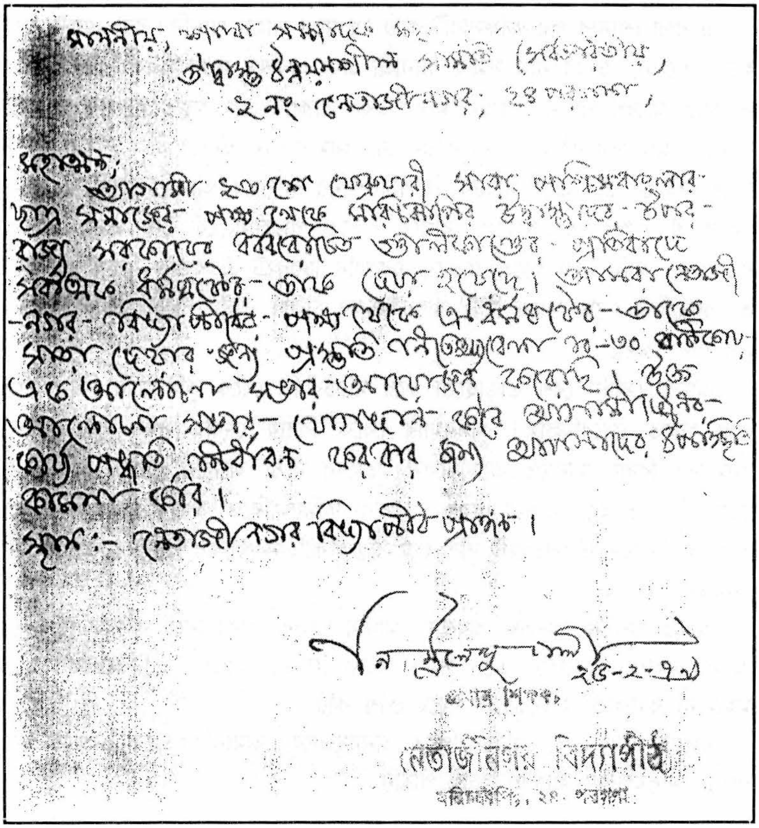
আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছি তখন হঠাৎই ১৫/১৬ জনের একটা দল আমাদের এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। তারা বনদপ্তরের কর্মী পরিচয় দিয়ে আমাদের হাত উঠিয়ে হুমকি দিতে লাগল। আমাদের শাসিয়ে বলা হল— আমাদের আর মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করতে দেওয়া হবে না। কোনো ছবি তুলতে দেওয়া হবে না এবং আমরা যেন কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ মরিচঝাঁপি ত্যাগ করি। আমাদের প্রশ্ন করা হয় 'কোন অধিকারে আমরা মরিচঝাঁপি প্রবেশ করেছি এবং আমরা কে তার প্রমাণপত্র কি আছে?' আমরা নিজেদের পরিচয় জানিয়ে মহামান্য হাইকোর্টের অর্ডারের প্রতিলিপি দেখাই। কিন্তু আমাদের পরিদর্শনে বাধা দেওয়া হয় এবং বলা হয় সরকারি লঞ্চে গিয়ে সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে দেখা করে অনুমতি নিয়ে তবেই পরিদর্শন করা যাবে। আমরা সে কথা না শুনে এগিয়ে যেতে থাকি এবং লোকগুলি ক্রমাগত আমাদের শাসাতে থাকে, বাধা দিতে থাকে।

আমাদের কুমিরমারিতে দুপুর একটার মধ্যে ফেরত যাবার কথা। কারণ ঐখান থেকে ঐদিন সময়মতো লঞ্চ ধরে কলকাতায় ফেরত যেতে হবে।

বনদপ্তরের কর্মীদের ঘন ঘন জ্বালাতনের জন্য আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়

এবং পরিদর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। অতএব তখন আমরা মরিচঝাঁপি পরিদর্শনের ইতি ঘটিয়ে ফেরত যাওয়া মনস্থির করি।

আমরা সবে মরিচঝাঁপি দ্বীপের কিনারায় এসে আমাদের নৌকোর দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ দেখতে পাই একখানা সরকারি লঞ্চ থেকে এক অফিসার আমাদের দেখিয়ে উচ্চস্বরে অর্ডার দিচ্ছেন, 'এ্যারেস্ট দেম' (ওদের গ্রেপ্তার কর)। তিনি লঞ্চ থেকে নেমে এগিয়ে এসে আমাদের নৌকোয় উঠতে বাধা দেন আর বলেন, আমাদের এ্যারেস্ট করা হবে। সেই সময় সেই অফিসার এবং ওনার সঙ্গে কয়েকজন উর্দীপরা সরকারি লোকজন মারমুখী হয়ে আমাদের দিকে ধেয়ে আসেন। আমরা সেই অফিসারাকে তার পরিচয় জানতে চাইলে উনি বলেন, 'আমি এ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড ডাইরেক্টার, টাইগার প্রজেক্ট (Assistant Field Director, Tiger Project)'। উনি জানালেন ওনার নাকি যথেষ্ট ক্ষমতা আছে আমাদের এ্যারেস্ট করার। আমাদের প্রশ্ন


মাননীয়, [illegible]
উদ্বাস্তু [illegible] সমিতি (সর্বভারতীয়),
১ নং নেতাজীনগর, ২৪ পরগনা,

মহাশয়,
আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী [illegible] মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর রাজ্য সরকারের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। [illegible] নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ [illegible] ধর্মঘটের [illegible] জন্য প্রস্তুতি [illegible] এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। উক্ত আলোচনা সভায় যোগদান করে [illegible] জন্য আমাদের [illegible] কামনা করি।
স্থান:- নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণ।

[illegible] ২৫-২-৭৯
প্রধান শিক্ষক
নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠ
মরিচঝাঁপি, ২৪ পরগনা

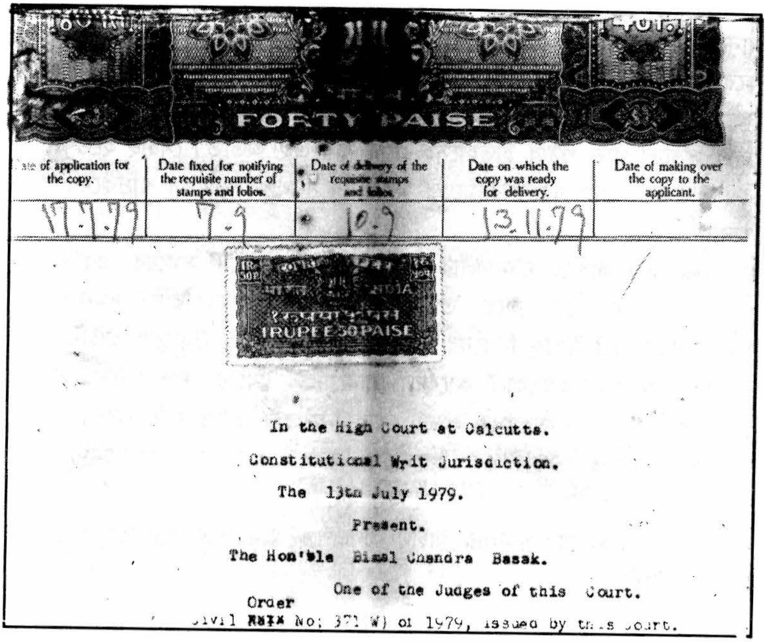
করা হয় আমরা কোন অধিকারে মরিচঝাঁপি দ্বীপে প্রবেশ করেছি। যখন আমরা মহামান্য হাইকোর্টের অর্ডার দেখিয়ে আমাদের অধিকার বুঝিয়ে দিই, তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তখন আমাদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে ঐ অফিসারটি যে অভদ্র আচরণ করেছিলেন, তা কোনো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর কাছ থেকে আশা করিনি। এরপর ঐ অফিসারের সঙ্গে আমরা সোজাসুজি মোকাবিলা করি। এরপর ওনার পরিচয়পত্র দেখতে চাই এবং কিসের ভিত্তিতে উনি আমাদের বাধা সৃষ্টি করে গ্রেপ্তার করতে চান তা জানতে চাই। আমরা ওনাকে এও জানিয়ে দিই যে আমরা দরখাস্তকারীদের আইনজীবী এবং মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক আমরা পরিদর্শন করতে এসেছি এবং উনি বা ওনার সঙ্গীরা কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করলে মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অবমাননার দায়ে ওনাদের চরম শাস্তিও হতে পারে। এরপরও যদি উনি আমাদের এ্যারেস্ট করতে চান করতে পারেন।

এ কথা শোনার পর অফিসারটি আর এগোতে সাহস পাননি। বরং একটু নরম হয়ে বললেন, ওনার নাম সমীর ব্যানার্জী এবং একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে সরকারি আদেশ পালন করছেন মাত্র। এবং তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার হয়, শ্রী ব্যানার্জী আমাদের কাছে প্রার্থনা করেন যে, আমরা যেন ওনাকে এক টুকরো কাগজ লিখে দিই যে উনি এসে মরিচঝাঁপি পরিদর্শনের ব্যাপারে 'আপত্তি' জানিয়েছিলেন। কারণ ঐ কাগজ ওপরমহলে দেখিয়ে বলতে পারবেন যে উনি ওনার কর্তব্য করেছেন। আমি নিজ হাতে ঐভাবে একখানি চিরকুটে ঐ বক্তব্য লিখে সই করে শ্রী ব্যানার্জির হাতে লিখে দিই, যাতে ওনার চাকরি বজায় থাকে। তারিখটা ছিল ২৪ জুন ১৯৭৯।

আমরা সেদিন বেশ তাড়াহুড়ো করে মরিচঝাঁপি থেকে কুমিরমারি ফিরে এসে লঞ্চ ধরতে পেরেছিলাম। কুমিরমারি থেকে বিদায় নেবার সময় বহু বাসিন্দা আমাদের বিদায় জানাতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া বাস্তুচ্যুত, যারা কুমিরমারিতে আশ্রয় নিয়েছেন। আর অপেক্ষা করছেন তাঁদের সেই দুর্বিষহ মর্মান্তিক কাহিনি শুনিয়ে বিচারের আশায় দিন গুনছেন।

আমরা সেদিন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায়, মাথায় চিন্তার বোঝা নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা লিখিত আকারে এ্যাফিডেফিট করে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের কাছে পেশ করি।

বলতে দ্বিধা নেই, মরিচঝাঁপিতে অন্যায়ভাবে, অমানবিকভাবে উৎখাত হয়ে যাওয়া মানুষগুলো আজও বিচার পায়নি।



FORTY PAISE

...ate of application for the copy.	Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	Date of delivery of the requisite stamps and folios.	Date on which the copy was ready for delivery.	Date of making over the copy to the applicant.
17.7.79	7.9	10.9	13.11.79	

1 RUPEE 50 PAISE

In the High Court at Calcutta.

Constitutional Writ Jurisdiction.

The 13th July 1979.

Present.

The Hon'ble Bimal Chandra Basak.

One of the Judges of this Court.

Order

...ivil R... No; 371 W) of 1979, issued by this Court.

ইতিহাসে 'মরিচঝাঁপি মামলা ১৯৭৯'

সৌমেন গুহ

মরিচঝাঁপি এখন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে এক রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন-অমানবিকতা আর উদ্বাস্তু-নিধনের প্রতীকী নাম।

১৯৭৮-৭৯ সালের সমসাময়িক নগণ্য সংবাদ বা প্রায় নৈঃশব্দ্যের পাঁচিল ভেঙ্গে, আজ তিরিশ বছরেরও অধিক সময় পেরিয়ে, মরিচঝাঁপি আবার স্মৃতিচারণ আর রাজনীতিক চাপান-উতোরের সামগ্রী। সেদিনের আক্রান্ত অথচ জীবিত উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের নানা অঞ্চলে। জীবিকার সন্ধানে, বাঁচার চেষ্টায়। সেদিনের শিশুরা আজ পরিণত যুবক, সেদিনের যুবকরা আজ বৃদ্ধ, সেদিনের বৃদ্ধরা আজ প্রয়াত।

মরিচঝাঁপির প্রায় তিরিশ হাজার আক্রান্ত উদ্বাস্তুরা কিন্তু মানুষ ছিল, ভারতের নাগরিক ছিল, বাঙালি ছিল। তারা বিদেশি ছিল না, চোর-গুণ্ডা-অপরাধী ছিল না, তারা সশস্ত্র-সৃষ্টিকারী ছিল না। তারা তা হলে, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের শিকার হল কেন?

এই তিরিশ হাজার স্ব-দেশ, স্ব-ভূমি হারানো উদ্বাস্তু, নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে,

মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিল। তাই তারা, বাসের অযোগ্য অঞ্চলকে বাসযোগ্য করে তুলেছিল, রিক্ত হাতেই গড়ে তুলেছিল বিদ্যালয়, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা, সৎ শ্রমনির্ভর জীবনে বেঁচে থাকার বনিয়াদ আর পরিকাঠামো। পৃথিবীর যে কোনো দেশে সভ্যতা গড়ে ওঠার ইতিহাসেই দেখা যায় এই অতীত। সেটাই হতে পারে, বিশ্ব ইতিহাসে শোষণের পিরামিডের মাথায় বসে থাকা মুষ্টিমেয় শাসকদের কাছে 'অন্যায়' !

আজ মরিচঝাঁপির ঘটনাবলীর বর্ণনার আড়ালে, সে সময়ের একটি প্রায় অনুচ্চারিত অধ্যায় রয়ে গেছে। তা হল, মরিচঝাঁপির সমস্ত রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন-অমানবিকতা আর উদ্বাস্তু-নিধনের বিরুদ্ধে সেদিন আক্রান্ত উদ্বাস্তুরা আইনি লড়াই করেছিল, কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিল, বিচার ব্যবস্থার কাছে সুবিচার চেয়েছিল। এ এক ঐতিহাসিক লড়াই, যার নিজস্বতা গুরুত্ব দাবি করে।

এখানে তারই তথ্যভিত্তিক আলোচনা করব। আর সে আলোচনার সমস্ত তথ্যের, ভাষাগত উপস্থাপনার উৎসই হল কলকাতা হাইকোর্টে মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত সাংবিধানিক অধিকারের মামলার আইনি কাগজপত্র। আর তার পরে কিছু সংযোজনী তথ্য ও বিশ্লেষণ।

মরিচঝাঁপিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম আইনি প্রতিবাদপত্র

হাইকোর্টে আবেদনপত্র পেশ করার ঠিক আগে, মরিচঝাঁপির আক্রান্ত উদ্বাস্তু ও সংগ্রামী দেবব্রত বিশ্বাস, 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' (সর্বভারতীয়), আর 'আমরা বাঙালি' সংগঠন এই তিনজনের পক্ষে আইনজীবী শাক্য সেন, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অত্যাচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, একটি আইনি চিঠি (চলতি কথায় যাকে 'উকিলের চিঠি' বলা হয়) তৈরি করে পাঠান। চিঠিটি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে পাঠানো হয় আটটি জায়গায় : ১. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির প্রতিনিধিত্বে ভারত সরকার ; ২. প্রধান সেক্রেটারির প্রতিনিধিত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; ৩. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ; ৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি ; ৫. রাধিকা ব্যানার্জি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ; ৬. ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, চব্বিশ পরগনা ; ৭. ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; ৮. সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, চব্বিশ পরগনা।

এই চিঠিটি, কলকাতা হাইকোর্টে পরবর্তী সাংবিধানিক আবেদনের 'পদক্ষেপের কারণ' (Cause of Action) হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই চিঠিটির জবাবে সরকারী পক্ষের কেউই কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। চিঠিটিতে সংক্ষেপে, মরিচঝাঁপিতে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিবরণ সরকারের অবগতির জন্য দেওয়া হয়েছিল।

এই চিঠিতে জানানো হয়েছিল যে :

১ ॥ গোসাবা থানার নেতাজীনগরে, যেটা মরিচঝাঁপি হিসেবে পরিচিত, প্রায় তিরিশ হাজার (৩০,০০০) ভারতীয় নাগরিক ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে বসবাস করছে শান্তিপূর্ণভাবে, নিজেদের শ্রম দিয়ে নানা রকম আত্মনির্ভরশীল কর্মকাণ্ডে জীবিকা নির্বাহ করে।

২ ॥ আগস্ট ১৯৭৮ থেকে, সরকার আর উপরোক্ত ঠিকানার অন্যান্যরা, কোনো আইনের পথ না মেনে, ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৫(১), ১৯(d,e, f, g), ২১ এবং ৩১ ধারা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, স্বাভাবিক বিচার (natural justice) সার্বিকভাবে অবহেলা করে, মরিচঝাঁপি এলাকার নাগরিকদের ওপর পরিকল্পিত অবৈধ আক্রমণ, মানুষের জীবনহানি ও সম্পদহানি করে চলেছে।

৩ ॥ নির্দোষ নাগরিকদের ওপর এই আক্রমণ আপনাদের পক্ষ থেকে প্রায় যুদ্ধকালীন (war footing) পরিবেশে চালানো হচ্ছে, বাসিন্দাদের দেশি নৌকো টুকরো টুকরো করার কাজে স্পিড বোট ব্যবহার করে, ভাঙা নৌকোর ডুবন্ত নারী, পুরুষ, শিশুদের বাঁচাতে ব্যস্ত স্থানীয় লোকদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল আর মারাত্মক বুলেট ব্যবহার করে, বাসিন্দাদের খাদ্য ও জল আনা আর ব্যবসাপাতি পুলিশ আর লঞ্চ দিয়ে ঘেরাও ও অবরোধ করে কার্যত আটকে রেখে, মানুষের ভয়ঙ্করতম দুঃস্বপ্নের থেকেও ভয়ঙ্করতম, ঠাণ্ডা মাথায় খুনের সাথে গণহত্যার পরিস্থিতি তৈরি করে, ভারতভাগের পর থেকে দুর্ভাগ্য আর বিপর্যয়ের শিকার প্রধানত হাজার হাজার বাঙালি বাসিন্দার অশ্রু আর রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে।

এই চিঠিতে মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের পক্ষে জরুরি দাবি করা হয়েছিল, পত্রপ্রাপক প্রত্যেকের কাছ থেকে সুবিচার, সমস্ত স্পিড বোট পুলিশ ইত্যাদি সরিয়ে নেয়া, সমস্ত ঘেরাও অবরোধ তুলে নেয়া; যুদ্ধকালীন পরিবেশ তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা, মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসাপাতি ও পুনর্বাসনের কাজকর্ম বাধাহীনভাবে চালিয়ে যেতে দেয়া।

এই দাবিগুলো মেটানোর কাজ করার জন্যে, এ চিঠিতে সরকার পক্ষকে ২৪ ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছিল। জানানো হয়েছিল যে, এই সময়, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবিগুলো না পূরণ করলে, সরকার পক্ষকে আর কিছু না জানিয়ে ক্ষুব্ধ পত্রদাতারা, মরিচঝাঁপির আক্রান্তরা, তাদের সাংবিধানিক ও অন্যান্য আইনি সমাধানের জন্যে যথাযথ পথে এগোবে।

সরকার পক্ষ এ চিঠির উত্তর দেয়নি। তাই, তাদের সাংবিধানিক ও আইনি অধিকার দাবি করার জন্যে, মরিচঝাঁপির আক্রান্ত মানুষরা বাধ্য হল ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন (application)

করতে। হাইকোর্টের আবেদনের পরিশিষ্টে এই চিঠিটির কপি সংযোজিত করা হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টে মরিচঝাঁপির আক্রান্তদের আবেদনপত্র

মরিচঝাঁপির আক্রান্তদের কলকাতা হাইকোর্টে সাংবিধানিক আবেদনপত্রের হলফনামা প্রস্তুত হয়েছিল ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে, আর আবেদনটি আদালতে পেশ করা হয়েছিল ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে, Civil Order No. 371(W) of 1979 ক্রমিক সংখ্যায় নথিভুক্ত হয়েছিল।

মূলত তিনজন আবেদনকারী, মরিচঝাঁপির আক্রান্ত উদ্বাস্তুদের পক্ষে দেবব্রত বিশ্বাস, মরিচঝাঁপি নেতাজী নগরের 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' (সর্ব ভারতীয়), আর 'আমরা বাঙালি' সংগঠনের পক্ষে তার সম্পাদক অম্বর চ্যাটার্জি।

আবেদনপত্রটিতে মোট আটজনকে বিরোধীপক্ষ করা হয় :

১. ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির প্রতিনিধিত্বে ভারত সরকার ; ২. প্রধান সেক্রেটারির প্রতিনিধিত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; ৩. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ; ৪. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি ; ৫. রাধিকা ব্যানার্জি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী ; ৬. ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, চব্বিশ পরগনা ; ৭. ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ; ৮. সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ, চব্বিশ পরগনা।

হাইকোর্টে পেশ করা ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারার ভিত্তিতে এই রিট (writ) আবেদনটিতে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে প্রধানত অভিযোগের বিষয়বস্তু হল :

১ ॥ মরিচঝাঁপির বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিকদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহতে বাধা সৃষ্টি করে, কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেআইনি ও যথেচ্ছ আক্রমণ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে নারী পুরুষ শিশুদের ওপর বেআইনি ও যথেচ্ছ গুলি চালিয়ে আইনের শাসন, জাতীয় প্রজাতন্ত্র আর ভারতের সংবিধানের নীতিকে নজিরহীনভাবে ধ্বংস করা ;

২ ॥ ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ধারার অধিকারকে সার্বিকভাবে ভঙ্গ করে, মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের ভারতীয় ভূখণ্ডে আইনের চোখে সমানাধিকার ও সমান সুরক্ষাকে অস্বীকার করা ;

৩ ॥ ভারতীয় সংবিধানের ১৫(১) ধারার অধিকারকে সার্বিকভাবে ভঙ্গ করে, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের বৈষম্যমূলক আচরণ করা ;

৪ ॥ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারার (d) ও (e) উপধারা সার্বিকভাবে ভঙ্গ করে,

ভারতীয় ভূখণ্ডে নাগরিকদের অবাধ বিচরণ ও যে কোনো স্থানে বাস করার অধিকারকে যথেচ্ছ ও বেআইনিভাবে ধ্বংস করা ;

৫ ॥ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারার (f) ও (g) উপধারা সার্বিকভাবে ভঙ্গ করে, মরিচঝাঁপির ভারতীয় নাগরিকদের পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকারকে যথেচ্ছ ও বেআইনিভাবে ধ্বংস করা ;

৬ ॥ মরিচঝাঁপির ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সব থেকে বেপরোয়াভাবে যথেচ্ছ খর্ব করা, যা ভারতীয় সংবিধানের ২১ ধারার বিরোধী ;

৭ ॥ মরিচঝাঁপির ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে খর্ব করা, যা ভারতীয় সংবিধানের ৩১ ধারার বিরোধী ;

৮ ॥ ভারতীয় সংবিধানের সমস্ত মূল নীতি ও তার নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার এবং সংবিধানে প্রদত্ত নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নাকচ করা ;

৯ ॥ কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাজকে বাতিল করে এবং শত সহস্র পুরুষ নারী শিশু ভারতীয় নাগরিকদের সমস্ত মানবিক অধিকারকে খর্ব করে, মরিচঝাঁপির বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিকদের সম্বন্ধে তাদের সমস্ত সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সার্বিকভাবে অমান্য করে, বেআইনি ও যথেচ্ছভাবে আক্রমণাত্মক শত্রুর মতো বাস্তবত মরিচঝাঁপিতে আগ্রাসী যুদ্ধে জড়িত।

সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার এই ঐতিহাসিক আবেদনপত্রটির বয়ান শুরু হয়েছিল, আবেদনকারীদের সামাজিক ও মরিচঝাঁপির ভৌগোলিক পরিচয় দিয়ে। তারপর, ছিল মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির বিবরণ।

দেখা যায়, মরিচঝাঁপি অঞ্চলের সরকারি তথ্যভিত্তিক বিবরণ দিতে, সেই ইংরেজ আমলের ১৯২৪-২৯ আর ১৯৩৬ সালে সংশোধিত ১৯১২-১৪ সালের সমীক্ষা মানচিত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। চব্বিশ পরগনা (বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) জেলার গোসাবা থানার, কুমিরমারি ডাকঘরের, মরিচঝাঁপির অঞ্চলের নেতাজী নগরে ছিল এই উদ্বাস্তু বসতি। যার পূর্বে ঝিল্লা নদী, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে কোরনখালি, সাতজেলিয়া আর হ্যামিল্টন আবাদ, পশ্চিমে রাঙ্গাবাউলিয়া গাঙ, দক্ষিণে সুন্দরবনের সবুজ জঙ্গল।

প্রায় ৩০,০০০ (তিরিশ হাজার) ভারতীয় নাগরিক ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে মরিচঝাঁপি অঞ্চলে বসতি গড়েছিল। সরকারি সাহায্য ছাড়াই, স্বনির্ভরভাবে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে, স্ব-উদ্যোগে তাদের জীবন ও মানবিক অধিকার রক্ষার জন্যে, নিজেদের খাদ্য বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা আর ভারতের বাঙালি নাগরিকদের সাংস্কৃতিক ও আমোদ-প্রমোদের উপকরণের জন্যে, তারা তাদের পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল।

নিজেদের পুনর্বাসনের জন্যে, অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশের কোনো ক্ষতি না করে, তারা এই অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে তুলেছিল, চাষের যন্ত্রপাতির জন্যে কামারশালা, মাটির বাসনকোসন তৈরির কুমোরের চাক, কাপড় বোনার তাঁত, স্থানীয় ঘাস থেকে মাদুর উৎপাদন, দেশি নৌকো তৈরির কারখানা, বিড়ি মিষ্টান্ন আর রুটি তৈরির ব্যবস্থা, বাঁশের ঝুড়ির হস্তশিল্প, ছুতোর আর কাঠের কাজ। গড়ে তুলেছিল চাষ, মাছচাষ, ভেড়ি, পশুপালন, আনাজ-সবজির ছোটো বাগান, স্থানীয় শিক্ষকদের দিয়ে মধ্যমানের বিদ্যালয়, নিজেদের হাসপাতাল, চারটি ডাক্তারখানা, দুটি স্থানীয় বাজার ইত্যাদি।

আবেদনকারীরা প্রয়োজনে এই সব কর্মকাণ্ডের ফটো হাইকোর্টে শুনানির সময় দেখানোর অনুমতিও চেয়েছিল। এ সব ফটো থেকে এটা স্পষ্ট করা যেত যে, এ অঞ্চলে সরকারের বনসৃজন, ক্যাসুরিনা, তাল ও নারকেলের বন, এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরঞ্চ সেগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

অথচ, রাজ্য সরকার আইনের তোয়াক্কা না করে, হৃদয়হীনভাবে মরিচঝাঁপির তিরিশ হাজার মানুষকে, শিশু, অসুস্থ রোগীদের, খাদ্য পানীয় ওষুধ, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঘেরাও ও অবরোধ করে আটকে দিয়ে, মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পুলিশি ঘেরাওরের মধ্যে মরিচঝাঁপির মানুষ এক সময়, মাছের ভেড়ির নদীমুখে জন্মানো জংলি যদু পালং শাক খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করত।

হাইকোর্টের আবেদনপত্রে এর পরবর্তী অংশে মরিচঝাঁপিতে অত্যাচারের কিছু বর্ণনা অছে। তার পর, ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারা ও দেশভাগের ফলশ্রুতিতে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আবেদনপত্রের প্রার্থনার মর্মবস্তু হল, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বাসিন্দাদের সাংবিধানিক ও বুনিয়াদি মানবিক অধিকার ধ্বংসকারী সরকারি অত্যাচার আর নির্মম অমানবিক আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং ওই সাংবিধানিক ও বুনিয়াদি মানবিক অধিকারগুলি আক্রান্ত মানুষদের জন্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

হাইকোর্টের আবেদনপত্রে মরিচঝাঁপিতে অত্যাচারের বর্ণনা

কলকাতা হাইকোর্টে মরিচঝাঁপির আক্রান্তরা তাদের আবেদনপত্রে (Civil Order No. 371(W) of 1979) মরিচঝাঁপিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে কয়েকটি অমানবিক অত্যাচারের 'নমুনা ঘটনা' (sample accounts) উল্লেখ করেছিল, তা হল :

১॥ ২০ আগস্ট ১৯৭৮, বিকেল তিনটে নাগাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মরিচঝাঁপির চারপাশে যাতায়াত আটকিয়ে বেড়ার মতো ঘেরাও ও অবরোধ করে ক্রমশই চাপ দেওয়ার কাজে প্রায় তিরিশটা লঞ্চ ব্যবহার করল। মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের নদী পেরিয়ে

অপর পার থেকে পানীয় জল আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার বাধা (blocks) তৈরি করা হল। ফলে, পানীয় জলের এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। যার ফলশ্রুতিতে, দারুণ রোদের তাপে তৃষ্ণার্ত শিশু, নারী আর সাধারণ মানুষের কান্নার রোল উঠল। সেখানে পর্যাপ্ত টিউবওয়েল, বা পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না।

বিরাট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও সমাজকর্মী তখন পানীয় জল আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনার অনুমতির জন্যে ঘেরাওকারী সরকারি লঞ্চদের একান্ত অনুরোধ করে। কিন্তু কোনো লাভ হয় না। রাত আটটা পর্যন্ত এই ঘেরাও চলতে থাকে।

২ ॥ ২০ আগস্টের এই ঘটনা চলাকালীন, রাত ৯টা ১০টার সময়, 'নিখিল বঙ্গ নাগরিক সঙ্ঘ' সংগঠনের সম্পাদক এস চ্যাটার্জি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইকে এই ফোনোগ্রামটি পাঠায়, যার কপি পার্লামেন্টের সদস্য সুব্রামনিয়াম স্বামী, শক্তি সরকার, চরণ সিং ও অন্যান্যদের পাঠানো হয় (হাইকোর্টের আবেদনপত্রের টাইপ করা বয়ান) :

> 'Prime Minister, your kind attention drawn to planned massacre of innocent refugees at Marichjhapi, Sunderban, in your name. Please take realistic stock of situation and kindly allow them independently to establish their stay irrespective of any political compulsion.
>
> About ten thousand built their huts economic fisheries starting paying divident regenerating economy locally. Now seems being brutally uprooted by L.F. Government in connivance with yours who probably ignorant of exact situation.
>
> REQUEST IMMEDIATELY STOP MARICHJHAPI OPERATION TOMORROW AND RESPECT WHOLE CULTURAL BENGALIS HEART.
>
> S. Chatterjee
> Secretary
> Nikhil Banga Nagrik Sangha.'

৩ ॥ ২১ আগস্ট ১৯৭৮, একেবারে সকাল থেকে সারাটা দিন ধরে, তিরিশটা সরকারি লঞ্চ আগের মতোই মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের বিপর্যস্ত করে ঘেরাও অবরোধ করে রাখল। যখন এই ঘেরাও অবরোধ তুলে নেয়ার সমস্ত অনুরোধ ব্যর্থ হল, তখন হাজার হাজার বাসিন্দা মিছিল করে তাদের প্রতিবাদ জানাতে থাকল। এর ফলশ্রুতিতে, মধ্য রাতের পৌনে এক ঘণ্টা আগে, ঘেরাও চালানোর ওপরওলা এক অফিসার, ঘেরাও শিথিল করার ব্যাপারে বাসিন্দাদের প্রতিনিধিদের সাথে অবাস্তব কয়েকটি পূর্বশর্ত আরোপ করে আপোষ মীমাংসার কথা বলল। এই প্রতিদিনের ঘেরাও অবরোধ ২৮ আগস্ট ১৯৭৮ পর্যন্ত চলল।

৪ ॥ ২১ আগস্ট ১৯৭৮ রাত ১২.৫০ মিনিটে, আবার 'নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ' সংগঠনের সম্পাদক এস চ্যাটার্জি একটি ফেনোগ্রাম পাঠাল ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। যার কপি পাঠানো হল, পার্লামেন্টের সদস্য সুব্রামনিয়াম স্বামী, শক্তি সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম ও কে বি মালকানিকে। ফোনোগ্রামটির বয়ান (হাইকোর্টের আবেদনপত্রে টাইপ করা বয়ান) :

> 'Prime Minister, humbly appeal - Stop further massacre operation on Marichjhanpi Sundarban refugees. Today all launch services suspended there sine die officially large contingent forces sent not for just requesting return to Dandak. Repeat appeal to P.M. and man Morarji must knew real situation before making Turkaman Gate plus Jallianwala Bagh blunder... Must... politics rule or Central Government and Civilised India. Kindly act.'

৫ ॥ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ থেকে রাজ্য সরকার আর হাইকোর্টের মূল আবেদনপত্রে ১, ৩, ৫, ৭ ও ৮ নম্বর বিরোধীপক্ষ, মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের দেশি নৌকো পরিকল্পিতভাবে যান্ত্রিক নৌকোর ধাক্কা দিয়ে খোলা নদীতে ধ্বংস করতে থাকে। অন্ততপক্ষে ২০০টি দেশি নৌকো সরকার ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করেছে। ওই দেশি নৌকো থেকে ৬৩ জন আরোহী এখনও নিখোঁজ। গুলি করা হয়েছে ৬ জনেরও বেশি লোককে, যার মধ্যে ২ জন মারা গেছে। যে ৪০০ জন লোক মরিচঝাঁপি থেকে দেশি নৌকোয় করে রওনা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ফিরেছে। এ ঘটনাগুলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের মতো উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সামনেই ঘটে।

৬ ॥ ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখেই, সরকারি 'এম ভি দেবযান' লঞ্চটি ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকগুলি দেশি নৌকোকে ধাক্কা মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলে, আর ডুবন্ত আরোহীদের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। লঞ্চের প্রপেলারের ব্লেডে কয়েকজন আহত ও নিহত হয়। যখন লোকেরা ডুবন্ত ও সাঁতার দেয়া মানুষদের উদ্ধার করার জন্যে নদীর তীরে এসে জমা হল, তখন তাদের ওপর সরকারি লঞ্চ থেকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়া হতে থাকল।

৭ ॥ ২৮ জানুয়ারি ১৯৭৯, তিনটি দেশি নৌকো করে যখন মরিচঝাঁপির মহিলারা অপর পারে কুমিরমারি থেকে পানীয় জল আনতে যাচ্ছিল, তিনটি নৌকোই সরকারি বাহিনীর আক্রমণে ডুবে যায়। এই দৃশ্য দেখে কুমিরমারির বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করলে, জনতার ওপর পাঁচ রাউন্ড আর নৌকোর ওপর চার রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। এই ঘটনায় আহত তিন মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

৮ ॥ ২৯ জানুয়ারি ১৯৭৯, সরকারি বাহিনী মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের মাছচাষের

ভেড়ির বাঁধগুলো ভেঙে দেয়। এর ফলে, ভেড়িতে লোনা জল ঢুকে মাছচাষ ধ্বংস হয়ে যায়। যখন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা প্রতিবাদ করে, সরকারি পুলিশবাহিনী তাদের ওপর বিপুল সংখ্যক কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে। যার ফলে মহাদেব মণ্ডল, সুনীল, অশ্বিনী সরকার, রেণুকা মণ্ডল, মালতি পাল গুরুতরভাবে আহত হন। এর পর, রাত একটার সময় বাসিন্দাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যে পুলিশ ছয় রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোঁড়ে।

৯ ॥ ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯, প্রায় বেলা দুটোর সময়, যখন কয়েকজন বাসিন্দা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাবারদাবার নিয়ে মরিচঝাঁপিতে ফিরছিল, তাদেরকে কোনো ওয়ারেন্ট বা নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই বন্দী করে কুমিরমারির পুলিশ ক্যাম্প-এ নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ করতে কিছু মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে, কুমিরমারির দিকে সাঁতরে যাওয়ার চেষ্টা করে। সরকারি বাহিনী এই মানুষদের ওপর এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। এই গুলিতে তিরিশজনের মৃত্যু হয়। বহু মানুষ, মহিলা শিশু আহত হয়। সরকারি বাহিনী মৃতদেহগুলি গোপনে সরিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়।

আবেদনপত্রে এই ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বলা হয়েছে।

মরিচঝাঁপিতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ ও সরকারি কার্যকলাপ

কলকাতা হাইকোর্টে এই আবেদনপত্রের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শাক্য সেন, আর তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী স্নেহাংশু আচার্য। প্রাথমিকভাবে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে বিচারপতি আর এন পাইন তাঁর সুস্পষ্ট স্থগিতাদেশে বলেন :

> 'The respondents are restrained from interfering with or creating any obstruction to the supplies of essential commodities such as drinking water, milk, medicine including disinfectants, foodstuff and clothes, etc. to the petitioners and other inhabitants of Marichjhanpi. The respondents are also restrained from interfering with the petitioners' and other inhabitants' right of ingress and egress from Marichjhanpi.'

মরিচঝাঁপির আক্রান্ত উদ্বাস্তুদের কাছে, এতো দ্রুত এই স্থগিতাদেশ এক বিরাট জয়।

কিন্তু হাইকোর্টের সুস্পষ্ট স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও, গোপনে ও প্রকাশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের উপর অত্যাচার ও আক্রমণ চালিয়েই চলল।

এ ব্যাপারে আবেদনকারীরা হাইকোর্টের কাছে পর পর দুটি সংযোজনী আবেদন (supplementary petitions) করে। তাতে, সরকারি পক্ষ তাদের বেআইনি কার্যকলাপ চালিয়ে যে হাইকোর্টের আদেশকে অবমাননা করছে, এটা উল্লেখ করে প্রার্থনা করা হয়েছিল, মরিচঝাঁপি অঞ্চলের সত্যিকারের পরিস্থিতি দেখার জন্যে আদালত ওখানে উভয় পক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতিতে কমিশন বসাক।

হাইকোর্টের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখের স্থগিতাদেশ সত্ত্বেও, ৭ মে ১৯৭৯ তারিখে ভাড়াটে গুণ্ডার দল ও ২৫০ মহিলা পুলিশ সাথে নিয়ে প্রায় ২৫০০ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি আক্রমণ করে, বাসিন্দাদের মারধোর করে, তাদেরকে টেনে হেঁচড়ে বাইরে বার করে ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর ফলে অনেক পুরুষ, নারী ও শিশুর মৃত্যু হয়।

মূল আবেদনকারীরা তাদের একটি সংযোজনী আবেদনে আদালতের কাছে, এই পুলিশী নিপীড়ন ও তাণ্ডবের শিকার ২৪০ জন ব্যক্তির নাম ও তাদের যৌথ স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা দেয়।

ইতিমধ্যে সরকারি পক্ষের মাত্র দু জন তাদের পাল্টা হলফনামা আদালতে পেশ করেছে। শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিয়কুমার সামন্ত। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, ত্রাণ, পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি ও অন্যান্য কোনো বিরোধী পক্ষ হলফনামা পেশ করেনি। আর মামলাটিও বিচারপতি আর এন পাইনের এজলাস থেকে বিচারপতি বি সি বসাকের এজলাসে চলে এসেছে। বিচারপতি বি সি বসাক (বিমল চন্দ্র বসাক), ১৯ জুন ১৯৭৯ আদেশ দেন যে, যেহেতু বিষয়টি পুরোনো হয়ে গেছে, তাই নতুন করে হলফনামা দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি আদালতকে জানাতে হবে। এর জন্যে আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শাক্য সেন বিরোধীপক্ষের আইনজীবীদের জানিয়ে মরিচঝাঁপিতে যেতে পারেন। তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ দেখে হলফনামায় আদালতকে জানাবেন। এ ব্যাপারে মরিচঝাঁপির পরিদর্শনে আবেদনকারীপক্ষের আইনজীবীদের সব রকম সাহায্য করার জন্যে বিরোধীপক্ষকে আদালত নির্দেশ দিল।

আইনজীবীদের মরিচঝাঁপি পরিদর্শন

আরও একটি সংযোজনী আবেদনে (জুলাই ১৯৭৯) মূল আবেদনকারীরা আদালতের কাছে মরিচঝাঁপির পরিস্থিতি ও আইনজীবীদের তা পরিদর্শন সম্বন্ধে জানায়।

২৩ জুন ১৯৭৯ সকাল আটটায়, মূল আবেদনকারীদের ব্যবস্থাপনায় তাদের কৌশুলী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শাক্য সেন কলকাতা থেকে গাড়িতে হাসনাবাদ পৌঁছোন, আর সেখান থেকে ইছামতি নদীর নিয়মিত লঞ্চে ওঠেন। সন্ধে সাড়ে ছটা নাগাদ, আবেদনকারীরা তাদের আইনজীবীদের নিয়ে কুমিরমারিতে পৌঁছোলে,

সেখানে কুমিরমারির বাসিন্দা ও মরিচঝাঁপির বিতাড়িত বাসিন্দা বহু মানুষ তাদের স্বাগত জানায়। একটি চা মিষ্টির দোকানে আইনজীবীদের বসিয়ে, এই মানুষের দল তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনি বলতে শুরু করে দেয়। আইনজীবী শাক্য সেন একটি টেপ রেকর্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে এই মানুষদের প্রত্যক্ষ ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বর্ণনা রেকর্ড করা হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, কি ভাবে গুণ্ডাবাহিনীকে নিয়ে পুলিশ রাতারাতি বাসিন্দাদের ঘরদোরে আগুন জ্বালিয়ে, ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের, প্রধানত নারী শিশু ও বৃদ্ধদের রড দিয়ে মারতে মারতে, নির্মম বল প্রয়োগ করে, আগে থেকে ব্যবস্থা করা কয়েকটি লঞ্চে করে তাদেরকে হাসনাবাদ ও অন্যান্য জায়গায় বা অজানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। সমস্ত বর্ণনাতেই ছিল ভয়ানক তাণ্ডব ও ধ্বংসের কাহিনির সাথে, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে বলপূর্বক মরিচঝাঁপির মানুষদের তাড়ানোর ঘটনাবলী।

হাইকোর্টের কাছে আবেদনকারীরা লিখেছিল যে, প্রয়োজনে তারা ওই বর্ণনার রেকর্ড করা ক্যাসেট ও বর্ণনাদানকারী ব্যক্তিদের আদালত গঠিত কমিশনের সামনে বা তার আগে পেশ করতে পারে।

কুমিরমারি আর মরিচঝাঁপির বাসিন্দারা আইনজীবীদের কাছে অনর্গল তাদের ওপর অত্যাচার নিপীড়নের কাহিনি বলে যাচ্ছিল। আর তার সাথে বলছিল তাদের বসতি গড়ার কথা। শাক-সবজি আবাদ, মাছের ভেড়ি রুটি নুন বিড়ি হস্তশিল্প ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিংস্র অমানবিক আগ্রাসী আক্রমণে তা সব ধ্বংস হয়েছে। এমনকি এতো দূর কুমিরমারি থেকেও সে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আইনজীবীদ্বয় সে রাত্রে কুমিরমারিতেই থাকেন।

২৪ জুন ১৯৭৯ সকাল সাড়ে ছটা-সাতটায়, আবেদনকারীদের সাথে আইনজীবীরা দেশি নৌকো করে মরিচঝাঁপির দিকে রওনা হল। রওনা হওয়ার মুহূর্তে ওদের সাথে যাওয়ার জন্যে কুমিরমারি থেকে ছুটে এল একটি বাচ্চা ছেলে, মরিচঝাঁপিতে তার বাড়ি ফিরবে বলে। সে কিন্তু জানে না, তার বাড়ি এখন ছাই হয়ে গেছে। তবু সে চলল ওদের সাথে। ওরা সকাল নটা নাগাদ মরিচঝাঁপিতে এসে পৌঁছোল।

মরিচঝাঁপি দ্বীপে নেমেই দেখা যায়, শুধু বাড়ি ঘরদোরের ধ্বংসাবশেষ। আইনজীবীরা যতো হাঁটছেন, ততোই দু পাশে শুধু পোড়া ভাঙাচোরা বাড়ি ঘরদোর, ভাঙা চালের নিচে ছেঁড়া কাপড় জামা বিছানা, ভাঙা টেবিল চেয়ার, রান্নার জিনিসপত্র, পড়ার বই কাগজপত্র, মানুষের সভ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় নানা জিনিসপত্রের ধ্বংসাবশেষ। পথিমধ্যে একটি ভাঙা শাঁখাও মিলল, কোনো হতভাগ্য মহিলার ওপর বলপ্রয়োগের সাক্ষ্য হিসেবে। সর্বত্র এক অমানবিক শয়তানের তাণ্ডবের স্বাক্ষর।

আবেদনকারী ও তাদের আইনজীবীদের চলার পথে হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে কিছু

খাকি পোষাক পরা লোকের উদয় হল। তারা আইনজীবীদের মরিচঝাঁপি পরিদর্শন করা, নোট নেওয়া, ফটো তোলায় বাধা দিল। এই বাধাটা না পেলে, আইনজীবী শাক্য সেন আরও কিছু ফটো তুলতে পারতেন। এদের দলের একজন কার্তিক চন্দ্র সরকার কিছুতেই হাইকোর্টের অনুমতির কথা মানল না। বরঞ্চ দ্বীপের অপর দিকে দাঁড়ানো একটা লঞ্চ থেকে তার অফিসারের অনুমতি নিতে বলল। এই সব কথাবার্তার সময় আরও কিছু খাকি পোষাকের অফিসার হাজির হয়ে, ওই একই কথা বলতে থাকল। এমন কি তারা আইজীবীদের অ্যারেস্ট করার হুমকি দিয়েছিল। তারা কিছুতেই মানল না যে, হাইকোর্টের নির্দেশ থাকলে, আইনজীবীদের আর কারও অনুমতি দরকার পড়ে না। স্পষ্টতই, এই খাকি পোষাকের বাহিনীকে হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করতে শেখানো হয়েছে।

এই বাধা দেওয়ার ফলে যদিও আইনজীবীদের মরিচঝাঁপি পরিদর্শন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, তবু তাঁরা ধ্বংসকাণ্ডের অন্যান্য দৃশ্যের সাথে প্রত্যক্ষ করেছেন :

১ ॥ মরিচঝাঁপি নেতাজীনগর আজাদ হিন্দ স্কুল আশেপাশের দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেখানে শিশু শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ১৭০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ত। এই স্কুল তুলে দেওয়ার জন্যে, এর সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে এক কোণে স্তূপীকৃত করা হয়েছিল। নেতাজির প্রতিকৃতি উধাও। স্কুলের ঠিক বাইরেই অতিথিদের জন্যে একটা খড়ের চালের বিশ্রামাবাস ছিল, যেটা চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে।

২ ॥ মরিচঝাঁপির আজাদ হিন্দ হাসপাতাল আগুনে পোড়ানো হয়েছে। তার শুধু কাঠামোটা এখন পড়ে আছে। হাসপাতালের আসবাবপত্র, বিছানাপত্র, ওষুধ, সমস্তই সরকার পক্ষের গুণ্ডারা লুঠ করে নিয়ে গেছে।

৩ ॥ বাসিন্দাদের ডাক্তারখানাটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সাইন বোর্ড মাটিতে গড়াচ্ছে, যার ফটো তোলা হয়েছে।

৪ ॥ বাজারের বহু দোকান চালাঘর ভাঙা ও পোড়ানো হয়েছে। এই বাজার ও তার মালপত্রের জন্যে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।

৫ ॥ এ অঞ্চল ও আশেপাশের ঈর্ষণীয় সুখ্যাত, আবেদনকারীদের গর্বের রুটি ও বিড়ি কারখানা, সরকার পক্ষের লোকেরা সমস্ত লুঠ করেছে। এখন খালি কারখানার ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে।

৬ ॥ ধ্বংসপ্রাপ্ত কামারশালে আধা-তৈরি জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে।

৭ ॥ অঞ্চলের একমাত্র সোনার কাজের দোকান এখন শুধু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

৮ ॥ সর্বোপরি, সারা দ্বীপ ঘেরা সুপরিকল্পিত মাছচাষের ভেড়িগুলো ধ্বংস করে, সরকার পক্ষের লোকেরা অনেক মাছ দখল করেছে। এই ভেড়ি থেকে চিংড়ি,

ট্যাংরা, পার্শে মাছ যা হতো, তা বিক্রি করলে কমপক্ষে পাঁচ-ছ কোটি টাকা আয় হত।

৯ ॥ বাসিন্দাদের নিজ খরচে তৈরি নলকূপগুলো পুলিশ ও গুণ্ডারা ভেঙেছে, নষ্ট করেছে।

কিন্তু ক্যাসুরিনা ও নারকেল গাছগুলো ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে ছিল, মোটেই নষ্ট হয়নি।

আবেদনকারীরা আদালতকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে তোলা ফটো দেখাতে পারে।

আবেদনকারীদের আইনজীবীরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের যে সব জিনিসপত্র সরকার পক্ষের লোকজন লুঠ করেছে, যেমন, আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার, বাঁশ, ভাঙা বাসনপত্র, বিছানাপত্র, অন্যান্য ঘরোয়া কাজের জিনিস, ব্যবসা বাণিজ্যের মালপত্র এক জায়গায় স্তূপীকৃত করা হয়েছে বেআইনি নিলাম করা হবে বলে, 'ঝিল নম্বর ৮৫' ইত্যাদি লটে ভাগ করে। দেখা গেল লট নম্বর ১২২ পর্যন্ত তখন রয়েছে।

আবেদনকারীরা এই বেআইনি নিলাম বন্ধ করার জন্যে আদালতের কাছে আলাদা একটি আবেদন করার প্রার্থনা করেছিল।

এই অসমাপ্ত পরিদর্শনের পর, বেলা একটায় কুমিরমারি থেকে ফেরার লঞ্চ ধরার জন্যে আইনজীবীরা নৌকোয় চাপল। কিন্তু মরিচঝাঁপি থেকে রওনা হওয়ার আগেই সরকারি লঞ্চ থেকে স্যুট-বুট পরা এক অফিসার চিৎকার করে উঠল, 'ওদেরকে অ্যারেস্ট করো'। ওই অফিসারের আরও লোকজন মিলে আইনজীবীদের নৌকো আটকাতে তেড়ে এল। জিজ্ঞেস করায়, ওই অফিসার টাইগার প্রজেক্টের 'অ্যাসিস্টেন্ট ফিল্ড অফিসার' বলে নিজের পরিচয় দিল, আর হুমকিও দিল, 'যে কাউকে সে এই দ্বীপে অ্যারেস্ট করতে পারে'। তার প্রশ্ন, 'কেন আইনজীবীরা সব ঘুরে দেখছে, কেন সব ফটো তুলছে।' আইনজীবীরা এই অফিসারটিকে চ্যালেঞ্জ করায়, তার পদাধিকারের কোনো প্রমাণ মিলল না, শুধু তার নাম সমীর ব্যানার্জি ছাড়া। তাকে আইনজীবীরা জানিয়েছিলেন, 'তার আচরণে আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করা যায়। ইচ্ছে করলে, অফিসারটি আইনজীবীদের অ্যারেস্ট করুক।' এর উত্তরে অফিসারটি জানায়, 'সে খালি ওপরওলার নির্দেশেই এই কাজ করেছে। তাই, তাকে একটা নোট যদি দেয়া হয়, মরিচঝাঁপিতে ঘোরা ও ফটো তোলা 'বাধাপ্রাপ্ত (objected)', তবে তার কর্তব্য রক্ষা করা হবে। সেই মতো তাকে নোট তৈরি করে দেয়া হল, আর তার তারিখ দেয়া রসিদও নেয়া হল।

আবেদনকারীরা এই অফিসার সমীর ব্যানার্জি ও তার নির্দেশক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে আলাদা আবেদন করার অনুমতি চেয়েছিল।

কুমিরমারি দ্বীপে পৌঁছে আইনজীবীরা দেখেছিল বহু বিপর্যস্ত পরিবারকে, যারা মরিচঝাঁপিতে ফিরে যাওয়ার জন্যে কাঁদছিল। মরিচঝাঁপির আশপাশের দ্বীপের ছাউনিতে আশ্রয় নেয়া এ রকম হাজার হাজার বিধ্বস্ত পরিবার, হাইকোর্টের বসানো কমিশনের সামনে তাদের বিপর্যয়ের বর্ণনা দিতে প্রস্তুত ছিল।

সংযোজনী আবেদনে (জুলাই ১৯৭৯) মূল আবেদনকারীরা আদালতের কাছে মরিচঝাঁপি পরিদর্শনের বিবরণ দিয়ে প্রার্থনা করেছিল, মরিচঝাঁপির পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার জন্যে, আদালত সেখানে একটি কমিশন বসাক।

হাইকোর্টে সরকার পক্ষের যুক্তি ও বক্তব্য

ইতিপূর্বে বলেছি, সরকারি পক্ষের মাত্র দু জন তাদের পাল্টা হলফনামা আদালতে পেশ করেছে, স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিয়কুমার সামন্ত। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী রাধিকা ব্যানার্জি ও অন্যান্যরা তাদের কোনো বিরোধী হলফনামা আদালতে পেশ করেনি।

সংযোজনী আবেদনে (জুলাই ১৯৭৯) মূল আবেদনকারীরা আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, ৮ নভেম্বর বিরোধীপক্ষ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিয়কুমার সামন্ত, তার বিরোধী হলফনামায় বহু মিথ্যা তথ্য দিয়েছে। আবেদনে তথ্যভিত্তিক বলা হয়েছিল, আদালত এর জন্যে অমিয়কুমার সামন্তর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার ফৌজদারি অভিযোগ আনতে পারে। আর তাকে আদালতে জেরা করার জন্যে ডাকার লিখিত প্রার্থনাও করা হয়েছিল।

অমিয়কুমার সামন্ত, তার বিরোধী হলফনামায় হাইকোর্টের ১৯ জুন ১৯৭৯ তারিখের নির্দেশ সম্বন্ধে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল : 'that the diserters from Dandakarayna who forcibly occupied the reserve forest have since left Marichjhanpi.'

যে কথাগুলো আদালতের নির্দেশে ছিল না। মরিচঝাঁপির বাসিন্দারা দণ্ডকারণ্যের পরিত্যাগী বা deserter নয়। তারা সংরক্ষিত বনাঞ্চল জোর করে দখল করেনি। তারা মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলেও যায়নি। মরিচঝাঁপির বাসিন্দারা তাদের যাবতীয় ব্যবসা ও শিল্পের উদ্যোগের জন্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছিল, বলপ্রয়োগ করেনি।

মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছিল না। এ অঞ্চলকে সংরক্ষিত বলা এই প্রথম।

তার বিরোধী হলফনামায়, অমিয়কুমার সামন্ত অবশ্য মরিচঝাঁপিতে পুলিশের অনুপ্রবেশ স্বীকার করলেও, অত্যাচার ও তাণ্ডবের কথা গোপন করে বরঞ্চ লিখেছে : 'In order to persude to persuade the deserters to leave

Marichjhanpi and render help to them so that they could leave Marichjhanpi peacefully.' একটি লোকেরও নাম না উল্লেখ করে, লিখেছে মরিচঝাঁপির বাসিন্দারা না কি পুলিশের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল : 'all possible assistance for smooth movement out of Marichjhanapi and onward journey to places of settlement in Dandakaranya.' এগুলো সর্বৈব মিথ্যাচার, এ কথা মূল আবেদনকারীরা আদালতকে তাদের সংযোজনী আবেদনে (জুলাই ১৯৭৯) জানিয়েছিল।

সরকারি পক্ষের স্বরাষ্ট্র সচিব ৫ মার্চ ১৯৭৯ তার হলফনামা আদালতে পেশ করে। স্বরাষ্ট্র সচিব এতে জানায় যে, এক লক্ষেরও বেশি উদ্বাস্তু দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে কলকাতার আশেপাশে আশ্রয় নেয়। রাজ্য সরকার নানা শিবির তৈরি করে তাদের দেখাশোনা করতো। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এদের এক লক্ষকে রাজ্য সরকার দণ্ডকারণ্যে ফেরাতে পারলেও, এদের মধ্যে আট দশ হাজার লোক মরিচঝাঁপিতে বসতি করে। তারা সরকারের কোনো কথাই শোনে না। এদের মধ্যে কয়েকজন নেতা সক্রিয়ভাবে দণ্ডকারণ্য ফিরতে নারাজ হয়, আর মরিচঝাঁপিতে অবৈধ ব্যবসা শুরু করে। তারা সংরক্ষিত অরণ্যের সরকারি গাছপালা ও বন্যপ্রাণী ধ্বংস করতে থাকে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই এলাকায় শোনা যায়, খুলনা থেকে মানুষ এসে মরিচঝাঁপিতে বসতি করছে। রাজ্য সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সাহায্য করে, কিন্তু সরকারি সংরক্ষিত অরণ্য বলপূর্বক দখল ও নষ্ট করা চুপ করে দেখতে পারে না। স্বরাষ্ট্র সচিবের বয়ানে :

> "... there is no place as such called 'Marichjhapi', in Sundarbans. The area which has been forcibly occupied by the deserters, is in Jhilla Block of the Reserved Forest in Sundarbans which has not come to be popularly known as Marichjhapi. I also state there is no area in said Jhilla Block known as 'Netaji Nagar'."

স্বরাষ্ট্র সচিবের তথ্য অনুযায়ী, মরিচঝাঁপিতে ৩০,০০০ বাসিন্দাও ছিল না, তারা কোনো পেশা, ব্যবসা বাণিজ্যর সাথে যুক্ত ছিল না। মূল আবেদনকারীদের সমস্ত অভিযোগ তো স্বরাষ্ট্র সচিব অস্বীকার করেছেই উপরন্তু আদালতকে জানিয়েছে, অবৈধ কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাসিন্দারা পুলিশ ও সরকারি কর্মীদের ওপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে। আর মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের অবৈধ কাজকর্মের জন্যে না কি, সন্দেশখালি ও গোসাবা থানায় বেশ কয়েকটি কেস ডায়েরি করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব ও অমিয়কুমার সামন্ত উভয়েই তাদের হলফনামায় আদালতের কাছে,

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বাসিন্দাদের ওপর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার তাণ্ডব ও ঘেরাও অবরোধের কথা সর্বাত্মকভাবে অস্বীকার করে। তবে অমিয়কুমার সামন্ত ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ মাত্র দু জন, একজন পুরুষও একটি মহিলার মৃত্যুর কথা লিখেছে।

হাইকোর্টে সরকার পক্ষের কয়েকটি মৌখিক জবাবি যুক্তির মধ্যে কয়েকটি ছিল :

১ ॥ প্রথম আবেদনকারী অর্থাৎ মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পক্ষে দেবব্রত বিশ্বাসের কোনো ব্যক্তিগত বা মৌলিক অধিকার নেই।

২ ॥ ক্যাসুরিনা গাছ নষ্ট করা হয়েছে।

৩ ॥ উদ্বাস্তুদের ক্ষিপ্ত আচরণ।

৪ ॥ রাজ্য সরকারের অফিসাররা উদ্বাস্তুদের সরানোর কথা বুঝিয়েছে। কোনো জোর জবরদস্তি করা হয়নি।

সরকার পক্ষের আইনজীবী নরনারায়ণ গুপ্ত, মরিচঝাঁপি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের যুক্তির ওপরই সব থেকে গুরুত্ব দেয়। বিশেষত ফরেস্ট আইনের (Indian Forest Act, 1927) ২৬ ধারা অনুযায়ী, সরকারি পদক্ষেপ ও কাজকর্মকে সঠিক বলা হয়। আর এটাই এ মামলায় সরকার পক্ষের যুক্তির মোক্ষম অস্ত্র বলে প্রমাণ হয়।

হাইকোর্টে 'মরিচঝাঁপি মামলা ১৯৭৯' পরাজয়ের শেষ রায়

১৩ জুলাই ১৯৭৯ অবশেষে, বিচারপতি বিমল চন্দ্র বসাকের সুদীর্ঘ শেষ রায়ে, মরিচঝাঁপির আক্রান্ত মানুষদের এই ঐতিহাসিক আইনি লড়াই পরাজিত হল।

মরিচঝাঁপির আক্রান্ত আবেদনকারীদের পক্ষে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন আইনজীবী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও শাক্যসেন এবং বিরোধী পক্ষের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আইনজীবী ডি এন দাস ও অর্চনা সেনগুপ্ত, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন আইনজীবী নরনারায়ণ গুপ্ত, এ পি সরকার ও পি আর মণ্ডল।

তাঁর রায়ের মূল অংশটি বিচারপতি বিমল চন্দ্র বসাক শুরু করেছেনঠ

> 'In my opinion, this application is totally misconceived. This land belongs to the Government. This the reserved forest within the meaning of Indian Forest Act 1927.'

এই শুরুতেই ছিল পরাজয়ের মর্মবস্তু। রায়ের এটি অংশ জুড়ে রয়েছে ফরেস্ট আইনের ২৬ ধারার দীর্ঘ বয়ান। যেটির ওপর দাঁড়িয়ে এই শেষ রায়ের প্রধান সিদ্ধান্ত। বিচারপতি জানিয়েছেন :

> 'So far as the land is concerned the admitted position is that the petitioners have no legal right to the said land in any capacity whatsoever.'

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বাসিন্দাদের ওপর যাবতীয় অত্যাচার নিপীড়ন, পুলিশ ও গুণ্ডাদের তাণ্ডব, হত্যা, লুঠতরাজ, ঘেরাও অবরোধের অভিযোগের ব্যাপারে, বিচারপতি বিমল চন্দ্র বসাকের মাত্র দুটি বাক্য :

> 'So far as the question of use of force is concerned this is denied and disputed. Accordingly, I am not going into such disputed facts herein.'

অবশেষে রায়ে :

> 'I dismiss this application and vocate all interim orders.'

যাই হোক, তাঁর রায়ের শেষ স্তবকে বিচারপতি বিমল চন্দ্র বসাক লিখেছেন,

> 'However, the position remains that these persons are really refugees. Their plight is unfortunate. They are the victims of incidents and decisions over which they had no control in the sense they have not become refugees out of their own choice. Accordingly I merely express my desire that in dealing with these persons, the Government will act with restraint sympathy and charity.'

'মরিচঝাঁপি মামলা ১৯৭৯' শেষ হওয়ার রায়ে, আক্রান্ত বাসিন্দাদের 'উদ্বাস্তু' বলে স্বীকৃতিই, আবার তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নতুন আইনি লড়াইয়ের প্রথম সোপান হয়ে উঠতে পারে।

ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যায় আইন

ভারতে উদ্বাস্তুদের অধিকারও তার সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ কোনো আইন নেই। উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক ঘোষণাগুলিও ভারত অবহেলা ও অগ্রাহ্য করে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের নিয়ে সমস্যা হলে, কয়েকটি পুরোনো আইন প্রয়োগ করা হয়, প্রধানত সেটা উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধেই। যেমন :

পাসপোর্ট এন্ট্রি আইন (The Passport Entry in India Act, 1920) । এই আইনে কোনো ব্যক্তি বাইরে থেকে ভারতে প্রবেশ করলে, তার পাসপোর্ট থাকতে হবে।

ফরেনার্স আইন (The Foreigners Act, 1946)। এই আইনে ভারতে বিদেশিদের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। আইনটি ব্রিটিশ শাসকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিদেশি আগমনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্যে তৈরি করেছিল, যা এখনও বিদেশি নির্ধারণ ও বিতাড়নের সবথেকে শক্তিশালী সরকারি হাতিয়ার।

পাসপোর্ট আইন (The Passport Act, 1967)। এই আইনটি প্রধানত পাসপোর্ট প্রস্তুত, প্রাপ্তি ও প্রয়োগের বিধি নিয়ম।

ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন আইন (The Registration of Foreigners Act, 1939)। এটি ব্রিটিশ ভারতে বিদেশিদের রেজিস্ট্রেশন করার আইন। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এখনও বহু অঞ্চলে, পাসপোর্ট ভিসা থাকা সত্ত্বেও, বিদেশিদের রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়।

ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্ট আইন (Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983)। এই আইনটি, কোনো ব্যক্তি ভারতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারী কি না, তা অনুসন্ধান করার জন্যে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা যেত। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় ট্রাইবুনাল নির্ধারিত বেআইনি অনুপ্রবেশকারীকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারত। এ আইনটির প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির রায়ে এই আইনটি ও তার যাবতীয় বিধি নিয়ম এবং তার যাবতীয় ট্রাইবুনাল, সংবিধানবিরোধী বলে বাতিল (ultra vires) হয়ে গেছে।

হিউম্যান রাইটস আইন (The Protection of Human Rights Act, 1993)। একমাত্র এই নতুন আইনটিতেই আন্তর্জাতিক ঘোষণা উল্লেখ করে উদ্বাস্তুদের অধিকারের স্বপক্ষে বলা যায়। কারণ, এ আইন বলে :

> " 'human rights' means the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India."

এই আইনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশন (National Humam Rights Commission, NHRC) আর রাজ্যগুলিতে রাজ্য মানবিক অধিকার কমিশন। এই জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশন সুপ্রিম কোর্টে উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মামলা দায়ের করে।

ভারতীয় আদালতের রায়ে উদ্বাস্তুদের অধিকার

ভারতে নান সময়ে উদ্বাস্তুদের অধিকারের প্রশ্নটি সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। বাস্তবত, ভারতীয় আদালতই উদ্বাস্তুদের অধিকার রক্ষা বা বিচার করার একমাত্র স্থান। মূলত ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, উদ্বাস্তু কেন, এমন কি যারা ভারতীয় নাগরিক নয় তারা পর্যন্ত সীমিত সাংবিধানিক অধিকার পেতে পারে কি না, এ বিতর্ককে সুপ্রিম কোর্ট একাধিক বার সামনে এনেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে আইনি বিতর্ক, ১৯৭১ সালে

'আনোয়ার' (Anwar) মামলা, ১৯৯১ সালে 'লুইস ডি রিড' (Louis De Raedt) মামলা, ১৯৯৬ সালে 'জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশন' (National Human Rights Commission) মামলা, ২০০০ সালে 'চন্দ্রিমা দাস' (Chandrima Das) মামলায় উল্লিখিত।

১৯৯৬ সালে 'জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশন বনাম অরুণাচল প্রদেশ সরকার ও অন্যান্য' (Writ Petition (C) No. 720 of 1995) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এম আহমদি ও বিচারপতি এস সি সেনের গুরুত্বপূর্ণ রায় চাকমা উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। এই মামলার পশ্চাৎপটে জানা যায়, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯৬৪ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যে বিরাট সংখ্যক চাকমা আসাম ও ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নেয়। ক্রমশ তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে থাকে। পরে প্রায় ৪০১২ জন চাকমা সরকারি সমর্থনে অরুণাচল প্রদেশে বসবাস করতে আরম্ভ করে। কিন্তু চাকমারা এখন অভিযোগ করতে থাকে যে, তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে অরুণাচল থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে। দিল্লির পি ইউ সি এল (People' Union for Civil Liberties) ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ তারিখে চাকমাদের সমস্যাটি জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশনের কাছে পেশ করে। কমিশন অরুণাচল সরকারের প্রধান সচিব ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি পাঠায়, যার উত্তরে বলা হয় সরকার চাকমাদের নিরাপত্তা যথাযথ রক্ষা করছে। কিন্তু ১৫ অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে সি সি আর সি (Committee for Citizenship Rights of the Chakmas) সংগঠন জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশনের কাছে চাকমাদের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগের সাথে দেয়া হয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত আপসু (All Arunachal Pradesh Students' Union) সংগঠনের 'চাকমা সমেত সমস্ত বিদেশি বিতাড়নে' দরকার হলে বলপ্রয়োগের হুমকির রিপোর্ট। এর ভিত্তিতে জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশন পরবর্তীকালে অরুণাচল ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে সাংবিধানিক অধিকারের মামলা করে। এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ রায়ে নির্দেশের অংশের প্রথম দুটি স্তবক :

'(1) The first respondent, the State of Arunachal Pradesh, shall ensure that the life and personal liberty of each and every Chakma residing within the State shall be protected and any attempt to forcibly evict or drive them out of the State organised groups, such as AAPSU, shall be repelled, if necessary by requistioning the service of paramilitary or police force, and if additional forces are considered necessary to carry out this direction, the respondent will request the second respondent, the Union of India, to provide such additional

force, and the second respondent shall provide such additional force as it necessary to protect the lives and liberty of the Chakmas;

(2) Except in accordance with law, the Chakmas shall not be evicted from their homes and shall not be denied domestic life and comfort therein.'

এই মামলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সমগ্র অভিযোগটি এসেছিল সি সি আর সি (Committee for Citizenship Rights of the Chakmas) সংগঠনের কাছ থেকে। আর সুপ্রিম কোর্ট সে অভিযোগ যথাযথ গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য মনে করেছে। সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে এক জায়গায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে :

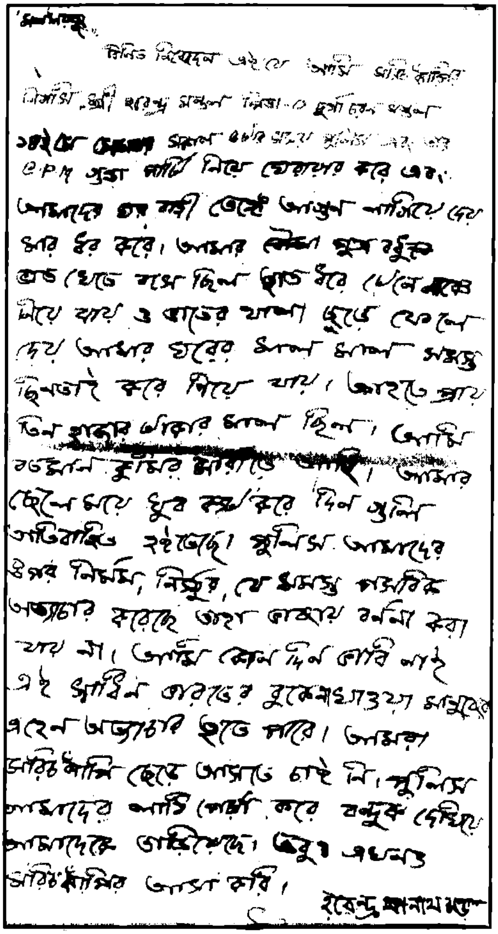
'We are a country governed by the Rule of law. Our Constitution confers certain rights on every human being and certain other rights on citizens. Every person is entitled to equality before the law and equal protection of the laws. So also, no person can be deprieved of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Thus the State is bound to protect the life and liberty of every human being, be he a citizen or otherwise...'

উল্লেখ করা যায়, ২০০৫ সালে 'সর্বানন্দ সনওয়াল বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য' (Writ Petition (Civil) No. 131 of 2000) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিত্রয় আর সি লাহোটি, জি পি মাথুর এবং পি কে বালসুব্রামনিয়ামের এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ে, ইল্লিগ্যাল মাইগ্র্যান্ট আইনটি ও তার যাবতীয় বিধিনিয়ম এবং তার যাবতীয় ট্রাইবুনাল, সংবিধানবিরোধী বলে বাতিল (ultra vires) হয়ে গেছে। সমস্যাটি ছিল আসামে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে আগত ও বসবাসকারীদের বিতাড়িত করার বৈধতা বিচার করা। এই রায়ের নির্দেশ অংশের প্রথম দুটি স্তবক :

'(1) The provisions of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983 and the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Rulers, 1984 are declared to be ultra vires the Constition of India and struck down;

(2) The Tribunals and the Appellate Tribunals constituted under the Illegal Migrant (Determination by Tribunals) Act, 1983 shall cease to function.'

এই রায়টি কোনো অর্থেই উদ্বাস্তুদের অধিকারকে সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নয়। কিন্তু, কোনো উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীকে বিতাড়ন করার বৈধতা নির্ধারণকারী কেন্দ্রীয় ইল্লিগ্যাল মাইগ্রান্ট আইন বাতিল হয়ে যাওয়াটাই একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার। অন্য ক্ষেত্রে, এ রকম উদ্বাস্তুদের অধিকার-খর্বকারী আরও আইনকে তো সংবিধানবিরোধী বলে চ্যালেঞ্জ করা যায়।



মহাশয়,
বিনীত নিবেদন এই যে আমি মরিচঝাঁপি
নিবাসী শ্রী হরেন্দ্র মন্ডল পিতা – ৺ দুর্গা চরণ মন্ডল
১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টার সময় পুলিশ এবং ঐ
C.P.M গুন্ডা পার্টি নিয়ে ঘেরাও করে এবং
আমাদের ঘর বাড়ী ভেঙ্গে আগুন লাগিয়ে দেয়
ছার খার করে। আমার নৌকা জাল [illegible]
ভাত খেতে বসে ছিল হাত ধরে ফেলে রেখে
নিয়ে যায় ও ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে
দেয় আমার ঘরের মাল মালা সমস্ত
ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাহাতে প্রায়
তিন হাজার টাকার মাল ছিল। আমি
বর্তমান কুমির মারিতে আছি। আমার
ছেলে মেয়ে খুব কষ্ট করে দিন গুলি
অতিবাহিত হইতেছে। পুলিশ আমাদের
উপর নির্মম, নিষ্ঠুর, যে সমস্ত পাশবিক
অত্যাচার করেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা
যায় না। আমি কোন দিন ভাবি নাই
এই স্বাধীন ভারতের বুকে হওয়া মানুষের
এহেন অত্যাচার হতে পারে। আমরা
মরিচঝাঁপি ছেড়ে আসতে চাই নি। পুলিশ
আমাদের পাটি জোর করে বন্দুক দেখিয়ে
আমাদেরকে তাড়িয়েছে। তবুও এখনও
মরিচঝাঁপির আশা করি।
হরেন্দ্রনাথ মন্ডল

'মরিচঝাঁপি মামলা ১৯৭৯' সম্বন্ধে কিছু আইনি প্রশ্ন

'মরিচঝাঁপি মামলা ১৯৭৯' পুনর্বিচারের জন্যে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বা সুপ্রিম কোর্টে যায়নি। সে প্রস্তুতি ও পরিস্থিতি তখন ছিল না। কিন্তু মামলাটির শেষ রায় কয়েকটি গুরুতর আইনি প্রশ্ন জাগায়।

১৯৯৬ সালে 'জাতীয় মানবিক অধিকার কমিশন বনাম অরুণাচল প্রদেশ সরকার ও অন্যান্য' মামলায় আমরা দেখি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে আক্রান্ত চাকমাদের নিজস্ব বর্ণনা ও অভিযোগ সব থেকে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু মরিচঝাঁপি মামলায় বিচারপতি বিমল চন্দ্র বসাকের রায়ে, আক্রান্ত

মানুষদের নিজস্ব বর্ণনা ও অভিযোগ একেবারে অবহেলা বা বাতিল করা হয়েছে। বরঞ্চ সরকার পক্ষ তাদের হলফনামায় মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি করেছে, পুরো রায়টি যেন তার ভিত্তিতে মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদেরই শাস্তি দিল। বিচারের এটি non-application of mind বা মনোনিবেশ না করার উদাহরণ।

বিচারপতি বিমলচন্দ্র বসাক নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, উভয় পক্ষের আইনজীবীরা মরিচঝাঁপি প্রত্যক্ষ পরিদর্শনে যাবেন। সেই মতো আইনজীবীরা গিয়েছিলেন, আর তার রিপোর্ট মূল আবেদনকারীরা অতিরিক্ত হলফনামায় জানায়। তৎসত্ত্বেও, বিচারপতির রায়ের কোথাও সেই পরিদর্শন বা তার ফলাফল সম্বন্ধে সামান্যতম আলোচনা নেই। বিচারের এটি non-application of mind বা মনোনিবেশ না করার উদাহরণ।

মূল আবেদনটিতে সংবিধানের যে সব ধারার উল্লেখ ছিল, তার অন্যতম হল ২১ নম্বর ধারা, যেখানে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একটি সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। এই ২১ নম্বর ধারার মৌলিক অধিকারটির, ১৯৭৭ সালে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর, সুপ্রিম কোর্টে ক্রমশই বিস্তার ও উদার ব্যাখ্যা করা হতে থাকে। অথচ, বিচারপতি বিমলচন্দ্র বসাক তাঁর রায়ে কোথাও আবেদনকারীদের বা মরিচঝাঁপির আক্রান্ত বাসিন্দাদের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টি বিচার করেননি। বরঞ্চ, তিনি এ বিষয়টি 'বিতর্কমূলক' (disputable) বলে বাতিল করেছেন। এটি bad in law বা আইনে খারাপের উদাহরণ। অন্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, হত্যা ধর্ষণ নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনার বিবরণ প্রথমত প্রধানত আক্রান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষই দেয়, অভিযুক্তের উপস্থিতিতে যেটা সব সময়ই 'বিতর্কমূলক' (disputable)। অপরাধীরা কখনও হলফনামায় সাধারণত অপরাধ স্বীকার করে না। বরঞ্চ অভিযুক্তরা অপরাধ অস্বীকারই করে।

মরিচঝাঁপি সরকারি সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সর্বার্থে ভুল এই তথ্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিচারপতির রায় এবং তাঁর প্রধান সিদ্ধান্তের হাতিয়ার ফরেস্ট আইন। মরিচঝাঁপির আক্রান্ত উদ্বাস্তুদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার বা নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন এই রায়ে অনুপস্থিত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য।

বিচারপতি বিমলচন্দ্র বসাকের অসংখ্য ভুলে ভরা, মনোনিবেশ না করা, আইনে খারাপের উদাহরণ রায়টির ফলশ্রুতিতে, হাজার হাজার উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপির বাসিন্দা তাদের স্বজন, সংসার, আশ্রয়, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ হারাল, রাষ্ট্র অমানবিক নিপীড়ন করার সমর্থন ও লাইসেন্স পেল, আর মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের অত্যাচার ও বিতাড়িত করে পশ্চিমবঙ্গ তার সামাজিক রাজনীতিক মানবিকতার ইতিহাসে এক কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের কলঙ্কিত উত্তরাধিকারী হয়ে রইল।



মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তু মহিলা সবিতা গোলদার। সে সব দিনের কথা মনে পড়লে আজও তার চোখে জল আসে।

আমার দেখা পুলিশী অত্যাচার

সবিতা গোলদার

প্র: আপনার নাম?

স. গো : সবিতা গোলদার।

প্র : রঙ্গলাল গোলদারের সঙ্গে আপনাদের আত্মীয়তা আছে!

স. গো : জানি না, কালিমেলায় শিবু গোলদার আত্মীয়।

প্র : বাংলাদেশে কোথায় বাড়ি ছিল?

স. গো : বাংলাদেশে বাড়ি হচ্ছে ডাকুব থানা, বড়বেড়ে গ্রাম। '৭০ সালে আসছি এই দেশে। ওখানে থেকে নিয়ে আসল বরদা ক্যাম্পে, বরদা ক্যাম্প থেকে ডাকে আইনলো আমাদের। এইখানে মনে হয় ৮ বছর জমি করে আছি, ঠিক খেয়াল নেই আমার। এই জায়গার অত্যাচার সহ্য করতে পারছিলাম না তাই। তারপর চলি গেলাম সুন্দরবন। সুন্দরবনে ১৩/১৪ মাস ছিলাম। ওখান থেকে জবরদস্তি উঠায় আনলো আমরা তো নিজের ইচ্ছায় উঠিনি।

প্র : কি রকম জবরদস্তি?

স. গো : খাদ্য অবরোধ করি দেলে। মরিচঝাঁপির পারে ছিলাম। কুমিরমারি

থেকে চাল-ডাল এ পারে পার হত না। বাচ্চা-কাচ্চা খাওয়ার জন্য কি কান্নাকাটি করত। কারো ঘরে খাওয়ার ছিল না, এখন কি করি! নারকেল গাছ লাগানো ছিল মরিচঝাঁপিতি, তার মাথি গুলান বাচ্চা-কাচ্চারে খুঁচি খাওয়ালাম। যদু পালং সিদ্ধ করে বাচ্চাকাচ্চারে লবণ টবন নয়, এইভাবে দিচ্ছিলাম খাতি, কয়দিন না খাওয়ায়ে পারি। তারপর রাত্রে... ওরা একবার সেই খাদ্য আনতে গিয়েছিলো।

তারা পার হতি পারে নি, তারা এ পারে আসতি পারেনি। তাদের চাল-ডাইল ধরি আটকাই দেছিল তারপর পুলিশি ঘেরাও করলো। মানুষ আর ওপারে যাতি পারে না। খাদ্য আনতি পারে না। ওইখানে নির্মল ঢালির স্কুল ছিল আমাদের ঘরের গায়, মানে আমাদের তিনডা ঘর থেয়ে ইস্কুলডা ছিল, ঢালির। রাত অন্তত ১০/১১টার সময় ইস্কুল ঘরে আগুন ধরাই দেলো। আমাদের ধারে ২/১ ঘর অন্তত জ্বলি গেল। বাচ্চাকাচ্চাদের লাঠি দিই পিটালো।

প্র : আগুনটা জ্বালালো কারা?

স. গো : আগুনটা জ্বালালো পুলিশি কি কারা, সেইটা আমি আমরা নির্দিষ্ট করি জানি না। পুলিশ ছিল। এই জায়গায় কন্সটেবলের আগুন লাগে। আগুন জ্বালায়ে দেল, ঘরদোর অমনিভাবে জ্বলে গেল। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সবাই কান্নাকাটি করতি লাগল। পুলিশ লাঠি চার্জ করতে লাগল রাত্তিরে। পিটায় পাটায় ওঠাল লঞ্চে। লঞ্চঘাটে কারে গলা ধরে নিয়ে যায়, কারো স্বামীরি, কারো স্ত্রী বাচ্চা নিয়ে পড়ে কান্নাকাটি করে। আর আমার শ্বাশুড়ি ছিল, আর আমার স্বামী ছিল, আমি বড় ছেলেটারে কোলে করলাম, তাপস ছেলে, ৫ বছর বয়স ছিল তখন, মেয়ে একটা কোলে ছিল ছোট। সেইটারে ঘরে রেখে বড় ছেলেরে নিয়ে দৌড়াই বারাই গেলাম খালের পাড়ে। আর আমার শ্বাশুড়ি একটা বালিশ কোলে নি দৌড় দিল। বাচ্চাটা আমার ঘরে থেকে গেল। তা আমি যেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মা বাচ্চার দম আটকি যাবে, তুমি চাপি ধরিছো, আলগা করি দেখি বালিশ। তারপর ফিরে আইসে আমার ননদ আমার বাচ্চাটাকে কুড়োই নিয়ে যায়, শাড়ির সাইডে আগুন ধরল তার ভিতর যাইয়ে। তারপর সেই রাত্রে মারধোর খাইয়ে তো নদীর ধারে থাকলাম। ভোর লঞ্চে ওঠাল। পিটান পাটান দিয়ে আনি আমাদের হাসনাবাদ ঢালি দেয় হাতে। হাতে গাড়ি করে আমাদের দণ্ডকারণ্য নিয়ে আসল।

প্র : মারা গেছে এই রকম দেখেছেন?

স. গো : মারা গেছে অনেক, গুলি করে মারা। আমি তো গুলিতে মরে যাচ্ছিলাম, আমার কানের সাইড দিয়ে গুলি চলি গিছিল, আমিতো মাটিতে ভুট হয়ে পড়ে গিইলাম। গুলি করে মরে গিইলো আমি ৩ জন দেখিছিলাম। শরণার্থী মরেছে। তারা এখন কোন জায়গায় আছে তাতো আমি জানি না। আমাদের এই জায়গায় আমাদের ৩ ফ্যামিলি, ঢালি, আর আমার ভাগ্নে পাগল।

অত্যাচার তো যা করিছে তা তো আর বলার মতো না। সুস্থ হয়ে কটা খাতি



পারিনি। কত মেয়েরা বাজার ঘাটে গেলে ধাক্কা দি ফালাই দেছে, কাপড় ধরি টানিছে, সে সব বলার মধ্যি না সে।

প্র : সবিতা ঢালিকে চিনতেন, যাকে বাগনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশে ?

স. গো : সবিতা ঢালি, না চিনি না আমি ওদের।

প্র : পুলিশ বলছে ওখানে কোনো লোক মারা যায়নি।

স. গো : না, মারা গেছে, অনেক লোক মারি, লঞ্চে উঠায় ভুট করি ফেলায়ে, লঞ্চে ওঠার জন্যি যে পাট্টা ফালায় তার উপর টানিটানি নিয়ে ভুট করি ফালায় ওর ওপর ওঠে গেছে পারায় পারায় টানি নিয়ে। কি বলে মারা যায় নি ? আমি সামনে দাঁড়ানো, কি মারা যায়নি কি সে জায়গায় ? সব লঞ্চে ওঠোইনি কি করিছে সেটা আমি জানি না।

প্র : ১৪/১৫ দিন খাদ্য অবরোধ ছিল...

স. গো : হ্যাঁ ৩/৪ দিনের মধ্যে তো ও পারের থেকে কিছু আসেনি। তার পর কাছি করে ওই পারের যে চাল পাঠাত নোনা জলে ডাবিয়ে [ডুবিয়ে] চাল এসে এই পারে উঠত, তাই কারো ৫০ গ্রাম ১০০ গ্রাম করে ভাগ করি দিত। তা দি সংসারে কি হত ! কাছি করে চাল পার হয়ে আসত এ পাড়ে ৪ দিন পরে। জলে ভেজা রাত্তিরে। এই পারের কাছি থাকতো ঐ পারের কাছি থাকত, তাই বস্তা বাইন্ধ্যে [বেঁধে] টানি তাই এ পারে কুমিরমারি গাঙের থে ওঠোতো। সেই নোনা জলে ভিজা চাল, ৪ দিন পর। তাই ভাগে হত ৫০ গ্রাম ১০০ গ্রাম। সবাই পাতো না। এই রকম অবস্থা ছিল। এত কষ্ট করি থাকলাম, তাও থাকতি পারলাম না। লাস্টে মার খাই উঠে আসতি হইছে।

সাক্ষাৎকার : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯



রবি মণ্ডল কুরিমারির ভূমিহীন কৃষক। উদ্বাস্তু ও স্থানীয় মানুষের মধ্যেকার সাধারণ দ্বন্দ্বকে প্রশাসন কাজে লাগায়। পুলিশ ওদের ৫০০ টাকা করে দেয়। ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯-এ পুলিশ প্রায় ৪০ জন উদ্বাস্তুকে গুলি করে মেরেছিল—সেই মৃতদেহগুলি প্রথমে রাখা ছিল এই রবি মণ্ডলের বাড়ির উঠোনে।

আমার পুকুরপাড়ে মৃতদেহগুলো ছিল

রবি মণ্ডল

আমার নাম রবি মণ্ডল, বাড়ি কুমিরমারি।

প্রশ্ন : আপনি কি করেন?

রবি মণ্ডল : আমি বাগদা ধরে খাই, খাটাখাটনি করে খাই।

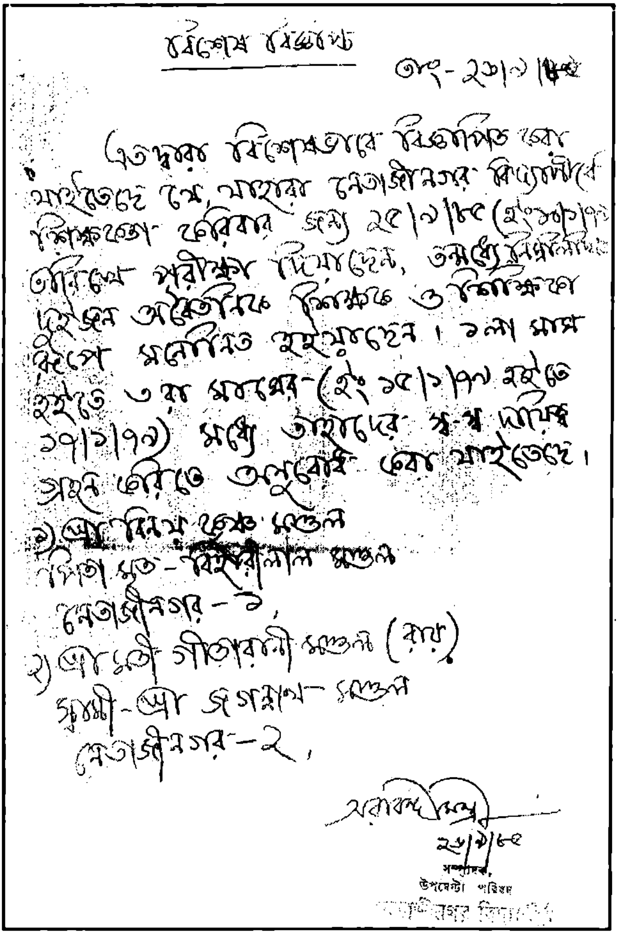
প্র : জমিজমা আছে আপনার?

র ম : না।

প্র : ৭৮/৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটা গণ্ডগোল হয়েছিল, আপনার দেখা, জানা, শোনা অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু বলুন?

র ম : শরণার্থীরা আমাদের ওখানে গিইলো, গিয়ে বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে থাকে মানে গেরামে, আমার বাড়িতে ছিল, বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাড়ি ছিল, শম্ভু গায়েনের বাড়ি ছিল, আমার বাড়ির কাছাকাছি। তাদের নামধাম জিজ্ঞেস করি নি। আমাদের বলল আমাদের একটু থাকতি দিতি হবে, আমরা বহুলোক তো, বারান্দায় শুয়ে থাকবো বা উঠোনে থাকবো। বলতে কি ধরো ৫/৬ হাজার হবে। পরস্পর এইরকম বহু লোক আইসলো। দুই/চার দিন আমাদের কুমিরমারি থেকে থাইকল,

থাইকে ওপারে নদী ঝাঁপিয়ে চলি গেল। অনেকে ধরো আমাদের নৌকো ডোঙা কাছাকাছি ছিল সেইসব খুলে নি চলে গেল। আমরা বললাম, দেখুন, আমাদের এই নৌকাডোঙা... তখন ওরা একটু উত্তেজনার মতো হয়েছিল। আমরা কিছু বললাম না, বহুলোকের ব্যাপার সেখানে। তারপরে ওপারে থাকে ওরা, জঙ্গল কাটে পরিষ্কার করে ঘরদরজা বাঁধে। তারপরে আমাদের পাড়ে আসে, নৌকো পার হইয়ে এ পারে আসে। বাজারঘাট করি নিয়ে যায়, আমাদের পুকুর থেকে জল নিয়ে যায়। আমরা ৫টা ছেলে ওপারে গিইলাম। আমাদের দেখে আসি কি পরিস্থিতি ওপারে। আমরা গিয়ে, আমাদের তখন জিজ্ঞেস করতেছে : তোমাদের পারমিশন? আমরা বলছি : আমাদের পারমিশন কি? তা বলে : এ পারে উঠতি গেলে পারমিশন লাগবে।



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তাং- ২৩/৯/৮৫

এতদ্দ্বারা বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, যাহারা নেতাজীনগর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য ২৫/৯/৮৫ (ইং ১০/১/৭৯) তারিখে পরীক্ষা দিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইজন অবৈতনিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা রূপে মনোনীত হইয়াছেন। ১লা মাঘ হইতে ৩রা মাঘের (ইং ১৫/১/৭৯ হইতে ১৭/১/৭৯) মধ্যে তাঁহাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১) শ্রী নিমাই চন্দ্র মণ্ডল
পিতা মৃত- বিহারীলাল মণ্ডল
নেতাজীনগর - ১,

২) শ্রীমতী গীতারাণী মণ্ডল (রায়)
স্বামী- শ্রী জগন্নাথ মণ্ডল
নেতাজীনগর - ২,

২৬/৯/৮৫
সম্পাদক,
উপদেষ্টা পরিষদ

তখন ফিরে আসলাম। আমরা বললাম, পার হইয়ে তাহলে কি করে যাবো আমরা। তখন ওখানে একটা মেয়েছেলে পারাপার করে। তা বললাম, দিদি আমাদের একটু ওপারে পার করে দেবেন? বলল, না, তোমাদের পার করে দেবো না, তোমরা নৌকা ওপারে থেকে ডেকে পার হয়ে চলে যাও। তো আমরা পাঁচটা ছেলে ঐ নৌকাটা ছিনিয়ে এপারে নিয়ে আসলাম, আমাদের পারে। আনে আমরা নৌকাটা তুলে দেলাম। আমাদের নৌকো ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গিইলো। পারে তুলে দেলাম। দিলে আমরা খেয়াটা বন্ধ করে দেলাম। যে আমাদের পারে থেকে নৌকো ডোঙা নিয়ে আমাদের পারমিশন চাচ্ছো ওপারে। আমাদের কাছাকাছি সুন্দরবন বা আমরা যাতে বাস করতি পারি, বা সুন্দরবন যাতে বাঁচাতি পারি, আমরা বন্ধ করি দেলাম। বন্ধ করি দিলি, ফরেস্টার থেকে সংবাদ কিভাবে পেল, পাইয়ে আমাদের পাঁচটা ছেলেকে, মানে লঞ্চ আইসলো, ডি ডি ও, না ডি এম (?) আইসে আমাদের তুলে নিয়ে গেল। নামটাম জিজ্ঞেস করলে যে আপনাদের নাম কী, আমরা নামটাম বললাম। 'তাহলে এখানে পারাপার কারা বন্ধ করেছিল?' আমরা বললাম, 'স্যার আমরা বন্ধ করিছি।' 'তাহলে খুব ভালো হয়েছে বাবা, আপনাদের কাছাকাছি সুন্দরবন, আপনারা বন্ধ করেছেন, ভালো হয়েছে।' আমরা বললাম যে 'স্যার রাইত্রে এসে যদি দা-বল্লম নিয়ে মাইরধোর করে?' বলে, 'ঠিক আছে আমরা এখানে ফোর্স দিয়ে দেবো আপনাদের বাড়িতে।' যথারীতি আমাদের বাড়িতে ফোর্স দেলে। ডি এম বলল, 'আপনাদের কি করে চলে?' বললাম যে 'আমরা মাছ, কেঁকড়া ধইরে খাই।' 'ও আপনারা খুব গরিব লোক?' বললাম, 'হ্যাঁ।' তা আমাদের ৫০০ কইরে টাকা দেলে। পাঁচটা ছেলেদের ৫০০ করে টাকা দেলে। নামটাম লিখিটিকি নেলে। 'আপনারা বন্ধ করেছেন খুব ভালো হয়েছে, আপনাদের কাছকাছি সুন্দরবন আপনারা বাঁচতি পারবেন। সুন্দরবন গেলে ক্ষতি হবে আপনাদের।' বন্ধ টন্ধ করে দেয়ে তার পরের থেকে, রাতির ভিতরে দশ বারো খানা লঞ্চ আইসে গেছে। মানে ডিউটিতে। মানে শরণার্থীদের ১৪৪ ধারা জারি করল। ওদের আর এ পারে আসতে দেয় না। পারাপার বন্ধ হয়ে গেলে সপ্তাহ খানিক। তখন ওরা নদী সাঁতরিয়ে আসে।

প্র : পাঁচশো টাকা করে যে আপনাদের দিল, এটা কি লঞ্চ পারাপার বন্ধ করার জন্য দিল?

র ম : স্যার, আমরা খেয়া বন্ধ করেছি ঐ জন্য আমাদের দিল।

তারপরে ১৪৪ ধারা জারি করল করে সপ্তাহখানিক বন্ধ থাকল। তারপর ওই পারের থেকে ওরা দা, বল্লম দিয়ে ছোড়াছুড়ি করতে লাগল। তখন ১ সপ্তাহ পরে ৩ দিকের থেকে লোক ঝাঁপিয়ে পার হল। পুলিশ ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলে, আমাদের বুধবেড়ে [বুধবারের] বাজারের থেইকে ফোর্স উঠল, উঠে ওখান থেকে

গ্যাস মারলো, কিছু শরণার্থী আবার পড়ে যায়। আমাদের ঘরবাড়ি অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের বারান্দায় ডি এম স্যার আছে। বললাম, 'স্যার দেখুন আমাদের বাড়িতে তো খুব ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে।' বলল, 'ঠিক আছে তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি হবে না, আমি তো এখানে আছি। আর আমার ফোর্স চারিধারে আছে। তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি করতে দেব না।' এখন, এরই মধ্যে বুধবেড়ে বাজারের থেকে ১৫/২০ জন ফোর্স আসলো, এসে মোটামুটি ওধার থেকে গ্যাস মাইরলো। বুধবেড়ে গোলাগুলি শুরু হইছে, হয়ে তখন শরণার্থীরা আমাদের বাড়ি থেকে মানে প্রত্যেকের বাড়ি আছরায় [আশ্রয়] নিয়েছে, নিয়ে পুলিশরা যখন গুলি করে, তখন স্থানীয় লোক মরে, শরণার্থী মরে এই রকম পরিস্থিতি হই গেছে। তখন ওরাও চিন্তাভাবনায় পড়ে গেছে। যখন একডাকে তখন তাড়িয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ, তখন ৪টা দিকে বেশ কিছু লোক মরেছে। আমি যা দেখিছি অনুমানে ৩০/৩৫/৪০ জন মরেছে। মরে আমার বাড়ির পুকুরপাড়ে ধাপ কইরে রেখেছে। আর মেনি মুণ্ডার মেরেছে ৫টার দিকেটিকে। রাস্তার উপর থেকে গুলি করেছে শরণার্থীদের, শরণার্থী মরেনি, আমাদের স্থানীয় লোকটা মরেছে, মেনি মুণ্ডা মরেছে। তার ছেলে কান্নাকাটি, আমার মা মারা গেছে। তখন বাড়ি থেকে বারুতে পারছি নে। চারিদিকে উত্তেজনার ব্যাপার। তখন লঞ্চে তুলছে দেখলাম বস্তার ভিতর ভরতিছে। লঞ্চের ভিতরে দেচ্ছে, পুলিশরা আমাদের বলছে, তোমরা একদম বাইরে বেরুবে না গুলির মাথায়, তখন একটা উত্তেজনার ব্যাপার। আমার বাড়ির সুমুখে। আর বস্তা ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছিল শরণার্থীদের, আমার সমুখে। শরণার্থী ছিল আর আমাদের স্থানীয় একজন ছিল মেনি মুণ্ডা।

প্র : তারপরে সরকার থেকে টাকা দিয়ে ওদের ঘরদরজা পুড়িয়ে দেবার জন্যে বা সহযোগিতা করার জন্য টাকা দিয়েছিল, বা বলেছিল যে আবার টাকা দেব।

র ম : না, আমাদের আর টাকাপয়সা দেয় নি, আমায় ৫০০ করে টাকা দিইলো। আমরা পাঁচজন খেয়াটেয়া বন্ধ করলাম। তা তোমরা কিসের জন্য বন্ধ করলে? আমার বললাম, ছার! আমরা ওপারে গিইলাম, আমাদের বলো, পারমিশন লাগবে, এইজন্য আমরা রাগ করে বন্ধ করে দিইছি।

প্র : আপনার যে বন্ধুবান্ধব বাকী চারজন, এদের নাম কী ছিল?

র ম : তাদের নাম ছিল, একজনের নাম, পাঁচজনের নামই বলব?

প্র : হ্যাঁ বলুন না।

র ম : আমার নাম তো জানেন লিখে দিইছি, আর নির্মল মুণ্ডা ছিল, হেমন্ত মণ্ডল, খগেন বর্মন আর একজনের নাম তারক মণ্ডল। আমার বাড়ির সব কাছাকাছি, গেরামের ছেলে। তারা এখনও মাছটাছ ধরে বাগদাটাকদা ধরে।

সাক্ষাৎকার : ৭ এপ্রিল ২০০৭



উদ্বাস্তু নেতা অরবিন্দ মিস্ত্রী। যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির, মরিচঝাঁপি বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন, ছিলেন মরিচঝাঁপিতে মাছ চাষের দায়িত্বে।

মরিচঝাঁপির অর্থনীতি

অরবিন্দ মিস্ত্রী

প্র : এসেই কি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, না দণ্ডকারণ্যে চলে গিয়েছিলেন?

অরবিন্দ মিস্ত্রী : ১৯৭০ সালের জুন মাসে আমি এসেছি। এসে প্রথমে আমরা বসিরহাট কিছুদিন ছিলাম। ওখানে চাল-ডাল দিত। ১ মাস না কদিন রাখল, মনে নেই, এরপর ট্রেনে করে আমাদের নিয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ, নিয়ে ওখানে প্রথমে কেন্দ্রি নামে একটা জায়গায় তাঁবুর ভিতর ফেলে। একটা ফাঁকা মাঠ। আবার বাংলাদেশ যুদ্ধ শুরু হল, আমরা হলাম রিফিউজি, ওখান থেকে যারা এল তারা হচ্ছে শরণার্থী। ওদের ওখানে নিয়ে গেল। আমাদের নিয়ে গেল মানা ক্যাম্পের পাশে বরদাভাটা ক্যাম্পে।

প্র : মানা ক্যাম্পের পরিবেশ কেমন ছিল তখন?

অ মি : মানা ক্যাম্পের পরিবেশটা কোনদিক দিয়ে বলব! প্রধানত বাঙালি বাস করার মতো আবহাওয়া তো নেই, মাটি তো নেই, পাথর। তারপর এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর দিকে দিয়ে প্রচণ্ড চাপ ছিল, মিলিটারি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ভারতের আর কোথাও

ছিল না, ওখানেই মিলিটারি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল, এটা বাস্তব সত্য। ওইখানে ঘটনাক্রমে আমি শরণার্থীদের মধ্যে চাকরিও পেলাম।

প্র : কি চাকরি করতেন আপনি ?

অ মি : সেবক বলতে পারেন, camp assistant, শরণার্থীদের, ওরা বলত সেবক, ক্যাম্প অ্যাসিস্ট্যান্ট, চাকরি পাবার পরে, কথাটা বলছি এই কারণে...

প্র : মাইনেকড়ি কী রকম ছিল ? আপনার কাজটা কি ধরনের ছিল ?

অ মি : L D C Ground। আমাদের শরণার্থীদের যাবতীয় দেখাশুনা করা। চাল-ডাল রেশন কি করে হচ্ছে, খাচ্ছে কিনা, মরে যাচ্ছে কিনা, স্কুলে যাচ্ছে কিনা, আসছে কিনা, পরিবেশটা আর কি! একটা LDC-র মাইনে পেতাম। থার্ড ক্লাস ছিলাম আমরা। এবারে আমি যখন ওখানে ঢুকলাম যখন evacueeরা যখন চলে যাবে, সেই সময় একটা সার্টিফিকেট দিতে হত আমাদের। আমি রিফিউজি হয়ে এসেছি ওখান থেকেই। সার্টিফিকেট লিখে, তখন ক্যাম্প কমান্ডডেন্ট কর্নেল এস পি নন্দী, উনি বললেন, সার্টিফিকেটটা কমপ্লিট করে দাও। আমি বললাম, ক্যাম্প অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে আমার হাত দিয়ে যা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে আমি তাই দিয়েছি। আমার Camp commandant দিয়েছেন, ওখান থেকে নন্দীবাবুর কাছে গেলাম মানা group of transit-র head of the department ওনার কাছে গেলে বললেন, 'এ পূরণ করা হয় নি। এটা এরকম ভাবে লিখতে হবে।' আমি বললাম, 'স্যার এগুলি তো দেননি আমাকে আপনি দিলে আমি পূরণ করতাম। তা না, নন্দী সাহেব বলে দিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তা হয় না।' তখন বলল, 'তা তুমি চল নন্দী সাহেবের কাছে।' নন্দীর কাছে গেলাম, উনি বললেন, 'আমি নন্দী বলছি এটা দিতে হবে, তুমি পূরণ করে দাও।' তখন ঐখান আমার দাদা, ১৯৬৪ এসে নন্দীর পাশে চাকরি করতেন। আমাকে ডেকে নিয়ে যান, ভদ্রলোকের নাম জ্যোতিষ। দাদা বলে যে 'বাঁচতে চাস তো লিখে দে, যা যা বলছে তুই লিখে দে, নয়তো camp out হয়ে যবি। Camp out বোঝেন ?'

প্র : না।

অ মি : সে এক মারাত্মক অস্ত্র। কোনো কারণ দর্শাবে না। Camp out একটা নোটিশ দিয়ে আপনাকে লরি করে ক্যাম্প-এর বাইরে যে কোনে জায়গায় ফেলে দেবে। আপনি চলে যাবেন সপরিবারে। এইটে যখন হয় আমি ভয় পেলাম। আমি সই করে দিলাম। এইবার evacueeরা যখন চলে গেল, আমাদের একটা প্যানেল হল, যদি অন্য কোনো জায়গায় পাঠানো যায়। সম্ভবত ৫৭ জনের একটা প্যানেল হল। আমার Placeটা হল 3rd চাকরির রিক্রুটমেন্ট যখন আসল ১, ২ দিয়ে ৪, ৫ দিয়ে ৩নংটা বাদ। কারণ আমি নন্দীবাবুর সঙ্গে তর্কাতর্কি করেছি, আমার চাকরিটা হল না। আমি বললাম, হল না তো হল না, আমি আর চাকরি করলাম

না। এইবার ঘটনাক্রমে সম্ভবত ১৯৭৩ সালে, আমি তখন একটা ব্যবসা করতাম। উড়িষ্যা থেকে লঙ্কা এনে মানা ক্যাম্পে এবং রায়পুর ডিস্ট্রিক্টে বিক্রি করতাম। একদিন হঠাৎ লঙ্কা নিয়ে এসে নামছি, আমি কিন্তু প্রথমে জানি না, মাইকে অ্যানাউন্স করছে, 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' কথাটা আমার কানে গেল। একটা লিফলেটও হাতে পেলাম। দেখলাম, 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' আছে, তাতে কোনো নাম নেই, ধাম নেই, কিচ্ছু নেই। মানা ক্যাম্পের ঠিকানা। একটা লিফলেট দিল, তাতে যে একটা ব্যক্তির নাম থাকবে একজন সভাপতি বা সম্পাদক, কিছু নেই। তবু আমার সন্দেহ হল, পরদিন মানা ক্যাম্পে গেলাম, কারা, কি শুনলাম। যাই হোক, এ পর্যন্ত দেখে আমি আর এগোই না। আমি আমার মতো ব্যবসা করছি। তারপর আস্তে আস্তে একটা কমিটি form হল আমি আস্তে আস্তে ঢুকতে লাগলাম। ঢুকে আমার প্রথম পরিচয় হয় রঙ্গলাল গোলদার বাবুর সঙ্গে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, উনি কিন্তু আমার বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। আমি বললাম, 'স্যার কি ব্যাপার!' 'দেখ উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে আমরা একটা সমিতি গড়েছি।' আমি বললাম, 'দেখুন, চামচাগিরি নেই তো এর মধ্যে?' এখানে মানা ক্যাম্পে Employees' Union-এর সঙ্গে সরকারের একটা গণ্ডগোল চলছিল, আমি বললাম, 'এর মধ্যে তেমন কিছু নেই তো?' উনি বললেন, 'না, আমরা উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই।' 'আপনি যদি করেন তো স্যার আমি এর মধ্যে থাকব, অন্যথায় থাকব না।' উনি আমায় ডেকে নিলেন। তারপর রাইহরণবাবু ও অন্যদের সঙ্গে পরিচয় হল। হঠাৎ একদিন রাত্রে রাইহরণবাবু আর একজন ভদ্রলোক Govt Employee. অনিলবাবু বোধ হয় নাম ছিল। আমাকে ডেকে নিয়ে মাঠের মধ্যে ঘন্টা ২/৩ আলাপ হল। 'ঐ উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি' গঠন হয়েছে, এই যে Employees' Union ওকে ধ্বংস করার জন্যে। অতএব ওতে কাজ করা যাবে না। তোমরা যেমন আছ চলে যাও।' 'ঠিক আছে করব না।' এইবার সেইখান থেকে আস্তে আস্তে রাইহরণবাবু, উনি কিন্তু মূলত বুদ্ধি সরবরাহ করতেন। রাইহরণবাবু কায়দা করে দেখল এই সমিতিটা হাতে নিলে সতীশবাবুকে পেয়ে যাব। সতীশবাবুর বিরাট জনবল আছে, প্রভাব, আর সবচেয়ে বড় জিনিস হল সততা। উনি আমার মতে এখনও একটা মিথ্যা কথা বলেন না। এইবার সমিতি গঠন হল। যুক্ত হলাম। এইবার যুক্ত হয়ে আমাদের আন্দোলনটা কিন্তু মোটামুটি গড়ে উঠল anti Central Government। আমরা তখন প্রথম দাবি করলাম যে আমাদের এমনি scattered অবস্থায় যেখানে যেখানে দিচ্ছেন সেখানেই দিন, কিন্তু একটা জায়গায় দিন। সেখানে industry করে দিন, আমরা সেই industry নিয়ে থাকব, scattered করবেন না। Scattered করতে এই কারণে নিষেধ করলাম, তখনই কিন্তু entire দণ্ডকারণ্যে যেখানে সেখানে 'বাঙালি নিধন যজ্ঞ' শুরু হয়েছে। আমরা যদি



scattered অবস্থায় না থেকে এক জায়গায় থাকতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এভাবে মারতে পারবে না। সতীশবাবু হয়তো আপনাদের বলেছেন এভাবে মরতে পারব না। বাঙালি নিধন যজ্ঞের কোনো শাস্তি নেই, কোর্টে যদি যেতাম, ওখানে বিচারক বলেছেন, 'দেখুন এরা অশিক্ষিত আদিবাসী সম্প্রদায়, এদের কোনো অপরাধ নেই। একটা গরুকে যদি একটা মানুষ মারে, গরু যদি মানুষটাকে শিং দিয়ে খুঁচিয়ে মারিয়াও ফেলে, তো গরুর কি অপরাধ, এরা তো গরুর সমতুল্য আপনারা বাঙালি সুসভ্য জাতি অতএব এদের কোনো অপরাধ নেই।' ব্যস। এই যে অবিচার, এর বিরুদ্ধে বললাম যে 'আমাদের যে কোনো একটা জায়গায় দেন, সে পাহাড়ের উপরে দেন আর সমুদ্রের তলায় দেন, এক জায়গায় সমস্ত বাঙালিদের পুনর্বাসন দেন।' হল না, এই নিয়ে মূলত আমাদের আন্দোলনটা গড়ে উঠল। তখন আমরা বাঙালিরা বাংলায় ফিরে আসার শ্লোগানটা তুললাম।

ইতোমধ্যে আমরা তখন যোগাযোগ করে পশ্চিমবাংলায় এসেছিলাম। আমি সঠিক তারিখটা বলতে পারব না, মোটামুটি অনেক নেতৃত্বের সঙ্গে, জর্জ ফান্ডান্ডেজ তার মধ্যে ছিলেন, জাম্বুবান রাও ধোতে, উনিও বিশেষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এটা ঠিক হল যে আমরা একটা সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল নিয়ে দিল্লি যাব, যেদিন যাব ঠিক হল, তার ১ দিন বা ২ দিন আগে emergency declare হয়ে গেল। আর কে কোথায় যায়! আমরা হারিয়ে ফিরিয়ে চলে গেলাম। আমি তখন দিশাহারা আমি তখন মিসার আসামী। আমি তখন ওখান থেকে পালিয়ে গেলাম। রাইহরণ বাবু পালিয়ে গেলেন। সতীশবাবু ধরা পড়লেন। সতীশবাবু তিন বছর জেলে ছিলেন।

আবার '৭৭ যখন জনতা গভর্নমেন্ট আসল, তখন আবার এক জায়গায় হলাম, আবার ঐ আন্দোলন শুরু করলাম। এইবার তখন একজন ভদ্রলোক কি যেন নাম, রবিশঙ্কর...

রবিশঙ্কর পান্ডে। উনি প্রথম একটা কথা বলেন, আমরা বেশি উৎসাহিত হয়েছিলাম সেখান থেকে। 'অন্যান্য তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার... '

হ্যাঁ গঙ্গাটা বাংলায় আছে, অতএব বাংলায় গেলে আমরা উদ্ধার পেয়ে যাব। উনি কিন্তু প্রথম বললেন, আমরা আসলাম। আন্দোলন চলতে দাও। এর মধ্যে সমরবাবু, প্রাণকৃষ্ণবাবু...

প্র : আচ্ছা এই আন্দোলনের আগে ওখানে আপনারা অনশন করেছিলেন ?

অ মি : হ্যাঁ, অনশন করেছিলাম...

প্র : অনশন, পুলিশের অত্যাচার, সেটা বলুন।

অ মি : রিলে অনশন হয়েছিল ১ মাস। সেখানে অসংখ্য মানুষ ছিল ২৪ ঘন্টা রিলে হাঙ্গার স্ট্রাইকে সতীশবাবু ছিলেন, আমিও ছিলাম। ২৪ ঘণ্টা অনশন ৪টা ক্যাম্পে হয়েছিল— মানা, মানাভাটা, বরদাভাটা, কুরুদ। এই অনশন আন্দোলনে আমাদের যেতে হোত, যে সব দাবি তা তো আগেই বলেছি, তারপরে যখন আর কিছুই হল না, শেষ পর্যন্ত আমরা আমরণে বসেছিলাম। তাতে সতীশবাবু বসেছিলেন, আর কে কে বসেছিলেন আমার মনে নেই। তখন একটা চুক্তি হল যে যেখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে সেখানে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি নির্ধারণের জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখে পছন্দ হলে তাদের মধ্যে দেওয়া হবে। একটা প্রতিশ্রুতি বা লিখিত...

প্র : এই চুক্তিটা হল কাদের মধ্যে ?

অ মি : সেন্ট্রাল গর্ভর্নমেন্ট আর আমাদের উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি। এদের সঙ্গে চুক্তি হল। তখন মোরারজীর সরকার আসেনি কংগ্রেস গভর্নমেন্ট। তখন পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন, নামটা ভুলে গেলাম। পুনর্বাসন মন্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি হল। চুক্তিগুলি ছিল এই রকম :

১. উদ্বাস্তুদের যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে, সেখানে উদ্বাস্তুদের নিয়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে উদ্বাস্তুরা দেখে যদি সম্মত হয়,' তাহলে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

২. যে ডোলটা দেওয়া হত, সেই ডোলটা অত্যন্ত সীমিত ছিল।

তখন প্রতি পরিবারের জন্য মাথা পিছু ১০ টাকা প্রতি মাসে বরাদ্দ করা হল। তখনকার দিনে মাথাপিছু ১০ টাকা খারাপ ছিল না। এই চুক্তি মোতাবেক আমরা অনশন তুলে নিলাম, আমরা মেনে নিলাম। এইবার যখন আবার পুনর্বাসন দিতে পাঠাতে লাগল এরা, আমাদের কোনো consent নেই, কিচ্ছু নেই, ওদের ইচ্ছে

মতো যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। এইবার আন্দোলনে আমরা পুনর্বাসনটাকে স্তব্ধ করে দিলাম। কোনো উদ্বাস্তু মানা ক্যাম্প থেকে কোথাও পুনর্বাসনে যাবে না। এই করতে করতে emergency এসে গেল। সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্র : আমরা তো শুনেছিলাম যে আপনাদের উপর গুলি চলেছিল...

অ মি : গুলি চলেছিল তারও আগে...

প্র : যাই হোক গুলি চলেছিল শুনলাম, সেইটা একটু বলুন। কিভাবে, ওরা গুলি করল কেন?

অ মি : আগে যে গুলিটা চলেছিল তখন আমি ওখানে ছিলাম না। আর আমি যাওয়ার পরে যে গুলিটা চলেছে ১৯৭০ সালের পরে, সেটা হয়েছে, কিন্তু আমাদের উদ্বাস্তুদের উপর হয়নি। সেটা হয়েছে ওই শরণার্থীদের উপর।

এবার থেকে যখন দিল না, তখন তখনই আমাদের আন্দোলনটার মোটামুটি নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক নেতারা সেখানে হাজির হল। প্রথম যায় রবিশঙ্কর পাণ্ডে, জাম্বুবান রাও ধোতে, তার পরে পশ্চিমবাংলার অনেকেই যান...

রাম চ্যাটার্জি, সমর মুখার্জী পরে যায়। আমরা যখন পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসনের কথা বলছি তখন সমর মুখার্জি পরে ওরা গেছে। এর মধ্যে শুনেছিলাম যে, ভিলাইতে নাকি জ্যোতিবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে, কি হয়েছে আমি জানি না, আমি ছিলাম না।

প্রথম যখন সমর মুখার্জিকে নিয়ে আমরা মিটিং করি, আমরা ওইখানে সমর মুখার্জির উপস্থিতিতে সুন্দরবনের দাবি তুলি। সমরবাবু কিন্তু সেখানে একটা কথা বলেছিলেন, 'সুন্দরবন পশ্চিমবাংলার মধ্যে, আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ।' একথা উনি বলেছিলেন। 'এখন সেখানে গেলে সুন্দরবন গভর্নমেন্ট দেবে কি, দেবে না, সে আমি বলতে পারিনা, আপনারা আন্দোলন করে পারলে আদায় করে নেবেন। পশ্চিমবাংলায় বহু জবরদখল কলোনী আছে, তারা লড়াই করেছে, আপনারা লড়াই করলে পাবেন, আর না পারলে গভর্নমেন্ট দেবে কিনা আমি জানি না।' দেবে নাও বলেননি হ্যাঁ ও বলেননি। প্রাণকৃষ্ণ ঠিক একথা বলতেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু একটা কথা বলেছিলেন, সব তো ভালো করে মনে নেই। যে, 'UCRC-র নেতৃত্বে তোমরা সংগঠন চালাও।' আমরা বললাম, 'দেখুন আপনার UCRC সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, জানাও নেই। আর শুনেছি আপনার একটা রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন, তা আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন চাই না। পারব না হতে। UCRC হোক বা অন্য কিছু হোক। আমরা সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক অবস্থায় থাকব।'

প্র : এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন কেন?

অ মি : আমরা রাজনৈতিক সংগঠনে তখন যেতে চাই নি। কোনো রাজনৈতিক

দলের, actually বলতে গেলে আমরা তখন রাজনীতিকে বাইরে রাখতে চেয়েছিলাম। এখানে একটা কথা ওরা বলেছিল ওখানে, যে আপনারা একটা কাজ করুন, সেটা হয়েছিল পশ্চিমবাংলায় এসে রাইহরণবাবু ছিলেন, গোলদারবাবু ছিলেন, আমি ছিলাম, আর একজন, কে ঠিক মনে পড়ছে না, প্রাণকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে কথা হল, দেখুন আমরা পশ্চিমবাংলায় এসে, তখন আমরা পশ্চিমবাংলায় আসি নি, 'এসে যে জবরদখল করবেন, কি করে দখল করবেন জানি না, আর সুন্দরবনের ঐ জায়গার কথা বলছেন, ওখানে যেতেও তো বিপদ আছে, ওখানে দখল করতে পারবেন কিনা! সরকার তো দেবে না! কতটা শক্তি আপনারা ধরেন জানি না, তার থেকে আপনার ওইখানেই, out of Bengal, যেখান আমরা আছি, সেখানে আপনারা আন্দোলন গড়ে তুলুন, আমরা এখান থেকে সমগ্র সহযোগিতা করব, মানে UCRC-র নেতৃত্বে।' ওই এক কথাই বলেছিলেন, আমরা রাজি হইনি। এইবার এখানে যখন এলাম, মানে পশ্চিমবাংলায় আসার আগের কথা বলছি, যে, কি করে এখানে আমরা আসব, পথটা তৈরি করব কি করে, ওখান থেকে আসারও তো বিশেষ সমস্যা আছে। এই নিয়ে যখন চলছে, আমরা তখন আন্দোলনটাকে তুলে দিয়েছি তুঙ্গে— পশ্চিমবাংলাকে আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত করেছি সমস্ত উদ্বাস্তুদের মধ্যে। সাড়া পেয়ে গেছি। ঠিক সেই সময় ওখান থেকে আসার জন্য কারা টিকিট করে দিলেন আমাদের, টিকিট, রেলের টিকিট! যাও। একটা, দুটো না। অনেক টিকিট করে দিয়েছে বহু পরিবারকে দিয়েছে। তখন আমাদের মাথায় বাজ পড়ল যে, একি! টিকিট করে কেন তারা আমাদের দিচ্ছে?

এমন হতে পারে যে, আমাদের এলাকা থেকে চলে যাও!

তাড়াবার জন্য দিয়েছে। এবং তাড়াবার জন্য এটা দিয়েছে বুঝলাম কখন জানেন? ওখানে বহু মামলা ছিল, বহু মামলা ছিল আমাদের। মামলার উকিল ছিল Mr. Chowhan, তিনি জনসংঘ করতেন তখন। চৌহান বলে বসলেন যে, দেখুন, তাড়াতাড়ি আপনাদের এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। যেভাবে হোক যেতে পারেন। আমার মনে হয় চৌহানের উদ্যোগে টিকিট কেটে দিয়েছিল।

প্র : মরিচঝাঁপিতে গিয়ে কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবেন ঠিক করেছিলেন?

অ মি : মরিচঝাঁপিতে আসার আগে আমরা তিনবার সার্ভে করে দেখেছিলাম, মরিচঝাঁপি যে টাইগার প্রোজেক্ট করে রেখেছে সে জায়গাটার এখানে আমি কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে বোঝাতে পারব না, বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারব পূর্বপুরুষদের কাছে শুনেছি যে নদীর চরায়, যেখানে ধানী গাছ হয় সেখানে চাষ করার জন্য প্রকৃতি বলে। আমার সেই বিশ্বাসে সেই জমিতে চাষ হওয়ার প্রতি এখানে ফরেস্ট করার উপায় নেই, চোখে দেখলাম বড় বড় গাছ নেই সেখানে ছোট ছোট গরান

ও গেঁওয়া গাছ হয়ে রয়েছে। বাস্তবিকই দেখলাম এখানে যে জলাশয় আছে মাছ তৈরি করে বিশেষ করে চিংড়ি মাছ চাষ করে ফরেন পাঠাতে পারব। পশ্চিমবঙ্গ সরকাকে বলেছি আমরা ফরেন মানি আর্ন করব। নিজেরাও বাঁচব এবং বৈদেশিক অর্থও উপার্জন হবে, আর ঐ জমিতে চাষ হবে এবং আমি নিজেও মরিচঝাঁপিতে থাকাকালীন পরীক্ষা করেছি। অনেক ঝাউগাছ ছিল, ঐ ঝাউ গাছের গোড়ায় আমার মা বেঁচে থাকতে একটা লাউ বীজ পুঁতে দিয়ে গিয়েছিল। তিন চারটে বীজ ঝাউ গাছের গোড়ায় পুঁতে দিলাম, গাছ গজাল, কুমিরমারি থেকে নাড়া নিয়ে আসলাম, লবণটাতে চাপা থাকে, বিছায়ে দিলাম, এত সুন্দর লাউ ধরল, যুগান্তর কাগজে ফটো তুলে নিয়ে এসেছিল। আমার জমির পাশে একটা গর্ত ছিল তাতে কুমিরমারি থেকে ধান এনে লাগালাম, ঘর করতে মাটি কাটতে যে জলা জমি হয় সেখানে লাগিয়ে দিলাম, সেখানে অনবদ্য ধান হল, আমি প্রমাণ করলাম এই জমি চাষের উপযুক্ত।

প্র : তারপরও, যখন বাঁচতে চাইলেন, সরকার আপনাদের উৎখাত করার চেষ্টা করল কেন ?

অ মি : এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, কেন উৎখাত করতে চাইল সে কথা আমি বলতে পারব না। আমরা অবহেলিত, এই জাতটা বাঁচুক এটা কেউ চায় না, সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঁচুক এটা কেউ চায় না। এই একটা কারণ হতে পারে, আর রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমরা ভীষণ, ভীষণ কাঁচা, আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে, কংগ্রেস ভাবল ওরা যদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সি পি এম হয়ে যাবে, বামফ্রন্ট ভাবল এদের ইন্ধন দিয়ে নিয়ে এসেছে এদের মনে যদি উদ্দেশ্য থাকে তবে এরা কংগ্রেসের সমর্থক হয়ে যাবে। রাজশক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হোক তাও তারা চায়নি, আমার দৃঢ় ধারণা বঞ্চিত অবহেলিত মানুষগুলো সংগঠিত হয়ে একত্র থাক এটা তারা চায়নি। আমরা দণ্ডকারণ্যে সংগঠিতভাবে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাদের স্কেটার্ড করে দিয়েছে, এখানে আমাদের সংগঠিতভাবে থাকতে দিতে চায়নি, আজ যদি আমরা সংগঠিতভাবে থাকতে পারতাম তবে কি করতে পারতাম তা দেখিয়ে দিতে পারতাম। ঐখানে যে ক দিন ছিলাম ঐখানে যে মাটিটা এই মাটি ধুয়ে ধুয়ে লবণ তৈরি করে বিক্রি করেছি আমরা, মরিচঝাঁপির মাটি ভীষণ নোনা মাটি, মাটিকে তুলে আনছি, এনে, ধুয়ে ধুয়ে যে জলটা বার করেছি সেটাকে সিদ্ধ করে... কোথায় লাগে টাটা লবণ, এত সুন্দর লবণ তৈরি করেছি, মোল্লাখালি বাজারে আমরা ঐ লবণ বিক্রিও করেছি, ওরা যে বলেছে আমরা বন জঙ্গল কেটে সাফ করেছি আমার বক্তব্য বনজঙ্গল মানে কি, গেঁওয়া গাছে বন হয় নাকি, বন তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, আমরা যখন বাঁধ দিয়েছি তখন ১০/২০ ফুটের মাথায় মাথায় বড় গাছ ঐ ২০ ফুট মাটি ভরাট হতে যে সময় লেগেছে, বন সেই সময় শেষ হয়ে গেছে। প্রকৃতি বলছে ওখানে আর বন হবে না, বনজ

সম্পদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, উপরে উপরে বড় গাছ পাবে। বড় গাছ শেষ হয়ে গেছে। নয়তো ২০ ফুট নীচে বড় গাছ পাবে কেন? এককালে বড় গাছ ছিল, সেখানে বড় গাছ জন্মাবে তাই প্রাকৃতিক নিয়মে ওখানে শেষ হয় গেছে। এই যদি বলেন আমরা বন ধ্বংস করেছি বাঁচার তাগিদে জ্বালানি কাঠ, গরান কাঠ আমরা কেটে বিক্রি করেছি। ওগুলো একটু মোটা হয়, জ্বালানি হিসাবে কেটে আমরা বিক্রি করেছি, এটাকে হাইলাইট করা হয়েছে। এটা নিতান্ত পেটের দায়ে। যতদিন অন্য ব্যবস্থা না আসছে, আমরা সমবায় ভিত্তিক ভেড়ি করেছিলাম, ৫টা ভেড়ি করেছিলাম। ঐ পাঁচটা ভেড়িতে বিশাল পরিমাণে মাছ হত, সাইজ হওয়া মাছ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে।

প্র : রাম চ্যাটার্জির ভূমিকা নিয়ে যদি কিছু বলেন—

অ মি : রাম চ্যাটার্জি নিজে কয়েকবার গিয়েছিলেন আলোচনার জন্য, আমরা তখন নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর অলোচনা করবে না। তারপর তৃতীয়বার রাম চ্যাটার্জি এলেন আমি তখন একটা জায়গায় ছিলাম একা, ভেড়িগুলো যে তৈরি করেছি তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আমার একার, কোনো নেতৃত্ব গিয়ে দেখেন নি ভেড়িগুলো তৈরি করছে কি হচ্ছে আমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে। এমনি একটি ভেড়ির মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না আমার তখন বাঘের ভয়ও নেই, এখন ভয় করে, এই রকম একটা জায়গায় একটু আগে বাঘ হেঁটে গেছে জল ঘোলা আছে তখনও, আবার বাঁধের উপর দিয়ে বাঘ গেছে থাবার চিহ্নগুলি তখনও রয়েছে তখন ভয় জাগেনি, কেন জাগেনি জানি না, এই রকম একটা জায়গায় আমি বসে আছি, রাম চ্যাটার্জি বললেন, এই ওঠ। কেউ আমার সঙ্গে কোনো উদ্বাস্তু ছিল না, আমি তখন লুঙ্গি-পাঞ্জাবি গায়ে, গামছা একটা মাজায় বাঁধা, আমি ভেড়ি তদারকিতে যাচ্ছি, আমি বললাম, 'আমার এই রকম পোশাক,' বলল, 'কিছু হবে না,' আমি বললাম, 'বাড়িতে তো অন্তত খবর দেওয়া উচিত, জঙ্গলে গেছি বাঘে খেয়েছি না কিসে খেয়েছে!' আমাকে লঞ্চে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসনাবাদে ওখান থেকে গাড়ি করে আমাকে ডাইরেক্ট নিয়ে চলে এল রাইটার্স বিল্ডিং-এ, আমি একা। আমাকে নিয়ে এলেন আলোচনা তো করতে হবে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে। আমি বললাম, 'স্যার, আমরা আলোচনায় বসতে পারি, কিন্তু দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পাঠাবেন না। এই আলোচনা করে তার পরে পাঠাবেন।' আমি একাই ছিলাম। জ্যোতিবাবুকে বললাম, 'আমরা আলোচনায় বসতে রাজি আছি আপনি সেইভাবে নির্দেশ দেবেন।' শুনে তিনি বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, জানানো হবে আপনাকে, আপনাদেরকে।' এই বলে রাম চ্যাটার্জি বলল, 'চল যাই।' রাম চ্যাটার্জি আবার গাড়ি করে হাসনাবাদে এনে নৌকায় মরিচঝাঁপি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। এর মধ্যে খবর হয়ে গেছে মিস্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই জানে জঙ্গলে গেছে। রাত বারোটার সময় ঘরে পৌছালে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায়

গিয়েছিলে ?' আমার তখন ভয় করছে। সমিতির কনসেন্ট ছাড়া আমি চলে গেছি কী চার্জ হবে কে জানে! আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তখনই বলেছি আমি জ্যোতিবাবুকে বলে এসেছি যতক্ষণ না আলোচনা হয় ততক্ষণ দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা বন্ধ রাখুন, এই নির্দেশটা দেন তো আলোচনা করব। আর খবরও পাঠায় নি। এদিকে আমাকে যখন হাসনাবাদে পৌঁছে দিচ্ছে পুলিশের গাড়ি করে তখন রেডিওতে খবর হয়ে গেছে যে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হচ্ছে সেই দিন রাত্রে। আর আলোচনা হল না। আমাদের উৎখাত করার জন্য তখন ইকনমিক ব্যারিকেড শুরু হল। ছেলেরা কাজের জন্য বাইরে গেছে পথে ঘাটে অ্যারেস্ট হয়েছে আর ফিরে আসে নি। আমাদের পক্ষে লড়াই করা সম্ভব হয় নি। এই সুযোগে পুলিশ ঢুকে পড়ে। ছেলেরা যে কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে আসবে, আসতেও পারছে না। কোন নৌকা ঢুকবে না, ব্যারিকেড রয়েছে, কেউ কেউ বলছে, 'আমরা দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ যাব।' আমরা সতীশবাবু, রঙ্গলাল, গোলদারবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম মোল্লাখালির একজনকে দিয়ে। বললাম, 'অ্যারেস্ট হবেন না, যেখানে পারেন চলে যান।' অত্যাচার শুরু হল বাড়ি ঘর ভাঙা দিয়ে, লোকজনকে মারধোর, মেয়েদের উপর যে অত্যাচার সে দেখাও যায় না, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই অবস্থা যখন চলছে সতীশবাবু, গোলদারবাবু কিন্তু মরিচঝাঁপিতে ছিলেন। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা যখন ছাড়িয়ে গেল, তখন তাদের পাঠিয়ে দিলাম, ঘরে আগুনও দিল। যতীন মণ্ডলের বাড়িতে আগুন লাগায় প্রথমে সম্ভবত পুলিশ এবং সঙ্গে কিছু যুবক ছিল। সাধারণ পাবলিক ছিল কারা আমরা জানি না। যতীন মণ্ডল সম্ভবত নাম। তার বাড়িতে যখন প্রথম আগুন লাগাল, তখন সতীশবাবুকে বললাম, 'আপনারা চলে যান, আর পারবেন না, আমরা অ্যারেস্ট হলে কিছু যায় আসে না, আপনি অ্যারেস্ট হয়ে আমাদের আন্দোলন মার খাবে। আপনি ভিতর দিয়ে আন্দোলন তুলে আনুন।' ওরা চলে গেলে আমি আর রাইহরণবাবু পড়ে রইলাম। রাইহরণবাবু বললেন, 'আমাদেরও চলে যেতে হবে।' আমি বললাম, 'রাইহরণবাবু! আপনি বৃদ্ধ আপনি চলে যান, আমি যাব না। কেন যাব না জানেন, আমি দেখাতে চাই, এখানে কি রেখে যাচ্ছি,' তখন একটা ছেঁড়া খেপলা জাল নিয়ে বললাম, 'ওরা দেখে যাক এখানে কী রেখে যাচ্ছি।' পাঁচটা ভেড়ির মধ্যে কোথায় কী আছে তাতো আমার নখদর্পণে। একটাতে খেপন দিলাম, জালে ভর্তি হয়ে উঠে এল বাগদা চিংড়ি। 'আর দেখবেন ? চলুন যাই,' তাতে উঠল বিরাট ভেটকি মাছ, আর দেখবেন জলের তলে দেখলেন জলের উপরে জল আর মাছ সমান পার্শে মাছ। অসংখ্য, এই ফেলে আজ কোথায় যাব আমি ? আপনি চলে যান, আপনারা বাঁচলে আন্দোলন বাঁচবে। এই অরবিন্দ মিস্ত্রী মরলে আন্দোলনের কিছু যাবে আসবে না। আমি যে করে রেখে গেছি এই পরিকল্পনা তো আপনারা কেউ করেন নাই, বাঁচার জন্য কিভাবে চাষ করতে হয় আমি তাই করেছি ফলে এই ছেড়ে আমি যেতে পারছি না। তিনি একটা

নৌকা ঠিক করে রেখেছিলেন, ওখান থেকে চলে গিয়ে কোথায় নামলেন তার পর আর কিছুই মনে নেই।

প্র : আপনি ফিরে আসার পর আর দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন ?

অ মি : আর যাইনি।

প্র : আপনার মনে হয় নি যে তারা কিরকম অবস্থায় আছে ?

অ মি : মনে হলেও আমার এখন কিছু করার নেই, আমার মনে বড় ব্যথা হয়, যারা পূর্ববাংলা থেকে একবার উদ্বাস্তু হয়ে এল দণ্ডকারণ্য গেল, কিসের আশায় আবার নতুন করে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এল, সে তো আমাদের জন্য আমাদের কথায় তো এখানে এল। আবার এখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে আবার উদ্বাস্তু হল আবার দণ্ডকারণ্যে গেল আর বহু মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনঅরণ্যে মিশে গেছেন। নেতার কাছে আমি ছিলাম সন্তানের মতো। আজ রাইহরণবাবু, রঙ্গলালবাবু বেঁচে নেই। তাদের জীবিত অবস্থাতে যদি দেখতে পারতাম, অনেক ভালো হত তাদের দুঃখ, ক্ষোভ ব্যথা কমতো কিন্তু যাওয়া হয়নি। সতীশবাবুর সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছি কিন্তু উনি নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। আমি আর এগোতে পারিনি।

প্র : এখন আপনি কি করছেন, ওখান থেকে চলে আসার পর কি পেশায় যুক্ত হলেন ?

অ মি : পেশা মানে ঠেলাগাড়ি, কলকাতার রাস্তায় দীর্ঘকাল ঠেলাগাড়ি চালিয়েছি, ছেলেপেলে নাবালক তখন শিশু, ছেলেপেলেদের পড়াশুনা করতে পারছি না, ছেলেদেরও নিলাম ঠেলাগাড়িতে, নিজে কাজ করতে পারছি না। বারো বছরের ছেলেকে ঠেলা গাড়িতে কাজে নিলাম। নিজেও পারছি না, অবার ওদের কষ্টও সহ্য করতে পারছি না। ওরা কষ্ট করে এনে খাওয়াবে, তখন বললাম তোরা যখন কষ্ট করছিস আর একটু কষ্ট করে আমাকে বস্তায় ভরে কয়লার গুঁড়ো এনে দে। ওরা সারাদিন খাটনির পরে ট্রেনে করে এনে প্ল্যাটফর্মে রেখে দিত, আমি সকালে সাইকেলে পাড়ায় পাড়ায় ঐ কয়লার গুঁড়ো বিক্রি করতাম। তাতে সারাদিনে হাঁড়ি চড়ত না, তবু একবেলার ব্যবস্থা হল, এখন কয়লার গুঁড়োর একটা দোকান দিতে পেরেছি। এখন খাওয়াপরার চিন্তাটা আপাতত নেই, অস্বচ্ছলতা কিছুটা কেটেছে। চারটে ছেলে এখন তারা এখন সাবালক সকলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। চার ছেলে, দুটো মেয়ে সকলের বিয়ে হয়ে গেছে, তারা এখন সকলেই আলাদাভাবে আছে। ছোট ছেলে আমার সঙ্গে আছে। আমার একটা অবলম্বন দরকার। বড় ছেলে ডেকোরেশন মিস্ত্রীর কাজ করে, মেজ ছেলে বাড়িতে আছে ভ্যান চালায়। সেজ ছেলের অবস্থাটা ভালো— রাজস্থানে আছে।

সাক্ষাৎকার : ১৭ জুলাই ২০০৬



প্রকৃত নাম নির্মলকান্তি ঢালী। সতীশ মণ্ডল মরিচঝাঁপিতে ওর নাম ব্যবহার করতেন নির্মলেন্দু ঢালী। মরিচঝাঁপিতে নেতাজী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

দণ্ডকারণ্য, মরিচঝাঁপি ও আমার বিদ্যালয়

নির্মলেন্দু ঢালি

আমি তখন নবম শ্রেণিতে পড়ি। একদিন বাবা খুলনা থেকে বাড়িতে এসে বললেন, আমাদের আর এদেশে থাকা হবে না। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? দেশ ছেড়ে আমরা কোথায় যাব?' বাবা বললেন, 'খুব শীঘ্র এখানে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হবে, মুসলমানরা আমাদের এখানে থাকতে দেবে না, সরকারও ওদের মদত দিচ্ছে, আমরা হিন্দুরা এদেশে আর থাকতে পারব না। যেতে আমাদের হবেই, এখানে থাকলে আমাদের মেরে ফেলে দেবে।' সপ্তাহখানেকের মধ্যে বাবা এক মুসলমান দালাল ঠিক করে আমাদের নিয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করলেন। আমাদের পরিবারে বাবা, মা, ঠাকুমা, আমি, আমার ছোট বোন। সব কিছু ফেলে রেখে আমাদের নিয়ে নৌকা যোগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নদীপথে অনেক দূরে আমাদের নামিয়ে দেওয়া হল। ঠাকুমার বয়স তখন আশির উপরে, একেবারে হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। মোড়ায় করে নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। প্রায় ১৫/২০ মাইল পায়ে হেঁটে অতি কষ্টে দালালের বাড়িতে এলাম। দালাল আমাদের ওখানে কাছের ঘেরির কাজ করতেন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল, বাবার খুব বিশ্বস্ত ছিল। বাবার যা কিছু

টাকাপয়সা ছিল ওই দালালের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। রাত্রিতে নদী পার করে এপারে পাঠিয়ে দিল কিন্তু এক টাকাও ফিরিয়ে দিল না। নিঃসম্বল কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমাদের নিয়ে বাবা এক হাটখোলায় কয়েকমাস কাটালেন। মায়ের কাছে কয়েকটি টাকা ছিল তা দিয়ে কয়েক দিন চলল। তারপর বাবা অনেক কষ্ট করে কয়েক দিন যাবৎ লাইন দিয়ে সরকারি খাতায় নাম লেখালেন। যার ফলে মাঝে মাঝে চিড়ে গুড়, রুটি খেয়ে অতি কষ্টে দিন কাটাতে লাগলাম। এভাবে এক মাসের উপরে কেটে গেল তারপর ডাক হল পাঠিয়ে দিল মানা ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। রেলে নিয়ে নামিয়ে দিল রায়পুর স্টেশনে। ওখানে থেকে লরি করে নিয়ে নামাল কেন্দ্রীর ফাঁকা ময়দানে, ছোট তাঁবু পাতা, অপরিষ্কার একটা তাঁবুতে একজন মানুষ কোনোরকমে থাকা যায়, তার মধ্যে একটি পরিবার সে যত বড়ই হোক না কেন। জলের কোনো ব্যবস্থাই নেই, মল মূত্রত্যাগের কোনো প্রকার ব্যবস্থা নেই মরুভূমির ন্যায় মাটি কোথাও কোনো গাছপালা নেই। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে। অনুদান বলতে গেলে ৮ টাকা থেকে ৭৮ টাকা। প্রতি দশ দিনে সে যত বড় পরিবারই হোক না কেন! পানীয় জলের কোনোরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত মানুষ রাত দিন ২৪ ঘন্টা ফাঁকা মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, লরিতে করে মানা ক্যাম্প থেকে কখনও কখনও জল এনে দিত। কেউ পেত, কেউবা পেত না। জলের অভাবে, খাদ্যের অভাবে, ওষুধ পথ্যের অভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল মড়ক। প্রতিদিন শত শত মানুষ মরতে লাগল। লরি ভরে নিয়ে বরদার ময়দানে পাহাড় সমান স্তূপ করা হত তারপর কিছু কাঠ দিয়ে আগুন দেওয়া হত, কোনটা পুড়ত, কোনটা বা আধপোড়া হত তো কোনটার গায়ে আগুন লাগত না, শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেত। মানার অন্তর্গত ৫টি ক্যাম্প ছিল— মানা, মানাভাটা, বরদাভাটা, কুরুদ ও নওগাঁ। প্রতিদিন এই ৫টা ক্যাম্প হতে লরি করে এইভাবে লাশ এনে ফেলা হত। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় রোলকল হত। রোলকলে প্রত্যেক পরিবারের প্রধানকে হাজিরা দিতে হত। উপস্থিত না থাকলে ডোল কাটা হত। প্রতি সপ্তাহে একবার সেনসার। তাতে পরিবারের সকলকে উপস্থিত থাকতে হত। অন্যথায় ডোল বন্ধ। এই আইনের ফলে কোনো লোক ক্যাম্পের বাইরে যেতে পারত না, কোনো রোজগারও করতে পারত না। দিনের পর দিন অর্ধাহারে অনাহারে থেকে মানুষ কঙ্কালসার হয়ে যেতে লাগল। অগণিত মৃত্যু। কিছু লোক ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকল। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসার সময় আমি স্কুল সার্টিফিকেট আনতে পারিনি তাই আমার মানা হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হল না। ১৯৭১ সালে কেন্দ্রি ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে আমাদের বরদাভাটা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। অর্ধাহারে অনাহারে থেকেও রোগাক্রান্ত হয়ে আমার মা ও ঠাকুমা ১৫ দিনের ব্যবধানে মারা গেলেন।



মরিচঝাঁপি নেতাজী বিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা (বাঁদিক থেকে চতুর্থ) প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু ঢালি

থাকলাম বাবা আমি ও ছোট বোনটি। ১৯৭১ সালে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে মানা হাইস্কুলে ভর্তি হই।

১৯৭৪ সালে শুরু হয় উদ্বাস্তু আন্দোলন। প্রথমে বিমল চক্রবর্তী, ধীরেন দের নেতৃত্বে গঠন হয় 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'। পরে সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার, রাইহরণ বাড়ৈ, রবীন চক্রবর্তীরা সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের পূর্বে যাদের পুনর্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের বেশির ভাগ পরিবার চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। অনুর্বর জমি উদয়অস্ত পরিশ্রম করেও কোনো ফসল ফলাতে পারত না। বর্ষার জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল কিন্তু বর্ষাও হত না। মানাতে সুখী পুনর্বাসনের দাবিতে যখন তুমুল আন্দোলন শুরু হল সেই আন্দোলনে বিভিন্ন পুর্নর্বাসন অঞ্চল থেকে যেমন মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর কর্ণাটকের সিন্ধানুর মধ্যপ্রদেশের বেতুল পারালকোট অন্ধ্রপ্রদেশের কাগজনগর ওড়িষ্যা প্রদেশের উমরকোটও মালকানগিরি বিভিন্ন পুনর্বাসন অঞ্চল থেকে শরণার্থী এসে আন্দোলনে যোগ দিল। সমিতির কর্মকর্তারা বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে সভা সমিতি করতে শুরু করল। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে নারী-পুরুষ আবালবৃদ্ধবনিতা মিছিল করে মানা ক্যাম্পে চিফ কমান্ডেন্ট অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে আরম্ভ করল। শ্লোগান উঠল 'আমরা কারা ? বাস্তুহারা, বাস্তুহারা ভাই ভাই, পুনর্বাসন বাংলায় চাই। আমাদের

দাবি মানতে হবে, বাংলায় সুস্পষ্ট পুনর্বাসন দিতে হবে' ইত্যাদি। এই সময় নানান অজুহাতে অনেক পরিবার ক্যাম্প আউটও করে দেওয়া হয়। আজ তারা অনুপ্রবেশকারী নামে পরিচিত।

কিছুদিনের মধ্যে আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করল। শুরু হল অনশন ধর্মঘট, প্রত্যেক ক্যাম্পে যথানিয়মে অনশন চলতে লাগল ১৪৪ ধারা জারি করা হল, প্রথমে উদ্বাস্তুদের উপর গুলি চালানো হল কুরুদ ক্যাম্পে, বেশ কিছু লোক আহত হল মরলও কয়েকজন। তারপর পৈশাচিকভাবে গুলি করে মারা হল মানাভাটা ক্যাম্পে। এই গুলি কাণ্ডের পর মানাভাটা ক্যাম্পের নামকরণ হল শহিদভাটা। এই গুলি কাণ্ডের পরেও আন্দোলন একটুও শিথিল হল না বরং আরও বেশি জোরালো আকার ধারণ করল। একমাস পরে, শুরু হল অমরণ অনশন। সতীশবাবু নিজে আমরণ অনশনে বসলেন আর প্রত্যেক ক্যাম্প থকে একজন করে। আমরণ অনশনে বসল চিফ কমান্ডেন্ট অফিসের সামনে মঞ্চ তৈরি করে। প্রতিদিন মিছিল করে প্রত্যেক ক্যাম্প থেকে আমরা উদ্বাস্তুরা ওই অনশন মঞ্চের কাছে সমবেত হলে শ্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতাম। এই আমরণ অনশন সাত দিন চলার মধ্যে অনেক সরকারি কর্মচারী ক্ষমতাসীন সরকার পক্ষের কিছু নেতারা বারংবার এসে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালালেন। আমরা হাজার উদ্বাস্তু অনশন মঞ্চের চারিদিকে সব ২৪ ঘণ্টা সজাগ থাকতাম যাতে কোনো প্রকারে জোরপূর্বক অনশন তুলে দিতে না পারে। শেষপর্যন্ত অনশনকারীরা একেবারে যখন মরণাপন্ন অবস্থায় তখন দিল্লি থেকে কয়েকজন বড় নেতা এসে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অনশন তুলে দেয়।

এই সময় আমার পারিবারিক অবস্থা হল আমি ১১ ক্লাসে পড়তাম, ছোট বোনটার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পরিবারে তখন বাবা আর আমি ছিলাম। বাবা একটা রেশন দোকানে মাপাজোপার কাজ করতেন, মাসে ২৫ টাকা করে পেতেন। বাবার বয়স তখন ৭০ এর কাছে। আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ বলতে সরকার পুরুষদের জন্য কুর্তা দিত, ছোটদের জন্য হাফ প্যান্ট, পুলিশের খাকি ঢিলা প্যান্ট, বড়দের জন্য ধুতি, মেয়েদের ছোট বড় সবার জন্য শাড়ি। সেইসব কাপড় এত নিম্নমানের ছিল যে, একবার জলে দিলে মশারির চেয়েও পাতলা হয়ে যেত। পরিধান লজ্জা ঢাকার জন্য ব্যবহার করতে হয় কিন্তু এই ধরনের বস্ত্র আমাদের কোনো জীব মনে করে কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হত একমাত্র তারাই জানতেন। মা বোনেরা নিরুপায় হয়ে দুই তিন প্যাচ দিয়ে ওগুলো পায়ে পেঁচিয়ে থাকতেন। ওই খাকি হাফ প্যান্ট আর কুর্তা পরে আমরা যখন স্কুলে যেতাম তখন সরকারি কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা আমাদের শরণার্থী ছেলেদের ডাকত ভাইদা বলে। এইসব উপহাস পরিহাস প্রতিদিন আমরা নীরবে সহ্য করতাম, পড়াশুনা করার জন্য বাড়িতে কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না। রাত দশটার পরে ক্যাম্পের মানুষ যখন

কিছুটা নীরব হয়ে যেতেন তখন বই নিয়ে এলেস্ট্রি থামের নিচে গিয়ে বসতাম। আমার খরচ বাবা কিছুই দিতে পারতেন না, প্রত্যেক পরিবার রাত তিনটের সময় উঠে নিজে হাতে রুটি তৈরি করে নিয়ে দশ কিলোমিটার পথ হেঁটে রায়পুর গিয়ে কারখানায় অথবা কারো বাড়িতে লেবারের কাজ করতাম। ৮ ঘণ্টা কাজ করে পেতাম মাত্র দু টাকা। ওই টাকা দিয়ে সারা সপ্তার খরচ চালাতাম। সকালে আমি নিজে রান্না করে খেয়ে বাবার জন্য রেখে স্কুলে যেতাম। এইভাবে কষ্ট করে পড়াশুনা করে ১৯৭৪ সালে আমি দ্বিতীয় বিভাগে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় পাশ করি।

এদিকে আমাদের আন্দোলন তখন জোরদারভাবে চলছে। সরকারি প্রশাসন তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিভাবে আমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যায় সেই চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য জুলুম চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের তখন একই দাবি, সুষ্ঠু পুনর্বাসন আমরা বাংলাতেই চাই অন্য কোথাও আমরা যেতে রাজি নই। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে চিফ কমান্ডেন্ট এস. পি. নন্দী সাহেবকে বদলি করে বিগ্রেডিয়ার দাসকে আনা হল। দাস সাহেব এসেই ডোল বন্ধ করে পুলিশ দিয়ে জলুম করে ডাকে পাঠাতে শুরু করলেন। এই সময় ডাকে না গিয়ে অনেক পরিবার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গেল, তারা আজ অনুপ্রবেশকারী। এমনিভাবে ১৯৭৪-৭৬ সালের মধ্যে ক্যাম্প থেকে সব পরিবারকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমার পরিবারকেও অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হল ওড়িষ্যার মালকানগিরি জোনে। মানাভাটা ক্যাম্প থেকে লরিতে করে গরু ছাগলের মতো একটার পর একটা ভর্তি করে দেওয়া হল। রাস্তায় লরির মধ্যে শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা সব বমি পায়খানা প্রস্রাব করে গাড়ির ভিতর সে কি মরণাপন্ন অবস্থা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অনুভব করা সম্ভব নয়। রাস্তায় ক্যাসকলখাটির উপর উঠলে শুরু হল মরণ চিৎকার। ক্ষিদে তেষ্টায় কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল। দুই দিন দুই রাত পরে মালগিরিতে নিয়ে পানড্রিপানি নামক এক অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখল। জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটা খোলা ঘর। খুটির উপর টিন দিয়ে ছাওয়া কোনো বেড়া দরজা জানালা কিচ্ছু নেই। ওই দলে আমরা ছিলাম ৩ পরিবার। ক্ষিদে তেষ্টায় সবাই তখন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সন্ধ্যাবেলায় গাড়িতে করে কোথা থেকে একটু খিচুড়ি এনে দিল। তাই খেয়ে সকলে একত্রিত হয়ে ভয়ে ২ রাত কাটালাম। ওখানে দিন কয়েক থাকার পর হঠাৎ একদিন একটা জিপগাড়িতে কয়েকজন সরকারি কর্মচারী এসে বললেন, 'আগামীকাল তোমাদের কর্মী শিবিরে যেতে হবে।' যথারীতি তারপর দিন কয়েকটা লরি এসে আমাদের ঢেলে দিল এক গভীর জঙ্গলের ভিতর। জঙ্গলের মধ্যে অল্প একটু জায়গা, বড় গাছগুলো ২/৩ ফুট দিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে, ছোট লতাপাতা গাছ সব রয়েছে তার মধ্যে কিছু মালবাহী লরি ঢাকা তারপলেন টাঙানো। আমাদের নির্দেশ

দেওয়া হল এখানে তোমরা থাকবে এটা কর্মী শিবির এখান থেকে তোমাদের সরকারি কাজ করতে হবে। আমরা অনুনয় করে বললাম, 'এখানে আমরা কী করে থাকব স্যার? এই জঙ্গলের মধ্যে এই অবস্থায় থাকা কি সম্ভব?' জবাবে বললেন, 'থাকতে তো তোমাদের হবেই আর কাজও তোমাদের করতে হবে।' আমরা সকলে মিলে সমস্বরে বললাম, 'কাজ করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই স্যার, দয়া করে আমাদের এই জঙ্গল থেকে কোনো লোকালয়ে নিয়ে চলুন। আপনারা যা বলবেন আমরা তাই করব। আমাদের বাঁচান স্যার।' বলল, 'তোমাদের এখানেই থাকতে হবে। আপাতত অন্য কোথায় নিয়ে যাওয়া যাবে না।' বলে চলে গেলেন। রাত্রিতে আমরা ভয়ে জড়সড় হয়ে এক জায়গায় জমা হয়ে আছি। পাশেই উঁচু পাহাড়, ভাল্লুক চিৎকার করছে, এর আগে কখনও এইসব হিংস্র পশুর গর্জন আমরা শুনিনি। ভয়ে শিশুরা মা বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করতে লাগল। পাশে চারিদিকে আমরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে বসে থাকলাম। রাত যত গভীর হতে থাকল ওই বাঘ ভাল্লুক পাহাড় থেকে নেমে এগিয়ে আসতে শুরু করল। আমরা তখন আরও বেশি করে চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিলাম। সকলে মিলে জোরে চিৎকার করতে থাকলাম, মাঝরাত পরে হঠাৎ একটা বাচ্ছা মেয়েকে সাপে কামড়াল, মেয়েটা চিৎকার করে উঠতেই ওর বাবা দেখল সাপটা কামড়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ৪/৫ ফুট লম্বা কালকেউটে সাপ, মেয়েটার বাবা ছিল দক্ষিণ খুলনার সুন্দরবন অঞ্চলের লোক ভীষণ সাহসী। সাপটিকে পালিয়ে যেতে দেখে সঙ্গে একটা বস্তা দিয়ে জাপটে সাপটাকে ধরে ফেলল। ধরেই একটি কলসির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জাল দিয়ে কলসির মুখ আটকিয়ে দিল। চীৎকার শুনে আমরা অনেকে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড কালকেউটে কলসির মধ্যে গর্জন করছে। মেয়েটার বাবাকে বললাম, মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে কি উপায়ে! পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল, উনি বললেন, আমি দেখছি, আপনারা একটু সরে যান আমাকে দেখতে দিন। উনি মেয়েটার কাছে দেরি না করে ঝাড়ফুঁক শুরু করলেন। তখনও ক্ষত জায়গা দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরচ্ছে। সারা রাত ধরে মেয়েটাকে চিকিৎসা করলেন। পরদিন সকালে সাইকেলে করে দুপুর নাগাদ মেয়েটাকে নিয়ে এক চিকিৎসালয়ে পৌঁছাই। তারপর সকলে মিলে কয়েকদিম ধরে আমাদের ওই থাকার জায়গাটাকে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করি। কয়েকদিন আমাদের পুকুর খনন করার জন্য সরকারি লোক এসে লরিতে করে গাইতি কোদাল এনে দিয়ে গেল। তারপর থেকে প্রতিদিন পুকুরে মাটি কাটতাম রাত্রিতে ক্যাম্প পাহারা দিতাম এমনিভাবে আমাদের ওই ক্যাম্পে এক বৎসর রাখা হয়। ওখানে আমরা ২টা পুকুর খনন করি। তারপর ওখান থেকে এক কর্মী শিবিরে নিয়ে রাখা হয়। ওখানেও ঠিক একই অবস্থা। জঙ্গলের মধ্যে তারপালন পাতা। আমরা গিয়ে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে ওখানে থাকলাম। এবার আমাদের

দিয়ে জঙ্গল পরিস্কার করানে শুরু হল। আশেপাশে কিছুটা জঙ্গল যখন পরিষ্কার হয়ে গেল ১৯৭৭ সালে ওখানেই আমাদের পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হল। এক জোড়া বলদ আর কিছু ধানের বীজ ও কিছু সার দেওয়া হল অল্প একটি জমি চাষ করলাম। তেমন কোনো ফসলও হল না। ইতিমধ্যে মানার পুর্নবাসন আন্দোলন আবারও জোরালো হয়ে উঠল।

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির পক্ষ থেকে সতীশবাবু চিঠিপত্রের মাধ্যমে সমস্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে সরকার গঠনও করেছিল। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি নিয়মিতভাবে এই সরকারের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে বামফ্রন্ট সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ও পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক অশোক ঘোষ বহির্বাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্রে যথা— মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর, মধ্যপ্রদেশের পারুলকোট, অন্ধ্রপ্রদেশের কাগজনগর, ওড়িষ্যার উমরকোট, মালকানগিরিতে গিয়ে বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দিয়ে বলেন, 'কংগ্রেস সরকার আপনাদের দণ্ডকারণ্যে এনে পুনর্বাসনের নামে যে নির্বাসন দিয়েছে এটা আমরা স্বচক্ষে দেখলাম। আপনাদের এই অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার সত্যিই দেখা বা সহ্য করা যায় না। আমি ফিরে গিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুকে অবশ্য আপনাদের এই চরম দুর্গতির কথা জানাব। আপনারা চিন্তা করবেন না খুব শীঘ্রই আপনাদের দাবি মেনে নিয়ে সুন্দরবনে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।'

অশোকবাবু বলেন, 'কংগ্রেস সরকার আপনাদের নিয়ে যে ধরনের প্রতারণা করেছে তা আমরা দেখে গেলাম। আপনারা পশ্চিমবাংলায় এলে পশ্চিমবাংলার ৫ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত আপনাদের সমর্থনে গর্জে উঠবে। আপনারা মোটেই দুঃখ করবেন না, দিন আপনাদের আসবেই। আমাদের ডাক এলেই আপনারা সকলে পশ্চিমবাংলায় চলে আসবেন।'

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই শুরু হয়ে গেল সুন্দরবন যাওয়ার প্রস্তুতি। দণ্ডকারণ্য সহ অন্যান্য সকল পুনর্বাসন অঞ্চলে সমিতির পত্রমাধ্যমে খবরাখবর হয়ে গেল, 'এবার আমাদের সুন্দরবন রওনা হতে হবে। যে যেভাবে পারেন সুন্দরবন যাত্রা করুন।' উদ্বাস্তুরা তখন সব কিছু ফেলে সুন্দরবন যাত্রা শুরু করল। প্রথম কিছু লোক চলে যাওয়ার পর প্রশাসন বিভাগ সক্রিয় হয়ে উঠল গাড়িতে বাসে উদ্বাস্তুদের উঠানো বন্ধ করে দিল। মানুষ তখন পায়ে হেঁটে উড়িষ্যা বর্ডার পার হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ গিয়ে গাড়ি ধরে পশ্চিমবাংলায় যেতে থাকল। পথিমধ্যে বিভিন্ন রেলস্টেশনে উদ্বাস্তুদের পুলিশ দিয়ে নামানো হল, বিভিন্ন রেল স্টেশনে উদ্বাস্তুদের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। বিভিন্ন রাস্তা ধরে বহু পরিবার পশ্চিমবাংলার ২৪ পরগনার বসিরহাট হাসনাবাদ অঞ্চলে পৌছে গিয়েছিল। আমি

যখন হাসনাবাদ পৌঁছলাম তখন বসিরহাট থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত উদ্বাস্তু পরিবারে, রেল স্টেশনে, রাস্তার ধারে এমনকি মাঠঘাট সব ভর্তি হয়ে গেছে। তাকালে দেখা যায় শুধু উদ্বাস্তুদের পলিথিন কাগজের ছই। দিন কয়েকের মধ্যেই সব জায়গা পূর্ণ হয়ে গেল। এখন উদ্বাস্তুরা আর দাঁড়াবার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। সমিতির কর্মকর্তা তখন প্রায় সবাই ওই জায়গায় পৌঁছে গেছেন।

সতীশবাবু অন্যান্য সকলে এক জায়গায় বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলেন, রামবাবুর কাছে যেতে হবে কারণ এমতবস্থায় তার পরামর্শ না নিয়ে আমরা কি করতে পারি! রামবাবুর কাছে গেলে উনিও চলে এলেন হাসনাবাদে সমিতির কর্মীদের নিয়ে মিটিংও করলেন। বললেন, 'আমরা সরকারি ভাবে তো আপনাদের সুন্দরবন নিয়ে যেতে পারব না। তাই আপনারা যে ভাবে পারেন সুন্দরবন চলে যান। আমরা তো আপনাদের সঙ্গে আছি। পরোক্ষভাবে আমরা আপনাদের সাহায্য করব।' এইভাবে আশ্বাস দিয়ে রামবাবু চলে গেলেন। এদিকে ইছামতী নদীর খেয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। লঞ্চেও কোনো উদ্বাস্তু উঠানো বন্ধ করে দেওয়া হল। এবার সমস্যা দাঁড়াল সুন্দরবন কি উপায়ে যাওয়া হবে? সিদ্ধান্ত হল খেয়া জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনা হবে। কিন্তু ওপার যাওয়া হবে কি করে? বেশ কিছু যুবক মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করে নদী সাঁতরিয়ে ওপার গিয়ে খেয়া নৌকা জোর করে ছিনিয়ে আনল। ইছামতী নদী সাঁতার কেটে পার হওয়ার সময় যুবকদের মধ্যে কয়েকজন খরস্রোতে বড় নদীতে ভেসে চলে গেল এবং কয়েকজনকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। এবার শুরু হল নদী পার হয়ে ওপার যাওয়া। দিন রাত নদী পারাপার চলতে লাগল। ওপার গিয়ে ধান বা কোনো ফসল মাঠে ছিল না। ওই ফাঁকা মাঠে পলিথিনের কাগজ দিয়ে ছৈ বানিয়ে সকলে থাকা শুরু করল। কয়েকদিনের মধ্যেই চর হাসনাবাদের মাটি উদ্বাস্তু পরিবারে পূর্ণ হয়ে গেল। কিছু পরিবার এরই মধ্যে সুন্দরবনের অপর পার কুমিরমারিতে গিয়ে পৌঁছে গেল। ৩/৪ হাজার পরিবার যখন কুমিরমারিতে পৌঁছে গেছে এবার মরিচঝাঁপি যাওয়ার পালা। নদী পারাপারের সমস্যা দেখা দিল। তখন স্থানীয় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। ওদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে দেখা গেল ওরাও আমাদের লোক অনেকেই আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। যার ফলে নদী পার হওয়ার জন্য ওরা আমাদের সবরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। ওরা তখন নৌকা খোঁজ করতে শুরু করে দিল ওখানে যার যার নৌকা ছিল সেইসব নৌকা এনে আমাদের পার করতে শুরু করল। পার হওয়ার জন্য আমাদের কয়েকখানা নৌকা দিয়ে দিল। তখন আমাদের লোক পারাপার করতে লাগল। ওদিকে যে যেভাবে পারে হাসনাবাদ ক্যানিং দিয়ে লোক তখন মরিচঝাঁপিতে পৌঁছাতে লাগল। দিন কয়েকের মধ্যেই তখন মরিচঝাঁপিতে হাজার হাজার পরিবার একত্রিত হয়ে গেল। এবার সমস্যা দেখা দিল খাদ্যের ও পানীয়ের। নদীর জলে

ভয়ঙ্কর লবণ। নদী পার হয়ে কুমিরমারি থেকে পুকুরের জল নিয়ে পান করা চলল, দেখতে দেখতে আশেপাশের পুকুর শুকিয়ে আসাতে ওরা মাছ মরে যাবে— এই ভয়ে পুকুরের জল নিতে মানা করল। তখন আরও দূরে গিয়ে অন্য পুকুর থেকে জল আনা শুরু হল।

খাদ্যসংগ্রহের জন্য আমাদের মধ্যে যাদের কাছে কিছু পয়সাপত্র ছিল তারা মোল্লাখালি হাটে গিয়ে কিছু খুদ, আটা, চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এনে যোগান দিতে লাগল। সমিতির একটা জরুরীকালীন সভা ডাকা হল। তখন পর্যন্ত সমিতির যে সকল সদস্য মরিচঝাঁপিতে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা সকলেই সভায় হাজির হলেন, সতীশবাবু, রবীনবাবু, রঙ্গলালবাবু, রাইহরণবাবু, অরবিন্দবাবু এবং অন্যান্য যুবক সদস্যবৃন্দ সকলেই।

সভার আলোচ্য বিষয়— থাকার ব্যবস্থা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শৃঙ্খলারক্ষা, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। প্রথমেই আলোচনা হল বাঁধ নির্মাণের কথা— তখন ঐ দ্বীপে জোয়ারের জল ওঠানামা করে কাজেই প্রথমে ওটা আটকাতে না পারলে ওখানে থাকা সম্ভব নয়।

তারপর আলোচনা গৃহনির্মাণের কথা— পাঁচটা সেক্টরেভাগ করা হল। একজনকে একটা করে সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হল। রাস্তা ঠিক রেখে সারিবদ্ধভাবে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করা হবে। তারপর আলোচনা হল খাদ্য ও পানীয় জলের উপর এই গুরুদায়িত্ব কয়েকজনের উপর দেওয়া হল, তার একজন দেবব্রত বিশ্বাস ও বারিষ গোলদার, রাইহরণ বাবু নিজেও এই দায়িত্ব নিলেন।

বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব নিলেন সতীশবাবু নিজে, স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পড়ল সমীর সমাদ্দারের উপর, আমার উপর পড়ল শিক্ষার দায়িত্ব। এমনিভাবে যে কাজ দায়িত্ব নিয়ে ঠিকভাবে করতে পারে ঠিক সেইভাবে কর্মবণ্টন করে দেওয়া হল। প্রত্যেকের মধ্যে কাজের একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের উপর পড়ল প্রচার বিভাগের দায়িত্ব। হাজার দুই মানুষ বেরিয়ে পড়লাম প্রথমে বাঁধ নির্মাণের কাজে। দেখতে দেখতে খাল বাঁধা, ভেড়ি বাঁধা হয়ে যেতে লাগল। প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মকার দিবারাত্র পরিশ্রম করে খোন্তা, লাফনা, কোদাল, কুড়াল, দা ইত্যাদি বানাতে শুরু করলেন। প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন বাঁধ নির্মাণের কাজে যাওয়ার নিয়ম ছিল, কোনো পরিবার থেকে ২/৩ জনও কাজ করতে যেত। অল্পদিনের মধ্যে বাঁধ তৈরি হয়ে গেল। মরিচঝাঁপিতে কোনো বড় গাছ বা ঘন জঙ্গল ছিল না। গেউয়া, গরানের মুথা, ছিটে হেতালি ও ছোট লতাপাতা ছিল। ওগুলি পরিষ্কার করার কাজ চলছিল। ওই সব জঙ্গল পরিষ্কার করা মুথা, ছিটে, গেওয়া মাথায় করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে লোকে বিক্রি করে খাদ্যের জোগাড় করত। স্থানীয় বাড়িতে না কলকাতার দিকে এসে কাজ করে অনেকে খাদ্য সংগ্রহ করত।

আমার উপর শিক্ষার দায়িত্ব পড়ায় প্রথমে কতগুলি ঝুপড়ি ঘর তৈরি করি তারপর স্কুল আরম্ভ করি। প্রথমে পাঁচজন শিক্ষক শিক্ষিকা মিলে শুরু করি। ১ মাসের মধ্যে স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় দুই তিন হাজার গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে আমরা যারা শিক্ষাদান শুরু করি তারা হলেন— নির্মলেন্দু ঢালী, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, কনিকা বিশ্বাস, অমিত কুমার মণ্ডল, স্নেহলতা মল্লিক, পারুল দে। পরে যখন ছাত্রছাত্রী আরও বেড়ে গেল তখন আরও শিক্ষিকা নেওয়া হল। তারা ছিলেন গীতারানি মৈত্র, সুকুমার পাল, ভদ্রকান্ত মিস্ত্রী, ভবতোষ মণ্ডল, রবীন রায়।

স্কুল সংলগ্ন বিরাট ফুটবল খেলার মাঠ। অন্যদিকে চিকিৎসালয়, অনতিদূরে বাজার। বাজারে শতাধিক স্থায়ী দোকান ছিল। তার মধ্যে মিষ্টির দোকান, মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান। চাউল, শাকসবজি ও মাছ ইত্যাদি দোকান ছিল। তাছাড়া প্রত্যেক দিন বিকালে স্থানীয় লোক এসে বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি, তরকারি, মাছ, ফলফলাদি বাজারে বসে বিক্রয় করত। স্কুল চালানোর পর আমরা শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী মিলে প্রত্যেক দিন ছুটির পর বাজারে গিয়ে দোকানদারদের কাছ থেকে ভিক্ষা চেয়ে নিতাম। এ পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েদের বইপত্র, খাতাকলম, স্লেট, পেন্সিল ইত্যাদি কিনে দেওয়া হত। ওখানকার আশেপাশের কুমিরমারি, মোল্লাখালি, ছোট মোল্লাখালি, সন্দেশখালি, ওখানকার বাসিন্দারা আমাদের দুঃখকষ্ট দেখে আমাদের সাহায্য ও সমর্থন দিতেন। অনেক মিশন থেকে বইপত্র আসত, দয়া মুখার্জি আমাদের অবস্থা দেখে বইপত্র দিয়েছিলেন। আমরা অনেক আশা নিয়ে শুরু করেছিলাম।

বেসরকারি কয়েকটি ত্রাণ সংস্থা কিছু কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করতে শুরু করল। কিছু জিনিসপত্র জুগিয়ে দেওয়ায় আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থাও করলাম। নলকূপে এত সুন্দর জল উঠল যা পশ্চিমবঙ্গে বিরল। ত্রাণ সংস্থার পক্ষ থেকে এবং অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি ওষুধপত্র, খাদ্যবস্ত্র, কম্বল দান করতেন। সকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সরকারি কোনোরূপ সাহায্য ছাড়া গড়ে উঠল একটা সুন্দর পরিবেশ। নতুন নগরীর নামকরণ হল 'নেতাজী নগর'। স্কুলের নামকরণ হল 'নেতাজী নগর উচ্চ বিদ্যাপীঠ'। স্কুলের বিদ্যার্থীর সংখ্যা চার হাজার হবে। পরে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা পঁচিশ হয়েছিল।

২৪/১/৭৯ তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী মরিচঝাঁপিতে আমাদের অবরুদ্ধ করে দেয় খাদ্য ও অর্থনৈতিক অবরোধ করে আমাদের খাদ্য পানীয় সবকিছুর যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়, খাদ্যের অভাবে ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠে, পুলিশ দিনরাত আমাদের চারিদিকে টহল দিতে থাকে, খাদ্যের অভাবে মানুষ গাছের পাতা, ঘাস, মাছ সিদ্ধ করে খেতে শুরু করে, ওখানে একপ্রকার

লবণঘাস জন্মায় স্থানীয় লোকে ওকে বলে যদু ঘাস। মহানুভব মুখ্যমন্ত্রীর নাম অনুসারে ঐ ঘাসের নাম আমরা দিয়েছিলাম 'জ্যোতি পালং'।

অবরোধের ফলে ইতোমধ্যে ২৭ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল। সরকারের বক্তব্য, 'দণ্ডকারণ্যে ফিরে না গেলে আমাদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারা হবে।'

শুধু অবরোধ করে ওরা ক্ষান্ত হয়নি, ২৪/১/৭৯ তারিখে তৃষ্ণার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের মেয়েদের বোঝাই কয়েকটি নৌকা নেতাজীনগর থেকে কুমিরমারির পারে জল আনতে যাচ্ছিল কিন্তু পুলিশের লঞ্চ ধাক্কা মেরে নৌকাগুলি নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং ওদের ওপর চার রাউন্ড টিয়ার গ্যাস বর্ষণ করে। মেয়েদের উপর এই পাশবিক অত্যাচার দেখে কুমিরমারির স্থানীয় লোকেরাও পুলিশের উপর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশ ওদের উপরও লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। এই ঘটনায় তিনটি মেয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌছায়। ২৯/১/৭৯ তারিখে ওরা আমাদের মাছের ভেড়ির বাঁধ খুলে কেটে দেয়, ফলে আমাদের সঙ্গে পুলিশের তর্কের সূত্রপাত হয়, পরে বেলা ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত পুলিশের লঞ্চ থেকে অগণিত টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়। এদিন গুরুতরভাবে আহত হন সুনীল, মালতী, পারুল এবং অশ্বিনী সরকার সহ আরও কয়েকজন। ৩০/১/৭৯ তারিখে একটি লঞ্চ কিনারে এসে জানাতে থাকে আমরা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাব কিনা? আমরা বাস্তুহারা সমস্বরে বলতে থাকি, 'আমরা প্রাণ দেব, তবুও দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাব না।' তখন থেকে লঞ্চগুলি আগের চাইতে সক্রিয় ও তৎপর হয়ে ওঠে এবং রাত একটার সময় আবার দশ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। অত্যাচার আরও বীভৎস আকার ধারণ করে। ৩১/১/৭৯ তারিখ বুধবার সকাল প্রায় দশটা থেকে পুলিশ মাঝে আমাদের দিকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে।

এদিকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের কিছু ছেলেমেয়েরা কয়েকটি নৌকা নিয়ে ওপারে খাদ্য ও পানীয় জল আনতে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পুলিশ ঐ নৌকাগুলি লঞ্চ দিয়ে ধাক্কা মেরে মাঝ নদীতে ডুবিয়ে দেয় এবং পুলিশ ওদের ওপর টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে। তখন ছেলেমেয়েরা নিরুপায় হয়ে সাঁতার কেটে কুমিরমারির পারে গিয়ে ওঠে। সেখানেও ওদের উপর একইভাবে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া চলতে থাকে। এই অবস্থা দেখে কুমিরমারির স্থানীয় লোকেরা যথেষ্ট ভিড় করে এগিয়ে আসে এবং উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলে। প্রায় তিনটা নাগাদ পুলিশ ওদের উপর লঞ্চ ও ডাঙা থেকে সমানে গুলি বর্ষণ করতে থাকে, তার সাথে সমানে টিয়ার গ্যাসও ছুঁড়তে থাকে। নেতাজী নগরের পারে পুলিশ ২ রাউন্ড গুলি চালায়, কুমিরমারির পারে চালায় ৩০ রাউন্ড। মোট ৩২ রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। ছেলেমেয়ে নারী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে পাশবিকভাবে লাঠি চার্জ চলতে থাকে।

ঐ সময় একদল পুলিশ কুমিরমারিরর একজন স্থানীয় লোকের বাড়িতে ঢুকে একজন মহিলাকে গুলি করে মারে। মহিলাটির কোলে শিশুসন্তান ছিল, শিশুটির গায়ে গুলি না লাগায় শিশুটি বেঁচে যায়। মৃত অবস্থায় ঐ মহিলাটিকে টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। মহিলার আরেকটি ছেলে একটু বড় ছিল। মায়ের এই অবস্থায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ তাকে মারতে মারতে লঞ্চে নিয়ে গেলে গুলি করতে উদ্যত হয়, কিন্তু অফিসারে নির্দেশে তাকে গুলি না করে লাথি মেরে লঞ্চ থেকে ফেলে দেওয়া হয়। একই সময় একটি শিশুকে গলায় পা দিয়ে দমবন্ধ করে মেরে ফেলা হয়।

এই নির্মম ও পাশবিক গুলিকাণ্ডে বাস্তুহারা ও স্থানীয় সহ নিহতের সংখ্যা প্রায় ৪০-এরও উপরে। মৃতদেহগুলি ঘটনার দিন সন্দেশখালী থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বেওনেট দিয়ে প্রত্যেকটি মৃতদেহের পেট কেটে বেলসজরিয়া নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এদের মধ্যে অর্দ্ধমৃত কিছু লোক ছিল তাদেরও বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে দেওয়া হয়। উক্ত মৃতদেহ একটি গাড়ালী নদীতে পাওয়া যায়। আর বেশ কয়েকটি মৃতদেহ কলাগাছী নদীতে ফেলা হয়।

পরদিন ১/২/৭৯ তারিখে স্থানীয় জনসাধারণ স্থানীয় লোকের মৃত্যুতে এবং বাস্তুহারাদের উপর সরকারি নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পুলিশ ক্যাম্পে মিছিল নিয়ে যান। পুলিশ তাদের ঐ মিছিলের উপরও দুই রাউন্ড গুলি চালায়। তাতে স্থানীয় একজন আহত হন। সমগ্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ মহিলা সহ ১৫০ জনেরও বেশি উদ্বাস্তুকে জেলে আটক করে।

এই পাশবিক নির্মম অত্যাচার করার পরেও যখন আমরা অটল, অনড়, আমাদের উৎখাত করতে পারল না তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তথা দেশবাসীকে ভুল বোঝাতে শুরু করল এই প্রতারক নেতারা। আমরা বাস্তুহারারা বিদেশিশক্তির সাথে হাত মিলিয়ে মরিচঝাঁপিতে আলাদা রাজ্য স্থাপন করতে চাইছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, বাইরে থেকে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করা হচ্ছে আরও কত মিথ্যা দোষারোপ।

শেষ পর্যন্ত হঠাৎ একদিন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ঢুকে গেল আমাদের নেতাজীনগরে মরিচঝাঁপি দ্বীপে। বহু সংখ্যক পুলিশ ঢুকে প্রথমে চারিদিকে ঘেরির উপর দিয়ে মার্চ শুরু করে দিল, তারপর ভিতরে ঢুকে শুরু করল তল্লাশি, সম্ভবত বিদেশি কোনো লোক বা অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা, তাই বোধহয় খোঁজাখুঁজি হচ্ছিল। আমাদের বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়গুলি হল পুলিশ ক্যাম্প। প্রায় সপ্তাহব্যাপী ঐসব খোঁজাখুঁজি চলল, তারপর কোনো কিছু না পেয়ে হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে পুলিশ সহ তাদের ভাড়া করা গুণ্ডা ক্যাডারদের নিয়ে শুরু করল উৎখাত অভিযান। রাতের অন্ধকারে প্রত্যেক ঝুপড়িতে ঢুকে ধরপাকড় শুরু করল, মারধোর আরম্ভ করল, প্রাণভয়ে কেউ

জঙ্গলে কেউবা নদী সাঁতরিয়ে পালিয়ে গেল। যারা ধরা পড়লাম তাদের নিয়ে লঞ্চে তোলা হল। সকলে মরতে রাজি কিন্তু জায়গা ছাড়তে রাজি নয়, পুরুষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হল, তারপর মহিলা ও শিশুদের জবরদস্তি লঞ্চে তোলা শুরু হল, শেষপর্যন্ত ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল, মরণ চিৎকার শুরু হয়ে গেল ওই দ্বীপে। পরদিনও চলল ওই ধ্বংসযজ্ঞ। কত শিশুবৃদ্ধ পুড়ে মরল কে তার হিসাব রাখে! আমরা তখন ছুটে গেলাম হাটের কাছে, দেখছি আগুন। রাত্রে ওখানে কোনো লোক থাকে না। আমাকে নিয়ে কয়েকজন পুলিশ অফিসার অমিয়বাবুর (এস পি অমিয়কুমার সামন্তর) কাছে গেলেন। আমি গেলাম একাই। উনি আমাদের তৈরি, জঙ্গলের কাঠ দিয়ে, একটা চেয়ারে বসা, সামনে একটা টেবিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার নাম কী?' আমি নিজের নাম নির্মলেন্দু ঢালি বলাতে উনি বললেন, 'ও তুমি তো সেই মাস্টার।' উনি আগে থেকে আমার পরিচয় নিয়েছিলেন হয়তো। আমাকে বললেন, 'বাবা এখানে তো থাকা যাবে না, সরকার তোমাদের এখানে থাকতে দেবে না। আগামীকালের ভিতরে সবাইকে এখান থেকে তুলে দেব। তোমাকে আমি দেখলাম, শিক্ষকতা কর তুমি, দুই/চার দিনে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয় যা আমি পেয়েছি, তোমার ব্যবহারে, আচরণে কথায় আমি সন্তুষ্ট, খুব ভালো লাগল তোমাকে। তোমাকে একটা লঞ্চ দেব তোমার জন্য, তোমার পরিবার সহ তোমাকে ক্যানিং নিয়ে যাবে, সেখানে গিয়ে তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানে পৌঁছে দেবে আমাদের লোক।' এইসব কথা মনে আছে বলে, তাই বললাম। উনি সদাশয় মানুষ হবেন, আমি তো আগে জানি না, আমার ভুল হতে পারে। আমার সাথে উনি যে ধরনের ব্যবহার করেছিলেন, তাই বললাম। আমি সেদিন তাঁকে বলেছিলাম, 'স্যার আমার জায়গায় যদি আপনি থাকতেন, আপনি কি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে পারতেন?' উনি বললেন, 'সেটা তোমার ব্যাপার। আমি বলছি তোমার উপর আমি খুশি, তাই তোমাকে আমি সাহায্য করব, তুমি যদি আমার সাহায্য নিতে না চাও তবে তোমাকে এখন পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে লঞ্চে ওঠাবে, তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে এখনই।' আমি বললাম, 'সেটা আপনার খুশি, আমাকে যদি নিয়ে যেতে হয় আমি স্বেচ্ছায় যাব না মরিচঝাঁপি ছেড়ে।' উনি বললেন, 'তোমার বড় বড় নেতারা পালিয়ে গেছে। তুমি এখানে কী করবে! ছেলেমানুষ!' তখন আমার বয়স ২৪/২৫ হবে।

প্রশ্ন : রঙ্গলাল গোলদার এর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর : রঙ্গলাল গোলদার তখনই বর্ষীয়ান নেতা, শিক্ষিত এবং শুভবুদ্ধি নিয়ে চলতেন। যতদূর আমি জানি ওনার ভূমিকাতে সংগঠন চলত।... তার পরদিন দুপুরের ভিতর ঐ জায়গা খালি হয়ে যায়। পুলিশ সকলকে লঞ্চে তুলে ক্যানিং

হাসনাবাদ তুলে দেয়। স্বেচ্ছায় হোক, জোর করে হোক পুলিশ তুলে দেয়। সেখান থেকে উদ্বাস্তুরা নিজেরা অথবা সরকারি সাহায্যে দণ্ডকারণ্যে চলে যয়, কেউ পশ্চিমবাংলায় রয়ে যায় কেউ কেউ আত্মীস্বজনের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। আমাকে নিয়ে রাত্রে পুলিশ লঞ্চে তুলে দেওয়া হল। আমাকে আমার বাবা স্ত্রী তখন ছিল। আমার বোনকে মানা ক্যাম্পজীবনে বিবাহ দিয়েছিলাম। মা-ঠাকুরমা মারা গিয়েছিলেন মানা ক্যাম্পে।... যারা ইচ্ছা করে যেতে চায় নি এমনও হয়েছিল লঞ্চের উপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল ছোট বাচ্চাদের, পুলিশ ওখানকার কিছু লোকাল লোককেও জোগাড় করে নিয়েছিল, স্থানীয় লোক, যা মনে হয় ঐ সময় যারা সরকারে ছিলেন, তাদের পোষা লোক হবে। পুলিশের পোষাকধারী লোক ছিল না। যা মনে হয় সরকারি মদতপুষ্ট লোক হবে। বহু লোক ঢুকেছিল ঐ সময় পুলিশের সাথে। ওরা আমাদের আসবাবপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিল, বাচ্চাদের ছুঁড়ে লঞ্চে ফেলেছিল। এইসব বহু হয়েছিল। সেই রাতে আমাকে নিয়ে লঞ্চে ওঠানো হল, আমার সঙ্গে তোলা হল বহু উদ্বাস্তুকে। পরের দিন সকালে ক্যানিং নেওয়া হল ওখান থেকে লরিতে করে বসিরহাট কোর্টের সামনে ঢালা হল। আমরা সারাদিন রইলাম তারপর রাত্রে আবার লরিতে করে দমদম সেন্ট্রাল জেলে ঢুকিয়ে দেয়, আমিও তার মধ্যে ছিলাম, কোনো বিচার হয়নি। গিয়ে দেখি একটা হল শুধু আমাদেরই লোক। আগে বলছি ঐ যে গুলি চলেছিল ঐ সময় কিছু লোককে ধরে আনা হয়েছিল, তারাও আছে, যখন ভিতরে ঢুকলাম, লম্বা একটা হল যা মনে হয় ঐ হলে ৫০০ মতো মরিচঝাঁপির লোক। একজনই কয়েদি ছিল বুড়ো লোক, মার্ডার কেসের আসামী। লাইফার কেসের আসামী। সে আমাদের দেখাশুনা করত। আমাদের গ্রুপ লিডার সে। বাকি আমরা সবাই উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপির। কিন্তু একটা লোকও বিনা জমানতে বেরুতে পারে নি। বেল দিয়ে নিয়ে প্রত্যেকে বের করাতে হয়েছে। আমার বাবার তখন ৮০ কাছে বয়স তখন উকিলকে ধরে, তখন পয়সাকড়ি কিছুই ছিল না কপর্দকশূন্য। এক বয়স্ক সদাশয় উকিল, বাবা তার হাতে পায়ে ধরে কোনোরকমভাবে একমাস পরে জেল থেকে জামিন দিয়ে বের করে। তখন আমার স্ত্রী প্রায় অর্ধ উন্মাদ। ওখান থেকে বেরিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কোথায় আছ, বললেন বার্ণপুর ক্যাম্পে। কয়েকটা ঘর সেখানে ভাঙাচোরা ওখানে উদ্বাস্তুদের রেখেছে তার মধ্যে বাবা ও আমার স্ত্রী ছিল। আমার শরীরে তখন কিছু নেই, একটা লুঙ্গি আর একটা ড্রয়ার ছিল। একমাস যে জেলে ছিলাম এই ছিল আমার পোশাক। সেইভাবে জেলে সিল মেরে দিল আমার হাতে। পয়সাকড়ি কিছু ছিল না। তাই এইভাবে যতদূর যাব গাড়িতে— পয়সা লাগবে না। গিয়ে সেই বার্ণপুর স্টেশনে নামলাম বাবার সঙ্গে। তারপর ক্যাম্পে গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী অর্ধ উন্মাদ, কখনও কখনও পাগলের মতো কখনও সম্বিত ফিরে

আসছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বললেন, এই রকম হয়ে গেছে। ওখানে ৪/৫ দিন ছিলাম। ওখান থেকে মালকানগিরিতে নিয়ে এল, সেই থেকে মালকানগিরিতে আছি।

প্র : সরকার কতগুলি অভিযোগ তুলেছিল যে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বিদেশিদের যোগাযোগ আছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে...

উ : হ্যাঁ ভালো কথা মনে করিয়েছেন, পশ্চিমবাংলার সম্ভবত আনন্দবাজারের একটা টুকরো খবর, তখন পেপার কাটিং রাখতাম, একটা কার্টুন দেওয়া হয়েছিল : জ্যোতিবাবু আমাদের উদ্বাস্তুদের নিয়ে, তাতে সতীশবাবু উদ্বাস্তুদের নিয়ে আছেন, জ্যোতিবাবু পুলিশ নিয়ে উদ্বাস্তুদের মোকাবিলা করছেন। আনন্দবাজার নয়তো যুগান্তর কোনো এক পত্রিকায়। স্মরণে নেই, আর সেই পেপার কাটিংও সঙ্গে নেই।

প্র : আর কিছু মনে আছে আপনার ?

উ : অনেক কালের কথা, সবকিছু মনেও নেই। সেই থেকে মালকানগিরিতে আছি কোনো রকমে, সকলের অবস্থা একরকম নয়। অনেকে ভালোভাবে দাঁড়াতে পারেনি। তবে সর্বশেষে একটা কথা বলতে হয়, এখানকার একটা বিমাতৃসুলভ পরিস্থিতিতে আছি বলা উচিত। যেমন ধরুন, আমরা বাঙালি, কোন জাতির মুখ থেকে যদি ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়, কোন জাতির কাছ থেকে যদি রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তো সেই জাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে, মুছে যেতে কত সময় লাগে বলুন তো ? এই প্রশ্ন আমার মনে জাগে, এটা কতটা বাস্তব, আপনারা পশ্চিমবাংলার মানুষ, সেটা একটু উপলব্ধি করবেন, এখানে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, কোনো স্কুল, কলেজে, পাঠাগারে কোনো বাংলা বই পাবেন না, কোনো বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে নেই। দ্বিতীয়ত এতদিন পর্যন্ত আমরা একটু রাজনীতিতে সুযোগ পেতাম, যেমন ধরুন এখানে এই মালকানগিরি জেলায় দুটো এ্যাসেম্বলি নির্বাচন কেন্দ্র, তার একটা ST ছিল একটা SC ছিল। এখানে বাঙালিদের মধ্যে আমরা কিছু SC আছি, আমরা সুযোগ পেতে পারি, পাচ্ছিলাম। বর্তমানে সেদিকটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন সব ST। বর্তমানে এই মালকানগিরি জেলার কোনো সিটে ST ছাড়া অন্য কোনো কাস্ট এর মানুষ বসতে পারবে না। তার মানে ST এর মধ্যে আমরা বাঙালি পড়ি না। SC আছে OBC আছে, হায়ার কাস্ট আছে। তো দেখুন, আমাদের রাজনৈতিক অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তার থেকে আমরা বঞ্চিত। এবার ভাবুন আমরা কত ভালো আছি ?

প্র : এখনও আপনাদের সম্বন্ধে লেখা হয় শরণার্থী বলে...

উ : হ্যাঁ, আমরা বঙ্গীয় শরণার্থী, এখানকার যে state-এ আছি, এখনকার গভর্নমেন্ট আমাদের সম্পর্কে কিছু লিখলে, ভালো কথা মন্দ কথা যাই লিখুন না কেন, লিখলে বা বললে— ঐ শব্দটা ব্যবহার করেন, আমরা বঙ্গীয় শরণার্থী।

প্র : আপনার পরিবারে যেমন অনেকে মারা গেছেন, এখানে আর কারা আছেন যাদের মরিচঝাঁপিতে প্রাণহানি হয়েছে?

উ : বহু মানুষ আছেন, যাদের সন্তানসন্ততি ছিল, নিঃসন্তান হয়ে ফিরে এসেছে। এই রকম পরিবার আছে, খুঁজলে পাওয়া যাবে। সেটা একটা সময়সাপেক্ষ।

প্র : উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতি যেটা ছিল, যাদের নেতৃত্বে আপনারা মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন, সেই নেতৃত্ব সম্পর্কে আপনার কোনো অভিযোগ আছে?

উ : নেতৃত্ব সম্পর্কে অভিযোগ বলতে গেলে, আমাদের রঙ্গলাল গোলদার, আমরা মরিচঝাঁপিতে উঠবার আগেই উনি বলেছিলেন, যে অঞ্চলটা সরকার কোনো কাজে লাগায় নি, মানে প্ল্যান্টেশন ছাড়া বাকি যে অঞ্চলটা মরিচঝাঁপির, সেই অঞ্চলে উঠতে আমাদেরকে রঙ্গলাল বাবু বলেছিলেন, কিন্তু রাইহরণ বাড়ৈ আর একজন নেতা ছিলেন, তিনি সেই কথাটা না মেনে, আমাদেরকে নিয়ে উঠলেন প্ল্যান্টটেশনে, সরকারি প্ল্যান্টটেশন যেটা ছিল, যেখানে ছিল নারকেল গাছ আর ঝাউ গাছ লাগানো। তার মধ্যে ওঠায় আমাদেরকে ব্যারিকেড করে দিল পুলিশ, এই সময় আমরা বাধ্য হয়ে, না খেতে পেয়ে পেটের জ্বালায়, কিছু কিছু নারকেল গাছ—তার যে মাথি, আমরা অনেকগুলি পেটের জ্বালায় তুলে খেয়ে ফেলেছিলাম। তো সেইদিক দিয়ে আমরা অনেক ক্ষতিও করে ফেলেছিলাম সরকারি সম্পদের এটাও ঠিক। রাইহরণ বাবুর উপরে আমার ব্যক্তিগত ক্ষোভ, যদি রঙ্গলালবাবুর কথায় আমরা প্ল্যান্টেশনে না উঠে আর একটু কষ্ট করে ঐ ছাড়া জায়গায় গিয়ে উঠতাম, তাহলে হয়তো সরকার এতটা কড়া স্টেপ আমাদের উপর নিতেন কিনা সন্দেহ আছে।

প্র : যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন, তাঁরা এখন কে কোথায় আছে জানেন?

উ: অরবিন্দবাবুর কথা শুনেছি, উনি নাকি মছলন্দপুরে আছেন, বাকি রঙ্গলালবাবু বেঁচে আছেন কিনা জানি না, রবীন চক্রবর্তী যিনি ছিলেন, উনি মানা ক্যাম্প মন্দিরে পূজা করে কালীমন্দিরে, আমি দেখে এসেছিলাম কয়েক বছর আগে। বাকি আর কারো খবর আমি জানি না।

সাক্ষাৎকার : ২১ জানুয়ারি ২০০৭

সবাই যখন কাঁদানে গ্যাসের ফাটানো সেল এর তাড়নায় আক্রান্ত... টেনে হিঁচড়ে সকলকে পুলিশ লঞ্চে তুলে দিচ্ছে; যার যতটুকু সম্বল গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত দিশাহীন মানুষগুলো, তখন শ্রীমতী তরুবালা ঢালী, প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী পুলিশকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে পড়লেন স্কুল বাড়িতে। সেখানে থেকে যতটা পারলেন কাগজপত্র, ফাইল খাবলা দিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠ, মরিচঝাঁপি

আলপনা বিশ্বাস

'মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়। যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে।... আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি সীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষের হয়ে উঠেছে...।' রবীন্দ্রনাথ।

তাঁদেরই খোঁজে গিয়েছিলাম দণ্ডকারণ্য। এরা স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক।

হাওড়া থেকে কোরাপুট ২৪ ঘন্টার পথ, রাতে অপেক্ষা করে পরদিন ১৩০ কিমি চড়াই উৎরাই, অসম্ভব খারাপ রাস্তা পেরিয়ে মালকানগিরি জেলা শহর থেকে বাসে পটেরু হয়ে ৩০ কিমি পর বাসের সাময়িক বিরতি পুল্লি মেটলা (আদিবাসী নাম)। বাস রাস্তা থেকে নেমে মোরাম রাস্তায় তিন কিমি ভিতরে গিয়ে, এম পি ভি ১১ (মালকানগিরি-পটেরু ভিলেজ ১১) গন্তব্যস্থল। দারিদ্রের ছাপ নিয়ে এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো কিছু বাড়ি। ১০/১২ বছর বয়সী মেয়েরা বা ছেলেরাও গোরু-ছাগলকে একসঙ্গে করে মাঠে নিয়ে চলেছে। পুজোর ছুটি চলছে তাই।

'রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।'

বাঙালি শৈশবের এই বিখ্যাত পংক্তি দুটি এখানকার বাঙালির শৈশবের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখানে 'মাঠ' ও 'পাঠ' মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। অবাক বিস্ময়ে দেখছিল তারা বাংলা থেকে আগত বাঙালিকে। দূরে মাঠের মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, যেন যুগান্তের সাক্ষী। কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে গাছ-আগাছা মিলেমিশে আরও ছায়াঘন করে তুলেছে পুরো গ্রামটাকে। এক একটা সবুজ ঘন লতাপাতার বেষ্টনীর মধ্যে এক একটা বাড়ি। এমনই উচ্ছে লতা ও অন্যান্য বুনো লতায় আবৃত বেড়ার প্রাচীর ঘেরা একটি বাড়ি। মাটির ঘর টালির ছাউনি দেওয়া। দারিদ্রের আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বড্ড বেশি নিরিবিলি যেন। উঠোনে ৪/৫টা গরু খুঁটোতে বাঁধা, মশা মাছি তাড়াচ্ছে নির্লিপ্ত ভাবে। মাটির বারান্দায় মাদুরের ওপর বজ্রাসন করে বসে আছেন প্রায় সাড়ে ছয়-ফুট ঋজুদেহী নির্মলেন্দু ঢালী। বয়স ৫০/৫৫, রেজিগেনেশন—প্রধান শিক্ষক, নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ, মরিচঝাঁপি, পোঃ কুমিরমারি, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শরীর দুর্বল। শক্ত চোয়াল, দৃষ্টিতে গভীর যন্ত্রণার তরঙ্গ। হয়তো আমাকে দেখে ঘুমন্ত শিক্ষক সত্ত্বার মোচড়।

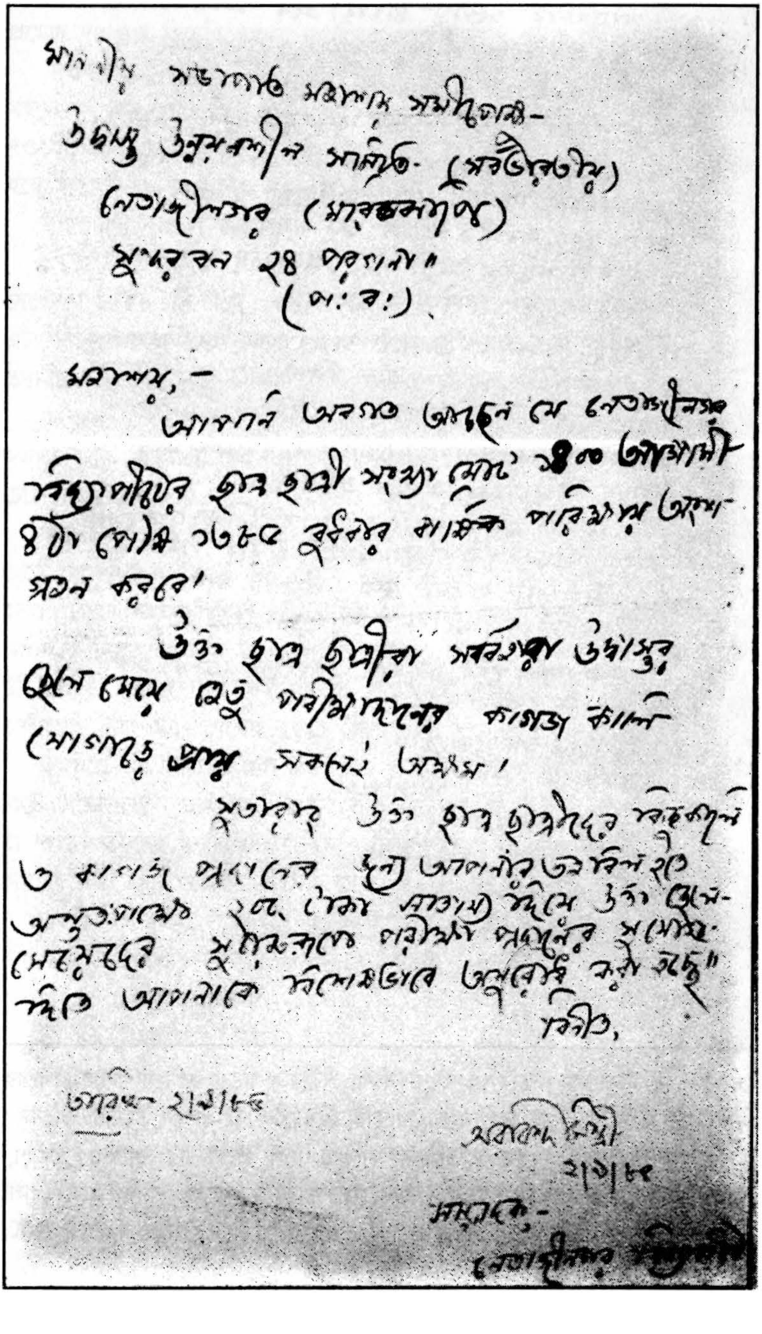
আমি যাব তাই নিজ হাতে বাড়িঘর মেরামতের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক নির্মলবাবু। কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। বছরে প্রায় ২/৩ বার এই ম্যালেরিয়া ব্যাধি অতিষ্ঠ করে তোলে এখানকার জনজীবন।

স্ত্রী তরুবালা ঢালী, এক মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে দিবাকর ঢালী। অত্যন্ত ভদ্র নম্র দিবাকরের বয়স ২০/২২ বছর হবে। পটেরু বাজারে একটি ছোট-খাট দোকান আছে। দিবাকর সেখানে বসে। অল্প জমি আছে। কোনোরকমে দিন কেটে যায়। ভালো অভিনেতা হিসাবে সুনাম আছে নির্মল বাবুর। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এই নির্মল ঢালী এবং কালিমেলার সুভাষ তরফদার। সুভাষ তরফদারের লেখার হাত অত্যন্ত সাবলীল।

বার দুয়েক পঞ্চায়েত প্রধানও হয়েছিলেন নির্মলবাবু। ফুলে ফেঁপে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও আপাদমস্তক মাস্টারমশাই নির্মল ঢালী, ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। আমার উদ্দেশ্য মরিচঝাঁপির নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ এর তথ্য সংগ্রহ করা।

চায়ের কাপে চুমুকের ফাঁকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'আপনারা মরিচঝাঁপি গেছেন '৭৮-এর এপ্রিলে। '৭৯-এর মে-তে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন ও ভাড়াটে গুণ্ডার মিলিত প্রয়াসে আপনারা দ্বীপ ছেড়ে আবার দণ্ডকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই অল্প সময়ে একটা বিরাট বিদ্যালয় গড়ে তুললেন কিভাবে? শিশু শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম বছরেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার পড়ুয়া হয়েছিল। এও কি সম্ভব? আর অর্থই বা পেলেন কোথায়?'

হঠাৎ চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চোখে তীব্র ঘৃণা। ধনুকের ছিন্ন ছিলার মতো



মাননীয় সভাপতি মহাশয় সমীপেষু-
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (সর্বভারতীয়)
নেতাজীনগর (মরিচঝাঁপি)
সুন্দরবন ২৪ পরগনা।
(প: ব:)

মহাশয়,-

আপনি অবগত আছেন যে নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা মোট ১৪০ আগামী ৪ঠা পৌষ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে।

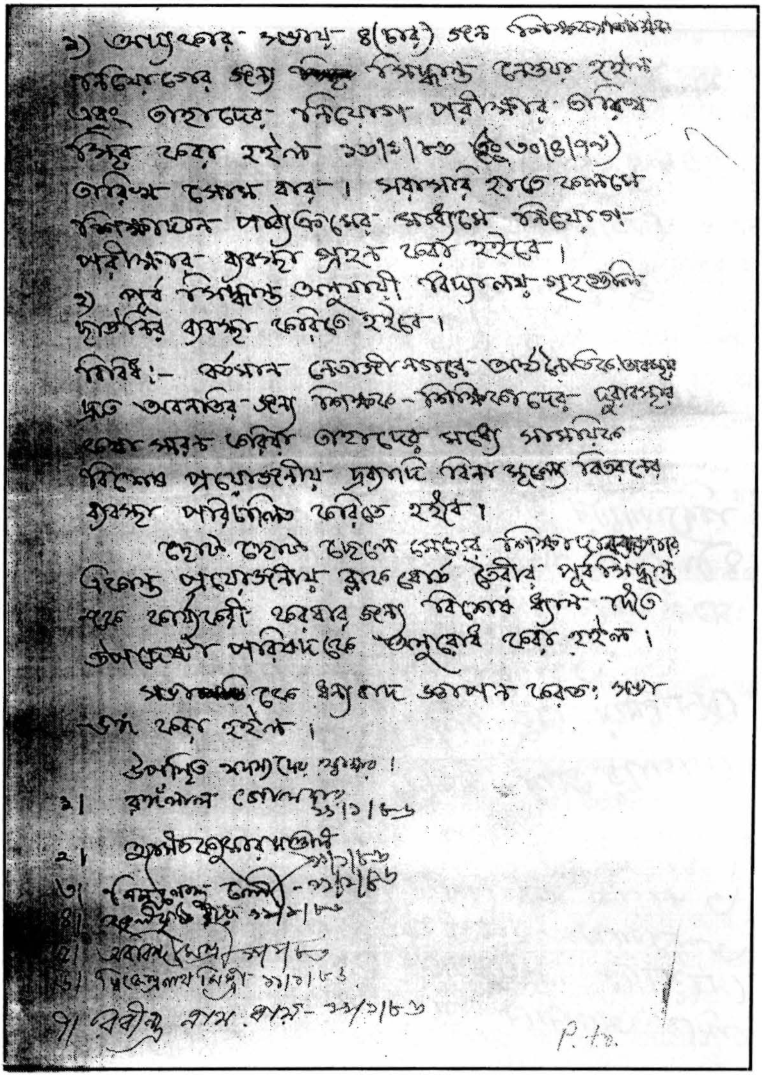
উক্ত ছাত্র ছাত্রীরা সর্বহারা উদ্বাস্তুর ছেলে মেয়ে হেতু পরীক্ষাদানের কাগজ কালি যোগাতে প্রায় সকলেই অক্ষম।

সুতরাং উক্ত ছাত্র ছাত্রীদের কালি ও কাগজ প্রদানের জন্য আপনার তহবিল হতে অনুগ্রহপূর্বক ২০০ টাকা সাহায্য দিয়ে উক্ত ছেলে-মেয়েদের সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা প্রদানের সুযোগ দিতে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিনীত,

তারিখ- ২।১২।৭৮

অরবিন্দ মিস্ত্রী
২।১২।৭৮
সম্পাদক,-
নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠ



১) অস্থায়ীভাবে ৪(চার) জন [illegible]
নিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল
এবং তাহাদের নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ
স্থির করা হইল ১৩/২/৮৬ (ইং ৩০/৫/৭৯)
তারিখ সোম বার। সরকারি হাতে কলমে
শিক্ষাদান পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে নিয়োগ-
পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
২) পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যালয় গৃহগুলি
[illegible] ব্যবস্থা করিতে হইবে।
বিবিধ:- বর্তমান নেতাজী নগরে অর্থনৈতিক অবস্থার
দ্রুত অবনতির জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দুরবস্থার
কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের মধ্যে সাময়িক
বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনা মূল্যে বিতরণের
ব্যবস্থা পরিচালিত করিতে হইবে।
ছোট ছোট ছেলে মেয়ের শিক্ষার [illegible]
একান্ত প্রয়োজনীয় ব্লাক বোর্ড তৈরীর পূর্বসিদ্ধান্ত
দ্রুত কার্যকরী করবার জন্য বিশেষ ধ্যান দিতে
[illegible] পরিষদকে অনুরোধ করা হইল।
সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা
ভঙ্গ করা হইল।
উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর।
১। [illegible] ২১/১/৮৬
২। [illegible] ২১/১/৮৬
৩। [illegible] - ২১/১/৮৬
৪। [illegible] ২১/১/৮৬
৫। [illegible] ২১/১/৮৬
৬। দ্বিজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী ২১/১/৮৬
৭। রবীন্দ্র নাথ রায় - ২১/১/৮৬
P. to.

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর কাঁপা কাঁপা শরীরটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন ঘরের দিকে। স্ত্রী তরুবালা সঙ্গে গেলেন সাহায্যকারী হিসাবে। তিনিও যে উত্তরটা জানেন!

প্রধান শিক্ষকের এহেন প্রতিক্রিয়া কাঙ্খিত ছিল প্রশ্নকর্তার কাছেও। কারণ, সূত্রটা দুজনেরই জানা। নীতিকথায় যেমন মেষশাবককে সিংহের পানীয় জল ঘোলা করার অপরাধের যুক্তি খাড়া ক'রে তাকে ভক্ষণ করেছিল, সিংহের নিজের জন্য।

তেমনি মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তু বাঙালিদের উচ্ছেদ করার যুক্তি হিসাবে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত বিদেশি অর্থের লেনদেন দেখেছিলেন। এটাই ছিল বৃশ্চিক দংশন।

'দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে সঠিক এবং সম্পূর্ণ তথ্য জানার আগ্রহ আমাদের দায়িত্বশীল মহলে খুব কম লোকেরই আছে।' আই এ এস শৈবাল গুপ্তের উক্ত ক্ষোভের ধাক্কায় দণ্ডকের প্রতি যে আকর্ষণটা এতদিন সুপ্ত ছিল, তা যেন গা ঝাড়া দিয়ে ঋজু ইচ্ছে হয়ে দাঁড়াল। রওনা দিলাম দণ্ডকের উদ্দেশ্যে।

দণ্ডকারণ্য বাঙালি মেধা আর মেদ ঝরানো ফসল।

১৭°৫' উত্তর দ্রাঘিমাংশে এবং উত্তরে ২০°৩' অক্ষাংশে দণ্ডকের অবস্থান। জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন অথবা নির্বাসন দেওয়ার এটা উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেই উদ্বাস্তু, যাঁরা স্বাধীনতার নৈবেদ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ ও রাষ্ট্রের তদানীন্তন ও তৎপরবর্তী ডান-বাম সরকারের মদমত্ত উচ্ছৃঙ্খল ক্ষমতালোভের উচ্ছিষ্ট।

কংগ্রেস যখন শাসক— তখন ট্রাক ভর্তি ট্রেন ভর্তি করে ভিটে মাটি আত্মীয় স্বজনহারানো মানুষগুলোকে দণ্ডকের বিপদসঙ্কুল পরিবেশে বন্যজন্তুর ভক্ষ্য হিসাবে ঢেলে দিয়ে গেল।

কথা ছিল অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা, নিজ এলাকার কিছু কিছু অংশ ছেড়ে দেবে দণ্ডক প্রজেক্ট এর জন্য। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র বেঁকে বসল। তারা নিজ দায়িত্বে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে রাজি আছে, কিন্তু দণ্ডক পরিকল্পনার আওতায় নিজেদের জমি ছাড়তে রাজি হয়নি। সুতরাং বর্তমান দণ্ডক কেবলমাত্র উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের সহানুভূতির সীমায় সীমাবদ্ধ। উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহান্ডি এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা নিয়ে দণ্ডকারণ্য এলাকা।

জন্মলগ্নে এর আয়তন ছিল ৮০,০০০ বর্গমাইল, পুরো অঞ্চলটাই জঙ্গল। জঙ্গল কেটে চাষোপযোগী জমি তৈরি করার জন্যই যে বাঙালি উদ্বাস্তুদের আনা হয়েছিল তা স্পষ্ট। মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয়নি, বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমিক হিসাবে লেবার ক্যাম্পে জমা করা হয়েছিল তাঁদের নামে।

নামহীন-গোত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, পরিকল্পনাহীন, নিরাপত্তাহীন, খাদ্য-পানীয় হীন, শিক্ষাহীন গ্রামগুলোর পরিচয় শুধু সংখ্যা মাত্র।

এম ভি (মালকান ভিলেজ) ১৩৩টি।

ইউ ভি (উমরকোট ভিলেজ) ৬৪টি।

এবং কোণ্ডাগাঁও— ১৬টি।

আর তাদের পরিচয়— এম ভি ১১, পিভি ১৩, ইউ ভি ৭ ইত্যাদি।

একটা ভিলেজের থেকে অন্য ভিলেজের দূরত্ব কম করে ২৫/৩০ কিমি। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার এ এক কৌশল। কারণ ঘনীভূত-বস্তুপুঞ্জ বিস্ফোরণ যোগ্য হয়ে ওঠে সহজেই।

...'দেখুন ম্যাডাম! দেখুন! আপনারাও তো সন্তানদের বিদ্যালয়ে পড়ান। আপনাদের বিদ্যালয় উঁচুতে ওঠার সোপান, আমাদের বিদ্যালয় টিঁকে থাকার পন্থা।'

বঞ্চনা, প্রতারণা আর অবহেলার আস্তরণ ঝেড়ে বার করলেন একটি ফাইল। উপরে লেখা 'নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ'। ফাইলের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ছুঁড়ে দিলেন কঠোর বাস্তবসম্মত প্রশ্নটা।

'আচ্ছা ম্যাডাম। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হল পাঞ্জাবে, তাহলে বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন বাংলায় হল না কেন ? আপনারা শহরের ভদ্রলোকেরা কখনও ভেবে দেখেছেন কি ?' না দেখিনি। তাহলে ৩০ বছর পর্দার আড়ালে থাকত না মরিচঝাঁপি। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা ? সব সরকারেরই তো বিরোধী পক্ষ থাকে, তাঁরা ?

আসলে সূর্যের আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করলে তবেই সাতটি রং দেখা যায়, নচেৎ একটি মাত্র রং। জনগণের মধ্যে এসেই রাজনৈতিক রং আলাদা হয়। উপর মহলে রঙের কোনো পার্থক্য নেই।

ফাইল খুলে সাবধানে কিছু কাগজপত্র বার করে সামনে দিয়ে বললেন, 'দেখুন! বুকের পাঁজরার মতো করে এগুলোকে আগলে রেখেছি, সত্যকে ধরে রেখেছি। দেখুন।

আমরা নাকি এমনিই দণ্ডকারণ্য ছেড়ে মরিচঝাঁপি চলে গেলাম, সেখানে গিয়ে বিদেশী টাকায় বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বাজার গড়ে তুললাম ; তারপর দেশবিরোধী কাজকর্ম শুরু করলাম। তথ্যগুলো পড়ুন, তারপর লিখুন।'

আগে তথ্যগুলো পর পর সাজিয়ে দেখে নিই। কী সেই যাদুমন্ত্র। যা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কোনো সরকারি অনুদান ছাড়াই! কোথায় তাদের শক্তি!

২৫/৯/৭৭ তারিখের লেখা একটি চিঠির কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি। লেখক- সারাভারত উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সভাপতি শ্রী সতীশ মণ্ডল লিখেছেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুর-মানা ক্যাম্প থেকে।

'উদ্বাস্তু ভাই ও বোনেরা,

... বাংলাদেশে হিন্দু সহ সংখ্যালঘুদের উপর পাশবিক অত্যাচার চলছে। সেখান থেকে আমাদের ভাই বোন দলে দলে প্রাণ, মান ও ইজ্জতের কারণে ভারতে প্রবেশ করছেন।... এখন এক সংকটময় অবস্থায় আমরা পৌছেছি যে সময় যদি পাকিস্তানীদের ন্যায় আমাদের দাবি আদায় করে নিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন প্রকৃত মানবিক অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ আমরা পাব না। তাই সকল প্রকার দলাদলি ও ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে প্রকৃত মানুষের মতো বাঁচার জন্য দ্বিধাশূন্য মনে সমিতিকে অর্থ এবং সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী ও মজবুত করে তুলুন।'



দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন সমিতির সভাপতি। কিন্তু কতখানি আস্থা ছিল নব নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রতি— তা দেখতে পাই পরবর্তী অংশে।

'গত ১৬/৯/৭৭ তাং পশ্চিমবাংলায় যেয়ে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আমাদের পুনর্বাসন ব্যাপারে জোর আলোচনা করি। যার জন্য বিধানসভার সদস্য অধ্যক্ষ শ্রী হরিপদ ভারতী (জনতা) শ্রী সুহৃদ চৌধুরী (মা: ফ. ব:) এবং অন্যান্য নেতারা গত ২১/৯/৭৭ তারিখ বিধানসভায় জোরদার দাবি তোলেন যে বহির্বাংলার উদ্বাস্তুদের অবস্থা খুব বেদনাদায়ক। তাঁরা বলেন এমন পুনর্বাসনের চেয়ে নির্বাসনই শ্রেয়। উদ্বাস্তুরা সর্বত্র নরকজীবন যাপন করছেন। তাঁদের প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে বাঙালিরাই উদ্বাস্তু, অতএব পশ্চিমবাংলার মধ্যে সুন্দরবনে তাদের পুনর্বাসন দেয়া হোক। এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের ন্যায় পূর্ববঙ্গীয়দের বেলাতেও সমহারে ক্ষতিপূরণ করা হোক।

এ সংবাদ ঐ দিন ২১/৯/৭৭ তাং আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয় এবং পরের দিন সংবাদপত্রেও প্রকাশ করা হয়েছে।

পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু দরদী শ্রী রাম চ্যাটার্জি (স্বরাষ্ট্র পুলিশ বিভাগীয় মন্ত্রী)

উদ্বাস্তুদের শোচনীয় দুরবস্থা ও ভয়াবহ পরিণাম থেকে উদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন নেতা ও লোকসভার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছেন।

অতএব আরও সামান্য কিছুকাল ধৈর্য্য ও শান্তি সহকারে আপনারা অপেক্ষা করুন এবং সকল প্রকার নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সকল প্রকার পরিস্থিতি আমাদের অবগত করান এবং সমিতির নির্দেশানুসারে জনকল্যাণে আপনারা ব্রতী হউন।'

সংগ্রামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সহ
জয়হিন্দ
আপনাদের
(সতীশচন্দ্র মণ্ডল)
সভাপতি
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
মানা শিবির
রায়পুর, এম পি।

এ পর্যন্ত অর্থাৎ ৭৭ এর বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরও উদ্বাস্তু বাঙালির মনে আশার আলো প্রদীপ্ত ছিল তা দেখা গেল। কোনো পক্ষ থেকেই কোনো নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায়নি।

সুতরাং উদ্বাস্তুরা সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই মরিচঝাঁপি বসতি স্থাপন করেছিলেন এটাও ভাবার অবকাশ নেই ; আবার সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য বিদেশি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাও অনর্থক প্রচার মাত্র ; এটাই ঠিক।

এবার আমার বিষয় মরিচঝাঁপির শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে।

যে সরকার এতগুলো, অন্তত কয়েক হাজার পরিবারের খাদ্য বা মাথা গোঁজার মতো ছাউনির দায়িত্ব নেয়নি, তারা যে শিক্ষার দায়িত্ব নেবে— এটা ভাবাই অমূলক।

তাই কিভাবে বিরাট একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, সেটাই জানতে চাইলাম মরিচঝাঁপির নেতাজীনগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের কাছে। সেই সময় দমনপীড়নের লক্ষ্যটা এমনভাবে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছিল যে প্রাণটুকু রক্ষার থেকেও নথিপত্র রক্ষার প্রচেষ্টা আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। পরে আসব সে প্রসঙ্গে।

তাই কিছুটা অংশের জন্য প্রধান শিক্ষকের স্মৃতিকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

যেমন— ফেব্রুয়ারি '৭৮ থেকেই দণ্ডকের উদ্বাস্তুরা বাংলায় ফেরার প্রস্তুতি নিতে থাকেন এবং এপ্রিল '৭৮ এ মরিচঝাঁপি পৌছান। কিন্তু বাংলার মাটি আর বাতাসটুকু ছাড়া আর কিছু পাননি তাঁরা। সবটাই তাঁদেরকে করে নিতে হয়েছিল। যেমন,

'সমিতির একটা জরুরী সভা ডাকা হল। তখন পর্যন্ত সমিতির যে সকল সদস্য মরিচঝাঁপি উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই সভায় হাজির হলেন। সতীশবাবু, রবীনবাবু, রঙ্গলালবাবু, রাইহরণবাবু, অরবিন্দবাবু এবং অন্যান্য যুবক সদস্যবৃন্দ। সভার আলোচ্য বিষয়— থাকার ব্যবস্থা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য শিক্ষা, শৃঙ্খলা রক্ষা, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি। প্রথমেই আলোচনা হল ঐ অঞ্চলে জোয়ারের জল আটকানোর জন্য বাঁধ বাঁধার প্রসঙ্গে। তারপর গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো। ৫টা সেকটরে ভাগ করা হল। এক একজনকে এক একটা সেকটরের দায়িত্ব দেওয়া হল।

বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব নিলেন সতীশ বাবু, স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পড়ল সমীর সমাদ্দারের উপর, আমার উপর পড়ল শিক্ষার দায়িত্ব।'— প্রধান শিক্ষক

তিনি কেমনভাবে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন? যাতে বিদ্যালয় গঠিত হবার মাস দুয়েকের মধ্যে হাজার আড়াই থেকে হাজার তিনেক ছাত্রছাত্রী জুটে গেল!

ফাইল থেকে একে একে বার করলেন নথি, অদ্ভুত সুন্দর পরিকল্পনা, অত্যাশ্চর্য পরিকল্পনা।

প্রথম, নথি, একটি বিজ্ঞপ্তি।

তারিখ ১৫/১২/৭৮

মাননীয়
সভাপতি মহাশয় সমীপেষু,
উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতি (সর্বভারতীয়)
নেতাজীনগর, ২৪ পরগনা

মহাশয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, অদ্য ইংরাজি ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের কল্যাণার্থে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

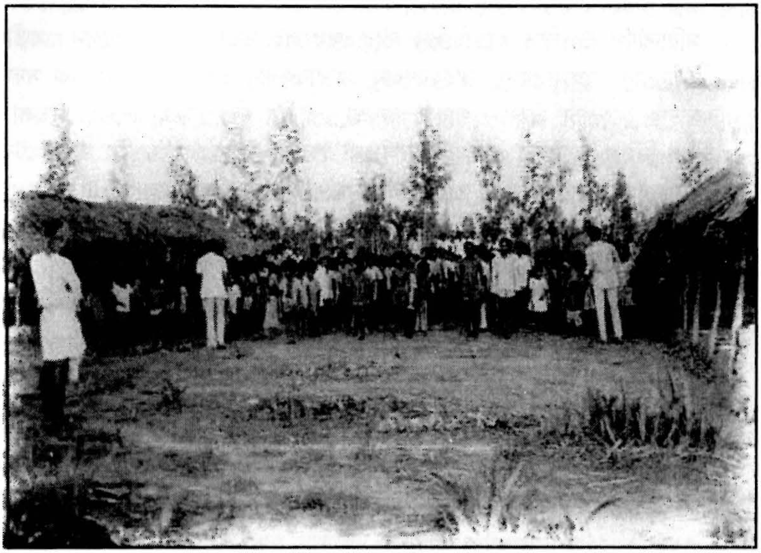
অতএব সমিতির কর্মীবৃন্দ সহ আপনার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

স্থান : বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ — ইতি—
তারিখ : ইং ১৫/১২/৭৮ — বিনীত

প্রধান শিক্ষক
নির্মল ঢালী
১৫/১২/৭৮

এই ১৫/১২/৭৮ তারিখের সভা থেকেই আমার কাছে পুরো ব্যাপারটা দণ্ডকের আকাশের মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল।

সৌম্য দর্শন পুত্র দিবাকর এক বিরাট রুই মাছ কানকোর মধ্যে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে এনে দাঁড়াল। 'কাকীমা!— কে রান্না করবে? কিভাবে রান্না করবে বলে দিন!'



'ওরে বাবা! আমি নেই! দাঁড়াও বাবার কাছ থেকে গোপন তথ্যগুলো জেনে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।' দিবাকর গর্বের সুরে বলল, 'বাবার কাছে ওগুলো প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। শরীরটা খারাপ তাই হয়তো সব দেখাতে পারবেন না।'

ইতিমধ্যে ১৫/১২/৭৮-এর সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাতা আমার হাতে তুলে দিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে প্রহর গুনছেন মরিচঝাঁপি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

'অদ্য ইংরাজি ২৫/১২/৭৮ তারিখ বেলা ৩ ঘটিকায় নেতাজী নগরে গরিব উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীর মৌলিক ও সঠিক পৌরাণিক সামাজিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষাদিবস' সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন সম্বন্ধে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির (সর্বভারতীয়) স্থায়ী সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী সতীশ মণ্ডল মহাশয়।

সভায় বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল।

১. ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের প্রস্তাব ও সমর্থনে এবং স্বেচ্ছাকৃত মত প্রকাশের দ্বারা ৯ (নয়) জন সদস্য বিশিষ্ট এক উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইল। প্রকাশ থাকে যে, এই নব মনোনীত সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পদমর্যাদা অভিজ্ঞতা

অনুসারে স্থির করিবেন। উদ্বাস্তু সমস্যা ও বাঁচার পথে সংঘর্ষের ভূমিকার উপর গুরুত্ব রাখিয়া সকল প্রকার বিদ্যানুসারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কমিটির মিটিং-এ অবাধ অধিকার প্রদানের মাধ্যমে পরস্পর মত বিনিময়ে সৌহার্দপূর্ণ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ধাপে ধাপে মৌলিক ও সার্বিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারতার সুচারু ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। যাহাতে অনতিবিলম্বে এই দুঃস্থ গরিব প্রতিষ্ঠানটি আদর্শ শিক্ষার কেন্দ্রভূমিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিচালন কমিটির সদস্যবৃন্দ বিশেষ মনোযোগী থাকিবেন।

মনোনীত সদস্যবৃন্দ

১. শ্রী নির্মলেন্দু ঢালী (প্রধান শিক্ষক)	স্বাক্ষর
২. শ্রী রঙ্গলাল গোলদার (প্রঃ উপদেষ্টা)	,,
৩. শ্রী অরবিন্দ মিস্ত্রী (সেক্রেটারি)	,,
৪. শ্রী অতুল কৃষ্ণ রায় (সহঃ সেক্রেটারি)	,,
৫. শ্রী সমীর সমাদ্দার (ক্যাশিয়ার)	,,
৬. শ্রীপদ মণ্ডল (সদস্য)	,,
৭. শ্রী বীরেন্দ্র গাইন ,,	,,
৮. শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী ,,	,,
৯. শ্রী অরুণ কুমার রায় ,,	

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাভঙ্গ হইল।

সতীশ মণ্ডল
সভাপতি
১৫/১২/৭৮

এরপর ১/৯/৮৫ তারিখের মিটিং-এ খুব পরিষ্কার ভাবে কার কী দায়িত্ব তা নির্ধারিত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত :

১. স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে সম্পাদক সরাসরি ভাবে সমিতির নিকট দায়ী রহিলেন।

২. সম্পাদকের দায়িত্ব : শীর্ষক কলমে ক—জ পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব উল্লেখ আছে, যা সাধারণ ভাবে থাকে তাই।

পরিষদের দায়িত্ব কলমে—

ক ও খ দুটি দায়িত্বের উল্লেখ আছে।

প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার সকাল ৮টায় পরিষদের সদস্য ও শিক্ষকগণ মিলিত হবেন। এবং প্রতি মাসে ১ বার জনসভা হবে।

সবচেয়ে লক্ষণীয় হল প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব :

• গতানুগতিক শিক্ষাদান প্রথাকে পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ণয়।

• বিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও নৈতিকতা সংরক্ষণ, শৃঙ্খলা, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা।

• শিক্ষক সুলভ আচরণের মাধ্যমে জনসাধারণের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব।

• জরুরী প্রয়োজনে তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার অধিকার, গ্রন্থাগারের গ্রন্থ নির্বাচন ইত্যাদি।

২নং সিদ্ধান্তটিতে আমার মতো অনেকেরেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

২ দিনের মধ্যে ঘরের ছাউনির জন্য সভাপতির সাহায্য, নোটিশ ও ঢ্যাড়া পিটিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে পরীক্ষার খরচের অর্থ সংগ্রহ।

এছাড়া শিক্ষক ও পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকেও পরীক্ষার খরচ চালানোর জন্য অর্থ সংগ্রহের একটি তালিকা আছে।

১. শ্রী সমীর সমাদ্দার	১০.০০	(জমা)
২. দ্বিজেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী	৫.০০	(,,)
৩. বীরেন গাইন	২.০০	(,,)
৪. অরুণ রায়	৫.০০	(,,)
৫. অতুলকৃষ্ণ রায়	২৫.০০	(,,)
৬. অরবিন্দ মিস্ত্রী	২১.০০	(,,)
৭. রঙ্গলাল গোলদার	২৯.০০	(,,)
৮. শ্রীপদ মণ্ডল	৬.০০	(,,)
৯. নির্মল ঢালী	৫.০০	(,,)
১০. রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল	২.০০	(,,)

সাধারণের তরফ থেকেও স্বেচ্ছা দানের আহ্বান ছিল এবং সেই ডাকে সাড়াও মিলেছিল। যেমন শিবপদ সরকার ২.০০।

ঐ সভারই বিবিধ বিষয়ে টিচিং এইডস এবং নেতাজির ছবি সংগ্রহের দায়িত্ব বণ্টন করা হয় এবং উঁচু শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী দল গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় একজন শিক্ষককে। ঐ দলটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও সমাজ সেবামূলক কাজে অংশ নেবে।

ঐ সভার আর একটি যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য, তা হল, যে কোনো কো-এডুকেশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে কোনো শিক্ষয়িত্রীকে সদস্য পদ দিতে সহজে রাজি হতে চান না। তার প্রমাণ, 'মহিলা' বিল পাশের দড়ি টানাটানি। অথচ তথাকথিত নিম্নশিক্ষিত প্রায় অশিক্ষিত (নিরক্ষর) লোকেরাও



কিন্তু স্বেচ্ছায় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটিতে শিক্ষিকা শ্রীমতী কণিকা বিশ্বাসকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলেন।

পরবর্তী সভায় অর্থাৎ ৮/৯/৮৫ তারিখের সভার মূল দুটো বিষয়ের গুরুত্ব বেশি। তা হল পরীক্ষা পরবর্তী কালের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালনের কর্মসূচি গ্রহণ।

ঐ সভা থেকে জানা যায়, বিদ্যালয়ের খরচের জন্য সমিতির কাছ থেকে ২০০/- দুইশত টাকা সম্পাদক মহাশয়ের কাছে জমা পড়েছে।

• পর্ষদের কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক চরিত্রের স্খলন হলে তাঁকে সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

• অষ্টম শ্রেণির কোনো ছাত্রছাত্রী অন্য বিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার অনুমতিপত্র চাইলে তা দেওয়া হবে না।

• অবৈতনিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আবেদনকারীকে অবশ্যই নেতাজী নগরের বাসিন্দা হতে হবে। তাঁর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর তবেই দায়িত্ব দেওয়া হবে।

•

দেশাত্মকবোধক গান কবিতা, নেতাজীর জীবনী সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিযোগিতা, খেলাধূলা, বক্তৃতা ইত্যাদির প্রতিযোগিতা হবে ২১-২৩ জানুয়ারি। তাও সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

১৫/৯/৮৫ সভায় ঠিক হয় ৮/১/৭৯ বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা, ১ দিন মাত্র অর্থাৎ ৯/১/৭৯ ছুটি অর্থাৎ পঠন পাঠন বন্ধ থাকার এবং ১০/১/৭৯ থেকে আবার প্রার্থনার পর নেতাজী বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

নতুন দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের বিষয়ে আলোচনা হল। আরও ঠিক হল বহিরাগত কোনো শিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। কারণ অনুমান করা যায় যে এত অল্প সময়ের মধ্যে যে আদর্শ ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারও দ্বারা সম্ভবও না, বা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিম্নতম উৎসটুকুও হাত ছাড়া করা সম্ভব নয়।

তবে ১/১/৭৯ থেকে ৮/১/৭৯ এর মধ্যে নুতন শিক্ষকের পদের জন্য আবেদন করার আহ্বানও জানানো হল। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কেও আলোচনার মৃদু দাবি রাখা হল।

এমন দরিদ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে গুণগুত মানের দিক থেকে দরিদ্র ছিল না, তার প্রমাণ— বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিও গঠিত হয়েছিল এই অল্প পুঁজি ও অল্প সময়ের মধ্যে।

৫। ক-সিদ্ধান্ত :-

এখানে আছে 'স্কুল লাইব্রেরি স্থানান্তরিত, সম্প্রসারিত ও নির্দিষ্ট স্থানে সুষ্ঠভাবে স্থাপনের কথা।'

আমাদের ক-টা বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি আছে?

৫। খ সিদ্ধান্তটি সরাসরি আমাদের অর্থাৎ 'বিদেশি সাহায্যে বিশ্বাসী' দের গালে সজোরে এটি থাপ্পর বলা যায়।

প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে নথিগুলো খুলে জোরে জোরে পড়ছিলাম। প্রথম বাক্যটি শেষ হতেই, লজ্জিত চোখ তুললাম প্রধান শিক্ষকের মুখে—। নির্লিপ্ত সে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত স্মৃতিপথে নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গণে।

বাক্যটি হল—

'শিক্ষকবৃন্দ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যমণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর বিদ্যালয় গৃহের ছাউনির কাজ ন্যস্ত করা হইল। স্বহস্তে তাহারা এই কার্য করিবেন।'

২৬/৯/৮৫-এর সভায়

১০/১/৭৯-এ শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দুইজন অবৈতনিক শিক্ষক শিক্ষিকাকে ১৫/১/৭৯-১৭/১/৭৯ এর মধ্যে কার্যভার গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

এরা হলেন শ্রী বিজয় কৃষ্ণ মণ্ডল ও শ্রীমতী গীতারানি মণ্ডল।

এরপরই ১১/১/৭৯-র একটি বিজ্ঞপ্তিতে ২৩/১/৭৯ এর মধ্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য অভিভাবকদের জ্ঞাত করা হচ্ছে।

১৪/১/৭৯ তে শিক্ষকদের বেতনহারের সামান্য উন্নতি ঘোষিত হল। ৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য বেতন বাবদ মাসিক দেয় মোট ৯৯০ টাকা (নয়শত নব্বই টাকা) ধার্য হল এবং তিনজন শিক্ষকের বেতন বিবেচনাধীন রইল।

পাঠ্যপুস্তক-তালিকা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হল প্রধান শিক্ষকের উপর।

২৩ জানুয়ারি, ভোর ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানসূচি ঘোষিত। এছাড়া সিদ্ধান্ত হয় '২৩ জানুয়ারি তিরিশতম সুভাষ জয়ন্তী দিবস ও সপ্ততম সমিতি দিবস উপলক্ষে দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে জামা ও প্যান্ট দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।'

ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত চেতনা। এই অলংকারহীন কঠোর বাস্তব বোধই ততোধিক কঠিন দণ্ডকের মাটিকে বশ করেছিল, এখনও করে চলেছে। সভ্যতার রথের চূড়ায় ওড়ে এঁদেরই জয়ের কেতন! আর রথচক্রে পিষ্ট হয় হিংস্র ক্ষমতালোভী মনুষ্যত্বহীন, বিবেকহীন প্রবঞ্চক ক্ষমতাদর্শীর দল। যুগ যুগ ধরে জনতার আদালতে ইতিহাস তাদের নাম ঘোষণা করে মাত্র।

মরিচঝাঁপি নেতাজী বিদ্যাপীঠের তথ্যের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাদের আশা আকাঙ্খা স্বপ্নের সঙ্গেই আমার চেতনাও কখন সহযাত্রী হয়েছিল বুঝতে পারিনি। বুঝলাম ২৬/১/৭৯ এর একটি বিজ্ঞপ্তিতে। বিজ্ঞপ্তিটি প্রধান শিক্ষকের নয়, দিয়েছেন রাইহরণ বাড়ৈ।

সাধারণ সম্পাদক
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
(সর্বভারতীয়)
নেতাজী নগর, মরিচঝাঁপি

এতে বলা আছে যে আগামী ২৭/১/৭৯ থেকে সমিতি ও নেতাজীনগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকাল ৮টা থেকে ১টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

কেমন যেন ছন্দপতনের সুর!

২৫/২/৭৯-এ একটি জরুর মিটিং-এ, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর রাজ্য সরকারের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজের ধর্মঘটের ডাকে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।'

অর্থাৎ সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভেঙে পড়েনি। তার প্রমাণ ৯/৪/৭৯ চারজন শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র চাওয়া হয়। ২৫/৪/৭৯ এর বিদ্যালয়ের সম্পাদক সমিতির সম্পাদকের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠান, তাতে 'বিদ্যাপীঠের দ্রুত অর্থনৈতিক অবনতির জন্য তাদেরকে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা মিলে বাজারে গিয়ে হাত পেতে ভিক্ষা করতেন পরীক্ষার খরচ চালানোর জন্য।'

৩০/৪/৭৯-এ সোমবার নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এবং ৪/৫/৭৯ তারিখে শ্রীমতী গীতারানি মিস্ত্রীকে ১ মাসের মধ্যে বৈধ কাগজপত্র সহ উপস্থিত হ'তে বলা হয়েছে। মরিচঝাঁপি বিদ্যাপীঠে এটাই শেষ নিয়োগ।

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। চোখে জল এল, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনি একটা যন্ত্রণা গলার কাছে ওঠানামা করতে লাগল।

‘কাকীমা! রান্না হয়ে গেছে খাবেন আসুন!’ দিবাকর! মরিচঝাঁপিতে যায়নি, বাংলাকে দেখেনি, বাংলা হরফ চেনে না, সে কি বাংলায় যেতে চায়?

উত্তর— ‘বাবা মা বা অন্যরা যেমন কষ্ট পেয়েছেন, তেমন হলে কখনই যাব না। তবে উনাদের মুখে গল্প শুনে একটা টান অনুভব করি। আপনি তো কত ভাল। তা হলে এমন হল কেন কাকীমা! সবাই কি আপনার মতো না?’

খেতে বসে শুনলাম প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী শ্রীমতী তরুরানি ঢালীর স্মৃতিচারণ।

সত্যিই তো! নির্মল ঢালীকে তো পুলিশ লুঙ্গি পরা অবস্থায় ঘুম থেকে তুলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ১ মাস জেলে বিনা বিচারে বিনা কারণে এক বস্ত্রে কাটাতে হয়েছিল। তারপর মরিচঝাঁপি ধ্বংসস্তূপ! তবে ফাইলটা রক্ষা পেল কী করে!

সবাই যখন কাঁদানে গ্যাসের ফাটানো সেল-এর তাড়নায় আক্রান্ত, পুলিশের ধরপাকড়-মার, টেনে হিঁচড়ে সকলকে পুলিশ লঞ্চে তুলে দিচ্ছে, যার যতটুকু সম্বল গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত দিশাহীন মানুষগুলো, তখন শ্রীমতী তরুরানি ঢালী, প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী, পুলিশকে অগ্রাহ্য করে ঢুকে পড়লেন স্কুলবাড়িতে। সেখান থেকে যতটা পারলেন কাগজপত্র ফাইল খাবলা দিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাসনাবাদের প্ল্যাটফর্মে শ্বশুরকে রেখে দিনের পর দিন জেলের দরজায় সারাদিন কাটিয়ে রাত্রে ফিরতেন বৃদ্ধ শ্বশুরের কাছে। খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে স্বামীর মুক্তির আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হওয়ায় প্রায় মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষকের স্বপ্নের ভগ্নাবশেষটুকু হাতছাড়া করেননি, যা আজ এই মুহূর্তে জ্বলন্ত দলিল হিসাবে আমার হাতে।

মনে পড়ল বিদ্রোহী কবির লাইন দুটি—

‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর।
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।’

সেদিন এক বুক টাটকা অক্সিজেন নিয়ে ফিরলাম, এম পি ভি-১১র মরিচঝাঁপির নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষকের বাড়ি থেকে।

মরিচঝাঁপি আজও পরিত্যক্ত দ্বীপ। স্মৃতিভারে সে বড় ক্লান্ত, রিক্ত।



সতীশ মণ্ডল শুধু সাক্ষর করাটুকু জানতেন। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সততায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সকলের নেতা। ছিলেন 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'র সভাপতি।

রাইটার্সে জ্যোতি বসুর কাছে

সতীশ মণ্ডল

জ্যোতি বসুর কাছে যেইয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ বললাম যে আপনি আমাদের বাঙালি, সর্বেসর্বা, আপনার কাছে একটু অনুরোধ যে আমরা এই রিফিউজি আন্দোলনটা দিল্লি করবো বাকি আমাদের উপর যে অত্যাচারটা হবে সেইটে পেপারে বা আপনার ক্ষমতা অনুসারে প্রচার করবেন। শেষ পর্যন্ত বইললো, তোমার কথায় কি আমার নেতাগিরি করতে হবে? আমি বইললাম, না আমার কথায় নেতাগিরি করবেন কেন। তখন বললাম শেষপর্যন্ত আন্দোলন করতাম দিল্লি সেই আন্দোলন এখন পশ্চিমবাংলায় করতে হবে। বাঙালির সামনে আমরা মরিবাঁচি কেউ যদি থাকে আমাদের, তা আমাদের সহায়তা করবে, আর কি। এই সমস্ত বলে বললাম যে আপনি যখন আমাদের সহায়তা করলেন না, তা ইতিহাসে যেন লেখা থাকে 'জ্যোতিবাবু এই এই করেছে।' আমরা তো মরা, আমাদের আর কি মারবেন। তবে আপনার কাছে অনুরোধ যে এই আপনার পুলিশ দিয়ে এদের উপর অত্যাচার আর করবেন না। আর সব তো মনে নেই, এখন, এখন ব্রেনে আর বেশি কিছু আসে না।

প্রশ্ন : না না, যথেষ্ট হয়েছে, আমরা এত আশা করিনি আপনার কাছ থেকে। মোটামুটি আমরা এই বললাম যে, মরিচঝাঁপির ইতিহাসটাকে ধরে রাখা পরবর্তী প্রজন্মের কাজ, অন্তত কিছু বার্তা পৌঁছাক, এই জায়গা থেকে আমাদের প্রচেষ্টা এবং আপনাদের দুজনের ছবি তোলার জন্য আমরা সকাল থেকে আসিওনি এখানে আজকে। বৌদিকে বলে গিয়েছিলাম যে সকালে আসব কিন্তু রাত্রে ওনার [রবীন চক্রবর্তী] সাথে কথা হল, কালকে রাত্রে যখন শুনলাম উনি আসবেন... বইটা যদি একটু আনেন, বইটার যিনি লেখক তিনি আপনাকে চেনেন, দুইজনকেই চেনেন, তো তিনি আমাদের সমস্ত ঠিকানা সংগ্রহ করে সবকিছু করে দিয়েছেন।

সতীশ : মেজ বউমা, আমার ঘরে টিভি-র পাশে কাপড়চোপড় বইয়ে... বই রইয়্যেছে একটা।

রবীন্দ্রনাথ : কি বই ?

প্র : মরিচঝাঁপি।

স : ও আর কিছু বই নেই তো!

প্র : তারপরে আপনার ইচ্ছা হয়নি যে পরবর্তী প্রজন্মকে এই আপনাদের চিন্তাগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া বা চিন্তাগুলোকে তাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখা, এইরকম কিছু ভেবেছিলেন ?

স : ঐ মছলন্দপুরে একডা... [মেজ বউ বইটা এনে দিলে দেখতে থাকেন]

প্র : বইটা রাত্রে দেখেছিলেন ? না, দেখা হয়নি!

স : [ইসারায় মাথা নাড়েন, না এবং বইয়ের পাতা খুলে, ঐ অসুস্থতার মধ্যেও আগ্রহ সহকারে পড়তে থাকেন...]

প্র : বইটা আপনাদের সঙ্গে ছিলেন এমন কিছু সাংবাদিক, তাঁরা আপনাদের দেওয়া যেসব তথ্যগুলো, আপনাদের কাগজপত্র সেইগুলোকেই এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটার কিছু কপি পাঠাব, যেটা রবীনবাবুকেও দিতে পারিনি, একটাই নিয়ে এসেছিলাম। হ্যাঁ যেটা আপনি বলছিলেন মসলন্দপুরের...

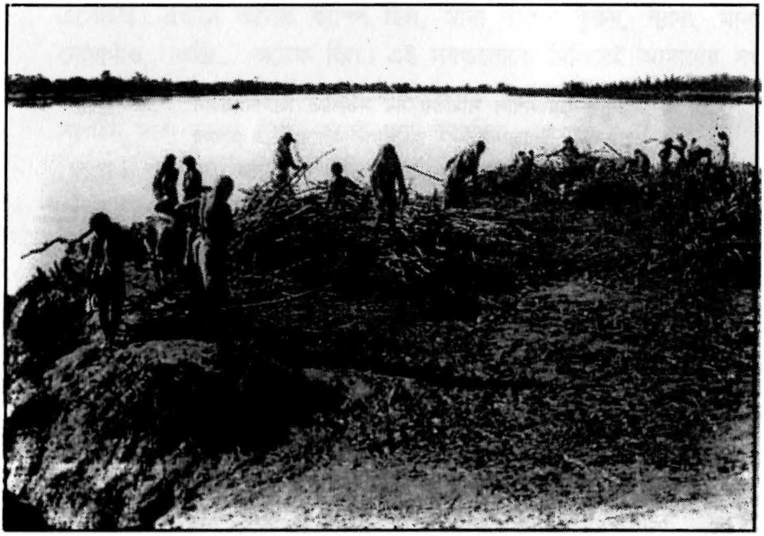
স : ওরা আবার কিছু সাহায্য টাহায্য করবে আবার আন্দোলন করবে। বললাম, যেডা করলাম সেইডেই কিছু করলে না, পরে আর কি কইরে লাভ হবে!

প্র : আবার যদি কোনো ডাক আসে নেতৃত্ব দেবার জন্য মরিচঝাঁপি যাবার, যাবেন ?

স : আর বুড়ো বয়সে যাবার মতন... অভিজ্ঞতা রইয়্যেছে, কিন্তু ঐ নেতাগিরি করতে গেলে... আগে জেল খাটবার ভয় করলে হবে না। তা হলে নেতাগিরি করা যাবে না!

র : মন চায় কিন্তু সেই শক্তি তো নেই এখন...

প্র : কিন্তু অভিজ্ঞতা তো অনেক মূল্যবান।



স : সেটা আপনারা কি করবেন না করবেন, আমরা কি বলতে পারি। তবে তখন যে লোক ডাক দিয়ে পেয়েছিলাম, এখন আর পাবো না। তার অর্থ এই যে কষ্ট করে তারা যে এই দেশের থেকে সে দেশে গেছে, বহু লোক মারা গেছে, তার কোনো সংখ্যা নেই।

প্র : মরিচঝাঁপির, আপনাদের হিসাবে কি রকম হতে পারে? কত ফ্যামিলি গিয়েছিলেন, ফিরেছেন কত জন, এইরকম।

স : শোনেন, গিছিলাম তো বহু, তারপর যেয়ে ওখানে গুলি গোলা হইছিল, তাতে ৮০/৯০ জন লোক মারা যায়। তারপর লোক ফেরত আসা শুরু করইলো, সরকার ডাক দিল যে এস, আমরা, তখন জনতা সরকার ছিল বোধহয়...

র : জনতা। কেন্দ্রে ছিল জনতা, পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম।

স : দিল্লি তো গিছিল আমাদের ওখানে, তারা তো বইলিছিল অনেক কিছু কিনতু করল না কিছু। সি পি এম-এর ৩৬টা এম পি ছিল, এটা ওরা সহায়তা করবে বলে আর কিছু করে নি আমাদের। সিদা কথা বললাম তো যে এই আমাদের আর করবার ক্ষমতা নেই, কইরতি গেলে যে ক্ষমতার দরকার হয়...

সাক্ষাৎকার : ২৭ মে ২০০৬



উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সহ সভাপতি ছিলেন রবীন চক্রবর্তী। উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন বহুবার।

শুরু থেকে শেষ

রবীন চক্রবর্তী

রবীন : আমাদের সংগঠনের নাম ছিল 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'।

প্রশ্ন : আপনি কোন পদে ছিলেন ? অন্যান্য পদে কারা কারা ছিলেন ?

রবীন : আমি সংগঠনের সহ-সভাপতি ছিলাম, অন্যান্য পদে ছিলেন সভাপতি সতীশ মণ্ডল, সেক্রেটারি রাইহরণ বাড়ৈ, জয়েন্ট সেক্রেটারি অরবিন্দ মিস্ত্রী, কালীনারায়ণ বোস, চিফ ক্যাশিয়ার রঙ্গলাল গোলদার, মেম্বার ছিলেন— মহাদেব দাস আরও অনেকে।

প্র : আপনার কাদের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে ?

র : একমাত্র সতীশদার সঙ্গে যোগাযোগ আছে আর অন্যান্যরা কলকাতার দিকে আছে। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

প্র : কত সালে আপনাদের সংগঠন তৈরি হয় ?

র : সালটা আমার মনে নেই। তবে '৭০-এর পরে '৭১-'৭২ এর মধ্যে হবে।

প্র : কত সালে পূর্ববাংলা থেকে আসেন ? আর কারা এসেছিলেন ?

র : আমি এখানে পৌঁছাই ১৯৬৫ সালে, এখানে ১ লাখের বেশি ফ্যামিলি

এসেছিল। এখানে অনেক ক্যাম্প ছিল, মানা ক্যাম্প কুরুদ, বরদা, মানাভাটা, নোয়াগাঁও, কেন্দ্রি... অনেক ছিল। এই সবগুলোকে মিলিয়েই আমাদের সংগঠন। মধ্যপ্রদেশের বেতুল। অর্থাৎ সারা ভারতে যত জায়গায় উদ্বাস্তুরা ছিল, আমাদের সংগঠন সারা ভারত ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল।

প্র : আপনারা মরিচঝাঁপি যাওয়ার কথা কেন ভাবলেন ?

র : এখন বাংলা, বাঙালি তো! বাংলার পাশে থাকতে চাই এই জন্য। আর এখানে একরকম ধরেন জল ব্যবস্থা কিছুটা হচ্ছে, আগে তো কিছুই ছিলনা, মরুভূমি। যে সমস্ত এরিয়া আমি ঘুরে আসছি যেমন মহারাষ্ট্র, সেখানে জলের যা ক্রাইসিস, ফসল তো হত না। আমাদের যে জমিগুলো দিত, তার উপরে পাহাড়ের দিকে আর আদিবাসীদের দিত নিচের দিকে। বর্ষার জলটা সব নিচে নেমে যেত, উপরে ফসল হত না। বড় অসুবিধা ছিল, বেতুল আগে যে condition ছিল, যদি বর্ষা নামত, আপনি market-এ আসছেন, চোপরা একটা মার্কেট আছে ওখানে, সপ্তায় একটা বাজার হত। আপনি মার্কেটে আসছেন, যদি বর্ষা নেমে গেল, আর আপনি ২/৩ দিন বাড়ি যেতে পারবেন না। এই রকম condition ছিল। বেতুল, আমি সেখানে গেছি একবার। সেখানে ষড়যন্ত্র করে আমাকে এ্যারেস্টও করা হল। যাই হোক আমলাদের ব্যাপার। কিন্তু আমি মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কয়েক জায়গায় আমি গেছি ক্যাম্পে দেখার জন্য কিন্তু কোথাও কোনো সাকসেস ছিল না। ঐ মরিচঝাঁপি jump করার পরের থিকা এরা নজর দিল। আমাদের আয়ের কোনো উৎস ছিল না। সরকার যা ডোল দিত তা sufficient ছিল না। কি করে sufficient হবে! তখন বাইরে আট আনা সের চাউল ছিল, গভর্নমেন্ট ৯ আনা কিলো নিত রেশনে। আবার এমনও সময় করত যে রেশন থেকে চাউল নিতে হবে। আমরা অনেক সময় দেখতাম বাইরে কম, তা হবে না, রেশন থেকে নিতে হবে। অনেক রকম আছিল। আরও অনেক বাধাবিঘ্ন, সমস্যা ছিল। হরির লুট দিতে গেলে বাড়িতে, পারমিশান নিতে হবে, সরকারি পারমিশন লাগবে। একটা অথরিটির ব্যাপার ছিল। যদি আপনি বাড়িতে লুট দেন বা কীর্তন দেন, তাহলে সরকারি পারমিশন ছাড়া আপনি করতে পারবেন না, সেখানে Security Guard থাকবে। সরকারের নীতি। এই রকম অবস্থায় আমরা ছিলাম আর কি। বাক্ স্বাধীনতা আমাদের ছিল না।

প্র : আপনার মরিচঝাঁপির অভিজ্ঞতাটা একটু বলবেন? তার আগে বলবেন, আপনারা প্রস্তুতিটা কিভাবে নিয়েছিলেন?

র : প্রস্তুতিটা মানে, সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হল, আমাদের সমিতি গঠন হল। গঠন হবার পরে, আমরা আলটিমেটামটা রাখলাম, হয় আমাদের পুনর্বাসনের জন্য যদি কোথাও পাঠানো হয়, তবে আমাদের জায়গা দেখার অধিকার

দিতে হবে। সেখানে যদি পছন্দ হয়, যাব, নচেৎ যাব না। সরকারের প্রশ্ন না, তা হয় না। যেখানে আমরা জায়গা পাব জমি পাব, সেইখানেই দেব। সে মরুভূমি আর জলাভূমি হোক। এইরকমভাবে আলোচনা অনেক দিন চলল তারপর অনশন শুরু হল। এখানে আমরা পুনর্বাসনের জন্য অনশন শুরু করলাম। অনশন শুরু করার পর, মানে একটা ঢিল ফেলাই দিলেন এক জায়গায়, মরল কি বাঁচল, দেখার দরকার নেই। অবশ্য সরকার, কাকে দোষ দিব বলেন, এখন কি আমাদের অদৃষ্ট, না, সরকারের পরিচালনার কোনো ত্রুটি ছিল! মাসের উপরে গেছে অনশন, যেটাকে হাঙ্গার স্ট্রাইক বলা হয়, সেটা একমাসের উপর চলছিল। তারপর চলল আমরণ অনশন, তারপর সেক্রেটারিরা আসল, আলোচনায় বসল, তারা মানতে রাজি না। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, দিল্লি থেকে আসল। পুনর্বাসন দপ্তরের, গোবিন্দরাম ছিল একজন, আছে কিনা জানি না এখন, ডেপুটি সেক্রেটারি, বোস বাবু ছিলেন ওদের সেক্রেটারি, উনি আসলেন, চিফ সেক্রেটারি আসলেন। এখানে মিটিং হল, চিফ কমিশনার ছিলেন, নন্দী, কর্নেল বাঙালি, উনি ছিলেন, ওখানে মিটিং হল, success হল না মিটিং-এ। তারপরে আমরা ultimetum দিলাম আমরা jump করব, কোথায় যাব? মরিচঝাঁপি যাব। মরিচঝাঁপি আমরা দেখতে গেছিলাম তো। আমরা দেখে আসছি, মরিচঝাঁপি। যেহেতু ওটা বাংলা, আমরা বাঙালি। বাংলায় যাব, খোঁজটা পেলাম, দেখেন খোঁজটা automatically হয়ে যায়। লোকের আলোচনায় পরস্পর সেটা হয়ে যায়। আমরা গেছিলাম। সতীশদা, আমি, রঙ্গলাল গোলদার, আরও একজন ছিলেন।

ওখানে আমরা কি করলাম, সাতজেলের থেকে আমরা নৌকায় করে চললাম। নৌকায় যেতে গেলে, ওখানে আবার ব্যারিকেড ছিল। মরিচঝাঁপি যেতে গেলে, কুমিরমারি থেকে ৫ টাকার টিকিট লাগত। আমরা কি করলাম, যেতে পারলাম না ভিতরে। তো বাইরে থেকে দেখলাম, উর্বর জমি, ভালো, নারকেল বাগান টাগান আছে। পাড়ে গেলাম।

আমি আর সতীশদা ছিলাম। সতীশদা বলল, দাদা যদি পাইয়া যাই, হইলে ভালো হবে। যাই হোক তারপর আমরা jump করলাম, বাধাবিঘ্নর উপর দিয়া অনেক কিছু হল। সরকার অনেক বাধা দিল। অনেক কিছু করার পরেও আমরা পৌঁছে গেলাম। Date গুলো আমার মনে নেই দাদা। এখান থেকে ট্রেন, তারপর নৌকায় গেলাম।

প্র : আপনার অভিজ্ঞতাগুলো ধাপে ধাপে বলুন।

র : হাসনাবাদ, হাসনাবাদ থেকে পার হয়ে ওপারে গেলাম আবার নৌকায়, আবার লঞ্চ, করতে করতে আমরা মরিচঝাঁপিতে উঠলাম। প্রথম দিন কম ফ্যামিলি উঠলাম। তারপর আস্তে আস্তে তো, সংখ্যাটা আমার খেয়াল নেই, এই মানা



ক্যাম্পটা যত দেখতেছেন না! এর চেয়ে বড় এরিয়াটা ছিল মরিচঝাঁপিটা। খাল বাইরাই গেছে, তারপাশে আবার চর উইঠা গেছে, সেগুলা আমরা দখল করছিলাম। সেখানে ঘর বাড়ি উইঠা গেছিল। আমরা যদি একটা বছর টাইম পাইতাম, বা দেড়টা বছর টাইম পাইতাম, আমরা তো সরকারের সাহায্য চাইছিলাম না, আমাদের সাহায্য কর, use কর, অক্লান্ত পরিশ্রম করে জায়গাটাকে আমরা উর্বর কইরা ফেলাইছিলাম। ওখানে গিয়া আমরা ধানও চাষ করছিলাম। যা নাকি নোনা মাটিতে হয় না, অবশ্য হয়নি ফসল, অল্প কিছু পাইছিলাম। কিছু জায়গা করা হইছিল। আর মাছের চাষ।

প্র : আপনারা পশ্চিমবঙ্গের কিছু নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে তো যোগাযোগ করেছিলেন।

র : হ্যাঁ রাম চ্যাটার্জির সঙ্গে ছিল। রাম চ্যাটার্জির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। রাম চ্যাটার্জি এখানে আসছিল, অন্য ক্যাম্পেও দেখছে গিয়ে। এখনো লোক বাস করার মতো না, সে নিজেও বলছে। জ্যোতি বসু মিটিং করছে। জ্যোতি বসু বলছিল, মরিচঝাঁপিতে না বসে তোমরা, ঝড়খালি এটা জায়গা আছে, ঝড়খালিতে তোমরা, কিছুটা জায়গা পুনর্বাসন হয়ে গেছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে, কিছুটা জায়গা খালি রইছে লোক যায় নাই সেখানে, প্রচুর জায়গা রয়েছে সেখানে, আমি দিয়ে দিচ্ছি আর বাকী যা থাকবে আন্দামান পাঠাই দেওয়া হবে। তা আমাদের তো মত ছিল যে, না, আমরা মরিচঝাঁপি ছাড়া আর কোথাও যাব না। সেখানে আমাদের বাড়িঘর, ইস্কুল হয়ে গেছে, হসপিটাল, বেকারি, মার্কেট। ওখানে

আশেপাশে যতগুলা গ্রাম ছিল, সব আমাদের মার্কেটে আসত। আসত তারা সওদা করতে। মার্কেটে যা বিক্রি হয়, সাংসারিক সবই চলত ওখানে। মুদির দোকান, মিষ্টির দোকান, চা-র দোকান, স্টেশনারি দোকান, রুটির বেকারি। রুটি তৈরি হত ওখানে। সে বড় বড় রাস্তা আমরা নিজেরা বানাইছি। মাথায় মাটি বইয়ে সেই রাস্তা আমরা নিজেরা বানাইছি। লেবার দিয়া আমরা বানাইনি। নিজেরা বয়েছি, মাটির বড় বড় সড়ক বানাইছি। মরিচঝাঁপি তো ছোট্ট জায়গা না তো। জ্যোতি বসুর সঙ্গে মিটিংটা হইছিল, সেই মিটিং-এ আমি ছিলাম না। সেই মিটিং-এ সতীশদা ছিল, রাইহরণ ছিল, অরবিন্দ মিস্ত্রী ছিল, গোলদার, গোলদার বোধ হয় ছিল। আমি বলতে পারছি না, শুনি নাই। সরকার এটা চেয়েছিল প্রকাশ্যে হোক আর গোপনে হোক। প্রকাশ্যে তো বলতে পারে না, গোপনে হোক, ঠিক আছে। এখন...

প্র : আপনাদের এখানে মন্ত্রী এসেছিল, আলোচনা হয়েছে, তা হলে তো বিষয়টা প্রকাশ্যেই এল। কিন্তু তা হলে এমন কি ঘটল যে আপনাদের সঙ্গে বিরোধ হল ?

র : এখন দেখেন আমরা যা কিছু করতাম, নিজেরাই করতাম। সরকারের কোনো সাহায্য, সরকার আমাদের দেয় নাই কিছু। যাই হোক আমরা কায়িক পরিশ্রমে যা কিছু করতেছিলাম, সমস্ত ঘরবাড়ি উঠতেছিল। এখন সরকারের কথা হচ্ছে যে মরিচঝাঁপিতে যদি এরা বসে, এটা রাজনীতির ব্যাপার। এখন ধারণা করে আর কি করবে কেন ? ধারণা হচ্ছে এই যে এখানে বসলে এরা আমার পার্টিতে থাকবে কি থাকবে না। এও হতে পারে। এরা কোনদিকে মোড় নেয় ঠিক নাই। এরা আলাদা রাষ্ট্র করে নেয়। এখন তো বর্তমানে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র হচ্ছে। এম পি ভেঙে দুইটা হয়ে গেল। বিহার ভেঙে দুইটা হয়ে গেল। ওটাও হইতে পারে যে মরিচঝাঁপি আলাদা রাজ্য হই যাক। এই বৈষম্য আসতে পারত। কথা হচ্ছে যে সরকার, তখন সি পি এম সরকার ছিল, জ্যোতিবাবুর সরকার ছিল। আর জ্যোতি বসু একা না, সরকারে। প্রমোদ দাশগুপ্ত তিনি সি পি এম-এর সেক্রেটারি ছিলেন। এখন অনেক কথা হতে পারে। কেন যে এরা খেপে গেল, আর টর্চারিং করল আমাদের উপরে, এমন কিছু অন্যায় তো আমরা করিনি। আমরা জায়গাটা চাইছিলাম এই তো। তোমাদের কোনো ফেসিলিটি বা তোমাদের কোনো সাহায্য কর এমনও তো কই নাই। অন্যান্য পার্টির থিকে আমাদের কি বলার দরকার। নদীর জল নোনা জল খাওয়া যাচ্ছে না। টিউবওয়েলে ২টা পাইপ, ৩টা পাইপ দিয়ে আমরা মিষ্টি জল পাচ্ছি। আমরা তো ২০/২৫টা টিউবওয়েলেও বসাইছিলাম। ভালো জল পাইতাম। আমি পুরো ফ্যামিলি নিয়ে ফাস্ট টু লাস্ট ছিলাম। অত্যাচার ? হ্যাঁ আমি তো প্রত্যক্ষদর্শী না ! ওরা প্রথম এ্যাটাক করে আমাদের উপরে, উঠে যেতো হবে। আমরা যাব না। আমরা বাধার সৃষ্টি করলাম ওরা কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। আমাদের

চেঙ্গা ছিল, চেঙ্গা চেনেন? চেঙ্গা বোঝেন তো? ডাল কেটে, এত বড় বড় এই মাথা চোখ্যা ঐ মাথা চোখ্যা। আমাদের অস্ত্র ছিল চেঙ্গা। চেঙ্গা ব্যবহার করতাম। ওরা কাঁদানে গ্যাস ছাড়তো, গুলি ছাড়ত ওরা। এইভাবে তো দুই/তিনবার আমাদের উপর এ্যাটাক করল ওরা। পারল না, ফিরে গেল। দেখেন, একে তো ভুখা মানুষ আমরা, ঠিক মতো খাওয়া পাই না। একের পর এক যদি আক্রমণ করতেই থাকে। আমাদের কয়েকটা নৌকা তো ওরা ব্যারিকেড করে দিল, আটকে দিল, আনাজের, চাউল, ডাইল আসতেছিল, মার্কেটে আটকে দিল। সেগুলা তো সরকার সব সিজ করে নিয়ে গেল নদীতে। ব্যারিকেড হয়ে গেল। খাব কি আমরা, আমাদের খাওয়া তো বন্ধ হয়ে গেল। লড়ব যে, পেটে যদি দানা না থাকে, তো লড়ব কারে দিয়ে। যদ্দুর সম্ভব ছিল, লড়ছি। ঢুকতে দিই নাই। লাস্ট, দেখুন মানুষ, এমন একটা পজিশনে ওরা ঢুকল, সে পজিশনটা ঠিক মানুষের একটা কালনিদ্রা আসে ভোরবেলার দিকে, ৪/৪.৩০ মিনিটে দেখবেন কালনিদ্রা আসে মানুষের। ঐ নিদ্রা যদি ভাইঙ্গে যায়, আর নিদ্রা আসে না, ঠিক ঐ টাইমে ওরা এ্যাটাকটা করল। তাও ঐ লাস্ট মাথায়, ১ নম্বর থেকে এ্যাটাকটা করল। আমাদের নাম্বার দেওয়া ছিল তো আমাদের ১, ২, ৩, ৪... এইরকম নাম্বার ছিল। মরিচঝাঁপির উপর ছিল ৭ নম্বর পর্যন্ত ছিল। এক একটা এরিয়া, এইরকম। আমি তো ধরেন রাইত নাই দিন নাই ভেড়ির উপর দিয়া সব সময় রাউন্ড দিতাম। যখন এ্যাটাকটা হল ঠিক ভোরবেলায়। মানুষ তখন সারারাত্রি জাগরণ, একের পর এ্যাটাক হচ্ছে সমানে, আর ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভোরবেলার দিকে লাস্ট ১ নম্বর থেকে ওরা উঠে গেল। তারপর পর পর লোক বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল, ডেকে ডুকে কাওরে আর পেলাম না। আস্তে আস্তে সব উঠে গেল। তারপর উঠে তো আমারে, সতীশদা সেইদিন রাত্রেই বোধ হয় চলে আসে। ওরা তো আমাদের নিয়ে, গোলদারবাবু, চিফ ক্যাশিয়ার ছিল সে, আমাদের জঙ্গলে রাইখে আসল। যদি ধরা দেই ওরা মাইকে announce করল। আমরা যে হাই স্কুল বানাইছিলাম, বিরাট করে। তার সামনে বিরাট মাঠ ছিল সেইখানে মিটিং টিটিং হবে এইরকম একটা দুই পাশে দুই বটগাছ লাগাই দিছিলাম। সে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। সে সব তো আর নাই, মনে হয়, সব নষ্ট কইরা ফেলাইছে। ওরা দখল করলে সেটা বড় হলঘর পাইয়া গেল। সেইখান ওরা ওয়্যারলেস ফিট করল, মাইক ফিট করলো। Announce করা শুরু করল যারা যারা আছো সব, আত্মসমর্পণ করা হোক। আমরা আপনাদের বন্ধু, বোঝানো শুরু করল, আমরা কোনো অত্যাচার করব না। সেই অত্যাচার করল লাস্টে। আগুন টাগুন লাগাই দিল। তখন তো আমি জঙ্গলে, আমারে নিয়া গেল জঙ্গলে। আমি একদিন, সারা দিন, এক রাইত জঙ্গলে কাটালাম। বাঘের আর ভয় নাই তখন, পুলিশের ভয়। ভয় আমি পাইছিলাম না, আমি তখন ধরা দিব। তো ছেলে বলল, না, আপনি একা

ধরা দিয়া কি করবেন! সবাই তো চলে গেছে কেউ নাই। সতীশদাও নাই, রাইহরণও নাই, অরবিন্দ মিস্ত্রীও নাই, কেউ নাই। তখন automatic ওরা ভোরবেলার দিকে নৌকায় করে বহু ঘুরে ক্যানিং-এ নিয়ে উঠিয়ে দিল আমারে। তাও বোধ হয় বেলা তিনটার সময় ওখান থেকে সুব্রত চ্যাটার্জি আমাকে নিয়ে যায় লোক দিয়ে। তখন আমার নামে ওয়ারেন্ট ছিল। ঐ আমরা বাঙালি, প্রেসিডেন্ট কি, কিছু হবে, ইঞ্জিনীয়ার বিল্ডিং-এর নকশা করে। বিলেতেও ছিলেন। উনি আমারে ওখানে, আমি যখন মরিচঝাঁপি থেকে চলে আসলাম, আমার ফ্যামিলি কোথায় আমি জানি না তো। আমার ফ্যামিলির সাথে দেখা হল ৭ দিন পরে। সুব্রত চ্যাটার্জি আমারে তেতালায় রাইখা দিল তিন দিন। রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাতায়াত শুরু করল ওয়ারেন্ট কাটানোর জন্য। যাই হোক ভদ্রালোক অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ওয়ায়েন্টটা কাটাই দিল। তো দেখেন সবাই একটা স্বার্থ চায়। আমরা যেমন স্বার্থ নিয়া গেছিলাম মরিচঝাঁপিতে, অবশ্য আইজকে সরকারের ঘাটা হত না। যে সরকারই আসুক, মরিচঝাঁপিতে আমরা যেভাবে পরিচালনা করে যেভাবে কিছু করছিলাম আইজকে প্রত্যেকটা রিফিউজি ভালো স্ট্যান্ড করে যেত। যদি আমাদের ১ থেকে ২টি বছর চান্স দিত ওখানে আবার তাইলে তো আমি আশা করি আমরা সরকারকে সাহায্য করতে পারতাম। এই পরিস্থিতি আমাদের হয়ে গেছিল। কিন্তু টাইম পাইলাম না। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ না কি জানি না, বিধাতার লিখন না কি বুঝতে পারলাম না। আর সরকারের সঙ্গে যখন আমাদের বিরোধিতাও নাই, ছিল না কিছু না, কেন আমাদের প্রতি এতো চেতলো, খেপলো! দেখেন খেপার কোনো কারণ ছিল? আমরা বাঙালির নেতারা আসতাছে, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতারা আসতাছে, ফরোয়ার্ড ব্লকও তো সরকারে ছিল, আর এস এস-এর নেতারা আসতেছে, সি পি এম-এর নেতারাও আসতেছে তো এর ভিতর কি দ্বন্দ্ব থাইকতে পারত? তার মাঝখানে একটা, এমনিতে ধরেন ৯৫% এর বেশি হবে এই তো সিডিউল্ড কাস্ট ছিল। হায়ার কাস্ট তো গুণতিতে ছিল চাইর পাঁচটা। এই নিয়া আমাদের ভিতরে একটা ঘুন ধরানোর চেষ্টা করছিল। যেমন আমি হায়ার কাস্ট ঠিক, আমরা ডিক্রেয়ার দিলাম আমরা 'জনজাতি' আমরা সিডিউল্ড কাস্ট, তাই না? এখন হায়ার কাস্ট পাল আছে, পোদ্দার আছে, সেন আছে, চক্রবর্তী আছে, ব্যানার্জি আছে। এরা এখন কি চিন্তা করল, আরে! আমরা কি সব সিডিউল্ড কাস্ট? একজন সকালবেলা আমার কাছে আইসা হাজির, সব দল বাইন্দা। কি ব্যাপার? ভাই তোমরা এখানে? বলে আমরা কি কইরা সিডিউল্ড কাস্ট হইয়া গেলাম? আমি কই, সিডিউল্ড কাস্ট তোমাদের বলা হয় নাই, তোমাদের নাম ঠিকই লিখবা, তোমরা শুধু লিখবা আমরা জনজাতি, ব্যাস মিইটা গেল। দিল্লি থিকা টিম আসছিল। এরা প্রকৃতই কি জনজাতি আছে না হায়ার, যাতে আমরা মাটিটা পাই। কথা বুঝলেন তো? এজন্যই আমাদের

পলিসি ছিল, কিন্তু তাতেও ঘুন ধরানোর চেষ্টা হইছিল, তো সেটা আমি মেকাপ করে দিছিলাম। তোমরা লেখ আমরা জনজাতি। তারপর যা হয় দেখা যাবে। জাতি তো এতটা সোজা না যে সাবান দিয়ে জাত চলে যাবে। তুমি যা আছ, আছই, লেখলে কি হইছে! তোমার টাইটেল তো চেঞ্জ করা হচ্ছে না। যাই হোক সেই মিটিং-এ মাইর খাইয়া গেলাম। কপাল খারাপ হইলে সবকিছু। এত দূর আসার পরে উঠে আসতে হবে চিন্তা করি নাই।

প্র : চলে আসার পর আপনাদের কমিটির অস্তিত্ব ছিল?

র : অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া গেল। অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া গেল কি রকম, একটা কথা কি, একটা কমিটি বা একটা পার্টি চালাইতে গেলে তার অর্থের দরকার। আমার ফ্যামিলি পিছনে, খাবার যদি না থাকে, বাচ্চা কানতাছে, বউ কানতাছে, মুখটা বীতশ্রদ্ধ, আমি ফ্যামিলি দেখব না পার্টি দেখব? এই জন্য পার্টিটা কি হইল, স্ম্যাষ্ট হইয়া গেল, ভাইঙা গেল। কারণ একেই তো সব ছত্রখান হইয়া গেল, সতীশদার মতো নেতা চইলা আসল, অরবিন্দ চলে গেল। ঐদিকে গেল, না, এখানে চইলা আসল জানি না। আমি তো কলকাতায় রইলাম ঐখানে থেকে আমি আবার সংগঠনটাকে জোড়াতালি দিলাম। দেওয়ার পর আমি আবার কি করলাম, আমি যখন ওখানে, রঙ্গলাল গোলদার ছিল, সুকুমার করে একটা ছেলে ছিল, এই রকম প্রায় ২০/২৫টা ছেলে নিয়া আবার সংগঠনকে ঠিক করলাম। আপনারা সরল দেবের নাম তো জানেন ফরোয়ার্ড ব্লকের, গোবিন্দ দেবকে চিনেন? না। বড় ভাই। তার আবার একটা পার্টি ছিল, সে আবার রাইত দিন আমার ঘরে আইসতো। ভাড়ার ঘর ছিল। আপনি আমার পার্টিতে আসেন, আপনারে আমি বাড়ি দিচ্ছি। আমারে বাড়ি নিয়া গিয়া দেখাইল। এখানে আপনারে আইনে রেখে দিচ্ছি, মধ্যমগ্রামে। কী করতে হবে? আমার যখন লোকের দরকার আপনি লোক নিয়া আমার পার্টিতে যোগ দিবেন। আমি তো পারলাম না, আমার বাড়ির দরকার নেই। অনেক অফার আইছে আমার। কিন্তু তাতে আমি মাথা দিই নাই। যাই হোক, শেষে আমি ঐ ক্যানিং-এর চর। মাঝখানে একটা চর উঠছে না ক্যানিং-এ! ঐ ক্যানিং-এর চরটা আমি দখল করি, একদিন হঠাৎ রাত্রে গিয়ে সন্ধ্যার সময় দখল করি। অনেক লোক ছিল। প্রায় আমি ৪০০/৫০০ ফ্যামিলি নিয়া উঠছিলাম। আমি, রঙ্গলাল, গোলদার, সুকুমার, ফণিভূষণ, নামটা মনে নাই, অনেকদিনের কথা তো! মিস হয়ে যায়, অরবিন্দ মিস্ত্রীর খোঁজ করছিলাম, পাই নাই তাকে। সে ঐ উল্টাডাঙায় নাকি ঠ্যালাগাড়ি টানতো। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অনেক কিছু করছি। কথা বোঝলেন না। তখন রামদা ছিলেন, তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমার। ক্যানিং-এর চরটায় উঠলাম। তখন কিছু নেতার সঙ্গে আমার কথা হইছিল। তারা বলছিল, যদি তুমি

দুইদিন থাকতে পার, তবে ক্যানিং-এর চরটা তোমারে দেওয়া হবে। কিন্তু ওখানে পাশে যতগুলো গ্রাম আছে, একটা গ্রাম ছাড়া, সবগুলা গ্রাম হচ্ছে মুসলমানের। ওরা টের পেয়ে, ওখানে এম এল এ বোধহয় মুসলমান ছিল। রাতারাতি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে হাজির হয়ে যায়। মরিচঝাঁপি ঘটনার ৬ মাসের উপরে। ওখান থেকে আবার ঝড়খালিতে যাই। ঐ সব জায়গা অবশ্য এ্যাটাক করে নাই। কিন্তু ক্যানিং চরটা দখল করছিলাম। সেখানে আমার সাথে সুব্রত চ্যাটার্জিও ছিল, তারও সায় ছিল। আমার নামে আবার ওয়ারেন্ট বার হইল। আমি আর ঢুকতে পারলাম না। লোকজন সব পুলিশ দিয়া উঠাই দিল। নিয়া আসলাম। ওখান থিকে আইসা বহু চেষ্টা করলাম, তারপরে আবার যখন দেখলাম আর হয় না, হল না, সেই রকম সংগঠন করতে পারলাম না। পয়সারও দরকার তো! রঙ্গলাল গোলদার, নিরঞ্জন তরফদার, বিমল, সুকুমার, ফণিভূষণ এদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। নিরঞ্জন তরফদার আছে বারাসাতে। বিমল আছে দত্তপুকুর, রঙ্গলাল গোলদার ক্যানিং যেতে দরগা আছে, ওখানে কয়েক ফ্যামিলি নিয়া উঠছিলেন, প্রায় ১০ ফ্যামিলি ছিল।

প্র : আমাদের আলোচনার মধ্যে কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে। এই সময় ৭৮/৭৯ সালের ঘটনা, ঐ সময় আপনারা একটা স্বশাসিত জোন গঠনের কথা ভাবলেন, এই ভাবনাটা কি করে এল ?

র : প্রথমে, এটা তো সরকারই আমাদের জাগাই দিল, ওখানে আমরা চাষবাস, ইস্কুল, কারখানা, খাদ্যবস্তু তৈরির কারখানা, হাসপাতাল, নৌকা, আসবাবপত্র তৈরির কারখানা, বাজার আমরা করছিলাম, হ্যাঁ করছিলাম, আমরা বাঁচার তাগিদেই করছিলাম। এমনি কিছু না, দেখেন, আমাদের যে এরিয়াটা ছিল, এপাশে বিরাট সমুদ্র, যদি কলকাতার দিকে দাঁড়াই তবে বাঁদিকে বিরাট নদী, তার কূলকিনারা নাই, সোজাসুজি যদি দাঁড়াই তা হলে এদিকে কুমিরমারি, সামনে নদী এদিকে গেলে মোল্লাখানি, সাতজেলে বিরাট নদী তো এর মাঝখানে আমরা যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা না রাখি, কারণ, আমরা সভ্য, আমাদের ভিতরে তো একটা জাগরণ শক্তি তো আছে যে মানুষের প্রথমে কি কি দরকার, আমরা সেগুলার ব্যবস্থা করছি! আমাদের ভিতর সবকিছু ছিল, ডাক্তার ছিল মনোরঞ্জন অধিকারী, এম বি বি এস ডাক্তার ছিল, সমীর সমাদ্দার ছিল, নামগুলা ভুলে গেছি দাদা! আমার কাছে লিস্ট ছিল। মাস্টার আমাদের ছেলেরা, বাইরের ছিল না কেউ, আমাদের ভিতরেই সব ছিল। ডাক্তার বলেন, বিস্কুট, রুটির কারখানা এ আমাদেরই লোক, মার্কেট করছি, আমার লোক! এই সব করতে টাকার যে প্রয়োজন! তা আমাদের মধ্যে যার যার টাকায়! টাকা ছিল সে করছে, টাকা ছিল!

প্র : তাহলে প্রশ্ন যার একটা বেকারি করার মতো টাকা ছিল, ব্যবসার করার মতো টাকা ছিল তা হলে এই মরিচঝাঁপিতে কেন, অন্য কোনো জায়গা ছাড়া, যেমন মানা ক্যাম্পই সেই কারখানাটা সে করতে পারত ?

র : এইটা দেখুন, মানাটা রায়পুরের পাশে তো ! রায়পুরে বেকারি আছে না ? এইখানে তো বেকারি নাই, তাছাড়া দেখুন এতোবড় তো বেকারি হয় নাই। Something, অল্প অল্প মাল তৈরি হইতো, তারপরে তো আস্তে আস্তে বেকারিটা তৈরি হইত ! কুমিরমারি, মোল্লাখালি, সাতজেলে, দুর্গাচর, এইসব জায়গায় যে গ্রামগুলা আছে। এইসব গ্রামে সমস্ত মাল সাপ্লাই করত। উঠন্ত অবস্থায় তো মাইর খাইয়া গেলাম দাদা ! আমাদের ইচ্ছা ছিল, ওখানে কলেজ স্কুল সবই করবো হাইস্কুল পর্যন্ত তো কইরা ফেলাইছিলাম না ! আমাদের অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল না। যে আমরা সরকারের সঙ্গে টক্কর দিব, বা কিছু একটা, কিচ্ছু না ! ঐ সমস্ত ভুল ধারণা যদি কেউ করে আমাদের নিজেদের বাঁচবার তাগিদে, আমাদের নিজেদের বাঁচার তাগিদে যে Primary Stage, আমাদের কী দরকার ? আপনি অন্যান্য ক্যাম্পে যাইয়া দেখেন, প্রতিটি গ্রামে রিফিউজিদের ভিতর আপনি ডাক্তার পাবেন, হাতুড়িয়া হোক, এম বি বি এস হোক, আছে। প্রত্যেকটা গ্রামেই আছে। তারা ডাক্তারি করতাছে। হোমিওপ্যাথি হোক, এ্যালোপ্যাথি হোক, কবিরাজি হোক, আছে। এই রিফিউজিদের মধ্যে এমন কিছু জিনিস নাই, যে নাই। এইজন্য হইছে রিফিউজি।

সাক্ষাৎকার : ২৭ মে ২০০৬



মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তু যুব নেতা ছিলেন পবিত্রকুমার বিশ্বাস। অনেক স্বপ্ন ছিল মরিচঝাঁপি নিয়ে। স্বপ্নভঙ্গ হবার পর তিনি আর দণ্ডকারণ্য ফিরে যাননি। অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করেননি। আছেন রেললাইনের পাশে ঝুপড়িতে। রাজমিস্ত্রির কাজ, কোনোদিন হয় কোনোদিন হয় না।

হাইকোর্ট তো কোলকাতার বুকে, ওখানে তো জ্যোতিবাবুর লোক ছিল

পবিত্রকুমার বিশ্বাস

প্রশ্ন : মরিচঝাঁপিতে যখন সকলে চলে আসছেন, তার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত ছিলেন?

পবিত্র : আমি '৬৫ সালে তখন পূর্ব বাংলা থেকে যখন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধে তখন ওখান থেকে চলি আসছিলাম।

প্র : আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

প : আমি তখন মানা ক্যাম্পে ছিলাম।

প্র : পূর্ব পাকিস্তানে কোথায় বাড়ি ছিল?

প: ফরিদপুরের বলাগাড়ি গ্রামে।

প্র : তখন আপনার বয়স কত ছিল?

প : ১৪ বছরের মতো ছিল, ওখান থেকে প্রথমে চলে যাই এম পি-র মান্দারা জেলায়। ধূলানধার ক্যাম্পে। ওখানে পড়ার জন্য এপ্লাই করি ওখান থেকে কুরুদ

ক্যাম্পে, তারপর ওখান থেকে মানা ট্রানজিট সেন্টার বলে ছিল ওখানে স্কুলে ভর্তি হই। মানা ক্যাম্পে ১০ বছর ছিলাম।

ওটাকে গ্রুপ অব ট্রানজিট ক্যাম্প বলত। প্রকৃতপক্ষে সরকার পার ফ্যামিলিতে সাড়ে দশ টাকা করে দিত। বেশি হলে ৭৮ টাকা দিত। দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট গঠিত হয়। সকলকে জঙ্গলে নিয়ে যেত, রাস্তাঘাট গাছপালা কাটাত। যখন গাছপালা কাটাতে নিয়ে যেত তখন এই ডোলটাকে বন্ধ করে দেওয়া হত। তারপর ফিরিয়ে নিয়ে আসত। কিন্তু পুনর্বাসন বলতে যা বোঝায় তার ধারেকাছেও যেত না। আগেও যখন হিন্দুস্থান পাকিস্তান বলতে যে পার্টিশানটা হয় তখন যাদের রাখা হয়েছিল, তারা টিকতে না পেরে চলে গিয়েছিল তাদের পরিত্যক্ত গ্রামগুলিতে আমাদের থাকতে দিয়েছিল।

প্র : টিকতে না পারার কারণ?

প : ঐ যে পাহাড়ী অনুর্বর জমি মোরাম মাটি জল দাঁড়ায় না, নির্ভর করতে হয় বর্ষার উপরে। এখন সমস্যা হল জলের, বর্ষার সময় যে জল দাঁড়াত যে অঞ্চলে সেগুলি মূলত স্থানীয় আদিবাসীদের দখলে নিচু জমিতে যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হত মুণ্ডা। আর আমাদের রাখা হয়েছিল ওদেরই পাশে। উঁচু পাহাড়ী জঙ্গল গাছপালা ভর্তি জায়গায়। এখন সমস্যা হল গাছপালা কাটবে নাকি জল সংগ্রহ করবে, নাকি জঙ্গল কেটে জমি চাষ করবে। গরুর বন্দোবস্ত নেই কাজকর্ম তো নেই তার ভিতর এই রকম আনসান জমিতে এনে ফেলেছে। এখন ঐ টাকাতে চলতে হবে। এখন কি করবে যে জমি চাষ করে ফসল হত না, খাওয়া জুটত না এখন বাধ্য হয়ে ওরা চলে এসেছে।

প্র : ওখানে কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কোনো মন্ত্রী নেতা গিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে এখানে এলে বাসস্থান দেওয়া হবে, পুনর্বাসন দেওয়া হবে? এই রকম কি কোনো মিটিং করেছিলেন?

প : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছি, পশ্চিমবঙ্গের ডাকাবুকো নেতা রাম চ্যাটার্জি, উনি মারা গেছেন, ওনার স্ত্রী শান্তিদেবী এখনও বেঁচে আছেন। রামবাবু বহুবার যোগাযোগ করেছেন। বর্তমানের মৎস্যমন্ত্রী যিনি আছেন কিরণময় নন্দ ইনিও বহুবার যোগাযোগ করেছেন, বহুবার গিয়েছিলেন।

প্র : কি বলেছিলেন?

প : একটু সময় দিন, একবারে বলতে গেলে কষ্ট হয়। উনি মানা ক্যাম্পের যে ট্রানজিট ক্যাম্পের অধিকাংশ ক্যাম্পগুলিতে আমাদের সঙ্গে মিটিং করেছেন এবং যে সব অঞ্চলে পুনর্বাসন দিয়েছিল সেখানেও মিটিং করেন তখন এরা ক্ষমতায় আসেনি মন্ত্রীও না। তখন সিদ্ধার্থশংকর রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এরা উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন তোমরা চলো ভাই বাংলায় পশ্চিমবঙ্গে ৫ কোটি জনতার দশ কোটি হাত তোমাদের

সঙ্গে আছে। এখানে থাকতে হবে না। তোমরা না খেয়ে মরবে তোমাদের ছেলেপুলে বিক্রি হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আমাদের ভিলাইতে ডাকলেন যেখানে স্টিল প্ল্যান্ট আছ সেখানে আমাদের ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে মিটিং করে বললেন : ঠিক আছে তোমরা চলে এস।

প্র : তখন কি মরিচঝাঁপিতে আসার কথা বলেছিলেন! এটা কি করে মাথায় এল?

প : এই যে কিরণময় নন্দবাবু এবং রামবাবু বলেছিলেন, এই ধরনের দ্বীপ সুন্দরবনে রয়েছে যেমন কুমিরমারি মোল্লাখালি সেখানে বসতি রয়েছে। সেখানে তো জঙ্গল ছিল, তাই এবার তোমরা চল, বসতি করতে পারবে কিনা দেখ। তখন একটা টিম এসেছিল ৭ জনের, তার মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।

প্র : সেই ৭ জনের মধ্যে কে কে ছিলেন?

প : সাধন বিশ্বাস, আমি পবিত্র বিশ্বাস, রাইহরণ বাড়ৈ, রামবাবু একজন লোক দিয়েছিল, একজন সাংবাদিক ছিলেন।

প্র : রামবাবু যে লোক দিয়েছিলেন তার নাম মনে আছে?

প : কিরণ মণ্ডল ছিলেন, উনি চন্দননগরেরই লোক।

প্র :. সাংবাদিক তার নাম, কোন কাগজের লোক?

প : সাংবাদিকের নামটা তো মনে নেই তবে উনি যুগান্তর কাগজের সাংবাদিক ছিলেন।

প্র : জ্যোর্তির্ময় দত্ত?

প : না, জ্যোতির্ময়দা যায় নি পরের বারে গিয়েছিলেন, একবার নয় দু-তিনবার গিয়েছিলেন।

প্র : সালটা মনে আছে, তারিখটা কি মনে আছে!

প : মনে নেই। তারপরে আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম। গিয়ে আলোচনা করলাম যে 'হ্যাঁ এখানে বসবাস করা যাবে।' তবে একটা প্রবলেম ছিল জলের। তবে আমরা ওখানে জলের একটা টেস্ট করে নিয়েছিলাম। তখন অনেকে বলল, লবণ জলে চলবে না ভাই, তোমরা ফরিদপুরের মিষ্টি জলের লোক, আর খুলনার যারা তারা লবণ জলের লোক তারা টিকে যাবে। কিন্তু ফরিদপুরের মিষ্টি জলের লোক টিকবে না। তখন ঠিক করলাম আগে জলের একটা টেস্ট করা হোক। আমরা তখন আর এস এস-এর মাধ্যমে জলের টেস্ট করালাম। ওরা আমাদের খাদ্য দিয়ে জলের পাইপ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আগেই জলের টেস্ট করিয়েছিলাম। তখন ঐ বাউন্ডারিতে যত জলের কলের জল আছে তার থেকে অনেক সুন্দর জল। এখন আমরা যেখানে বসে আছি দমদমের থেকে অনেক বেটার জল।

প্র : আপনারা যখন এলেন তখন কীভাবে এলেন?



প : আমরা হাসনাবাদ থেকে ভটভটি ধরে নিয়েছিলাম।

প্র : কুমিরমারিতে যে উঠলেন তখন কারা আপনাদের সাহায্য করল ?

প : প্রথমে আমরা যোগাযোগ করি কুমিরমারির মাস্টার প্রদীপ বিশ্বাসের সঙ্গে। কুমিরমারি হাইস্কুলের এখন মনে হয় কলেজ হয়ে গেছে। প্রদীপ বিশ্বাস অত্যন্ত ভদ্রলোক, আর এস পি-র লোক। সব রকমের সাহায্য দিয়েছিলেন। উনি আমার থেকে বড় আমি তাই বললাম, প্রদীপদা আমরা তো এখানে এসেছি, আপনি কী বলেন। উনি বললেন, ভাই তোমরা আস যদি বাঁচতি পার তো সকলকে নিয়ে চলে আস। তারপর আর একজন ভদ্রলোক মণ্ডলবাবু (প্রফুল্ল মণ্ডল) নামটা মনে নেই তাকেও বললাম, ভাই তোমাদের এইখানে আসতি চাই, তোমাদের সাহায্য চাই। তা উনি বললেন, ভাই যদি বাঁচতি পার তো চলি আস। ওখান থেকে যোগাযোগ করে আমরা বেরিয়ে যাই। বেরিয়ে গিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই যে চলে আসব। কিন্তু চলে আসবোই যে এটাই সিদ্ধান্ত নয়, আমরা আলোচনা করলাম। যে যে লোকগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা পয়সা দিয়েছে তাদের এখানে এসে পুনর্বাসন দিক আমরা চাই নি যে এখানে হঠাৎ করে এসে এমন ঝামেলার মধ্যে পড়তে হবে আমরা বারবার ইন্টিমেশান দেওয়া সত্ত্বেও, তখনকার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী আর কে খাদিলকারের কাছে অনেকবার ধর্না দিয়েছি উনার যে ডিপার্টমেন্টের হেড অফিস তার সামনে অনেকবার ধর্না দিই। দিল্লি আমি নিজেও গেছি। কেবল আশ্বাস আর আশ্বাস কয়েক বছর ধরে, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নি। এরপরে আমরা আমরণ অনশনে বসে গেলাম।

প্র : সেটা কোথায় ?

প : এই মানা ক্যাম্পে, এরপর একদিন দুইদিন দীর্ঘ ৮ দিন পরে...

প্র : এই আমরণ অনশনে কারা কারা ছিলেন ?

প : অনশনে আমি ছিলাম না। কাকু, সতীশ মণ্ডল, অরবিন্দবাবু ছিলেন এরকম আরও ৭/৮ জন ছিলেন। আর কারা কারা ছিলেন এখন নামগুলি মনে নেই। সকলে পর পর অনশনে বসে। তখন আমরা কনটিনিউ দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কথা বলছি। তারপর উপরাষ্ট্রপতি ও ভেঙ্কটরামাইয়া মানা ক্যাম্পে আসলেন। তখনকার ক্যাম্পের অধিকর্তা কর্নেল শান্তিপ্রসাদ নন্দী, যাদবপুরে অছেন এখন, বেঁচে আছেন কিনা জানি না। ভেঙ্কটরামাইয়ার সঙ্গ খাদিলকার এলেন, জাম্বুবানরাও ধোতে মহারাষ্ট্র থেকে এম পি, কেন্দ্রে উনার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল, একটা পদ ছিল। উনি আইসে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। আমরা ওদেশে গিয়েছিলাম ঠিক আছে, এইভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হোক, মজুরি বাড়িয়ে দেওয়া হোক, এইভাবে লোকগুলিকে লণ্ডভণ্ড না করে, টানাটানি না করে, স্পষ্টভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া হোক, জমিগুলি প্ল্যান করে, আমরা যেভাবে বলেছিলাম এইভাবে কাঁকরগুলি তুলে দেওয়া হোক কিভাবে তুলতে হবে আমরা সাজেশন দিয়ে সেগুলি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তখন উনি দেখেশুনে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা ঠিক প্ল্যান দিয়েছ। আমরা দিল্লি যাচ্ছি, তোমরা অনশন তুলে নাও, তোমাদের দাবিগুলি মেনে নিচ্ছি। কিছু দাবি মেনে নিতে পারছি না এগুলি বিবেচনার মধ্যে থাকবে। উনি সেইখানেই দাঁড়িয়ে ডিক্লেয়ার দিলেন। তখন কিন্তু অনশনটা তুঙ্গে চলে গেছে, ঠেকানোর আর কোনো পথ নেই এইরকম একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে। এদিকে আবার হাতছানি দিচ্ছে। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন ক্ষমতায়। ঝামেলায় ফেলানোর জন্য বারংবার সেখানে ইনটিমেশন দিচ্ছে। ডেইলি সেখানে খবর দিচ্ছে। একবার রওনা দেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধার্থশংকর রায় ঢুকতে দেয়নি খড়গপুর হাওড়ায় আটক করে, কিছু লোক গড়ের মাঠে ঢুকেছিলেন কিন্তু ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আমরা দেখলাম এই ভাবে হবে না। At a time attempt না করলে হবে না। তখন রিটার্ন যাবার পরেও এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। দিল্লিও আজ হবে কাল হবে বলে গড়িমসি করতে থাকে। দিল্লিও তখন নাছোড়বান্দা হয়ে গেছে। কোনো কিছু করতেই আর রাজি হল না। আমরা তখন এই আওয়াজটা তুলে দিলাম। তার আগেই তো আমাদের জানা হয়ে গেছে জলটা কোথায়, কী পাব না পাব। তখনই আমরা আওয়াজ তুললাম যে চল। আমরা কিন্তু এই প্ল্যানটাকে বাতিল করে ঝামেলায় ফেলতে চাই নি। আমরা তখন বাধ্য হয়েছি আর এখানে যে সহায়তা করবে বলেছিল তারও একটা আশা ছিল মনের মধ্যে।

প্র : বাংলার দশ কোটি হাত...

প : দশ কোটি হাত! পশ্চিমবাংলার লোক তোমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে সহায়তা করবার জন্য। সেই মন্ত্রী কিরণময় নন্দ মরিচঝাঁপিতে উনি চিংড়ি মাছের চাষ করছেন, আমাদেরই তৈরি করা বাঁধে।

প্র : আপনারা ঢোকার কতদিন পরে অত্যাচারটা শুরু করে দিয়েছিল, আপনারা তো তৈরি করেছিলেন ইস্কুল দোকানপাট মাছের চাষ শুরু করে দিয়েছিলেন?

প : ডেটটা কিন্তু মনে নেই, '৭৮ হবে। তখন কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসতে শুরু করে, একদিনেই কিন্তু আসেনি। রাস্তাঘাটে এখানে ওখানে। তখন কিন্তু জ্যোতিবাবু ক্ষমতায় এসে গেছেন। বিপুল হারে লোক চলে আসতে শুরু করেছে। তখন কিন্তু এই ভদ্রলোক, জ্যোতিবাবু ধারণাই করতে পারেন নাই যে এই এত বিপুল হারে লোক সতীশ মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গ ঢোকাতে পারে। এই ভদ্রলোক কিন্তু সৎ, লেখাপড়া জানে না। বুদ্ধিমান লোক, সই করতে পারেন না। আমিই কিন্তু হাতে কলমে নাম সই করাইছি। রাইহরণবাবু অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। ঢাকা সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের সেক্রেটারি ছিলেন। ওখানে তার টাকা পয়সার অভাব ছিল না। আমার শ্বশুরমশাইয়ের টাকা পয়সার অভাব ছিল না। আর আমি তো একা আসছিলাম পরিবার নিয়ে। আমার টাকাপয়সার অভাব ছিল। আমরা ওখানে ঢুকতে পারিনি একমাত্র সতীশবাবুকে লুকাইয়ে রেখেছিলাম মরিচঝাঁপিতে। তার আগে কিন্তু এইসব সংস্থা— ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন পাঁউরুটি, দুধ, আটা এইসব খাদ্য দিতে শুরু করেছিল হাসনাবাদে, ঐ এরিয়াটায় হাসনাবাদের এই পারে আমরা একত্রিত হই। তবে সংশয় ছিল এই লোকগুলাকে নিয়া, এট-এ-টাইম ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমরা চেয়েছি আমাদের ক্ষতি হোক, কিন্তু এই লোকগুলার ক্ষতি হোক এটা চাইনি। অতদিন আমাদের হাসনাবাদের ওপারে যেতে বাধা দিচ্ছে। এর মধ্যে আবার রামবাবু মিটিং করছেন, গরম কথা বলছে কিছু একটা পিছটান খেয়েছে, এখন জ্যোতিবাবুর কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েছে। আমার এটা ধারণা, ধারণা কেন কারেক্ট। তখন উনি বলছে, 'ভাই তোরা আর ঢুকিস না।' তখন দাদা রাইহরণদা রামবাবুকে বললেন, 'দাদা আর তা ফেরার কোনো পথ নেই।' এর আগে ওনার বাড়িতে বহু রাত কাটিয়েছি, উনার সঙ্গে পালাইছি। এ্যারেস্ট হওয়ার ভয়ে, উনি আর কিছু করতে চাইছেন না। সুর পাল্টে গেছে। আমরা বললাম, 'ফেরা আর অসম্ভব। এই জনস্রোত আর আটকানো যাবে না।' দেশের বিভিন্ন জায়গা ট্রানজিট ক্যাম্প যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখে দিয়েছে। আমরা কিন্তু সবগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছি মধ্যপ্রদেশের ক্যাম্পগুলির সঙ্গে। আমরা বললাম, 'রামদা এই বিপুল জনস্রোত আর ঠেকানো যাবে না।' তখন সব ঢুকে পড়ছে। তখন হাসনাবাদে সুন্দরবনের কাঠ কেটে যাদের ব্যবসা আমরা তাদের

বললাম : 'ভাই তোদের নৌকাগুলি দে আমরা কিছু পয়সা দেব।' তখন পার্টি থেকে খবর হয়ে গেছে, 'না, নৌকাগুলি দিও না। দিলে আমরা তোমাদের নৌকো ছিনতাই করে নিয়ে যাব।'

প্র : কোন পার্টি সি পি এম ?

প : এই যে রাজার পার্টি তখন তাদেরকে বলল, 'দিও না।' আমরা তখন বলি, 'ভাই তোদের নৌকা যদি আমাদের না দিস তবে তোদের নৌকা ছিনতাই করবো। আমরা তোদের নৌকা ফেরৎ দিয়ে দেব। কিন্তু বাধা দিলে ভাই ঝগড়া হবে।' তখন ওরা বলল, 'ভাই নিয়ে যান।' প্রথম আমরা মরিচঝাঁপিতে ঢুকিনি। আমরা ঢুকেছি কুমিরমারিতে মোল্লাখালির এই পারে। ঐ পারে মোল্লাখালি। প্রথম আমি গিয়েছি, কারণ লিড দেওয়ার লোক নেই। খুলনার বেতাই যে জায়গাটা, ওখানে পুলিশ আমাদের প্রথম বাধা দেয়। দারোগার নাম সুভাষ কিন্তু টাইটেল মনে করতে পারছি না। উনি এখনও বেঁচে আছেন, উনি প্রথম গুলি চালাইছিলেন এখানে।

প্র : এটা বইতেও আছে। উনি কি ওখানকার ও সি ছিলেন ?

প : এখানে হাসনাবাদ, সন্দেশখালি, গোসাবা— এখানকার ওসি-রাই বেশি আসে।

প্রথম দুদিন বাদে আমরা এক সপ্তাহের মতো হল্ট করি কুমিরমারি এই পারে। এর মধ্যে দাদা পৌঁছে যায় ওখানে রাইহরণ বাড়ৈ। এর আগে আমিই ছিলাম ওখানে। এরপর আমার সঙ্গে রঙ্গলাল গোলদার ছিলেন। শারীরিক দিক দিয়ে উনি একটু বিকলাঙ্গ ছিলেন। ওনাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওনার থেকে আমি পরামর্শও নিতাম। ভদ্রলোক কিন্তু ভালোই নলেজবল। বললাম গোলদারদা কী করা যায়! উনি বললেন তুমি কুমিরমারিতে সেটেল করলে কেন? স্থানীয় লোক যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। বললাম কি করা যায় উনি পরামর্শ দিলেন এই পারে চলে যেতে। পরদিন ঐ পারে চলে গেলাম। এর পরে কিন্তু আর ডাকতে হয়নি। সকলে ওপারে চলে গেলে, তখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হল জলের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আপনি জানবেন কিনা জানি না। ঐরকম মিষ্টি জল আমি আর পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পাইনি। এই ঐখানে আস্তে আস্তে আমি মানে আমরা ইস্কুল তৈরি করতে শুরু করলাম। আমাদের মধ্যে থেকে শিক্ষিত নির্বাচিত ছেলেরা ছিল।

প্র : নাম মনে আছে আপনার ?

প : আর এন বিশ্বাস, নিলুনাথ হালদার, সুনীল হালদার। তারপর চিন্তা করলাম, পড়াশুনার জন্য যারা পড়তে ইচ্ছুক ওখানে একটা লাইব্রেরির মঞ্চ হল ঘর করে ফেললাম। বই পুস্তক কিছু যোগাড় করলাম। বীণাদি গিয়েছিলেন, উনি ভালো রকম জানেন। তারপর চিন্তা করলাম এদের পড়াশুনা করানোর জন্য আয়ের রাস্তা চাই। তারপর মাঠ তৈরি করলাম। দেখলাম পি টি করানোর শিক্ষক চাই। মানা

ক্যাম্পে থাকাকালীন আমরা সকলে ওখানে পিটি করতাম। যারা স্কুল কলেজে পড়েছে তারা এন সি সি করেছে। তাই সকলেই পিটি জানে আমরা ঐ সব ছেলের মধ্যে থেকে যোগাড় করলাম। তারপর ভাবলাম আয় না থাকলে তো কিছু হবে না। তাই ছেলেদের বললাম সকলে বেরিয়ে যাও শহরে। এখান থেকে যা জোগাড় করতে পারব তা তোমাদের বাড়িতে দেব। কিন্তু ভাই টাকা পয়সা তো যোগাড় করতে হবে। এখানে কিছু গাছের গোড়া যুগ যুগ ধরে পড়ে রয়েছে চলো এগুলি নিয়ে শহরে যাই বিক্রি করে পয়সা করি। এইভাবেই কিন্তু অর্থ আয়ের জন্য পথগুলি বেছে নিলাম।

প্র : মাছ ধরতেন ?

প : হ্যাঁ ধরতাম, শহরে যাবার জন্য যেমন সাইকেল তেমনি পূর্ব বাংলায় যারা ছিলেন, তারা জানেন নৌকোর কি প্রয়োজনীয়তা তাই নৌকা তৈরি করতে শুরু করলাম। একবার এইসব করলে ভাতের অভাব হবে না। আর কিছু না পার মাছ ধর। ওরা বলল, 'বিক্রি কী করে করব।' বললাম, 'নৌকা তৈরির কাজে লাগো।'

প্র : কত নৌকা তৈরি করেছিলেন ?

প : একটা দুইটা নয় কয়েক হাজার নৌকা তৈরি করেছিলাম। তার পর মাছ ধরতাম সেই মাছগুলি এককাট্টা হয়ে যেত। বাজারে যে রেট আছে। সবার তো যাবার সুবিধা ছিল না। তাই পাইকারি হিসাবে দেওয়া হত।

প্র : মাছগুলি কী কুমিরমারিতে বেচে দিতেন ?

প : আমরা কুমিরমারিতে দিতাম না, আমরা নিয়ে যেতাম বেতাই খুলনার ওখানে মনকাটা রয়েছে। এইভাবে ওরাই নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ওরাই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে নিত পাইকারি দরে আর আমাদেরও দৌড়াদৌড়ি করতে হত না। এদিকে আমাদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরা সুন্দরবনের কাঠ কাটছি। পশ্চিমবঙ্গে কোণায় কোণায় মিথ্যা প্রচার করে জ্যোতিবাবু বলে বেড়াচ্ছেন যিনি কোনো দিন সুন্দরবনে মাটিতে পাও রাখেন নি। আমরা সব মানুষকে নিষেধ করেছি গাছে হাত না দিতে। দুই চারটা যে কাটে নাই একথা অস্বীকার করা যাবে না, অত হাজার হাজার লোক এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে মোটামুটি সেট হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা বার বার আবেদন করে গেছি, কিন্তু জ্যোতিবাবু টোটালি বলেছেন, 'তোমাদের সঙ্গে আলোপ আলোচনা করব না।' এর মধ্যে কিন্তু অনেক ঘটনা হয়ে গেছে ওরা দেবযানী বলে লঞ্চটা তুলে নিয়ে গেছে। ওটা পাবলিক লঞ্চ, সরকারি নয়। ঐ বাউন্ডারিতে মা-মনসা সহ যত লঞ্চ ছিল সবগুলি সরকার ব্যারিকেড করে রেখে দিল। আমি অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি। আমরা তখন দিল্লিতে ডেমোন্সট্রেশন দিয়েই চলেছি। তখন কিন্তু কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে মোরারজী দেশাই, জনতা পার্টি মিলিজুলি সরকার। ওদের (সি পি এমের) মনে হয় ৩৬ সিট ছিল এর

পর বেস করে উনি দিল্লিতে ক্ষমতায় টিঁকে ছিলেন। এর মধ্যে একটা কথা বলিনি, আমরা কিন্তু সাতজেলে, মোল্লাখালি মানুষের প্রচুর সাহায্য পেয়েছি, প্রচুর সহানুভূতি পেয়েছি এবং ওরা...

প্র : নাম বলতে পারবেন কিছু কিছু, ঐ যে কুমিরমারির কথা বললেন।

প : সত্যি বলতে কি আমি কিন্তু এ্যাকশন স্কোয়াডের ছিলাম এবং আমার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করাই মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছেন এই জন্য আমি পাবলিকের সঙ্গে বেশি বসিনা। নিজেদের মধ্যে কেবল বলেছি এই করছি, ঐ করছি। এই জন্য আমি পয়সার জন্য বেরিয়ে যেতাম।

এইবার ঐ সদস্যরা তো (সংসদীয় তদন্ত কমিটি) ঢুকল মরিচঝাঁপিতে ওরা দেখেশুনে বলল দেখ ভাই জায়গা তো বসবাস করার উপযুক্ত। দিল্লি বলল, দ্বীপটাতো রাজ্য সরকারের আন্ডারে। কিন্তু দেখ ভাই আমরা কেন্দ্রের দিল্লিতে ইনটিমেশন দিচ্ছি। কথায় আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে ঐ রিপোর্টটা কী হবে। কিন্তু এর আগে ঐ (জ্যোতি বসু) ভদ্রলোক পৌঁছে গেছেন ওখানে। জ্যোতিবাবুর ঘুম চলে যাবে, জ্যোতিবাবু তো জনতার নেতা তার কী করে ঘুম হয়? এই ভদ্রলোক এসে যদি সরকার ফেলে দেয়। অরুণ সৌরীও খুব লিখতেন।

হঠাৎ কী একটা ঘটনা যে লেখাই বন্ধ হয়ে গেল যুগান্তরে, শুধু বঞ্চনা, জীবনদাকে এমন ধমকি দিল যে কাগজটাই বন্ধ হয়ে গেল। জ্যোতির্ময় দত্ত খুব সৌখিন লোক ছিলেন, নৌকায় একটা কী করছিলেন, নৌকায় হোটেল। এখন তো ভদ্রলোক কিছু না করেই বসেই আছেন। রিষড়ায় একবারই গিয়েছিলাম। আমাকে বলেছিলেন, 'রাজনীতি বড় নোংরা জিনিস বুঝলে পবিত্র, বড় নোংরা জিনিস। ভালো লাগে না। আজকে আমার স্ত্রী সার্ভিস না করলে কী করতাম আমার একটি মেয়ে সাংবাদিকতা করার জন্য বাইরে কোথায় পাঠিয়েছে লন্ডন না কোথাও এই রকম আর কী দুই একদিনের মধ্যে চলে গেল।' তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আর মানবিধকার কমিশনকে আনার কথা হয়েছে কিন্তু কাউকে আনতে দিল না। তারাকুণ্ডের মতো লোক কী করবেন। মানবাধিকার কমিশন রাতারাতি পাল্টে গেল। জ্যোতিবাবু তারাকুণ্ডের বাড়িতে হাজির। কী করবেন তারাকুণ্ডে? এক ধাক্কায় সব পাল্টে গেল। তিনি বলেন, 'আমি কী করব।' তারাকুণ্ডের বাড়িতে জ্যোতিবাবু হাজির।

প্র : তারাকুণ্ডে চিঠিও দিয়েছিলেন নিরঞ্জন হালদারকে।

প : হ্যাঁ তারাকুণ্ডে হালদারকে চিঠিও দিয়েছিলেন। নিরঞ্জন বাবু দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বলেন, 'দেখ কী করব।' তার মস্তিষ্ক আর কাজ করছে না। এই সদস্যরা ফিরে গেল। তারপর আমরা ভাবলাম আর মরিচঝাঁপিতে টিকতে পারব না। এবার আমরা কী করব। এবার দেখি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট দিয়ে আমাদের

ব্যারিকেড করে দিল। এইভাবে আমাদের ব্যারিকেড করে দিয়েছে যাতে কোনোরকম খাদ্য ঢুকতে না পারে। এর ভিতরে হাইকোর্টে ইনজাংশন দিয়েছে। হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, 'এইভাবে তোমরা খাদ্য আর জল বন্ধ করতে পার না।' হাইকোর্ট তো কলকাতার বুকে। ওখানে তো আর কোর্ট নেই! ওখানে তো জ্যোতিবাবুর লোক ছিল। ওই যে জঙ্গল, যেতে গেলে দুই ভাটার রাস্তা। এইবার জ্যোতিবাবু পুলিশ বসাল। কুমিরমারির পারে ক্যাম্প বসিয়ে দিল। আর এই পারে আমরা বসে রইলাম। এবার জল তো খাব কিন্তু খাবার! লুকোচুরি করে আর কত খাবার জোগাড় করব। এইবার দেবযানী বলে লঞ্চটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, খাবার নিয়ে যে নৌকাগুলি আসত সেগুলিকে ডুবিয়ে দিত। আরও অনেক লঞ্চ ছিল তারাও অনুরূপ কাজ করত। এখন ধরেন কেউ তো টাকার বস্তা নিয়ে ফেলায় নি। বৌয়ের গায়ে আর কখানা গয়না? এখন খাদ্য দিতে পারছি না। লুকোচুরি করে রাত্রেও আর খাদ্য আনতে পারছি না। আর নদীপথ পরিষ্কার দেখা যায়, ছোট নদী। ওখানে ট্রাক তো নেই! মাথায় করে বস্তা আনতে গেলে নদীপথ ব্যবহার করতে হয়। চাল ঢুকাতে পারছি না, আমরা অসহায় হয়ে গেলাম। আমাকে অন্য পথ নিতে হল। গোসাবা সন্দেশখালির থানায় ইনটিমেশন দিলাম। আমি বলতে আমরা, 'দেখুন আমার নৌকাগুলিকে ডুবাইবেন না। আমাদের যে নৌকোগুলিকে আটকে রেখেছেন ছেড়ে দিন।' মানল না। তারপর আমরা বললাম, 'আমরা নৌকা নিয়ে আসছি, আমাদের রক্ষা করেন।' ওরা কিছু করল না। এই পারে থানা ঐ পারে শ'দুই তিন পুলিশ রাইফেল নিয়ে।

প্র : কুমিরমারি, মোল্লাখালির কিছু ভাড়াটে গুণ্ডাকে ব্যবহার করেছিল?

প : না এই টাইমে করে নাই। ওখানে যাবার পর অফিসার বলল, 'দেখ ভাই! আমি কী করব? আমার ধরবার অর্ডার আছে।' ভয়েতেই বলুক, যেভাবেই বলুক আমরা তো সংখ্যায় প্রচুর। পালাতে গেলে তো আমরা আক্রমণ করব। তাই আক্রমণ করতে যায় নাই। আমাদেরও উদ্দেশ্য ছিল সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলুক, কিন্তু কথা বলছে না। 'দেখ, আমার কাছে তো ওয়ারলেস নাই যে কথা বলব।' আমরা বললাম, 'আপনার ওয়ারলেস নেই এটা আমরা কী করে মানব?' তিনি বললেন, 'ভাই তোমরা নৌকাগুলি নিয়ে যাও।' কী করব বাধ্য হয়ে নৌকাগুলি নিয়ে আসতে হল। ভাঙাচোরা ৫০/৬০ খানা নৌকা। এগুলি হল প্রথম দিকের ঘটনা। দ্বিতীয় অবস্থা আমাদের খাদ্য নেই, কী করি! এইবার বললাম, 'তাহলে চল।' কাঠ ছিটা মানে গরানের ছিটা, গরানের ছিটা কেটে কিছু নৌকায় ভরা হল। বললাম, 'চল শালা রাইটার্স-এ উঠাই দেব।' বাগুইআটির মাঝখান দিয়ে খাল আছে দেখেছেন তো। যতদূর যাওয়া যায় যাব। এইবার তো আমাদের সন্দেশখালির কাছে আটকাল। এখান থেকে তো ইনটিমেশন দিয়ে দিয়েছে। ওখানে তো রক্তক্ষয়ী

সংগ্রাম হয়ে গেল। কাঁদানে গ্যাস চলল। খালি হাতে কতক্ষণ লড়াই করা যায়, অসামঞ্জস্য। ছিন্ন ভিন্ন, বিচ্ছিন্নতা। পুলিশ কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ এঁটে উঠতে পারে নি। ব্যাক সাইড থেকে ক্যাডার এখান থেকে সাপ্লাই হয়েছে। এই ক্যাডাররাই আমাদেরকে ওখানে হারিয়ে দিয়েছে। পার্টি এ্যাকশান নিতে শুরু করেছে ওখানকার পাবলিক, একদম অবুঝ নয় ওরা, যখন দেখল সরকার এ্যাকশন নিতে শুরু করেছে। মনোবল কিন্তু এইভাবে ভাঙতে শুরু হল। মাইরধোর খেয়ে আমরা সবাই মরিচঝাঁপিতে ফিরে গেলাম সবাই। কিন্তু সমস্যা তো সেই খাদ্য। এবারে দেখছি কিছু কিছু লোক আস্তে আস্তে হয়রান হতে শুরু করছে। তখন ঐ নারকেলের মাথি, এগুলি সত্য কথা, কিছু কিছু নারকেল গাছের মাথি সিদ্ধ করে খেতে লেগেছে। হাজার হাজার নয় কিন্তু সামান্য যে কটা ছিল। লোকজন কত সময় কথা শুনবে? পেটের জ্বালায় নারকেলের মাথি খাইয়ে ফেলাইছে ওখানে গাছ নয় শাক টাইপের, আমার স্ত্রী চলে গেলে একটু হেলপ করত পারত। যদুপালং অখাদ্য কিন্তু ওগুলি সিদ্ধটিদ্ধ করে খাচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে তাও কিন্তু ওখান থেকে উঠিনি আমরা। এরপরে একদিন দেখা গেল ক্যাডাররা প্রচার শুরু করছে জ্যোতিবাবু লঞ্চে করে মিটিং ডেকে দিয়েছেন কুলতলি, গোসাবা, মোল্লাখালি। নদীর এপারে আমরা ঐ পারে ওরা মাইক লাগিয়ে মিটিং করেছেন। ওপার থেকে জ্যোতিবাবু দেখতে দেখতে আসছেন আমাদের দিকে লঞ্চের সামনে দাঁড়ানো। ভাষণ দিতে লাগল সেই ভাষণ 'এরা আপনাদের ক্ষতি করে জঙ্গল কাটছে। এসব তো তোমাদের পাওয়ার কথা ওরা বাইরে থেকে এসেছে মাছ মেরে খেতে তোমরা।' এইসব কথা বলে জ্যোতিবাবু চলে যাবার পর ওখানকার কমরেডদের আর পায় কে! এই জমিগুলি আমরা যে পরিষ্কার করে এসেছিলাম, পরিশ্রম করে ঐ যে প্রলোভন দেখিয়ে এল যে এবার ওগুলি তোরা ভাগটাগ করে নে। ওখানে যে জায়গা আমার আগাছা কেটেছি প্রকৃতপক্ষে ওখানে কোনো সুন্দরী গাছই নেই। ঐ দ্বীপটার সুন্দর গাছ বলে কোনো গাছই নেই, আছে কিছু কেওড়া কিছু গেয়ো, আর কিছু ছিটে গরানের। এইসব ঘটনার পরে তখনও কিন্তু ঐ লোকগুলা আমাদের খারাপ চোখে দেখে নাই। ওদের ওখানে আমাদের লোকজন যেত, কোনোদিন কিছু করে নাই। এমনকী খাদ্য দিয়েও সাহায্য করেছে। আমার মনে হয় এখনও যদি আপনি মরিচঝাঁপি যান ওরা কান্দে আমাদের জন্য। আমাদের এই অবস্থা হত না। যাক, এর পরে দেখা হল একদিন সকালবেলা। ব্যারিকেড তো করে রেখেছে, আবার এ্যাকশান শুরু হয়ে গেল। ঐ যে ভিটা মাটিটুকু দ্বীপের বাইরে কাউকে আসতে দেবে না। নীলকমল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট...

প্র : নীরদ দাস ছিলেন...

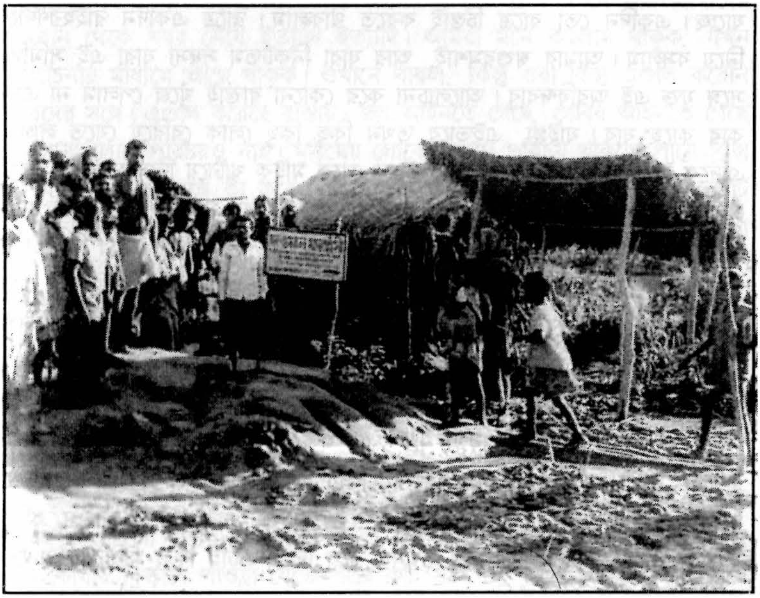
প : ও তো ছিল অ্যাকশনের সময়। কল্যাণ চক্রবর্তী চীফ টাইগার প্রোজেক্ট।

ভিক্ষে করে চাকুরি পেয়েছে। ওর তো চাকুরি চলে গিয়েছিল। তারপর ডেকে ডুকে চাকুরি দিয়েছিল। এই কাজ করার জন্য মনে হয় দিয়েছিল। কী তা কী জানি! লোকটা একটা ভালো কাজ করেনি। যাগগিয়া, এ্যাকশন শুরু হয়ে গেল। তারপর বি এস এফ-এর যে যুদ্ধ জাহাজ এনে হাজির করল। এরপর আবার কী হল। এত সবের পরেও যখন এরা উঠছে না, রামবাবুকে দূত করে পাঠাল জ্যোতিবাবু। পাঠিয়ে লঞ্চের থেকে উনি... এর আগে আর একটা কাণ্ড করেছেন। উনি ডেকে ডেকে বলছেন, 'এই আমি তোদের মরিচঝাঁপিতে আসতে বলেছিলাম?' দেখেন কথাটা, উনি আমাদের স্বীকারোক্তি নিতে চাইছেন যে আমরা মরিচঝাঁপিতে আসতে চাইছিলাম। সবাই বলল, আসতে চাইছিলাম না তো কি? কিন্তু দেখি কাগজে উল্টা লিখছে। ভাঙন ধরানোর জন্য উনি কিন্তু এইসব করতে শুরু করলেন। ওখানে গোলদার (রঙ্গলাল গোলদার) বাবু, তখন ওখানে আমি হাজির। আমাদের ছেলেদের ডেকে বলছে 'এই আয় আয়।' আমি বললাম, 'কই চ্যাটার্জিদা নামুন।' উনি বললেন, 'নারে, সময় কম আছে। এদিকে ঘুরতে ঘুরতে আসলাম সুন্দরবনে।' দেখুন এত ব্যস্ততার মধ্যে উনি ঘুরতে এসেছেন। আমাদের ডেকে বলছেন, 'এদিকে আয়না লঞ্চে চা-টা খাবি।' আমাদের ছেলেগুলি সহজ সরল। সাদা মনে ভিতরে গেছে। ওদের নিয়ে গিয়ে খাসির মাংসটাংস খাওয়ানো শুরু করেছে। এইবার দেখলাম, আমি ভিতরে যাই নি। যেহেতু আমি ওখানে কমান্ড করতাম, আমার মনে সন্দেহ হয়ে গেল। ঘটনাটা কী, এর মধ্যে দেখি। রামবাবু বেলের সরবৎ করে গোলদারবাবুর ওখানে পাঠিয়েছে। বুঝতে পারছেন? আমি বলছি সরবৎটা কোথায় যাচ্ছে 'গোলদার বাবুর জন্য'? আমাদের না খেতে পাওয়া ছেলেদের মাংস ভাত খাওয়াচ্ছে। তার মন্ত্রিসভার অনেক পরিষদ ছিল। অঢেল খাবার। এর মধ্যে আমি কিন্তু ভিতরে গেছি। আমাকে দেখে রামদা বলে, 'এই পবিত্র দাঁড়া দাঁড়া।' এমনিতেই রামবাবু আমাকে তুই তুকারি করে। 'হ্যাঁ, তুই উঠে আবার নেমে যাচ্ছিস কেন?' আমি বললাম, 'রামদা জিনিসটা কী ভালো হল?' এই বলে আমি নেমে গেছি। এইসব জিনিসগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে তিনি জিনিসগুলি করলেন। আর ঐ যে প্রদীপবাবুর কথা বললাম। ওনার ইস্কুলে চেয়ার টেবিল ছিল না। উনি বললেন, 'পবিত্র, কয়েকটা চেয়ার টেবিল বানিয়ে দে তো, স্কুলে চেয়ার টেবিল নেই।' আমি বললাম, 'দাদা, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমি করে দেব।' চেয়ার টেবিল করে দিয়েছি। কিছু পয়সা নিয়েছিলাম। কারণ মজুরি দিয়েছিলাম ছেলেদের। তারপর গাছও তৈরি হয়ে গেছে, চেয়ার টেবিলও তৈরি হয়ে গেছে। এই সময়ে এ্যাকশানটাও হয়েছে। এখনও কুমিরমারির স্কুলে আমার তৈরি করা চেয়ার টেবিল আছে, কেননা ঐ গাছের তৈরি চেয়ার টেবিলগুলি নষ্ট হবার নয়। একটু দম নিতে দেন, অনেকগুলি কথা বলছি।

প্র : তার পরবর্তী অবস্থা ?

প : এরপর পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে দিলেন কুমিরমারির একদম নদীর পাড়ে আর তার পাশে তো গোসাবা ফরেস্ট ডিপার্মমেন্টের থানা রয়েছে, ওখানে কিছু তাঁবু গেঁড়ে দিলেন আর গোসাবা থানায় অস্ত্রশস্ত্র সমেত অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করে দিলেন। নির্দেশ হল কোনোমতেই যেন ঐ আইল্যান্ড থেকে কোনো লোকই ঢুকতে বেরতে না পারে। টোটাল ব্লকেড। আর ঐ দিকে এ্যাকশন গ্রুপের জন্য নির্দেশ হল। জাহাজে উঠে বসে থাকে। আর লঞ্চগুলি চক্কর লাগাতে থাকল অনর্গল। রাতদিন কখনো বন্ধ নেই। এইসব করতে করতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মরিচঝাঁপিতে যে লোকগুলি বসবাস করছিল। কোনো চাউলই ছিল না। না চাউল না আটা। কত সময় ধরে মানুষগুলোরে বুঝিয়ে রাখব। এমন অবস্থায় এ পারের লোকে কাঁদছে, হাঁক দিচ্ছে ওপারের লোকে কাঁদছে। এই যখন অবস্থায় পৌঁছাল, না পারি একদিন সকালবেলা বললাম, ঠিক অছে চল ব্যারিকেড ভেঙে দিই। তো মাইক টাইক ছিল, চেয়েচিন্তে জোগাড় করেছিলাম। ছেলেদের বললাম, মেয়েদের বললাম, দেখি কী করি, তো নৌকায় করে পারাপার করার জন্য নৌকো লাগে, বড় সাইজের যে নৌকো হাসনাবাদ থেকে নিয়েছিলাম। ওদেরকে কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলাম গোটা তিনেক নৌকা আমাদের জন্য রেখে দিস ভাই। ওদের যা দাম ছিল সেই অনুসারে ওরা টাকাটা তো নিতেই চাচ্ছিল না। পরে বলল, 'তো ঠিক আছে কিছু টাকা দে ভাই,' আবার কিছুটা দিলাম জবরদস্তি...

হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে দেখি মেয়েরা যখন ওপারে গেল, ওপারে নৌকা ওদের ভিড়তে দিল না, প্লাস ঐ মাইরধোর শুরু হয়ে গেল। এবার যখন মাইরধোর খেতে শুরু করল, এবারে তো পুরা লোকগুলি অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষুধার তাড়নায় ঐ পারে ঢুকে গেছে। ছেলেরা বুঝেছিল যে কোনো রকমভাবে পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ না করে বসে। বলেছিলাম যে তোরা যেন কোনোভাবে পুলিশ ক্যাম্পের দিকে হাত না বাড়াইস, কিন্তু কী সুন্দরভাবে ওরা গুলি চালিয়ে দিল। ছটাছট ঘণ্টা দেড়েক গুলি চালাতে শুরু করল। যখন যাতায়াতটা একটু স্বাভাবিক হয়েছে। ঐ বাইরে নয়। কিন্তু কুমিরমারির এপার ও পার তখন গুলি করতে করতে এক ভদ্রমহিলা সে ঘরের মধ্যে বসেছিল। গুলি চালিয়ে দিল তার গায়ে। সেই বয়স্কা ভদ্রমহিলা কুমিরমারির বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ৭০/৭৫ বছর বয়স। গুলি লাগার পর এই তো ওখানেই থেমে গেল, ক্যাম্পটাকে আরও বাড়িয়ে দিল, আর সংবাদপত্র ট্রান্সজিস্টারে খবর হয়ে যাচ্ছে 'কুমিরমারি স্থানীয় লোকজনদের উপর এরা অত্যাচার করতে শুরু করেছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জিনিস আর থামানো গেল না। দেখা গেল কী যে কোথা থেকে ছেলেগুলি আমদানি করে দিল। এর আগেও একটা কথা আপনারে বলেছি, অনেকদিনের জিনিস বলতে ভুলে যাই, মেদিনীপুরে তখন বন্যা হচ্ছিল,



একদিন আমাকে বলা হল, আমাকে বলতে আমাদের এখানের সকলকে বলা হল ভাই ওখানে বন্যা হচ্ছে তোরা যদি যাইস তো বন্যাত্রাণে সহায়তা করলে মজুরি পাবি। একটা মান্থলি পয়সা দেওয়া যাবে। কে কে যেতে রাজি আছিস। এদিকে কোনো কাজ নেই যদি সম্ভব হয় যা না ভাই। কিন্তু এই ২০/২৫ জন ছেলেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা মতো ব্রেনওয়াশ করেছে। আর ওদের বলল, 'তোরা বল এইভাবে থাকা যাবে না, সরকার থাকতে দেবে না। তোরা সময় নষ্ট করছিস। না খেয়ে অসুখবিসুখে পড়ে মারা যাবি, এইভাবে দুইজন চারজন করে নিয়ে বেরিয়ে চলে আয়। এরপর চাকরি পাবি। টাকা পাবি। এই নে টাকাটা নিয়ে যা।'

প্র : কারা করেছিল এসব ?

প : 'বামফ্রন্ট সরকার কিছু বলার নেই আর'... এখানকার মাধ্যমে টাকাটা গিয়েছে, পার্টির মাধ্যমে, পার্টির মাধ্যমে গেছে, ক্রিয়ার জিনিস। কথাবার্তায় ঐ যে ওদের আচরণ কথায় কথায় খরচা করে, না ধরার কোনো কারণ নেই যাকেই জিজ্ঞাসা করছি এই কথা বলছিস কেন ? এই টাকা পেয়েছিস ভালো কথা কিন্তু এতো টাকা তো পাওয়ার কথা না। তখন বুঝলাম যে ২২ জনকেই ব্রেনওয়াশ করে ছেড়ে দিয়েছে। এই ব্রেনওয়াশ করার ফলে দেখা গেল কী এই ব্রেনওয়াশ করে যে ৫ পরিবার ১০ পরিবার নিয়ে সরে আসছে। আর আমরাও দেখছি আমাদের সিধে রাস্তায় হাঁটার কোনো জায়গাই থাকছেনা। দেখছি ডাইন হাত বাঁ হাত সবই সরে

যাচ্ছে। একদিন তো রাত্রে চিন্তাই করতে থাকলাম। রাত্রে একদিন রাইহরণদাকে নিয়ে বসলাম। আমার শ্বশুরমশাই, আর যারা নিকটতম সদস্য যারা এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত এই অরবিন্দবাবু। আলোচনা করে কোনো রাস্তাই খুঁজে পেলাম না এখন কার কাছে যাব। যাইগ্গা, এইভাবে তখন কিছু কিছু লোক বেরিয়ে যেতে লাগল। এদিকে ইনি কী করলেন সরকারের তরফ থেকে মাইক খাটায়ে দিলেন। আর মাইকে প্রচার শুরু করে দিল নদীর ওপারে 'ভাই তোরা না খেয়ে মরছিস কেন ? মাছ মাংস মুরগি মাংস হচ্ছে, অগাধ খাবার আছে এ পারে আর দণ্ডকারণ্যে ফিরে যা তোদের সুন্দরভাবে বসতি দেওয়া হবে ওখানে, আয় চলে আয়। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে হাসনাবাদে।' এইভাবে চলতে চলতে দেখা গেল কী, সত্যি কথা বলতে একদিন দেখা গেল কী এখানকার সমিতিটাকে লোকগুলিতে নাজেহাল করে দিয়েছে। আর এখানে তো খাদ্য নাই। বাচ্চাদের খিদাকে কি করে সামলাই। আবার কারো কাছ থেকে যে আনবো তারও ব্যবস্থা নাই। এই মত পরিবেশে দেখা গেল একদিনকা, একদিন সকালবেলা দেখা গেল হাজার হাজার ক্যাডার ঢুকে গেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হাজার হাজার ক্যাডার ঢুকে গেছে। ঝুপড়ি ঘরগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, স্কুল ভেঙে দিয়ে ফটো তছনছ করে দিল। এটাই কিন্তু মরিচঝাঁপির শেষ কথা, এইখানেই মরিচঝাঁপি শেষ হয়ে গেছে।

প্র : কুমিরমারির কিছু কিছু ক্যাডার ছিল ওখানে...

প : ছিল, অমল বলে একটা ছেলে ছিল। যার নাকি একটা চায়ের দোকান ছিল। কুমিরমারি মার্কেটের দিকে। উনি আবার প্রদীপবাবুর ছাত্র ছিলেন। এবারে ছাত্র অছাত্র হয়ে গেছে। ওই ঘটনা ওখানে হল, ও ছিল, আর তখন তো সামনে দাঁড়ানোর কায়দা নেই, টার্গেট তো আমরা। আমাদের আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যেতে হল। এই পিরিয়ডটা আমাদের কাশীনাথ বাবুকে ঢুকতে দেয় নাই। চেষ্টা করেছিলেন যাও একটা পরামর্শ ওনার কাছ থেকে পেতাম। কিন্তু উনি এ্যারেস্ট হয়ে গেলেন। তখন কাউকে লাস্ট পরামর্শ করার মতো কাউকে পাইনি যে কী অ্যাকশান কী করা যেতে পারে! এইরকম অবস্থা হয়নি। কিন্তু ওখানে যাওয়ার তো কোনো পথ নাই।

প্র : মেয়েদের উপর যে অত্যাচারটা পুলিশ করেছিল...

প : অত্যাচার তো হয়েছে। এখানে ওখানে তুলে নিয়ে গেছে, জঙ্গলের দিকে গেছে তুলে নিয়ে গেছে, জল আনতে গেছে তুলে নিয়ে গেছে।

প্র : পুলিশ কি করে এবার মাঝখানে ঢুকল...

প : পুলিশ কী করেছে এইবারে মাঝখানে ঠিক ঐ এক তারিখ ওরা ঢুকল, সরকারের নির্দেশে তো লোক লাগে দেখাশুনা করার জন্য বাঘ ভাল্লুক তো আছে। তা বাঘ ভাল্লুক আমরা তো এখানে বসে আছি, আমাদের যখন খায় নি তবে তোরা বাঘ হয়ে ঢুকবি ? তোদের কোনো অসুবিধা নেই, তোরা ঢোক। ওরা ঢুকে ক্যাম্প

কইর‍্যা বসল। এগুলি গুলিগোলা চলার আগে। আমরা জানতাম যে ওরা আমাদের মাঝখান থেকে খবর নেবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা মনে করলাম থাকুক, যখন আলোচনার মাধ্যমে আছে থাকুক। ওখানে থাকল, কিন্তু ওরা কিন্তু এগুলি করেনি মেয়েদের সঙ্গে। এগুলি করেছে রাস্তায়। জল আইনতে গেছে, গোবর আইনতে গেছে আ-গোনা লোক পরিচয়ও নাই। মুষ্টিমেয় লোকের সাথে পরিচয় থাকতে পারে কিন্তু আ-গোনা লোকের সঙ্গে কী করে পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু কেউ যখন রিপোর্ট করছে তখনই জানতে পারছি। রাইহরণবাবুর রিপোর্টেই আছে কিন্তু এমনি তো খবর করতে পারি নি। শুনেছি কিছু রিপোর্ট হয়েছে অধিকাংশ রিপোর্ট হয়নি।

প্র : কিন্তু আপনি কি করে চলে এলেন ?

প : আমি আপনাকে বলছি তো দাদা, আমি এই টাইপের ছিলাম না। অন্য কারো বাড়ি ছিলাম। ওখানে এক ভদ্রলোক আছেন সাহা বলে। টাইটেল সাহা। সাহাদা কিন্তু চোরাচালানি লোক। সুন্দরবনের কাঠ কাইটা চালান দিতেন। সুন্দরবনের রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ নখদর্পণে আছে। আমরা যখন ওখানে প্রথম ঢুকি, এই টাইপের কিছু লোকের সঙ্গে, যারা সুন্দরবনের রাস্তাঘাট জানে। ঐ সুন্দরবনে যখন থেকে ঢুকেছি ঐ সাহাদা ছায়ার মতো থাকত আমার সঙ্গে। রাজনৈতিক ব্যাপার না। কিছু তথ্য কোথায় কিভাবে পাওয়া যেতে পারে কার সঙ্গে যোগাযোগ করব এই ব্যাপারে সাহাদা আমাকে হেলপ করেছে। জন্মও ওইখানেই ঐ নদীর পাড়েই জন্ম। সাতজেলেতে। উনি আমার ওখানেই পড়ে থাকতেন। যখন দেখলাম আমার আর কিছু করার নেই তখন সাহাদাকে বললাম, 'সাহাদা এখন কী হবে! ধরা দিয়ে দেব ?' তখন সাহাদা বললেন, 'ধরা দিলে তো তুমি থাকবে না।' তখন বলে, 'চল।' সাহাদার সঙ্গে খালি পায়ে হাঁটা শুরু করি ঐ সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। মরিচঝাঁপি তখন ছাড়িয়ে গেছি দ্বিতীয় দ্বীপে চলে গেছি। ওই ভদ্রলোক সব রাস্তাঘাট জানে। কিন্তু আমাদের সংস্পর্শে যখন এসেছে তখন চোরাচালান বন্ধ হয়ে গেছে। তখন আমি বলেছি, 'দেখেন যতদিন এই মরিচঝাঁপিতে আছেন আপনার চলার রাস্তা করে দেব। ঐ সব কাজ আর করবেন না। আপনি শুধু আমাদের যোগাযোগের রাস্তাটা করে দেবেন। আপনার পরিবারের দায়িত্ব আমরা নিয়ে নিচ্ছি যেই করে হোক আপনার পরিবারকে চালিয়ে নেব। এইবার ঐ ভদ্রলোকের মাধ্যমে আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এসেছি। ওখান থেকে ও আওয়াজ দেয়। ওর বাড়ির লেবেলে চলে এসেছি। পরিচিত লোকজন আছে। আওয়াজ থেকে দেখা যায় বাড়িঘর থেকে কেউ আওয়াজ দিচ্ছে না। তখন ঐ গ্রামের মধ্যে দিয়ে কিছু লোক নৌকায় শুকর মেরে নিয়ে যাচ্ছিল। ওরা আমাকে দেখে ডাকে, 'দাদা আপনি এইখানে।' আমি বললাম, 'ভাই আমায় নৌকায় পার করে দে।' আমাকে দেখে ওরা নৌকা পিছিয়ে নিয়ে আসছে, ওখান থেকে ওরা আমাকে তুলে নিয়েছে। বললাম, 'যেখানে পুলিশ নেই

এইরকম একটা স্পটে সাহাদাই বলছে, 'ভাই এখানে নামিয়ে দে।' এইবার সাহাদার ওখানে লুকিয়ে রয়েছি, কয়েকদিন রাস্তায় বেরোতে পারিনি।

প্র : তখন রাইহরণদা বেরিয়ে...

প : হ্যাঁ, রাইহরণদাকে আমি আগেই বলেছি, দাদা আপনি সরে যান। আপনি এই বয়সে নড়াচড়া করতে পারবেন না। রাইহরণদাকে আমি চারদিনের আগে সরিয়ে দিয়েছি

প্র : অরবিন্দ মিস্ত্রী আগেই চলে গিয়েছিলেন?

প : হ্যাঁ, উনি একটু ভীতু লোক ছিলেন। আমি বলছিলাম, 'দাদা আপনি আগেই বেরিয়ে যান।' কাকাকে তার আগে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যখন পুলিশ ছিল না, তখন তো আর কিছু করার নেই।

শোনেন এবার আমার ঘটনাটা কী, আমি না ফিরতে পারছি দণ্ডকারণ্যে, না থাকতে পারছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। কারণ এই অঞ্চলে তো এই লোকজনতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওদের সঙ্গে ঘুরেছি এই লোকগুলিতে আমারে চেনে, আমি চিন্তা করলাম আমার দ্বারা তো এখানে থাকা সম্ভব হবে না। আবার ওখানে আমি যদি দণ্ডকারণ্য ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্টে পৌঁছে যাই ওখানে আমার অসুবিধা আছে। যারা ওখানে ফেরত গেছে, তারা, ওদের প্রশ্নের সম্মুখে আমাকে হতেই হবে বলবে 'আপনার সেই রামবাবু গেল কোথায়, কিরণময় নন্দ গেল কোথায়, মুখ দেখাইতে আসছেন কেন।' অনেকে অনেক কিছু বলবে, এ বলবে আমি ছেলে হারাইছি, বৌ হারাইছি, অর্থ হারাইছি! আমি ওখানে আর যাইনি দাদা আমরা ডাইরেক্ট ইউ পি-তে চলে গেছি। এখান থেকে বেরিয়ে ট্রেনের টিকিট তো কাটি বসছি, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমি জানি না। চলে গেছি এখান থেকে নাগপুর, নাগপুর থেকে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ থেকে কর্ণাটকের বাঙ্গালোর। বাঙ্গালোরে একদিন কাটিয়ে, ওখানে আমার এক ভাইপো ছিল এয়ার ফোর্স ট্রেনিং-এ ছিল। মনে করছিলাম যাই দেখি ওর ওখানে কী অবস্থা। ট্রেনি-এ আছে, সার্ভিস না। দেখলাম এখানেও তো হল্ট করা যাবে না। রিটার্ন হয়ে ওখান থেকে চলে আসছিলাম বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রের একটা বড় শহর বিজয়ওয়াড়া থেকে চলে গেলাম বিশাখাপত্তনম, বিশাখাপত্তনম থেকে কোরাপুট হয়ে মালকানগিরির কাছে দেখলাম ওখানে থাকা সম্ভব নয়। আবার রিটার্ন আবার চলে গেছি উত্তরপ্রদেশ রামপুর ডিস্ট্রিক্ট। ওখানে যারা গেছে পুর্নবাসন পেয়েছে, হিন্দুস্থানীদের জমিতে কাজকর্ম করে চলছে, আমার পরিচিত লোক ছিল। যখন আন্ডারগ্রাউন্ড-এ ছিলাম। তারপর এক লং পিরিয়ড চলল, ইলেকশন হয়ে গেল, জ্যোতিবাবু ভোটে জিতছেন, আনন্দে আছেন। কাজ করে তো খেতে হবে। তখন মানা যাই নি। ওখানে গেলে আমার অসুবিধা ছিল। কারণ ওখানে যে আমার ফিল্ডটা ছিল নষ্ট হয়ে গেছে আর যারা পড়াশুনা করতো তারা কেউ ব্যারিস্টার

ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দেখলাম ওখানে যেয়ে আমি আর পূর্বের পজিশন পাব না। আমি এখানে এসে কাজকর্ম করতে শুরু করলাম। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ইউ সি আর সি-র সভাপতি ছিলেন, ওখানে ডাঃ অমল চন্দ্র সেন। ওখানে ওনার অফিস ছিল। আর ঐ সময় উনি থাকতেন টালার যে বস্তি আছে ঐখানে। উনি আমাকে ওনার পরিচয় দিয়েছিলেন। আন্দামান সেলুলার জেলে ছিলেন ব্রিটিশ পিরিয়ডে, তারপর ইউ সি আর সি-তে জয়েন করেন, উদ্বাস্তু পিরিয়ডে শুরু করা হয়েছিল ইউ সি আর সি, বর্তমানে ওটা এখনও আছে। যেটাকে আমরা ঐ সময়ে হাসনাবাদে ডিনাই করেছিলাম, যে ঐ সময়ে হোমগার্ড মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি উনি চাইছিলেন এবং ওনার সঙ্গে আরও প্রতিনিধি ছিলেন, চাইছিলেন যে চর হাসনাবাদে বসে আমরা যেন ওনার সঙ্গে মিলে যাই কিন্তু আমরা সেটা দেখছিলাম যে আন্তর্জাতিক ভাবে কিছুটা অসুবিধা আমরা বোধ করছিলাম যে মিলে গেলে আমাদের উদ্দেশ্যটাই, আন্দোলনের গুরুত্বটাই মার খাবে। সেই জন্য আমরা ডিনাই করে গিয়েছিলাম। যখন আমরা মরিচঝাঁপিতে ছিলাম এক ভদ্রলোক, আমরা স্বামীজি বলে সম্বোধন করতাম। উনি বঙ্কিম চন্দ্র পাঠভবন, ওটা শিয়ালদাতে অবস্থিত, উনি প্রথম থেকে তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেবামূলক কাজকর্ম করতেন। উনি আমাদের সঙ্গে দারুণ সহানুভুতির সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। উনার নাম ডাক্তার সমীরণ কিন্তু আমরা তাকে স্বামীজি বলে ডাকতাম, নেতাজী বলেও ডাকতাম। উনি ওষুধপত্র দেওয়া, ট্রিটমেন্ট করতেন এবং আমাদের কাছে যে সব চিঠিপত্র আসত সেগুলি পড়ে কোনটার কি উত্তর, কোন বিষয়ে কি করতে হবে এইসব সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে নানা পরামর্শ দিতেন এই ভদ্রলোকের কথাও আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

প্র : কতদিন উনি ছিলেন ?

প : উনি প্রথম অবস্থা থেকেই ছিলেন। প্রথম অবস্থা থেকে শেষ অবধি ছিলেন। এই সন্দেশখালির এখানে যে ফাইট-টা হয়, ঝগড়াটা হয়। ঝগড়াটার পরের থেকে উনি ওখানে অ্যাটেন্ড করেন নি। এই একটা ঘটনা যা সেদিন বলতে ভুলে গেছি আর ওখানে একটা প্রশ্ন করছিলেন যে ওখানকার Agricultural Department টাকা DNKA টা এটা সেন্ট্রল গর্ভমেন্ট-এর অধীন দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। এটা মূলত পূর্ববাংলা থেকে আগত রিফিউজিগুলি প্রথমে ওদের কাছে ঢুকল তখন একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা, বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চলের জলের তো একটা প্রাদুর্ভাব তো আছেই আর মরু অঞ্চল, পাথর, জঙ্গলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। সবচাইতে বড় যেটা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙালিরা যেরকম জল বাতাসের সঙ্গে পরিচিত তারা প্রথম অবস্থায় দেখেছে যে জলের কোনো বশংই নেই পরে এদেরকে দিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যগুলিই আমাদের মনে হত এদের নিয়ে গিয়ে জঙ্গল

সাফ করা হত, রাস্তা তৈরি হত, পুনরায় কিছুটা হয়ে যাবার পর যারা এদিক সেদিক পালাত তারপর তাদের ওখানে থেকে পুনরায় ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে আসত। তারপর এই ক্যাম্প থেকে ঐ ক্যাম্প এই করতেছিল, কিন্তু ১০ বছরে পুনর্বাসন বলে শব্দটা ওরা use করে নাই এবং এই পরিবারগুলিতে কোনোভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করল না। তারপর যখন ওদের আশেপাশের পাহাড়ী জঙ্গলে নিয়ে গেল, ওদেরকে বলা হল এই জমি তোমাদেরকে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং তার পরিবর্তে ডোল একটা শব্দ বলে যে কথা ছিল, সরকারি অনুদান যেটা দিত মাসে ৬৫ টাকা এর মধ্য থেকে। আপনাকে চাউল থেকে শুরু করে সব কিছু করায় নিতে হবে এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে ওখানে কোনো মার্কেট ছিল না, যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নেই ৩০০/৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো শহর নেই এই রকম দুর্গম জায়গায় নিয়ে গিয়ে এদেরকে ফেলে রাখা হয়েছিল। এবং যে জমিগুলি ওদের দেওয়া হয়েছিল সেগুলি প্রকৃতপক্ষে চাষের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত জমি। আর মুষ্টিমেয় ওখানে যে জমিটা ছিল ওটা ওখানকার আদিবাসীদের দখলে তো অনেক আগে থেকেই ছিল। দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কি করল, যে বলল, একটা টাকার বাজেট করা হল, যাতে জল সেচ টেচ করা যেতে পারে। তবে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে যাওয়ার কথা ছিল যে দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি হাতে ক্ষমতা না দিয়া সেটা চলে গেল স্টেট-এর হাতে, খেয়াল রাখতে হবে। দণ্ডকারণ্য অথরিটি বলতে কি। দণ্ডকারণ্য হল একটা এরিয়া মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ, অন্ধ্রের কিয়দংশ, মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ, ওড়িষ্যার কিয়দংশ, কিন্তু কোনো স্টেটের সম্পূর্ণ অংশ নিয়া নয়, বিভিন্ন স্টেটের। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয় এই টাকাটা। সম্পূর্ণ রিফিউজিদের জন্য, তখন ডাইরেক্টর ছিলেন শৈবাল গুপ্ত উনার উপরেই সব কিছু ডিপেন্ড করছিল, কিন্তু ভদ্রলোককে কাজ করতে দেওয়া হয় নাই, বরং বিরক্ত হয়্যা ঐ ভদ্রলোক ঐ পদ থেকে সরেই গেলেন, কেননা আমরাও দেখেছি উনিও বলেছেন এই যে, যে পন্থায় এই ড্যামগুলি তৈরি করা হচ্ছে এবং যে পদ্ধতিতে জলসরবরাহ করা হচ্ছে তাতে কোনোমতেই বাঙালি অধ্যুষিত জমিতে জল পৌছাবে না। Actually হয়েছেও তাই। যেমন উদাহরণস্বরূপ, সতিগুড়া ড্যাম এটা মালকানগিরির শহরের একদম নিকটতম জায়গায়, শহর বললে কিন্তু ভুল হবে, ঐ গ্রামগঞ্জে যে রকম বাজার, সেইরকম, কোরাপুট ডিস্ট্রিক্ট সরু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে কিন্তু একটা মাটির বাঁধ এই বাঁধের যে ক্যানাল তৈরি হয়েছে, এখানে আমি কর্মও করেছি। ওখানে আমি কিছুদিন ছিলাম, কী কারণে আমি ছিলাম বলছি না। তো বাঁধে যে জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই বাঁধে জল কোনো মতেই বাঙালি অধ্যুষিত জমিতে গিয়া পৌছায়নি। আদিবাসীদের জমির উপর দিয়েই গিয়েছে। বাঙালি যেখানে পড়ে আছে সেখানে কোনো রাস্তাই নাই। যদিওবা কারো

জমিতে গিয়া পৌছাইছে, সেই জমির এমন পজিশন যে জল দাঁড়ানোর কোনো প্রশ্নই নাই। জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে চলে আসছে। এই ধরনের কারণের ফলে ঐ সময় দেখা গেছে যে অধিকাংশ গ্রাম ৯০টা পরিবার গিয়েছে এক আধ জন কমতে কমতে পুরা গ্রামই উজাড় হয়ে গেছে। যারা বা দাঁড়িয়ে রয়েছে তারাও অতি দুঃখকষ্টের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশে ছিল। তারপর যে আওয়াজটা তোলা হল যে বারংবার ওখানে গিয়া উস্কে দেওয়া কথাবার্তাগুলি বলা হল ওদের মনেও একটা আশার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ওরা ওটোমেটিকালি জাম্প দিয়েছে। এই কথাগুলি সেই দিন আমি সুন্দরভাবে বুঝাইতে পারিনি। এখানে যে লোকগুলি (DNK) দণ্ডকারণ্যতে ফেরৎ গিয়েছে কি যায় নাই আমার মনে হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এর খোঁজখবর রাখে না। দেখা যাচ্ছে যে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ওখানে থেকে গিয়েছে আর অধিকাংশ লোকগুলি কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলের জনঅরণ্যে মিশে গিয়েছে। হাজার হাজার লোক রেললাইনের পারে শহরের বিভিন্ন বস্তিতে তারা আছে।

প্র : কোন কোন রেললাইনের পাশে তারা রয়েছে।

প : বনগাঁ লাইনে রয়েছে। বনগাঁ স্টেশনে রয়েছে ও দত্তপুকুরে রয়েছে, বামুনগাছিতেই রয়েছে। পশ্চিমবাংলার কোন রেললাইনে নাই মরিচঝাঁপির লোক! দুদিন আগে তো মরিচঝাঁপির বস্তিতে গণ্ডগোল হল খবরের কাগজে দেখলাম। দমদম রেলস্টেশনের পাশেই রয়েছে মরিচঝাঁপি কলোনী। এইভাবে মরিচঝাঁপির লোক পশ্চিমবঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এরা যতই আনন্দ করুক আর যাই করুন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যাই বলুক, DNK এর থেকে আসা ৯০ ভাগ লোক এখানেই রয়ে গেছে। ১০ জন লোক এদিক ওদিক হয়ে গেছে। এই টাইপের কিছু লোক। এই টাইপের কথা ঐ দিন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, সেই আপনাকে ঠিক বুঝায়ে বলতে পারিনি।

প্র : আর এই রকম কোনো ঘটনা আছে?

প : যে ঘটনাগুলি আর যা আছে দাদা, আমার মুখ দিয়ে এটা বের হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

সাক্ষাৎকার : ৭ মার্চ ২০০৬
১৯ মার্চ ২০০৬



প্রশান্ত হালদার, সুন্দরবন লঞ্চ ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার।

আক্রমণের শুরু

প্রশান্ত হালদার

প্রশ্ন : উদ্বাস্তুরা যখন মরিচঝাঁপিতে এলেন তখন আপনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।

প্রশান্ত হালদার : ওরা যখন প্রথম মরিচঝাঁপি আসে আমার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ওরা যখন আসে তখন ওদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন রঙ্গলাল গোলদার, রাইহরণ বাড়ৈ, সতীশ মণ্ডল। আমি তখন লঞ্চ ইউনিয়নের সেক্রেটারী। একদিন সতীশবাবু আমাকে বললেন, 'আমাদের টাকা পয়সার তো খুব অভাব, আপনি আমাদের দুইজন ভলান্টিারকে দুটো ফ্রি পাশ করে দিতে পারেন কিনা,' তখন মালিকদের পাস দরকার ছিল না। আমি দুইজন ভলান্টিয়ারকে দুটো ফ্রি পাশ করে দিয়েছিলাম। মরিচঝাঁপি থেকে ক্যানিং গোসাবা হয়ে আর একটা মরিচঝাঁপি থেকে হাসনাবাদ, যে ওরা যে কোন লঞ্চে যেতে পারবে। বলে দিয়েছিলাম ওদের কোন ভাড়া লাগবে না। আমি মরিচঝাঁপি যেতাম। ওখানে তখন তিনটে প্রাইমারী স্কুল, ১টা জুনিয়ার হাইস্কুল ছিল। আমি বললাম, আরো দুটো

প্রাইমারী স্কুল করুন। আমি সতীশবাবুকে বললাম, তিনি বললেন, 'বই?' আমি বললাম, 'আমি বইয়ের ব্যবস্থা করে দেবো।' আমার তখন বইয়ের দোকান ছিল, পাবলিশার্সরা যেসব পুরানো এডিশনের বই বাতিল করতো, প্রাইমারীর সেই রকম বাতিল হওয়া ১ বান্ডিল বই পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক তার দিন সাতেক পরে সি.আই একটা নোটিশ জারি করেছেন, আমার নির্দিষ্ট ডেটটা তো মনে নেই, তাতে বলা হয়েছে 'অমূক ডেট থেকে কোন লঞ্চ লাইনে যাবে না। সব লঞ্চ বন্ধ।' গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, যিনি তিলজলায় খুন হন, হাসনাবাদের সি.আই ছিলেন। আমি তাঁর কাছে ছুটে যাই। উনি কন্ট্রোল করছেন সব। আমি সি.আই-এর কাছে চলে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম সমস্ত লঞ্চ বন্ধ থাকবে? এত প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করবে, তারা এসে বসে থাকবে বিভিন্ন ঘাটে। দূর দূর থেকে এসে বসে থাকবে, আপনারা এতো লঞ্চ কি করবেন? সমস্ত লঞ্চ কী করবেন? তিনি বললেন : 'বলা যাবে না, Confidential,' আমি বললাম দেখুন, তাহলে কোন লঞ্চ যাবে না, আপনারা যতই আইন দেখান, আমরা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি, তারা বসে থাকবে কোন সারেঙ্গ অসুস্থ কোন ড্রাইভার অসুস্থ, অর্ধেক সারেঙ্গ ড্রাইভার যাবে না, আমি তখন সব লঞ্চ আটকে দেবো, সারেঙ্গ ড্রাইভার ছাড়া বেআইনী কোন লঞ্চ চলবেনা। তখন কী করবেন? আপনি চালাতে পারবেন বেআইনী? তখন বললেন যে, 'মরিচঝাঁপি ঘেরাও হবে ওদের উচ্ছেদ করা হবে।'

এটা গেল রাত্রের ব্যাপার, খুব ভোরে একটা লঞ্চ যেতো চারটের সময়, সেই লঞ্চে সতীশ মন্ডলকে একটা চিঠি লিখে দিলাম, তাতে লিখলাম যে 'এই তারিখ থেকে কিন্তু আপনারা ঘেরাও হয়ে যাচ্ছেন, আপনাদের উচ্ছেদ করবে আপনারা কি পলিসি নেবেন সেটা আপনারা ঠিক করুন।'

প্র : আপনি নিরঞ্জন হালদারকে যে প্রথম চিঠি পাঠান সেই ব্যাপারটা বলুন।

প্র হা : ৭০ সালে যখন রিফিউজিরা আসে, তখন ওদের সবটাই দেখাশুনা আমি করতাম, ডাক যেতো, ট্রেন আসতো, সব খবর আমার কাছে আসতো, তখন CPM-এর মন্ত্রী ছিল দমদমের, ত্রাণ মন্ত্রী ছিলেন। ভানু সেন, আমরা ভানুদা বলতাম, তিনি একটা টেলিফোন করলেন যে অমুক তারিখ থেকে এরা যাবে ওরা চলে যাবে, প্রথম ট্রেন যাবে। ওখানে অনেক মুভমেন্ট হয়। তার সব নেতৃত্বে আমি ছিলাম। তারপর এলো শরনার্থীরা, সবটাতে আমি ছিলাম, এরা যখন এলো তার একটা অংশ ছিল, খুলনায় আমি যখন কৃষক আন্দোলন করতাম, তার মধ্যে এদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি করতেন আমার পুরানো বন্ধুরা সব, ওরাও এসেছিল সেই জন্য আরও জড়িয়ে পড়লাম বেশী, প্রথম এসেই আমাকে খোঁজ করেছিলেন, আমাকে পাননি, আমি ছিলাম না, ৭দিন পরে ফিরে এসে দেখা করি, তখন ওরা নদী পার হয়ে প্রথমে টেংরামারির ওপারে চলে গেছে, ঐখানে ওদের সঙ্গে দেখা

করি, তারপর নিয়মিত যোগাযোগ, যতদিন ওরা ওখানে ছিল। পরে লঞ্চগুলো সব নিয়ে নিল, ঠেকানো গেল না। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ক্যানিং এ-নিয়ে গেল, ক্যানিং-এ একটা সিন্ডিকেট ছিল। সেখান থেকেও সব লঞ্চ নিয়ে ওদেরকে ঘেরাও করলো, তখন কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। কিছু লঞ্চে সারেঙ্গ, ড্রাইভার ছিল না। আমি জ্যোতিবাবুকে একটা চিঠি লিখি : 'যে এরা বে-আইনীভাবে চলছে এটা আন্তর্জাতিক জল আইন বিরোধী এবং আমাদের যে ইনল্যান্ড জল আইন আছে তারও বিরোধী আপনি এটাকে স্টেপ নিন।' লঞ্চের নাম করে করে কোন কোন লঞ্চে ড্রাইভার সারেঙ্গ নেই লঞ্চগুলোর নাম উল্লেখ করে আমি একটা চিঠি দিই। তারপর জ্যোতিবাবুর দপ্তর থেকে চিঠি আসে, তাতে বলা হয়, 'আপনার চিঠি পেয়েছি, এটার তদন্ত করা হবে।' এবার উচ্ছেদ হয়ে যাবার পর তদন্তের আর প্রশ্নই উঠলো না। এইভাবে শেষ হলো। অপারেশন শুরু হলো, সারেঙ্গরা এসে বললো যে নৌকা করে উদ্বাস্তুরা পালাচ্ছে এবং কীভাবে লঞ্চ দিয়ে ঐ নৌকোগুলোর মাঝখান দিয়ে মেরে নৌকোগুলোকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। কিছু লোক পাখায় কেটে মারা যাচ্ছে আর কিছু লোক সাঁতরে পাড়ে উঠছে।

প্র : লঞ্চটার নাম কি মনে আছে, সারেঙ্গ কে ছিল ?

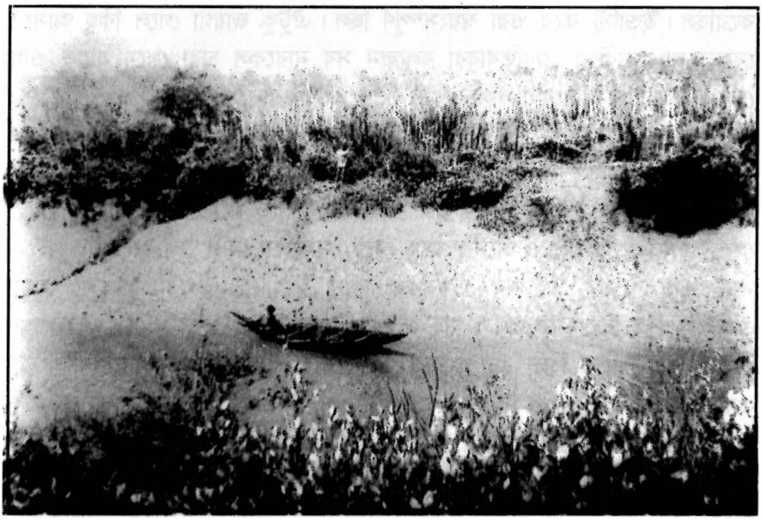
প্র হা : না, ইউনুস নয়, ইউনুস মৃত দেহগুলো রাত্রে নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল।

প্র : হ্যাঁ রাত্রের ঘটনাটা বলুন।

প্র হা : একজন সারেঙ্গ হাসনাবাদে আছে, ওই গঙ্গাধরের লঞ্চে ছিল ওকে যদি আনা যেতো ও অনেক খবর বলতে পারতো, আপারেশনের সময়ও ছিল, সবকথা মনে নেই বয়স হয়েছে। ওরা এসে বললো, লঞ্চগুলো যখন ফিরে এলো, রাত্রের অন্ধকারে ডেড বডিগুলোকে নিয়ে গিয়ে Bay of Bengal এ ফেলে দিয়ে এসেছিল, লঞ্চের নামটা মনে নেই তবে সারেঙ্গের নাম ছিল ইউনুস, ও এসে বলেছিল, সব সারেঙ্গ এসে ইউনিয়নে রিপোর্ট করেছিল, কে কি করে এসেছে। আর একটা ড্রাইভার ছিল ও খুব উৎসাহ নিয়ে নৌকোগুলো ভেঙ্গে ছিল। হাসনাবাদের সি.আই ওকে প্রলোভন দিয়েছিল তুমি এইগুলো করো তোমাকে পুলিশে চাকরি দেব, তুমি প্রাইভেট লঞ্চে আছো, তোমাকে পুলিশ লঞ্চে চাকরি দেবো, পুলিশ লঞ্চে তো চাকরি পায়নি। ও এখন বোধহয় বম্বে আছে।

প্র : নৌকাগুলো যে ভেঙেছিল, সেই লঞ্চটার নাম আর সারেঙ্গের নাম বলুন।

প্র হা : সেই ড্রাইভারটার নাম ছিল সুনীল দাস, কোন লঞ্চে ছিল নামটা অমার মনে নেই, ওই সুনীল দাসই সবথেকে বেশী নৌকা ভেঙে ছিল। সি.আই গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ওর লঞ্চে ছিল। উনি বলেছিলেন, 'এগুলি ভাঙো, এখান থেকে যাওয়ার পরে তোমাকে পুলিশ লঞ্চে চাকরি দেওয়া হবে।' সেই প্রলোভনে ও ঐটা করেছিল,



তারপর সুনীলকে এখানে এনে আমরা একঘরে করি। লঞ্চগুলি ভর্তি হয়ে এলো। ওরা এসে বললো পুলিশ ঘরবাড়ি পোড়াতে রাজী হয় নি, CPM-রা নানা জায়গা থেকে ক্যাডার এনে ঘর বাড়ী পুড়িয়ে ছিল, তখনই আমারও প্রশ্ন ছিল, আমি আনন্দবাজার-এ কয়েকটা চিঠিও লিখেছিলাম। আমার প্রশ্ন ছিল, আমি এটা অন্য চোখে দেখেছিলাম, আমি লিখে ছিলাম, 'এরা যদি নমশূদ্র, পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়, রাজবংশী সিডিউল কাষ্ট না হয়ে যদি এরা কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য হতো, জ্যোতিবাবু এদের উপর এই অত্যাচারটাকে করতে পারতেন কিনা?' প্রশ্নটা আমার তখন ছিল, পরবর্তীতে আমার লেখা বেরিয়ে ছিল। তখন সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কে কোথায় চলে গেল। একটা হাসির কথা, আমি যখন ওখান থেকে আসি তখন বলেছিলাম যে মরিচঝাঁপিতে একটা খোঁড়া পাঠিয়ে দেবো। ওদের অফিস ছিল, অফিসে ফাইল ছিল খুব ভালো system ছিল, সবাই মানার থেকে অফিস থেকে এসেছিলতো! মানা ক্যাম্প থেকে। আমি বলেছিলাম যে এবার একটা খোঁড়া পাঠিয়ে দেবো, তো বললেন কেন, সতীশবাবু কানা, রঞ্জলাল গোলদার কুঁজো, তো আমি একটা খোঁড়া পাঠিয়ে দেবো, আপনারা, কানা, খোঁড়া কুঁজো তখন এক হতে পারবেন। তার ৭ দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে অপারেশনটা হয়ে গেল, বইগুলো পাঠালাম, কাজে লাগালো না, ওরা ওখানে ভারী সুন্দর করেছিল। মাছের ভেড়ি ছিলো, একটা নৌকো তৈরির কারখানা করেছিল, একটা পাড়া ছিলো কুমোর-পাড়া। ওরা মাটির হাঁড়ি, কলসি নৌকোয় করে সুন্দরবনে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতো ওর বদলে ধান নিয়ে আসতো, বিড়ির কারখানা করেছিলো, ওদের ওই 'মরিচঝাঁপি বিড়ি' সুন্দর বনে খুব নাম করেছিল, সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে করে ছিল ওরা, স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। পাঁউরুটির কারখানাও

করেছিল। ইন্ডাস্ট্রি করে ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ঐটুকু জায়গা গেলে কিছু আসতো যেতো না, তারপর জ্যোতিবাবুরা বললেন সব নারকেল চারা খেয়ে যাচ্ছে ওরা, রেনু চক্রবর্তী যে নারকেল বাগান করে দিয়ে এসেছিলেন, একটা গাছও খায়নি, ১৩ দিন ধরে ব্যারিকেড করে রেখেছিল বাইরে থেকে কোন খাবার যেতে পারছিল না, জল যেতে পারছিল না, তখনই ওরা নারকেলের মাথি, মাথাগুলো তুলে খায়। কোন কিছুতেই হাত দেয় নি, উল্লেখ যোগ্য এমন কিছু মনে নেই, অনেকদিন হয়ে গেল, এখন স্মৃতি শক্তিও অনেক কমে গেছে, সবচেয়ে বেশি ভুল হয় নাম, বইয়ের নাম, ওষুধের নাম, এই সব। তখনকার কোন documents আমি রাখিনি, আমার একটা পত্রিকা ছিল, 'জলপথ'। সেই জলপথে ছাপতাম, সেই জলপথের ফাইল আর নেই, বিরাট বান্ডিল ছিল, এই বাড়ীতে উই ধরে গেল, সব ফেলে দিয়েছিলাম, তার একটা কপিও নেই, ৫০ বছরের জলপথ ছিল, পত্রিকা চলেছিল, মাসিক, তার একটা কপিও আর নেই।

প্র : ঐ ইউনুস যে ডেডবডিগুলো এনে রাখতো সেটা হচ্ছে মরিচঝাঁপির শেষের দিকে, রস মল্লিক তার বইতে বলেছেন মরিচঝাঁপির দক্ষিণে তো কোন লোক ছিল না, তাই কত ডেড বডি ফেলেছে?

প্র হা : ও তো আর গুনতে পারেনি, সারেঙ্গছিল, বলেছিল অনেক ডেডবডি রাত্রে নিয়ে গিয়ে একেবারে Bay of Bengal-র মাঝখানে ফেলে দিয়ে এসেছিলে। ওরা মরে ছিল গুলিতে, পুলিশের গুলিতে। তবে পুলিশ একটা কাজ করেছিল ঘরে আগুন দিতে রাজী হয়নি, ওটা পার্টি ক্যাডার নিয়ে করেছিল। কুমিরমারির ছেলে, পাশের যোগেশগঞ্জ থেকে গিয়েছিল।

প্র : কুমিরমারির কাকেও মনে আছে?

প্র হা : মুস্কিল হচ্ছে আমার সমসাময়িক কেউ আর বেঁচে নেই, আমি অসুস্থ হবার পর খবর দেব বলে অনেকের খোঁজ করে দেখেছি অনেকেই মারা গেছে, আমার সহকর্মীরা সারেঙ্গ ড্রাইভার, অর্ধেক মারা গেছে, অর্ধেক আছে কেউ মাদ্রাজে, বম্বে, কেউ গোয়ায়, চলে গেছে এখানে লঞ্চের লাইন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে হাসনাবাদের হরেন আচার্য ও বেঁচে আছে, আসামে ছিল বাড়ী এসেছে, ও যদি বাড়ীতে থেকে থাকে, ওকে পেলে, লঞ্চের সমস্ত ঘটনাগুলো ওর কাছে জানা যাবে ও অপারেশনে ছিল।

সাক্ষাৎকার : ৩১ ডিসেম্বর ২০০৬



প্রচার করা হয়েছিল 'উদ্বাস্তুদের বুঝিয়ে দণ্ডকারণ্য ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তারা স্ব-ইচ্ছায় মরিচঝাঁপি ত্যাগ করেছেন।' সূর্যকান্ত বাইনের অভিজ্ঞতা কী বলে ? তিনি নেতা ছিলেন না, অত্যন্ত সাধারণ উদ্বাস্তু কৃষক।

আমরা যাব কোহানে ?

সূর্যকান্ত বাইন

প্রশ্ন : আপনার নাম ?

সূর্যকান্ত বাইন : সূযর্কান্ত বাইন।

প্র : এই গ্রামটার নাম কি ?

সূ বা : এম.পি.ভি উনত্রিশ নাম্বার।

প্র : বাংলাদেশের কোথায় ছিলো আপনার বাড়ী ?

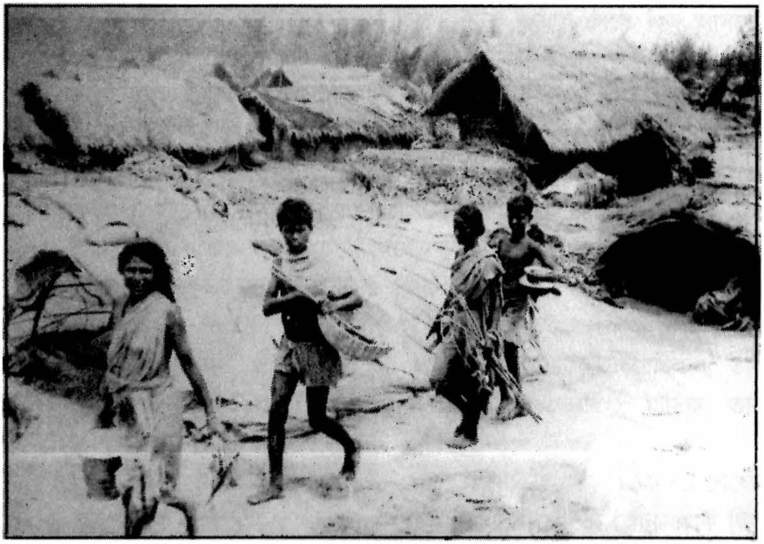
সূ বা : বাংলাদেশের আরশুনি থানা, তালবেড়ে গ্রাম।

প্র : তারপর কোথায় আসেন ?

সূ বা : হাসানাবাদে আসলাম।

প্র : সরাসরিই কি হাসনাবাদে আসেন ?

সূ বা : হাসানাবাদে ক্যাম্পে এসে, নিয়ে গিয়েছিল আমাদের দুইজুড় ক্যাম্পে, বিহারে। বিহারের থেকে আসলাম মানাভাটা, মানাভাটার থেকে direct এইখানে নিয়ে আসলো এই ক্যাম্পে ছিলাম। ২৯ নম্বর এই ক্যাম্পেই ছিলাম। এখান থেকে



সুন্দরবনে গিয়েছিলাম। সুন্দরবনের থেকে ঐ তাড়াহুড়োর সময় চলে আসি এখানে। এখানে এসে তারপর পুনর্বাসন পাই।

প্র : কতদিন ছিলেন সুন্দরবনে?

সূ বা : সুন্দরবনে Last পর্যন্ত ছিলাম।

প্র : আপনার অভিজ্ঞতা কি ওখানকার? কেন চলে আসলেন?

সূ বা : ঐ লঞ্চে মারধোর করলো তাড়াহুড়ো দিলো।

প্র : কিভাবে কি মারধোর করেছিল, একটু ব্যাখ্যা করুন।

সূ বা : ঐ আমরা মানে নারকেল বাগানে ছিলাম। নারকেল বাগান থেকে তাড়াহুড়ো করলো মারধোর করলো।

প্র : কারা মারধোর করলো?

সূ বা : পুলিশে।

প্র : কিভাবে মারধোর করলো?

সূ বা : পুলিশি তো মানে লঞ্চে উঠোই দিইছে, উঠোই দিয়ে তারপরে কেউ কেউ থানা, হাজাতে ছিলো, আমি আর হাজতে ছিলাম না, আমি ওখান থেকে ডাইরেক্ট হাসনাবাদে এসে গাড়িতে উঠে চলে আসি, মালকানগিরিতে।

প্র : ওখানে কি কেউ সাহায্য করেছে না খাটাখাটনি করে খেতেন?

সূ বা : না, আমরা নিজেরাই খেটেখুঁটে খেতাম, আমরা, ওখানে, কেউ আমাদের সাহায্য করে নাই। আমরা ওখানে আটা ঘোটা খেয়ে আমরা বেঁচে ছিলাম,

তারপর ঐ জলশাকটাক খেয়ে বেঁচেছিলাম। তারপর দেখলাম আর হল না, তারপর আমরা কুমিরমারি থেকে কাজ করতে আসতাম Town-এ কাজ করতে এসে ১৫ দিন ১৬ দিন পরে আবার যেতাম।

প্র : কাজেতে কত পয়সা পেতেন ?

সূ বা : কাজেতে তো তখন কম ছিল, ৭ টাকা রুজি ছিল তখন।

প্র : কি কাজ করতে হতো ?

সূ বা : ওখানে মাঠে মানে, ঘাস-বাছতি হতো, মাটি কাটতে হতো।

প্র : আপনার পরিবারে কত জন ছিল ?

সূ বা : আমরা দুইজন, আমি, আমার স্ত্রী।

প্র : ওখানে জলটল...

সূ বা : জল, ওই নোনাজল, কুমিরমারির থেকে নিয়ে আসতে হত। বয়ে বয়ে নিয়ে আসতি হতো।

প্র : জলটল আনতে কেউ বাধা দিতো ?

সূ বা : খেয়া পার হতে হতো, খেয়া পার হই কুমিরমারি যেতে হতো, কুমিরমারি থে জল আনি রান্না করতে হতো, খাতি হতো।

প্র : চলে আসলেন কেন ?

সূ বা : ঐ তো পুলিশের তাড়াহুড়োয় চলি আসলাম। মারধোর খেয়ে চলি আসলাম।

প্র : পুলিশ মারতো কি বলে, আপনাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য ?

সূ বা : আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য তো।

সাক্ষাৎকার : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯



মরণের ভয় মানে, মালপত্র ! তখন বৌ ছেলি-মেয়ে নিয়ে আসা মুশকিল। আমার মা ছিল বুড়ো মানুষ, সাতজন মানুষ ছিলাম, মাকে বাঁচাবো, না ছেলি-মেয়েকে বাঁচাবো, এই করি আমরা উঠি আসলাম।

আমরা লঞ্চে উঠব না

নারায়ণ মণ্ডল

প্রশ্ন : আপনার নাম ?

নারায়ণ মণ্ডল : নারায়ণ মণ্ডল।

প্র : আপনি এখানে কোথায় আছেন ?

না ম : আমরা মালকানগিরির ১১৬ ক্যাম্পে ছিলাম, ১১৬ ক্যাম্প থেকে এখানে বসতি পাই এম. পি. ভি উনত্রিশ নম্বর। এই গ্রামে আমরা ছিলাম ৭৩ ফ্যামিলি। ৭৩ ফ্যামিলির থেকে ১৩ ফ্যামিলি এই গ্রামে ছিল, বাকি সবাই চলে গেছিলাম। সেখানে যেয়ে ট্রেনে যাবার সময় ওখানে টি.টি.তি মাইরধোর করি অনেক মালাটাল নামাই দিল লাথি দিলো। তারপর... (খিস্তি দিয়ে বললে) ছেলেরা যেখানে যাচ্ছিস যা, এখানে আর আসবিনা। সুন্দরবনে যাচ্ছিস যা, এখানে কেন, যাচ্ছি যখন দূরে হয়ে বেরো। এই করি গেলাম। যেইয়ে ফাঁকা মাঠে ৩ দিন থাকার পরে, ঐ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে কার্ড দিলো, ১ কিলো চাল ১ কিলো আটা ৭ দিনের জন্য। ও দিলে আমাদের পেট চলে না। আমরা গেলাম সুন্দরবনে। সতীশ মণ্ডল ছিলো আমাদের নেতা, তারপরে রাইহরণ বাড়ৈ, রঙ্গলাল গোলদার কালিমেলার শিবু গোলদারও

ছিলো। তারপরে কুমিরমারি গিয়ে থাক্লাম কয়েকদিন। তারপর গেলাম সেই 'Plantation'-এ সুন্দরবনে। ওখানে যাইয়ে, বাসাটাসা বেঁধে... তারপর জলের তো খুব অভাব। জল তো মানে পাওয়াই যায় না, মেটে কলস নি যাতাম জল আনতি। একটা নি গেলি সেটা ভাঙি যেতো। এভাবে জল আনি খাতাম। তারপরে কালিমেলার শিবু গোলদার কইলো, 'তোমরা এক কাজ কর, বইসে থেকো না, তোমরা মেল বাঁধো।' জমির মেল বাঁধলাম নদীর সাইড দিয়ে নোনা জল। মেল বাঁধলাম। প্রায় ৫ হাত চওড়া তলায় উপরে যা হয়। তারপরে আমরা এইভাবে ২ রসি বাঁধলাম। বললো কি, 'তোমরা পয়সা পাবা।' আমরা বললাম, 'পয়সা কেডা দিবে?' 'না, সরকার থেকে দেবে।' তা আমরা পয়সা পালাম না। ঐ ১ কিলো চাল ১ কিলো আটা পাতাম। ফি হপ্তায় ১ দিন। এইভাবে আমরা চাল আটা পাতাম, তাই খাতাম। Last-এ কি হলো, পুলিশ মাঝে মাঝে আসি দেখ্যা যায় যে, এরা কী করে! পুলিশে দেখে টেখে যায় কিছু বলে না। লঞ্চে আসি ঘুরে ঘুরে চলে যায় তারপরে আমরা বললাম, 'ভাব তো দেখি ভালো না।' একদিন এমন হইলো ৪/৫ খান লঞ্চ আসলো, কি তারো বেশী। টিয়ার গ্যাস, বন্দুক লাঠি আনলো। আসি বললো, 'তোমরা লঞ্চে ওঠো।' আমরা বললাম, 'না, আমরা লঞ্চে ওঠবো না, লঞ্চে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবা?' না, 'তোমাদের হাজতে নিয়ে যাবো।' আমরা বললাম, 'আমাদের অপরাধ?' না, 'তোমরা সুন্দরবনে কার কথা মতো আইছো?' আমরা বললাম, 'আমাদের নেতা সতীশ মণ্ডল ছিল। রাম চ্যাটার্জীও ছিল। সুন্দরবনে মিটিংও করেছি আমরা সেই জংগলের ভিতর যাইয়ে। তারপরে,' 'না, এখানে তোমাদের থাকার জায়গা নেই।' এটা সরকারী জায়গা। Plantation-এ নারকেল গাছ সব তোমরা নষ্ট করি দেবা।' আমরা আসবো না মন করি ছিলাম। কিন্তু যখন পুলিশে গুলিগোলা করলো, তখন মালপত্র নিয়ে।

প্র : আপনাদের গুলিগোলার কথা মনে আছে?

না ম : হাঁ, আমরা ছিলাম না ঐ ক্ষেত্রে!

প্র : যখন চারি দিক দিয়ে অবরোধ করলো...

না ম : তখন যদু পালং ছিলো, ঐ সিদ্ধ করে করে, খাওয়া তো যায় না, নাইরকেলের যেগুলি গজ, মাথি, ওগুলোও খাইছি কয়দিন। তখন একদম খাবার তো ছিল না!

প্র : যাদের গুলি করে মেরেছিল আপনার পরিচিত কেউ ছিলো।

না ম : আমার পরিচিত ছিল না কেউ। বহু জায়গার লোক তো আমরা চিনতি পারবো না।

প্র : ওখান থেকে যে আপনারা চলে আসলেন, তার কারণটা কি?

না ম : কারণ, 'সুন্দরবনে তোমরা কেন আইসলেন, তোমাদের কে অধিকার

দেছে।' সুন্দরবনে আমরা কাটকুটো কাটি খাতাম। তা বলে, 'তোমরা কেন কাঠ কাটি নষ্ট করতিছো, এখানে থাকতি পারবানা, তোমরা এখান থিকে বেরিয়ে যাও।' 'স্যার! আমরা তো ওখানে আছি অনেক দিন, দুই মাস টাস খানিক তো থাকলাম, আমরা যাবো' কোহানে। এখানে আমরা থাকি ঘরটর বাঁধি, বসতি নেবো? তখন বললো, 'না এখানে হবে নি। সরকারী জায়গা, তোমাদের উঠতি হবে।' জবরদস্তি আমাদের উঠি আনলো, মালপত্র সব ছিনিয়ে ফিনিয়ে নিয়ে গেলো বাধ্য হয়ে আমরা...

প্র : কি মাল ছিলো, আপনাদের?

না ম : দুটো টেরাঙ্ক (ট্রাঙ্ক) ছিলো, দুটো বস্তা ছিলো, ঘটিবাটি থালা সব।

প্র : এগুলি কারা নিলো?

না ম : নেইনি কেউ এগুলো ফেলি আসতি হয়েছে সব। মরনের ভয় মানে, মালপত্র! তখন বৌ ছেলি-মেয়ে নিয়ে আসা মুশকিল। আমার মা ছিলো বুড়ো মানুষ, সাতজন মানুষ ছিলাম। মাকে বাঁচাবো, না, ছেলি-মেয়েকে বাঁচাবো, এই করে আমরা উঠি চলি আসলাম।

প্র : তখনকার পুলিশের কোন ঘটনা মনে আছে? দুই একটা বলেন তো।

না ম : ভালো মনে আছে। পুলিশে কী করে, পুলিশে ফাষ্টে আইসে ঘুরি ঘুরি দেখছে, পুরো ঘুরছে, ঘুরিটুরি কাউরে কিছু কয় না। লঞ্চ আসি গেল, বলে, 'লঞ্চে ওঠো।' আমরা বললাম, 'কে? কেনো ওঠবো?' বলে, 'না, এখানে তোমাদের থাকা হবে না লঞ্চে আমরা উঠাবো।' আমরা নিজির ইচ্ছায় আসছি। বললো, 'তোরা যেখানে যেখানে ছিলি, সেখানে সেখানে যাতি হবে।' না, স্যার আমরা এখান থেকে যাবো না। না, 'এটা সরকারী জায়গা। এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।' ঘর-টালি ভাঙি দিলো, পুলিশে ভাংগিছিলো, সব পুলিশ ছিলো, ওদের একটা করি লাঠি আর বন্দুক।

সাক্ষাৎকার : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯



দীনবন্ধু মণ্ডল— তিনি দীনের বন্ধু ছিলেন না, ছিলেন পুলিশের ভাড়া করা গুণ্ডা। টাকার বিনিময়ে মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের ঘর ভেঙে ছিলেন।

আমরা সব তাড়িয়ে দিলাম

দীনবন্ধু মণ্ডল

প্রশ্ন : এই গ্রামটার নাম?

দীনবন্ধু : কুমিরমারি।

প্র : আপনি কতদিন ধরে আছেন এখানে?

দীনবন্ধু : জন্ম থেকে। আমার আটান্ন বছর বয়েস।

প্র : এখানে বাঘ আসে?

দী : আগে আসতো এখন আসেনা। চারিদিকে নদী আছে। তাই বাঘ এখানে আসতে পারে না।

প্র : ওপারের দ্বীপটার নাম কি?

দী : ওপারের দ্বীপটাকে মরিচঝাঁপি বলে। ওপাশেরটা ঝিলা। এই নদীটির নাম করানখালি।

প্র : মরিচঝাঁপিতে লোকজন আছে?

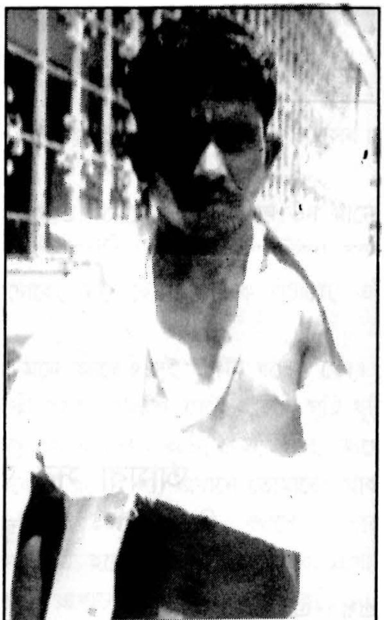
দী : হ্যাঁ, ওখানে অফিস আছে। ফরেস্টের লোক আছে।

প্র : জনবসতি আছে?

দী : না, জনবসতি নেই। বাংলাদেশের শরণার্থী ছিল, আমরা সব তাড়িয়ে দিলাম।

প্র : শরণার্থী ছিল ? আপনারা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ?

দী : শরণার্থী ছিল। আমরা তাড়িয়ে দিলাম। তারপর উপর থেকে পুলিশ-টুলিশ আসলো। আমাদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করলো। তাই তাড়িয়ে দিলাম। আমাদের বাঁচতে হবে তো ?



মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ও ভাড়াটে গুণ্ডার হামলায় আহত উদ্বাস্তু নিরাপদ আশ্রয়ে

প্র : আপনাদের উপর কি রকম অত্যাচার কোরতো ?

দী : লুটতারাজ করতো। সিদ্ কাটতো ডাকাতি কোরতো উৎপাত করতো। তারপর আমাদের এখানে মালামালের দাম চড়ে উঠতে লাগল। আমরা তখনতো বাঁচবো ! কিভাবে আমরা বাঁচবো।

প্র : আপনি কিভাবে তাড়িয়ে ছিলেন, মানে আপনারা ?

দী : আমরা জনসাধারণ সবাই গিয়েছিলাম। এই ভাবে আমাদের ক্ষতি হচ্ছেতো- কিভাবে আমরা বাঁচবো। আমরা মানে আমাদের টাকা দিয়ে নিয়ে যেত।

প্র : কে পুলিশরা ?

দী : হ্যাঁ, পুলিশরা। গ্রামের লোকজন নিয়ে যেত।

প্র : আপনাদের নিয়ে গিয়ে কি করতো ? কি করতেন আপনারা ?

দী : চাল-চুলো, দু চালা ঘর ছিলতো ! সে গুলো ভেঙ্গে যা ছিল লঞ্চে তুলে দিতাম। বলতাম যাও, তোমরা দণ্ডকারণ্যে ফিয়ে যাও।

প্র : তাদের কি সব দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গেছে ?

দী : হ্যাঁ, দণ্ডকারণ্যে নিয়ে গেছে।

প্র : একটু আগে একজন বলছিলেন, অনেককে নাকি গুলি করে মারা হয়েছে।

দী : গুলি করে ? না গুলি হয় নি। আমরাতো এখানকার বাসিন্দা। আমরাতো তেমন কোন খবর পাইনি।

দী স্ত্রী : হাটের দিকে কিছু লোক আসছিল তখন পুলিশ গুলি চালিয়েছিল-

একটা মেয়েছেলে মারা গিয়েছিল। শরণার্থীর উপর গুলি চালিয়েছিল। তখন আমাদের পাড়ার লোকের গুলি লাগে।

প্র : পুলিশরা শরণার্থীদের উপর গুলি চালিয়েছিল? তাহলে তো বেশ কিছু মানুষ মারাও গিয়েছিল?

দী : হুঁ। কিছু কিছু গিয়েছে আর-কি।

প্র : কতো লোক ওখানে ছিল?

দী : সঠিক বলতে পারবো না।

প্র : না, আপনারা ভাঙ্গতে গিয়েছিলেনতো?

দী : বহু লোকজন গিয়েছিল। এই গ্রামের বাইরের লোকজন ছিল- বহু জায়গার লোক ছিল। ওদের তুলে দেওয়ার কাজে ছিলাম।

প্র : কিছুক্ষণ আগে কুমিরমারির কিছু মানুষ বলছিলেন- কুমিরমারির মানুষজনের সাথে শরণার্থীদের ভালো সম্পর্ক ছিল। আপনাদের এখানে চুরি ডাকাতি করতো। কুমিরমারিতেই অন্য লোকের সাথে মেলামেশা বন্ধুত্ব হোল কি করে?

দী : ওধারটা নিকটে হয়, যাতায়াত ছিল। এ ধারটা দূরে হয় সেই জন্যে।

দী স্ত্রী : সবাইতো এক সমান না, ভালোমন্দ ছিল।

সাক্ষাৎকার : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬



দীনবন্ধু মণ্ডল-এর সহযোগী ভবসিন্ধু মণ্ডল। কপালে তিলক কাটেন নিয়মিত, গলায় কণ্ঠী, পরম ধার্মিক বৈষ্ণব। ভবসিন্ধুও ঘর ভেঙেছিল উদ্বাস্তুদের।

ওদের তো ছেড়ে দেওয়া যায় না

ভবসিন্ধু মণ্ডল

মরিচঝাঁপিতে ৮০ হেক্টর জমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে জঙ্গল সাফ করে নারকেল গাছ, ঝাউগাছ, ইউক্যালিপটাস গাছ লাগিয়েছিল। ভিতরে সাত মিটার চওড়া রাস্তা ছিল। এ সব শরণার্থীরা নষ্ট করে দিচ্ছিল।

এরা তো কোন অনুমতি নিয়ে আসেনি। ওদেরতো ছেড়ে দেওয়া যায় না। ওরা বললো আমাদের ৪০ হাজার লোক আছে। আমরা বসবাস করবো। ওরা জঙ্গল পরিষ্কার করে। বাজার ঘাট করলো। অনেক কিছু করেছিল। প্রথম টিউবওয়েল বসালো। প্রায় ২০/২৫ টা টিউবওয়েল বসিয়েছিল। এরপর পরস্পর বাজার টাজার যেমন আমাদের গ্রামে আছে সেরকম তৈরী করলো। কাঠ কাটতো। মাছ ধরে আয় করতো। ওরা জঙ্গল তছনছ করে বহু ক্ষতি করতো ওরা। সে জন্য সরকার জানালো সুন্দরবন নষ্ট করে দিচ্ছে ওরা। বহু পুলিশ এসেছিল, আমাদের কিছু সহযোগিতা পুলিশকে করতে হয়েছে। আমাদের মজদুরী দিয়েছে, আমরা গিয়েছি সেখানে। পুলিশ বললো, 'তোমরা যদি সহযোগিতা করো ওরা এখানে থাকতে পারবে না।' অস্ত্র যন্ত্রপাতি ওদের। আমরা যেতাম ওদের সাথে। ওরা বললো, 'আমরা সঙ্গে

থাকছি ঘর দরজা গুলো ভেঙ্গে দাও তোমাদের মজুরী দেব।' তাই আমরা যেতাম। আমাদের কোন পরিকল্পনা ছিল না। ওদের পরিকল্পনা মাফিক আমরা কাজকর্ম করতাম।

সাক্ষাৎকার : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬





কুমিরমারির বাসিন্দা বীরেন্দ্রনাথ মৃধা। নেতৃত্ব থেকে সাধারণ উদ্বাস্তু সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার। কেমন ছিল তার যোগাযোগ, কী দেখেছিলেন তিনি— অকপটে তার কাহিনি শুনিয়েছেন।

আমার দেখা মরিচঝাঁপি

বীরেন্দ্রনাথ মৃধা

প্রশ্ন : আপনার নাম, আপনি এখানে কতদিন আছেন?

বীরেন্দ্রনাথ মৃধা : বীরেন্দ্রনাথ মৃধা, বাংলা ১৩৮৮ ওপার থেকে এপারে এসেছি। ওপারে ছিলাম শ্যামনগর থানা, মালিখালি গ্রাম।

প্র : ওপার থেকে এপারে এলেন কেন?

বী ম : রাজনৈতিক কারণে, বিনিময়ের কারণে, তখন আমার বয়স ছিল ১০/১১, ক্লাশ ফাইভে পড়তাম, এখানে এসে স্কুলে ভর্তি হলাম। এইটে পাশ করলাম। গৌরাঙ্গ ফণীন্দ্র বিদ্যামন্দির থেকে মাধ্যমিক পাশ করলাম, ম্যাট্রিকও '৬২তে। কস্ট এ্যাকাউন্ট নিয়ে ভর্তি হলাম গৌরডাঙাতে। প্রি-ইউনিভার্সিটি-তে ব্যাক পেলাম এ্যাকান্টটেন্সি-তে। তখন একটা হতাশায় পড়লাম। ইস্কুলটা করতে লাগলাম মায়াবানিতে, হেড পোস্টে কিছুদিন কাজ করবার পরে, কিছুদিন পূর্বে আমি প্রিলিমিনারি পাশ করলাম। বি কম-এ ভর্তি হয়ে পার্ট ওয়ান-এ ফেল করলাম। আর পড়াশুনা ঘটে নি। না ঘটায় ফরেস্টারে ১৯৭২ কাজ করলাম। আমাকে ছাঁটাই করল, বলল তোমাকে পরে ডাকব, আর ডাকেনি। তারপর আমি ধানের ব্যবসা

করতাম, তারপর বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা আসে '৭৮ সালের এপ্রিলের ৮/১০ তারিখে। কুমিরমারি হাটটা দিয়ে। আমাদের জিজ্ঞাসা করেনি। আমি বাজার থেকে আসছি, রাইহরণ বাড়ৈ, সতীশ মণ্ডল, রঙ্গলাল গোলদার কয়েকজন নেতা ঐ ধারে বসে মিটিং করছিল। রাইহরণ বাড়ৈ তখন বক্তৃতা দিইছিল। তা উনি বললেন, 'এখানে কেউ আছেন আমাদের সহযোগিতা করার ?' তখন মানিকগঞ্জ হাটে যাবার অনেক লোকজন ছিল। আমরা বললাম, 'তা আমরা কিভাবে সহযোগিতা করব ?' ওনারা বললেন, 'আপনারা কিভাবে সহযোগিতা করবেন ?' আমরা বললাম, 'আমরা কিভাবে করব, আপনারা যেইভাবে বলবেন।' ওনারা বললেন, 'আমরা একটু ওপারে পার হব, আপনাদের অনুমতি চাই।' বৈশাখের ৭ তারিখে দলবল নিয়ে ঢুইকে পড়ল। নৌকা পাবলিকের কাছে চেয়ে নিল, ওখানকার লোকালিটি লোকের থে পার হয়ে একটা 'বনবিবির থান' তৈরি করল সেখানে। খুব কান্নাকাটি করল। কান্নাকাটি করার পর ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়ার পরদিনের পরদিন, একজন দুইজন করতে করতে বেশ লোক জুটে গেল। অন্তত প্রায় ১০,০০০/২০,০০০ লোক জুটে গেল। ওখানে ঢুকে বিভিন্ন কারখানা আরম্ভ করল। রুটির কারখানা, সরষের তেলের ফ্যাক্টরি, গেঞ্জির ফ্যাক্টরি, বিড়ি তৈরি করা, গেঞ্জির মেশিন দিয়ে ওরা গেঞ্জি তৈরি করতে আরম্ভ করল। বাজার সিস্টেম করল, স্কুল করল, নাটক নভেল করতে আরম্ভ করল। এবং বাইরের কিছু রিপোর্টার, আনন্দবাজার কিছু কাগজের সাংবাদিক ওরা আসল। আমাদের ছেলেদের কাছে জলটল নেয়, সাহায্য চায়। আমরা বললাম, 'ঠিক আছে।' এইরকম প্রচণ্ড গরম পইরেছে, পুকুরের জল একবারে শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে যাবার পরে, ওরা ওপারে টিউবল (টিউবওয়েল) বসাল। বাজার হাট বসল। ওদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম করে। চাল ধান আমাদের থেকে নেয় না বটে, অন্য জায়গার থে নিয়ে আসে, কোন কায়দায় নিয়ে আসে। এরপর ধরুন, ওরা ৬ মাস ৭ মাস হবে। প্রথমে জল নিতে আইসতো পরে স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দেয় ওখানে টিউবওয়েল হবার পর।

প্র : এবার বলুন আপনি মরিচঝাঁপি নিজে গেছেন ? গিয়ে কি দেখেছেন ?

বী ম : আমি গিয়ে দেখতাম ওখানে লোকজনের মিটিং হত। কোথায় থেকে কি করবে না করবে। সব কিছু তো আমরা জানতাম না। হুট করে যেতাম ২/৪ দিন অন্তর। আমার সঙ্গে পরিচয় ছিল রাইহরণ বাড়ৈ, সতীশ মণ্ডল, মেঘনাদ শীল, অরবিন্দ মিস্ত্রী, নির্মল দে। নির্মল দে আমার বাড়িতে বেশ কিছুদিন ছিল, প্রায় মাস তিনেক। একটা ঢেকির ঘরে থাকত। বেশ একবছর চলে গেল, রাইহরণ বাড়ৈ থাকত আমার বাড়িতে। আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা হত না, ওদের কথা আমাদের কিছু বইলতো না। আমি মনে করেন যেতাম আসতাম এই পর্যন্ত। কিন্তু চাল ধানটা আমাদের কাছ থে নিত না আর কি ওরা বাইরের থে যোগাযোগ করত।

এবং মাঝে মাঝে এপারের লোক ওপারে বাজার করতেও যেত এবং আমাদের এখানে চাল যখন ৩ টাকার বাজার ওখানে আড়াই ২ টাকায় বাজারে পাওয়া যেত। যদি সরষের তেল এখানে ৮ টাকায় হত ওখানে ৫/৬ টাকায় পাওয়া যেত। মাছ ওখানে হেভি সস্তায় পাওয়া যেত। এই করে বাজার করল, একটা ছোট বাজার করলো, একটা বড় বাজার করল। বড় বাজারটা করল কোরানখালির মাজায়। ছোট বাজারটা করল, দক্ষিণ দিকে ওটার নাম ঠিক বলতি পারব না। ঘর ছিল, ঝুপড়ি দোচালা ঘর। ওদের মধ্যে মিটিং হত আর ওদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপার ছিল এই ওদের মধ্যে ফ্রি চাল-ডাল রেশনের ব্যবস্থা ছিল। তারপর ধরুন এরা বিভিন্ন বাজার হাট কইরলো। ওদের দিন দিন যাওয়া আসা কোনো অসুবিধা হয় না। রাইহরণ বাড়ে এদের সঙ্গে গল্প হত, আমরা এখানে থাকছি। এখানে আমরা ছোট্ট একটা নগর করব এবং কোলকাতার সঙ্গে বেশ আমরা যোগাযোগ করব। এবং যানবাহনের বেশ একটা সুযোগ সুবিধা করব, ইস্কুল-পাঠশালা-কলেজ করব এবং বিভিন্ন কলকারখানা এখানে করব। উন্নতিমূলক করব। যখন ওদের মিটিং হত, মাঝে মাঝে আমরা উপস্থিত থাকতাম। মিটিং-এ হত : আমরা এই যে সংস্থা করেছি, তোমাদের নিয়ে আসছি, তোমরা বাইরের জঙ্গল কাটবে না এবং ক্ষতি খানাজ করবে না। আমাদের মইধ্যে যদি থাক আমরা তোমাদের খাদ্যসংস্থান যোগাব। ওদের মধ্যে তো ভালোমন্দ লোক তো আছে তারা বাইরের জঙ্গল যেয়ে কাটকুটো কাইটে আনত। গ্রামে বেচত বিভিন্ন এলাকায়। ধরুন এখান থে নিয়ে গিয়ে কালীনগরে বেচত, আমতোলি নিয়ে বিক্রি করত এই রকম করতে আরম্ভ করল এবং যারা নেতা ছিল তারা নিষেধ করত। ওরা শুনত না। একাধিক ক্রমে ওরা এক বছর এখানে থাকে। এর মধ্যে সরকার বোধহয় ১১ কি ১৩ মাসের মাথায় জ্যোতি বসু মোল্লাখালিতে মিটিং করল। জ্যোতি বাবু বলল, 'এদের উৎখাত করতে হবে, তুলতে হবে। যদি এরা এখানে থাকে এরা এখানে গ্রামের অসুবিধা করবে।' এবং বিভিন্ন স্তোকবাক্য ছিল এবং গ্রামের কিছু লোক সহযোগিতা এদিকে ওদিকে সবদিকে করে। দোদল্যমান হয়ে থাকল কিছু কিছু লোক। এবং তারপরে পুলিশে ওদের উপর টর্চারিং করা আরম্ভ করল। ওদের খাদ্য খাদক বন্ধ করে দিল, ওদের যদি এপারে আইসতে না পারে, খাদ্য খাদক যদি না পায় তা হলে ওরা উঠি যাবে। আমাদের কথা শুনতে হবে নয়তো উঠে যেতে হবে। ওরা এমনিতেই সরল সহজ। কথা বলে ওরা শোনে না। জোরদস্তুর করে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে অ্যাকচ্যুয়ালি বন্ধ করতে চায়। এই রকম করতে করতে একদিন দেখি একটা শোরগোলের সৃষ্টি হল। ঐ মেনিমুণ্ডার বাড়ির ধারে। এখানে সরকারের একটা ক্যাম্প ছিল। পুলিশ ক্যাম্প। দুখানা লঞ্চ ছিল। সেই ভদ্রলোকটার নাম ভুলে যাচ্ছি। তিনি আমাদের সঙ্গে উঠি পরিচয়টা হল। আর ওদের পুলিশ কাঁনাই হালদার, অশোক মণ্ডল, কারো বাড়ি

মেদিনীপুর, কারো বাড়ি বারুইপুর। এরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিশেরা, 'আপনারা আমাদের সঙ্গে একটু সহযোগিতা করুন।' আমরা বলি, 'আমরা কী সহযোগিতা করব।'

প্র : কী সহযোগিতা করতে বলছিল ?

বী ম : 'সহযোগিতা মানে ওদেরকে উঠোতে চাই।' 'আমরা তা করতে পারি নাকি, আপনাদের যা সরকারি তা আপনারা করুন আমরা কী করব।'

আমাদের পয়সা দিতে চায়নি, যেটা দিতে চায়নি সেটা বলব কেন। ওরা বলে, 'আপনারা বুঝিয়ে বলুন।' হঠাৎ করে একদিন বেলার দিকে ওদের উপরে, ওরা যখন কিছু লোক এপারে চলে আসে, যখন খাদ্য বন্ধ করেছিল। বাধ্য হয়ে ওদের নিজেদের তৈরি নৌকায়, ওরা খুব উন্নত মানের নৌকা তৈরি করেছিল, এ পারে আসছিল, তখন ওদের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। ওরাও চেঙ্গা নিয়ে তেড়ে আসে। তখন পুলিশ গুলি ছুঁড়তে থাকে, তখন ওরা স্তম্ভিত হয়েছে। আগ্নেয় অস্ত্রের কাছে হারে। তখন আমাদের বাড়ির আশপাশ থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তখন মেনি মুণ্ডা মারা যায়। আমরা ভয়ের চোটে ঘরে ঢুকে পড়লাম। লক্ষ্য করলাম না কিছু। তারপর কি হল না হল বোঝা গেল না। ওদের লোকজন নিয়ে চলে গেল। মৃতদেহগুলি নিয়ে চলে গেল, কোথায় কি করল আমরা তো বলতি পারবো না।

প্রায় এক বছরপর একদিনকা রাইহরণ বাড়ৈ, রবীন চক্রবর্তী হঠাৎ করে আইসে উপস্থিত আমার বাড়িতে। আমার সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল। রবীন চক্রবর্তী আমারই মতো দেইখতে, রোগা মতো। আর রাইহরণবাবুও আমার মতন দেইখতে। খাতির বন্ধু বন্ধু কইরে ডাইকত। আমাকে বলল, 'যে বন্ধু, আমরা এখানে একটা অষ্টপ্রহর করবো।' 'কেন অষ্টপ্রহর কইরবে ? তোমরা তো চলি গেছ, অষ্টপ্রহর করবে কেন ?' বলে, 'এখানে একটা অষ্টপ্রহর করব, এখানে আমরা তো আর আইসবো না। একটা অষ্টপ্রহর কইরে চলে যাব।' ওরা স্কুলবাড়িতে মাঠে পূজার থান করে। পুলিন মণ্ডল মারা গিয়েছে, অমল মির্ধা মারা গিয়েছে। একটু সহযোগিতা করে থানাটান কইরে সকলে অষ্টপ্রহর করে। ওখানে রাইহরণ বাড়ৈ আর রবীন চক্রবর্তী পয়সাকড়ি নিয়ে আসে। বেশ কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে আসে। এবার ঐ পয়সাকড়ি নিয়ে রাখার জায়গা পায়না, আমার ওখানে রেখে গেল, না আমি রাখব না, একটা এ্যাটাচি ভর্তি, সব একশো টাকার নোট। আমি রাখব না, তোমরা নিয়ে যাও। কিছুতেই আমি রাখব না। বলে না এখানে রাখতে হবে, আমি বলি না একদম রাখব না। কোথায় কি আইন, কি বইলতি পারো।

প্র : পুলিশ যে ৩১ জানুয়ারি '৭৯ সালে গুলি চালিয়েছিল সেই দৃশ্য আপনি দেখেছিলেন ?

বী ম : সে দৃশ্য দেখেছিলাম। সে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লব, চোখে দেখার মতো

না, কাঁদানে গ্যাস ছিল। ভীষণ গুলিগোলা করে চারপাশ থেকে। উত্তর দিকে থেকে আপনি যে দক্ষিণ পাড়ায় গিইছিলেন, লোকগুলি যাচ্ছে দক্ষিণ পাড়া দিয়ে যেখানে পুলিশ ক্যাম্প করে। লোকগুলোকে গুলি করে মারে। আমাদের সামনে ২০/২৫-এর মতো লোক মারা গেছে গুলিতে। সেই লোকগুলোকে লঞ্চের মধ্যে তুলল টেনে, দেবযানী বড় লঞ্চটা, বেশি নৌকো ভাঙার কাজ করত। ধরুন নৌকো যাচ্ছে তার উপর লঞ্চ তুলি দিল। মানুষগুলো জলে হাবুডুবু করছে, এর মধ্যে মেয়েছেলে ছিল। মেয়েছেলে বাচ্চাকাচ্চা জলে ডুবি মারা গেছে। মেয়েছেলে কাপড় জড়িয়ে মারা গেছে। ওরা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য এসেছিল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে। খাইদ্যে যখন অবরোধ করেছে খাইদ্যের জন্য এপারে ছুটে এইছে, খাওয়ার তো চাই। কিন্তু ওরা আমাদের এখানে কুমিরমারির এলাকার লোক এমন কেউ বইলতে পারবে না যে ওরা খাদ্যের জন্যে গোলযোগ কইরেছে বা জবরদস্তি কইরেছে, এমন কোনো নজির নেই।

প্র : পুলিশ কতদিন ধরে এই অত্যাচারটা চালিয়েছিল ?

বী ম : তা অন্তত সপ্তা দেড়েক।

প্র : পুলিশ বলছে একজনের বেশি মারা যায় নি, সে হচ্ছে মেনি মুণ্ডা।

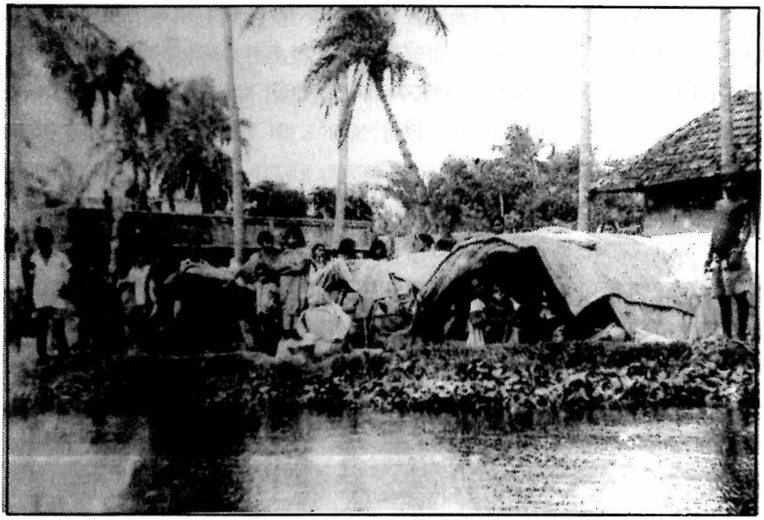
বী ম : না না, ওগুলো মিথ্যের হাড় বজ্জাত। ওগুলা ঢাইকে রেখেছে। তখন যদি কোনো সাংবাদিক রিপোর্টার থাকত, বা ক্যামেরার কিছু সিস্টেম থাকত রানিং, তবে ওগুলো তুলতে পারতো তবে বুঝতেন। ওগুলো তো গোপনভাবে হয়েছে। সরকারি আইন তো বাঁচাবেই। অন্যায়ভাবে প্রজার উপর অত্যাচার করে কখনও স্বীকার কইরবে যে এটা কইরেছি? তার কাজ সে যথারীতি করবে। আইন মোতাবিক বলে কথা।

প্র : কত নৌকো ভাঙা হয়েছে মনে হয়।

বী ম : তা ধরুন এক দেড়শো নৌকা ভেঙেছে। কিন্তু ওরা যখন পালায় আমাদের কেউ আর ধারে যেত না পুলিশের ভয়ে। চারপাশে পুলিশ লঞ্চ টহল দিত বাইরের কেউ যেন কোনো সাংবাদিক যেতে না পারে।

প্র : কাশীকান্ত মৈত্র দলবল নিয়ে গিয়েছিল।

বী ম : কাশীকান্ত মৈত্র এসেছিলেন। আর একজন আইসতো, সে একজন সন্ন্যাসী, একদিন গভীর রাত্রে এসেছিল হাল্কা করে পোষাক পরত। সে বলল, 'তোমাদের কোনো ভয়ভীতি নেই, আমরা আছি পিছনে।' এই আশ্বাসটা দিয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে বসে আলাপ হইছিল, তিনি আমাদের এখানে ঢুকেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনারা একটু সহযোগিতা করুন।' আমি বলি কী সহযোগিতা করব, আমরা ধরুন বাংলাদেশের লোক। এখানে এসেছি অল্পদিন, আর আমরা বুঝতে পারব না সরকারের কি নীতি, ওদের সাহায্য করলে কি ফ্যাসাদে পড়ে মারা



হাসনাবাদে অপেক্ষারত উদ্বাস্তুরা, মরিচঝাঁপিতে যাবার অপেক্ষায়

যাব, এটা আমরা তো... তিনি বললেন, 'হ্যাঁ মুখে।' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ' আমরা মুখে, অন্তরে যতটুকু সাহায্য সহায়তা করতে পারি করব। আমি তো প্রায় রোজ যেতাম। আমার পুকুর থেকে প্রথম জল দি। আমার ১৫ কাঠার পুকুর, জলাশয়। আমার যতটুকু সহযোগিতা করার করেছি। ওরা ছিল দারুণ পরিশ্রমী। সপ্তাহে তিনবার মিটিং করত ওরা মানুষের জন্য নানা ভাবনাচিন্তা করত। খাইদ্যটাইদ্য বিতরণ করত। চাল, আটা, দুধ, বিস্কুট দিত। নানান জায়গা থে যে সব সাহায্য আসত ওইসব বিতরণ করত। এমনকি বস্ত্রহীনদের বস্ত্র বিতরণ করত। ছেলেদের জামাপ্যান্ট দিত।

প্র : ওরা তো ওখানে নানা কারখানা তৈরি করেছিল বললেন। আপনি কি কোনো অস্ত্র কারখানা দেখেছেন ওখানে?

বী ম : না না, এই ধরনের কোনো অস্ত্র কারখানার কথা আমি দেখিনি। প্রকাশ্যে এই ধরনের কিছু আমি দেখিনি। তবে ওখানে আমি যা দেখেছি, ওদের মধ্যে খুব নিয়মশৃঙ্খলা ছিল। দুটো বাজার ছিল, জমজমাট। বড় বাজারটা যেখানে ছিল, সেখান ওরা নাটক নভেল করত, ইস্কুল ছিল। ইস্কুলের সামনে ওরা মাঠ করেছিল। সেখানে বল খেলত, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, হকি খেলত।

প্র : ভারতবর্ষে যে উদ্বাস্তু স্রোত এদেশে এল, তারা তো মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। প্রশ্ন হল বাংলার জল-মাটি-আবহাওয়ার মানুষগুলোকে পাঠানো হল বাংলার বাইরে জলহীন রুক্ষ মাটির দেশে, পাহাড় বনাঞ্চল-এর দেশে। তাঁরা আবার জন্মভূমির টানে পশ্চিমবাংলায় ছুটে এল এই ঘটনাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

বী ম : আমার তো মনে হয় এটা যুক্তিসঙ্গত ছিল। এর মধ্যে কোনো অন্যায় দেখি না। তবে এর পিছনে একটা রাজনৈতিক কারণ ছিল। এরা ঠিকই মনে কইরেছ যে যেহেতু জ্যোতি বসু আমাদের এখানে এনেছে, সেটা হল ভোটের কারণে। প্রথমে এরা জ্যোতি বসু জিন্দাবাদ করত। কিন্তু পরে যখন জ্যোতি বসু মুর্দাবাদ বলল তারপর থেকে টর্চার শুরু হল।

দেখুন আমার বয়স হইয়েছে, আজ বাদ কাল মরে যাব। কিন্তু ওদের কথা আমার মনে আছে। আমি হার্ট এন্ড সোল সহযোগিতা করেছি, কিন্তু জ্যোতি বসু এসে প্রফুল্ল মণ্ডল, প্রদীপ বিশ্বাসকে নিয়ে আলোচনা করে বলে যে, 'তোমরা এদেরকে সাহায্য দিও না।' তা সত্ত্বেও আমরা মানবিকতার কারণে গোপনে সাহায্য সহায়তা করেছি। কারণ এরা বাংলার মানুষ বাংলায় থাকতে চেয়েছে। তাদের কোনো অপরাধ ছিল না। মরিচঝাঁপিতে না হোক অন্য জায়গায় এদের পুনর্বাসন দেওয়া যেত। সেটা না করে এদের উৎখাত করে পুনরায় দণ্ডকারণ্যে ফেরত পাঠানো হল। যেভাবে এদের হত্যা করে পাঠানো হল এটা সম্পূর্ণ বেঠিক, এই মানুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করা উচিত না। বালবাচ্চা নিয়ে সবাই বাঁচতি চায়। প্রত্যেক মানুষের আশা থাকে যে আমরা অকালে প্রাণ হারাব না, এই চেষ্টা প্রত্যেকের থাকে। একটা পিপিলিকা-রও থাকে। এ্যান্টস জন কীটস এর লেখা আমরা পড়েছি, লাইপ হিস্ট্রিটা। এই ভুবনে কেউ মরতে চায় না।

প্র : কিন্তু আপনি যেমন বলেছেন মরিচঝাঁপির ঘটনার কোনো তথ্য বা ছবি কিছু আজ নেই, ফলে এত বড় একটা মানবাধিকার লংঘন, গোপনে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কি বিচার হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

বী ম : ১০০ বার বিচার হওয়া উচিত। এবং এখনও এই যে আইন তো আর পচে না। কতো মানুষ মরে যায়, কিন্তু আইন তো আর পচে না। এর বিচার হওয়ার এখনো যথেষ্ট টাইম আছে। সবার উপরে মানুষ সত্য। মানুষের মধ্যেই কেউ বিচার করতে পারে! এরাই বিচার করবে, এদেরই সংবিধান, মানুষই মানুষের বিচার করে। কিন্তু সংবিধানে মানুষের অধিকারের কথা বলা আছে, ভারতের যে কোনো প্রদেশের মানুষের যে কোনো জায়গায় থাকার অধিকার আছে। এমনকি পৃথিবীর যে কোনো জায়গার মানুষ যে কোনো জায়গায় থাকার অধিকার আছে। কিন্তু সেই মানুষগুলো যখন নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করে এখানে বাঁচার অধিকার নিয়ে এল, অন্যদিকে এদের অমানুষিকভাবে উৎখাত করা হল...

হ্যাঁ এই হত্যাকাণ্ড তো ওরাই করেছে। বামফ্রন্ট সরকারই তো দোষী, এটা তাদের করা উচিত হয় নি। তার রাজ্যে যদি প্রজা না থাকে তবে চলবে কি করে!

এরা এখানে এসে ১২ মাস থাকল, হাট, বাজার, ইস্কুল, হাসপাতাল করল,

কারখানা বানাল। তারপর তাদের উপর অত্যাচার কইরলো। আমার মনে হয় কোথাও এদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

তারপর কিছুদিন পর দেখলাম পুলিশ কী করছে, যেটা অত্যাচার হয়েছে। প্রত্যেক রাতের পর রাতে প্রত্যেক বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখেছে শরণার্থী আছে কিনা, এই ধরনের কোনো লোক আছে কিনা। অনেকে বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও গোপন করেছে। যেমন ঐ কেষ্ট মণ্ডল ছিল। ওদের বাড়িতে ৫০ ঘর লোক ছিল। ঐ যে লোকগুলারে বসানো হয়েছে। ও তখন উপ-প্রধান ছিল। ও ওদের আশ্রয় দিয়েছে। আমাদের এই প্রফুল্লবাবাজী, ইনি, ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। ঐ উপপ্রধান যখন আশ্বাস দিয়েছে ইনিও তাই বলেছে। তা না হলে উনি তো করতি পারে না। কারণ ইনি তো রাজা তো রাজার মন্ত্রী যখন বলেছে ওরাও জানতে পেরে গেছে।

আমরা দরদ দিয়ে ওদের দুঃখ কষ্ট বোঝার চেষ্টা করেছি আমরাও তো রক্তমাংসের মানুষ, আর এদের উপর যে নির্যাতন করেছে পুলিশ এসে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। মানুষের শরীর তো, মানুষের শারীরিক কষ্ট দৈহিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট দেখলে বোঝা যায় যে অত্যাচারের কথা। তাতে করে বোঝা যায় ওদের উপর টর্চারিং হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

ওনারা গল্প করতেন, রাইহরণ বাড়ৈ, সতীশ মণ্ডল যা শুনতাম যে আমরা মরিচঝাঁপি থেকে কুমিরমারি থেকে পোল করে যাতে এধারে যানবাহনের রাস্তা আমরা করব। এসবগুলো বলতেন আমরা শুনতাম, অনেকগুলো পরিকল্পনা ওরা করেছিল। এইগুলো শুনতাম মাঝে মধ্যে। আমরা বলতাম, সেই ভালো, আমরাও দেখে একটু তৃপ্তি পাব। তা হলে আমাদের ছোট্ট, ন্যাংটো বয়সের স্বপ্ন গেল। কিন্তু আমাদের ধারণা যে ওরা এত কম সময়ের মধ্যে যা করেছে, তাতে তারা এই কাজটাও করতে পারত। এটা একেবারে সঠিক। তবে আমি মাঝে মাঝে বলতাম দৃষ্টিকটু, শ্রবণকটু, হয় এইরকম কাজ তোমরা করো না। আর আমাদের গ্রামে যাতে চুরি ডাকাতি না হয়। ওরা বলত, 'এটা ঠিক কথা।' মাঝে মাঝে গ্রামে রাতে কিছু কিছু বাড়িতে হয়তো চুরিটুরি হতো।

তবে হ্যাঁ একটা জিনিস দেখলাম, দোলনায় শোয়ানো অবস্থায় অনেকের বাচ্চাকাচ্চা মরে গেছে। দেখে পালিয়ে গেছি। ঐ মরিচঝাঁপিতে এই দৃশ্য আমার চোখে দেখা। মৃত্যু শুধু গুলিতেই হয়েছে তা না, মৃত্যু না খেয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েও মরেছে। ডাইরিয়া হয়ে মারা গেছে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, সরকারের পক্ষ থেকে টাইগার প্রোজেক্টে যে নারকেল গাছ লাগাইছিল, না খেতে পেয়ে গাছ ভেঙে খেয়ে ফেলেছে। না খেতে পারলে মানুষ কি করে! নারকেলের মাথি, যদুপালং সিদ্ধ করে রান্না করে খেয়েছে। না তেল, না নুন, না ঝাল। জল দিয়ে সিদ্ধ করে খেয়েছে

আদিম যুগের মানুষের মতো অস্থায়ীভাবে জীবিকা নির্বাহ করেছে। অনেকে আবার পালিয়েও গেছে। আর যারা ধরুন এই কুমিরমারিতে কমপক্ষে ২০০ লোক বাস করছে। যখন ওদের তাড়ানো শুরু হল, এই অবসরে অনেকে পালিয়ে এসে বান্ধবতা করল, ভাই বলল, বন্ধু বলল, ধর্মভাই বলল, এখানে ওখানে বান্ধবতা করল, ভাই আমরা আর কোথায় যাব তোমার কাছেই থাকি, এই কথাটা বইলবে না। তা থেকে যাও। এইভাবে ওরা থেকে গেল।

প্র : ওদের সাথে আপনাদের এখন সম্পর্ক কি রকম ?

বী ম : হ্যাঁ, মানুষের সাথে তো মানুষের বান্ধবতা গড়ে ওঠে। এখানে অনেক বিয়ে হয়েছে, অনেক মেয়ে আদানপ্রদান করেছে। এখানে ফার্স্ট বিয়ে করে গোরা। ও একটা শরণার্থী মেয়েকে বিয়ে করল আগে। পরস্পরে বিয়ে হচ্ছে। গোরা থাকে ঘোস পাড়া বাগনা। আমাদের প্রফুল্লবাবু চেনে। লেনিন কলোনীতে কিছু আছে, মাঝিদের বাড়ির ওখানটায় আছে। কেষ্ট মণ্ডলের কথা বললাম ওখানে ২৫ ঘর লোক আছে। এপাশ ও পাশ করে আছে। ভালোমন্দ সবদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কুমিরমারি অঞ্চলে নেই এমন লোক নেই। প্রত্যেক জায়গায় শরণার্থী আছে। তারা দেখল যে ওখানে গিয়ে আমাদের বসবাসের উপযোগী না। দণ্ডকারণ্যে। আর কোথায় সরকার নিয়ে যাবে, কোথায় ফেলবে, এইজন্যে এখানে পড়ে আছে। ওরা খাটাখাটনি করে জীবিকা অর্জন করছে। ঐ যে বরিশাল, খুলনার লোক ওরা কর্মদক্ষ ওরা কেউ ধরুন হাতের শিল্পের কাজ জানে অনেকে, সেইভাবে ওরা জীবিকা নির্বাহ করেছে। ওরা ধরুন জামাকাপড় বানানো, মিস্ত্রীর কাজ করা, বিল্ডিং বানানো। এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করা, আর কেউ নেতৃত্বও করছে এখানে। আমাদের সঙ্গে পড়ে, তারাই ভালো নেতা। ওই যেখানে বসছিলাম ওর ছেলে একটা তো সি পি এম করত আগে, তার নাম হচ্ছে জগন্নাথ সরকার, এখন আবার বর্তমানে আর এস পি-র সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে। এইরকম রাজনীতির মাধ্যমে থাকে। রাজনীতি ও ভালো বোঝে। মাধ্যমিক পাশ কিন্তু। ও পাশ করেছে ১৯৮৫ তে এই কুমিরমারি থেকে।

সাক্ষাৎকার : ২৪ এপ্রিল ২০০৭



বাসুদেব মণ্ডল কুমিরমারির পঞ্চায়েত সদস্য। তার দেখা অভুক্ত শরণার্থীদের উপর কিভাবে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ, ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে।

কি দেখেছি

বাসুদেব মণ্ডল

প্রশ্ন : আপনার নাম, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার নাম।

বাসুদেব মণ্ডল : বাসুদেব মণ্ডল, এর নাম সর্দারপাড়া, কুমিরমারি সর্দার পাড়া।

প্র : আপনি কোন পদে পঞ্চায়েতে আছেন ?

ব ম : আমি পঞ্চায়েত সদস্য এই সর্দারপাড়া বুথের। যখন গোলাগুলি চলে তখন দেখতে এসেছিলাম। আমার বয়স তখন ২০/২১ বছর, আমার তখন ভালো জ্ঞানগম্যি। দক্ষিণ পাড়ায় অনেকে দাঁড়িয়েছিলাম। গুলিগোলা হচ্ছে দেখছি, পুলিশের সাথে শরণার্থীদের। এবং আমাদের এখানকার সর্দার পাড়ায় ঢুকে ওরা হুড়োহুড়ি করে মেনি মুণ্ডাকে ঘরের ভিতরে গুলি করে মারল। বাইরে থেকে গুলি করেছিল। ওরা মনে করেছে বুঝি এর ভিতর শরণার্থীরা আছে এই মনে করে গুলি করেছিল। নৌকায় করে প্রচুর শরণার্থী পার হচ্ছিল, এই দক্ষিণ দিকে। খাদ্যের জন্য অনেকে তাড়াহুড়া করেছে, পুলিশেরা, সেই ভয়ে পালিয়ে আসছিল ওদের উপরেও গুলি করছিল। ওরা লঞ্চে সব তুলে নিল, টেনে টেনে সব লঞ্চে তুলল, আমরা দূরের থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম তখন। আমাদের সঙ্গে অনেক ছেলেরা ছিল,

আমরা দেখি লঞ্চে করে নিয়ে তুলে নিয়ে চলে গেল, আনুমানিক আমরা তো দেখছি দূরে থেকে আমরা তো গুলির সামনে আসি নি। টেনে টেনে তুলেছে। রাস্তার উপর দিয়ে টেনেছে। আনুমানিক ২৫/৩০ জন তো আমরা অনুমান করছিলাম। ওরা লঞ্চে করে নিয়ে গেল। কোথায় যে নিয়ে গেল ঠিক বলতে পারব না। আমরা তো ওদের সঙ্গে যাইনি। ওদের নিয়ে নাকি কোর এরিয়ায় নিয়ে ফেলেছে। তা আমরা দেখিনি যে কোথায় ফেলেছে। আমরা দূরের থেকে তখন দেখছি, আমরা তখন যুবক ছিলাম, এবং আমাদের সঙ্গে অনেকেই ছিল। যখন সন্ধে হয়ে যাচ্ছে, যার যার বাড়ি চলে গেলাম। দেখলাম যে অনেক লোক গুলিতে মারা গেছে।

পুলিশ এখানে বন্দুক নিয়ে ঘুরোঘুরি করত, লঞ্চে করে আসত, পাড়ে উঠে টহল দিত। ক্যাম্প করেছিল দক্ষিণপাড়ায় স্কুলবাড়ি, বাগনায় ফরেস্ট অফিসের ধারে। তখন সব লঞ্চ সিজ করেছিল, পারাপারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, আমরা আগে গিয়েছিলাম, মারামারি শুরু হবার পর আর যেতে পারিনি। আগে আমরা ওখানে গিয়ে দেখতাম ইস্কুল, কল বসেছে, দোকান, হসপিটাল, বিভিন্ন রকম রুটি কারখানা করেছে আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতাম। তখন আমাদের সঙ্গে কোনো অসুবিধা ছিল না, বাজারও হত, বাজার বসত ওখানে, ওরা কাটকুটো নিয়ে আসত। আমরা দেখতে যেতাম, বাজার করতে যেতাম না ঠিক, দেখতে যেতাম যে কিরকম নতুন জায়গায়, সুন্দরবনের মধ্যে এত লোক এসে হাট বাজার, হসপিটাল করছে— সেগুলি আমাদের সঙ্গে ওদের কোনো ঝামেলা হয় নি, আমাদের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। মরিচঝাঁপির ছেলে গোরার সঙ্গে ঘোষ পাড়ার মধুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হইছিল। আমাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করত আমরা গেলে। আমার সঙ্গে একটা ছেলের ভালোই পরিচয় হয়েছিল, নামটা ঠিক মনে নেই। পাঁচু এই রকম নাম হবে। তারপর ওরা চলে যায়। আমার সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

সাক্ষাৎকার : ২৪ এপ্রিল ২০০৭



অশোক চৌধুরী আর এস পি কৃষক ফ্রন্টের প্রথম শ্রেণির নেতা। বাসন্তীর বিধায়ক ছিলেন। বর্ষীয়ান অশোক চৌধুরী মরিচঝাঁপির ঘটনাকে কোন চোখে দেখেছেন— উঠে এসেছে তাঁর কথায়।

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা

অশোক চৌধুরী

প্রশ্ন : আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, ভারতভাগ হবার পর, সবথেকে জ্বলন্ত বিষয় হলো উদ্বাস্তু সমস্যা। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের প্রতি এক রকম ব্যবহার করা হয়েছে, বাংলার উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে অন্য রকম। এর বিভিন্ন কারণ আমরা দেখেছি। এখনও উদ্বাস্তুস্রোত পশ্চিমবঙ্গে আসা অব্যাহত রয়েছে। শেষের দিকে এসেছে অনুন্নত সম্প্রদায়ের যারা যেমন ধরুন নমশূদ্র, চাষী সম্প্রদায়। আমাদের এখানে কমিউনিস্ট পার্টি এবং বৃহত্তর পরিসরে বামপন্থী ভাবাপন্নদল এবং মানুষ জন এদের সাহায্যে সমর্থন করেছেন। এবং এখনকার পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছিলেন তারাই এদের হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। পার্টি যদি না থাকে তার ভূমিকাটাও পালন করা যায় না। আমরা দেখেছি আগে উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছে। সেখানেও বিরোধিতা এসেছিলো বামপন্থীদের কাছ থেকে যে, 'কালাপানির দেশে পাঠানো হবে না,' এখানেও রায়পুর থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্প বাগজোলা, কুপাসক্যাম্প, ধুবুলিয়া বহু ক্যাম্পে তাদের ৮/১০ বছরেরও বেশী সময় ধরে ফেলে রাখা হয়েছিল, উদ্বাস্তুদের ন্যায়

সংগত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল এবং তাদের উপর গুলি চলেছিলো, বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছিলো। তারপর আবার এই উদ্বাস্তুদের 'দন্ডকারণ্য প্রোজেক্ট' - এর অধীন বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হলো। কিন্তু সেই প্রোজেক্টেরও যথাযথ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ হলো না। এবং ঐ সময়ে রাম চ্যাটার্জী, কিরণময় নন্দ এবং সমর মুখার্জি দন্ডকারণ্যের ক্যাম্প পরিদর্শন করে মানুষের অবর্ণনীয় জীবনযাপনের চিত্র দেখেছিলেন, রামচ্যাটার্জী একাধিকবার দণ্ডকারণ্যে গেছেন আলোচনা করেছেন, জনসমাবেশে মিটিং করে বক্তব্য রেখেছেন। বলেছেন, 'আপনারা পশ্চিমবঙ্গে চলুন সেখানকার ৫ কোটি বাঙালীর ১০ কোটি হাত আপনাদের স্বাগত জানাবে।' এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্য থেকে আসা লক্ষাধিক উদ্বাস্তু একবছরেরও বেশী সময় নারকীয় পরিবেশে হাসনাবাদে খোলা আকাশের নিচে থাকলো, ৩০/৪০ হাজার লোক ছিল মরিচঝাঁপি দ্বীপে, এরা একবছর ধরে থাকলো, নিজেরা আলাদা ইকনমি তৈরী করলো, তারা সরকারী সমর্থন না নিয়ে শুধু জায়গাটা চেয়েছিল, তারপরই গভর্ণমেন্ট তাদের উৎখাত করলো, এটা কেন করলো ?

অশোক চৌধুরী : এটার দুটো কারণে করেছে বলে আমার ধারণা হয়েছে, আর এই সময়ে আমি কুমিরমারিতে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মন্ত্রী ছিলেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিও ছিলেন। এখন এরা যারা মরিচঝাঁপিতে এসেছে তাদের অধিকাংশ খুলনা, যশোরের লোক, আর কুমিরমারি আর মোল্লাখালিতে যারা বসবাস করে তাদেরও অধিকাংশ খুলনা, যশোরের কাছাকাছি বর্ডার এলাকার লোক, যেমন শ্যামনগর, ইটিণ্ডার ওপারের লোক। এরা উদ্বাস্তু হয়ে আসে এবং দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন ক্যাম্পে, দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের অধীন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন যখন হয় তখন কেন্দ্রে রিফিউজি মিনিষ্টার ছিলেন মেহেরচাঁদ খান্না , ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের লোক। পাঞ্জাবের একেবারে শেষ প্রান্তের, তাদের প্রতি একেবারে সিম্প্যাথি ছিলো না। সিম্প্যাথি আগেও ছিলো না। যখন পার্টিশনের সিদ্ধান্ত হয় পরে যখন পাঞ্জাবে এক্সচেঞ্জ অব পপুলেশন ও প্রপার্টি হয় তখন বাংলা সম্পর্কে কোন চিন্তাই করা হয় নি, কংগ্রেস নেতারাও বলেনি এবং বামপন্থীনেতাদেরও দুর্বল কণ্ঠস্বর ছিলো, সেটাও খুব বেশী আসে নি। সুতরাং বাঙালীদেরকে ভয় পায়। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বাঙালীদের ভয় পায় এবং বাঙলা ভাগ না করলে আজকে পপুলেশন হয়তো ২২ কোটি। প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন অব পপুলেশন হিসাবে বাংলার এম. পি.-র সংখ্যা বেশী হতো, সুতরাং সেই গুলিকে ভেবে ওরা বাংলা ভাগটাকে ভাগ করলো এবং বাংলা ভাগও এমনভাবে করেছে, যার ফলে এই পশ্চিম বাংলার সীমান্তের ৯ টা জেলাতে কোন হিন্দু পপুলেশন বর্ডারের ৫ মাইলের মধ্যে বাস করতে পারছে না। গরু সব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর BDR/BSF মিলে স্মাগলিং-এর ব্যবসা করে মাঝে মাঝে ঝগড়া হলে গুলি গোলা চলে। আর এপারের

লোকের উপর BSF রা অত্যাচার করে বহু নারী ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে everything তারা করে, কেউ দেখবার লোক নেই, এই গভর্নমেন্টও দেখে না। ঐ যখন এক একটা মারা যায় গুলি করে থানা interview করে BSF ওদের কে মানে না। এই রকম অবস্থায় ১ কোটি লোক পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে বাস করে ফ্রম কুচবিহার টু নদীয়া, ২৪ পরগণা। ওখানে এই দুটো সম্প্রদায় খুলনার যারা স্থানীয় বাসিন্দা, আর মরিচঝাঁপির যারা ঐ অঞ্চলের লোক তারা খুলনা যশোরের আর তারা যদি intermingle হয়ে যায় সেটা একটা আশংকা গভর্নমেন্টের মনে ছিলো। আর একটা ইকনমিক প্রব্লেম দেখা দেয়, ওরা যতই বলুক না কেন, কারণ inhospital জায়গাতে জঙ্গল কেটে যতই বসতি করলে খাওয়ার জল পাবে কোথায়? ওখানে একটা টিউবওয়েল বসাতে গেলে মাটির অনেক নীচে প্রায় ৮ হাজার ১০ হাজার ফুট নীচে চলে যেতে হয় তারপরে মিষ্টি জল পাওয়া যায়, তাছাড়া সবই নোনা জল। আর কুমিরমারি থেকে মরিচঝাঁপি যেতে হলে একটা ছোট নদী আছে নদী পার হয়ে ওখানে যায়। এখন এই লোকগুলি কুমিরমারিতে চলে আসে, বাজারে চাল ডাল ভিক্ষে করে, লোকে দেয়।

প্র : প্রাথমিক অবস্থায় কুমির মারির লোকজন এদের সমর্থন করে। দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির প্রতিনিধিরা এলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা হয় এবং তাদের সমর্থন চাওয়া হয়। স্থানীয় মানুষজন নৈতিকভাবে তাদের সমর্থন করেন এবং একথাও বলেন যে আমরা যদি এখানে থাকতে পারি তাহলে আপনারা থাকতে পারবেন না কেন? এরই উপর ভিত্তি করে তারা উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসেন।

অ চৌ : এই তথ্যটা আমার জানা নেই। ওরা এসে গিয়েছিলো তারা বিভিন্ন কারণে চলে এসেছিল, ওদেরকে কে বা কারা আনার জন্য বেশী উৎসাহী হয়েছিলো, সেটা একটা বিতর্কের বিষয়, রামবাবু সম্পর্কে অনেক কথাবার্তা বলা হয়। ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আসার পর একটা অসুবিধা হলো যে হাটবাজারের জিনিস পত্র ওরা কিনে নিতো, কুমিরমারি একটা আইল্যান্ড একটাই গ্রাম, বিশাল বড় গ্রাম। এখানে আসার পরে তারা বললো খাবার দাও চাল দাও, একটু জোর করে কথা বলতো, ওরা একটু প্যানিক হয়ে গেল। তারপরে ওরা আছে, আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, এতগুলিকে তুলবোই বা কি করে। আর এরা আসার সময় বাধা দেয় নি, আসার সময় গভর্নমেন্ট চুপচাপ ছিলো, কিচ্ছু বলে নি, ওরা ওদের মতো এসে ঢুকে পড়েছে। ওখানে একটা নারকেল বাগান ছিলো, ১০ হাজার নারকেলচারা পুতেছিলো, সেই গুলোকে ওরা ভেঙে খেয়ে নিয়েছে। আমি বলছি details আমার সবকিছু মনে নেই, অনেকদিনের ঘটনা। তারপরে বাজারে আসে এবং গ্রামে ভিক্ষে করতে আরম্ভ করে। কুমিরমারিতে বহু দরিদ্র লোক আছে যে আর কত দেবে। সিম্প্যাথি থাকা

সত্ত্বেও যখন দিতে আরম্ভ করলো, তখন সিম্প্যাথিটা বেশি আর থাকলো না। এইভাবে চলছিলো। হঠাৎ একদিন CPM এর কিছু লিডার সেখানে যায়। এবং উদ্বাস্তুর সঙ্গে পুলিশের আগেই একটা গোলমাল হয়ে যায়, গুলিগোলা চলে blank fire হয়ে যায়। উদ্বাস্তুরাও শ তিনেক লোক ঢুকে পড়ে কুমিরমারির মধ্যে, পুলিশ ক্যাম্পের দিকে যায় এবং গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের লাঠি সোটাও ছিলো, তখন পুলিশ random firing করে, গুলিগোলা চলে, তাতে fire এ কত লোকজন মারা গিয়েছিলো বলতে পারবো না, কিন্তু একটা আদিবাসী স্ত্রীলোক সে বেলা ৪টার সময় রান্নাঘরে রান্না করছিলো, মানে ঝুপড়ির ভিতর ঢুকে আর কি, সেখানে ঢুকে Point bank range থেকে গুলি করে মেরে ফেলে। এতে গোটা কুমিরমারির লোক বিদ্রোহ করে বসে। এর ফলে পুলিশ ক্যাম্পে চলে গেলো, বাইরে বেরোতে সাহস করলো না, আমরা ঘটনা শুনে পরের দিন দেবুবাবু (দেবব্রত বাবু) সবাই আমরা গেলাম, বামফ্রন্টের কেউ যায় নি আমাদের পার্টির (RSP) সবাই গেছি ওখানে। মোল্লাখালির দিক থেকে আমাদের লোকেরা মুভ করেছে, রাঙাবেলিয়া, গোসাবার দিক থেকে গেছে দেববাবু গেছে, আমি গেছি। গিয়ে সেখানে মর্মান্তিক দৃশ্য দেখলাম। মানে, টিয়ার গ্যাসের সেল, অসংখ্য সেল ফাটিয়েছে। ২০০/৩০০ সেল ফাটিয়েছে। গুলি করেছে। blank fire করুক আর লোক মারুক, লোক মারা যায় নি, আর মারা গেলেও সেটা জানা যায় নি ফেলে দিয়েছে কোথাও। গুলিটা চলেছে actually বিকেলের দিকে। তারপরে আমরা সেখানে যাই এবং যাওয়ার পর গভর্নমেন্ট বলে, এটা অন্যায় কাজ হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে নিখিল বাবু তখন বিধান সভার সদস্য ছিলেন, ইনি ৭৯-এ এপ্রিল মাসের দিকে বিধান সভার একটা বক্তৃতা দেন, এটার উপরে। তখন জ্যোতিবাবুদের ঘুম ভাঙে যে কি কাণ্ডটা ঘটলো, দেবুবাবু বলে অসভ্য ধরনের সব লোক, গুলি করার সেখানে দরকারই ছিলো না। তারা ২০০ লোক কুমিরমারির মাঠে হেঁটে বেড়াতো। আস্তে আস্তে তাদেরকে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতো। তা না করে এবং কোন পলিটিকাল পার্টির, CPM এর লোকজন ছিলো আমার ধারণা, কে কে ছিলো জানি না। একজন ছিলেন তিনি মারা গেছেন, জ্যোতিবাবুর আপ্ত সহায়ক ছিলেন, শ্যামলীদেবীর husband, শঙ্কর গুপ্ত, এদের presence এ গুলিটা চলে, উনি মারা গেছেন, বলবো না আর। এরকম পলিটিক্যাল লিডার্স ছিলেন তাদের presence-এ গুলি চলে। এই গুলি চলাতে ঐ মহিলাটি মারা যায়। তখন অমিয় সামন্ত এস.পি. ছিলো, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে জমি জিরেত কিনে দেওয়া হোল। বিরেনবাবু স্বীকারই করলেন সেই মিটিং-এ আমরা প্রাণ নিয়ে ফেলেছি, আমরাতো সেইটা ফিরিয়ে দিতে পারবো না। সেই মহিলার পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তখনকার মতো লোকের সেন্টিমেন্টটা খানিকটার বশে আসলো। নয়তো লোক খুব aggressive হয়ে গিয়েছিলো।

তারপরে আমরা, ওরা আছে, ওরা থাকতে পারলে থাকবে, এই রকম একটা মত ছিলো। এটা নিয়ে পার্টিতে বেশী আলোচনা করিনি, আমরা disturbe করতে চাইনি জায়গাটা কারণ ওখানে ওদের ওঠানো সম্ভব না, আমাদের কাছে মনে হয়েছিলো তখন। আর ওরা যদি থাকতে পারে থাকুক। আর ইন হসপিটাল জায়গা ওরা আস্তে আস্তে চলেও যেতে পারে। কারণ এখানে না আছে খাবার জল, না আছে বাজার, না আছে রুজিরোজগারের কোন বন্দোবস্ত কি করে অতগুলি লোক থাকবে ?

আমাদের, মে মাসে কিষান সভার কনফারেন্স ছিলো ক্যানিং-এ, সুতরাং কুমিরমারির প্রায় ৪০/৫০ হাজার লোক এখানে চলে আসে, সেই সময়টাকেই প্ল্যানফুলি, অমিয় সামন্ত, এস. পি. ছিল তখন, এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারেরা মিলে, evaquition টা forcefully করতে হবে, জ্যোতিবাবুর Strict order। ৭০/৮০ টা মোটর লঞ্চ নিয়ে এসে, প্রচুর পুলিশ নিয়ে এসে, হাজার ২/৩ পুলিশ নিয়ে এসে, রাত্রে বেলা সেখানে ঢুকেছে গিয়ে, ঢুকে লোকগুলিকে on gun point লঞ্চে তুলেছে। আমাদের কিছু লোকজন দেখে, পরে ওরা বলেছে, ওরা সেই দিন মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছে নদীতে, ঐ চিংড়ি মাছের পোনা ধরতো। on gun point লোকগুলিকে লঞ্চে তুললো।

প্র : একটা কথা মাঝখানি বলি ঐ সময় টোটাল লঞ্চগুলিকে সীজ করা হয়েছিলো, ডায়মন্ডহারবার, হাসনাবাদ, ক্যানিং থেকে। লঞ্চ ইউনিয়নের সেক্রেটারী প্রশান্ত হালদার বলেছেন, একাজ আন্তর্জার্তিক এবং জাতীয় জলযান আইন বিরোধী কাজ, ওরা জ্যোতিবাবুকে চিঠি দিয়েছিলেন এটা অনিয়ম কাজ, জ্যোতিবাবু বলেছিলেন এটা তদন্ত করা হবে।

অ চৌ : তদন্ত আর হয়নি কোনদিন...

প্র : নিরঞ্জন হালদার সাংবাদিক উনি আপনার কথাই বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে, উনিই (অশোক চৌধুরী) জানেন ব্যাপারটা এই সময় বহু লোকের লঞ্চ সীজ করার জন্য আপনাদের ক্যানিং-এর মিটিং এ আসতে পারেন নি।

অ চৌ : আসতে পারেন নি। আমরা শুধু ডায়মন্ডহারবার থেকে তার আগেই ৮ খানা লঞ্চ নিয়ে গিয়েছিলাম ফেরী পার করার জন্য। আর নৌকোতে লোক পার হয়েছে। আর এপ্রিল মে মাসে ভয়ানক টারবুলেন্ট থাকে মাতলা নদীতে। সেই জন্য লঞ্চে আমরা পার করেছিলাম। হঠাৎ সমস্ত লঞ্চ গুলিকে ডায়মন্ডহারবার থেকে নিয়ে যায়। ডায়মন্ডহারবারে number of Launch বেশী, ক্যানিং হাসনাবাদ থেকে নিয়ে যায়। প্রায় ৭০/৮০ টা বড় বড় লঞ্চ সেখানে নিয়ে যায়।

প্র : আপনাদের কিষাণ সভার সম্মেলনে সব প্রতিনিধিরা কি আসতে পেরেছিল, এই লঞ্চগুলি তুলে নেবার জন্য ?

অ চৌ : কুমিরমারির কিছু লোক আসতে পারেনি, সাতজেলিয়ার কিছু লোক

আসতে পারেনি। open rally তে আসতে পারে নি। আমরা যখন কনফারেন্সের শেষ দিকে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম, শেষ দিকে শুনলাম, এই ভাবে forcefully লোকগুলিকে gun point এ লঞ্চে তুলে হাসনাবাদ নিয়ে যায়।

প্র : লঞ্চে শুধু তোলাই না, একটা ঘটনা আপনাকে মনে করিয়ে দিই, সেই সময় ওদের যে নৌকোগুলো ছিলো, খাদ্য অবরোধ এবং জল অবরোধ দুটোই করা হয়েছিল এবং ভাঙাও হয়েছিল নৌকোগুলিকে। এই লঞ্চগুলো যারা চালাতো, যাদেরকে দিয়ে ভাঙানো হয়েছিলো, তাদেরও আমরা interview করেছি, তাদেরও সাক্ষাৎকার নিয়েছি এবার ঘটনাহলো এটা ভাঙা হয়েছিলো, তারপরে কিন্তু ঢুকে গিয়ে তোলা হলো। আর আপনি বললেন যে অমিয় সামন্ত, ইনি বললেন যে, না শুধু দুজনই লোক যারা গেছে। আমি বললাম যে, আমার কাছে proof রয়েছে যে মারা গেছে এবং আহত হয়েছে, পা বাদ চলে গেছে গুলি খেয়ে, সেই লোকগুলোর সাক্ষাৎ কিন্তু পেয়েছি। হাই কোর্টে এক কেস উঠেছিলো, জল এবং খাদ্য অবরোধ করা যাবে না, এবং হাই কোর্টে কেসের পর ওরা আটকে না দিয়ে ওদেরকে আসতে দেওয়া বন্ধ করে দিলো। এটাতে এমন হলো আইনটাও মানা হলো আটকেও রাখা গেল।

অ চৌ : ওদেরকে বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিশ লঞ্চ টহল দিয়ে ওদেরকে বাইরে আসাটা বন্ধ করে দিয়েছিলো, তাতে বাধ্য হয়ে ওরা একবার বেরিয়ে আসে তখন গুলিটা চলে ঐ আদিবাসী মহিলাটি মারা যায়। তারপর গভর্নমেন্ট থেকে ঠিক হলো RSP -র মিটিং হবে সুতরাং ঐ দিন ফাঁকা থাকবে সুতরাং evacuation অসুবিধা হবে না । Tactically ওরা সেটা, আমাদেরও ধারনা ছিলো না, এইভাবে forcefully লোক গুলিকে তুলো নিয়ে চলে যাবে। ওরা প্রায় একদিন একরাত ধরে evacution টা করেছে, আমাদের লোক ফিরে গিয়ে দেখে : মরিচঝাঁপি খালি। যারা এসছিলো হেঁটে হেঁটে ওখান থেকে বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখে মরিচঝাঁপি খালি হয়ে গেছে, কোন লোক নাই সেটা মে মাসের মাঝামাঝি। এবং ঐ রাত্রে পুলিশ যেখানে মরিচঝাঁপির ভেতরে ঢোকে, সেখানকার কোন evidence কিন্তু আমাদের কাছে নাই, তবে বলপ্রয়োগ হয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং Specially এটা আমাদের প্রাক্তন Chief Minister -এর আদেশে explicit order -এই জিনিসটা করেছে, করে হাসনাবাদ নিয়ে আসে, সেখান থেকে বর্ধমান নেয় এবং সেখান থেকে ওখানে ফেরত পাঠায়ে দেয়।

প্র : একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে এর পিছনে একটা Political কারণতো কাজ করেছে ?...

অ চৌ : Definitely ! definitely Political কারণ কাজ করেছে.........

প্র : সেটা কি ? আপনার কি মনে হয় ? কারণ একটা কথা আমরা বারবার

ওদের কাছ থেকে শুনেছি ওরা বলেছে যে আমাদের, CPM-এর যে উদ্বাস্তু সংগঠন আছে তার সঙ্গে merch করাতে, ওরা সেটা রাজী হয়নি, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যেহেতু আমরা অনুন্নত সম্প্রদায়, এটা যদি মধ্যবিত্ত বা উচ্চ বর্ণের হতো, এটা হোতো না।

অ চৌ : আর ওরা যে বলছে ওরা যেহেতু নিম্ন বর্ণের লোক, সেজন্য ওদের প্রতি খারাপ ব্যবহার হচ্ছে, এটা পুরোপুরি সত্য না। কারণ আপনি দেখবেন Throughout the political movement and peasent movement উচ্চবর্ণের লোকেরাই movement গুলি lead করেছে ওদের ভিতর থেকে কোন লোক বেরিয়ে আসেনি।

প্র : এর পলিটিকাল কারণ কি হতে পারে, এতদিন ধরে আসতে দেওয়া হলো, তাদের বাধা দেওয়া হলো না, ওখানে স্কুল তৈরী করলো, স্কুল তৈরী করার পর হাসপাতাল তৈরী করলো, খেলার মাঠ তৈরী করলো, alternative তারা মাছ চাষ করলো এবং যখন ধরা শুরু করলো, তারা তখন হাটে নিয়ে যেতো তারপর ফড়েরা এসে মাছ কিনে নিয়ে যেতো, মোটামুটিভাবে তারা একটা খালকেটে নিয়ে গিয়েছিল একটা planed colony তৈরী করার জন্য।

অ চৌ : এটা, CPM চায়নি ওখানে আর একটা Colony হোক।...

প্র : তাহলে আসতে দিলো কেন ?...

অ চৌ : তখন বুঝতে পারেনি। কোন খবরই ছিলো না, বুঝতে পারেনি আর যেটা হয়েছে CPM চায়নি আর একটা কলোনী হোক। উদ্বাস্তুদের উপর RSP-র influenceটা বাড়বে। আমরাই কাছাকাছি লোক আছি, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা বাড়বে। সুতরাং ওদের যে এ কর্তৃত্ববাদের রাজনীতি এবং ওখানে population কে বাড়ানো যাবে না। এই ধরনের মনোভাব একটা কাজ করেছে। তারপর আমরা বললাম, দেখুন এখানে, সাধারণ লোক এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা মিলমিশ হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আপনি Government-এর Standটা বলুন। মোল্লাখালিতে একটা মিটিং হলো জ্যোতিবাবু গিয়েছিলেন। প্রায় হাজার ৪০ লোক হয়েছিলো। ওখানে জ্যোতিবাবু বললেন, ওখানে বসতি না করে আমরা দেখবো যে ওদের মালকানগিরিতে বা দন্ডকারণে উদ্বাস্তু পুনর্বসিত হয় তিনি সেই assurance ও দিয়েছিলেন সেই মিটিং-এ।

প্র : কিন্তু ঘটনা যা হলো, মালকানগিরিতে আজও, মানকানগিরিতে তখন ৬ একর থেকে ৩ একর পর্যন্ত জমি দেওয়া হয়েছিলো, এখনো কিন্তু সেখানে চাষবাস হয় না, পুরোপুরি সেচের কোন ব্যবস্থা হয়নি সেই অর্থে, একটাই পটারু নদী থেকে কয়েকটা ক্যানাল বের করা হয়েছে তাছাড়া কিছু নেই, এখনও লোকে ভিক্ষা করছে। আমি নিজে evidence আমি দেখে আসছি এবং shoot করে আসছি, লোকে ভিক্ষা

করছে, এখনও। তাহলে সেই সবকিছু ছেড়ে এইখানে এতো কিলোমিটার দূরে এসে বিভিন্ন অবস্থায় তারা এখানেই থাকতে চেয়েছিলো। তার দুটোই কারণ ছিলো, এক বাঙালী, বাংলায় থাকতে চাই, দুই আমরা চাষবাসের লোক, আমরা জলের দেশে থাকতে চাই। UNOর একটা resolution ছিলো, পৃথিবীর যে কোনে দেশের লোক, পৃথিবীর যে কোন দেশে থাকার অধিকার তার আছে, এবং সে ইচ্ছে করলে সে আবার নিজের দেশেও ফিরে যেতে পারে। তাহলে আমাদের আরও একটা কথা বলা হয়েছিলো, যেটা জ্যোতিবাবুরা বলেছিলেন বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাবে, দুই হচ্ছে এদের বিদেশের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে। একথা তখন তারা কিন্তু বলেছিলো। এই সমস্ত কারণে এদের উৎখাত, কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোন আমরা কোন evidence পাইনি।

অ চৌ : বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যাপারটা বানানো গল্প। ওটা দেখুন গঙ্গাসাগরের পাশে একটা মৎস্যজীবীদের island ওখানে ছিলো। সেখানেও ওরা একই অভিযোগ তোলে। ওরা সবসময় বিদেশী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলে। ওটা Their habit। বাঙালী হিসাবে বাংলাদেশে থাকার আকাংখা থাকতেই পারে। সেটা খুব অন্যায় নয়...

প্র : আলোচনার ক্ষেত্রে বলছি, এখন তাদের লিখতে হয়, এম.পিতে যারা থাকে, মাতৃভাষা হিন্দী, মালকানগিরিতে তাদের লিখতে হয় মাতৃভাষা ওড়িয়া। এর মতো বেদনাদায়ক কিছু হতে পারে না। এটা আপনাকে আমি দেখবো। যখন ছবিটা করবো। এখনও এটা তাদের করতে হচ্ছে। সেখানে বাংলা পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। বিভিন্ন আন্দোলন করে তারা চেষ্টা করছেন। ধরুন আইন! মানুষের জন্য আইন, না আইনের জন্য মানুষ, আমরা কোন জায়গা নেবো?

অ চৌ : এখন তো আইনগুলিই আমাদের দেশে প্রায় inhuman। সেই আইনের পক্ষে সব সময় থাকা যাবে না। যেমন ধরুন আমাদের দেশে ১৪৪ section IPC-আছে। ইংরেজ আমল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ১৪৪ ধারা ব্যবহার করা হয়। আরও কতগুলি section আছে 107, 151, এই আইনের পক্ষে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব না। যে কোন লোকের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় 107 এবং 151 section -এ, যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে নিষিদ্ধ করা হয় ১৪৪ ধারা দিয়ে। সুতরাং এই সমস্ত আইনের পক্ষে থাকা, এই আইনকে সমর্থন করাই যায় না। সুতরাং মানুষের জন্য আইন আমাদের দেশে খুব তৈরি বেশি হয়নি। আমাদের ফৌজদারী আইনের ১ থেকে ৫০০ ধারা পর্যন্ত যা আছে, সেগুলি মানুষের জন্য তৈরি হয়নি, সেগুলি ইংরেজরা করেছিলো তাদের Colonial administration-এর স্বার্থে, সেগুলিই রয়ে গেছে, সেই system টাই রয়ে গিয়েছে। Even চার্চিল বলেছে তার ইতিহাস গ্রন্থে যে, Indian are lower

breed people, তাদের জন্য কোন সভ্য সমাজের আইনের দরকার হবে না। এ কথা বলেছে এবং বই খুলে দেখিয়ে দিতে পারি। সুতরাং সেই আমাদের দেশে কী শাসন ব্যবস্থা ছিলো চার্চিলের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এবং সেই legacy, সেই আইনের legacy এখনও বহন করে চলেছে, তার কোন পরিবর্তন নেই। এখন আমাদের দেশে কোন সাধারণ মানুষের দুঃখের বা কোন, বেআইনী কাজের দ্বারা সে অত্যাচারিত হচ্ছে, তার প্রতিকার পাওয়াটা খুব কঠিন। হাইকোর্টে, সুপ্রিমকোর্টে যেতে গেলে প্রচুর টাকা লাগে, সুতরাং গরীবলোক বা সাধারণ লোক, কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয় এত টাকা খরচ করে প্রতিকারের জন্য যাওয়া, বছরের পর বছর সেই মামলা ঘুরবে। কোন প্রতিকার হবে না। সুতরাং আমাদের দেশে গোটা আইন-কানুনটা হচ্ছে inhuman। যদি আইনের শাসনের কথা বলেন, আইনগুলি কি, আইনগুলি প্রয়োগ এবং আইনগুলির ব্যবহার যে কোর্ট-কাছারি দেখলে যে আমাদের culture কোথায় নেমে গেছে, ভেতরে দেখলে বোঝা যায়। সুতরাং আইনের শাসনের গর্ব করার মতো অবস্থা আমাদের ভারতবর্ষে নাই।

এটার পুরো ইতিহাস নিয়ে আবার re-consider করা উচিত আবার আলোচনা হওয়া উচিত। এই জন্যই বলছি যে সেই সময় এতো দ্রুত ঘটনাগুলি ঘটছে, আমরাও ঠিক ঠিক ভাবে একটা long term plan নিয়ে আমরা ভেবে উঠতে পারিনি এই লোকগুলিকে সম্পর্কে। আমাদের weekness এর কথা আপনাকে বললাম। তবে যে ধরনের কাজ করে evacuation টা করেছে, যে ধরনের গুলি চালিয়েছে এবং লোকগুলিকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল সেইখানেই বাধা দিয়ে গভর্নমেন্ট পলিসিটা ডিক্লেয়ার করা সেই কাজটা গর্ভনমেন্ট করেনি। না করে পরে গায়ের জোরে বন্দুক দেখিয়ে লোকগুলিকে সেইখান থেকে সরিয়ে এনে যেখানে ফেললো সেটা মরুভূমি, সেখানে লোকগুলি মরে যাবে। মরে যাবে মানে, সে বাঙালী হিসাবেও থাকতে পারবে না, মানুষ হিসাবেও বাঁচতে পারবে না। আমি এই বঙ্গে আসার পর 1949-এ একটা exsudus হয় East Bengal থেকে, বরিশাল পর্যন্ত দাঙ্গা হয়, লোকজনকে মেরে ফেলে, তখন লোক পালাতে আরম্ভ করে, তখন আমরা ডঃ মেঘনাদ সাহা সভাপতি ছিলেন তিনি East Bengal Relief Society করেন ৯১, ধর্মতলা স্ট্রীট তার অফিস ছিল। আমরা চাকরি বাকরি ছেড়ে সেই Relief work-এ চলে গেলাম। তারপর relief করতে লোকজনকে পাস করে দেওয়া, খাবার দাবার জল দেওয়া এই সব কাজ, এরা কোথায় যাচ্ছে কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া যাচ্ছে। একটা Shelter তাদের হচ্ছে। তখন আমাদের এখানে কিছু লোক এসে বললো যে, গেদেতে, দেখুন বাবু আমরা ক্যাম্পে যেতে পারবো না, আমরা চাষী মানুষ। আমরা একটু জমিজমা নিয়ে বসতে চাই এখানে। ভিক্ষে করে খাবো তাই সই, জনমজুর খেটে খাবো তাই সই। আমি, গোপাল মৈত্র, সত্য ভট্টাচার্য এই তিনজন আমরা বললাম তোমরা

এখানে থাকো, আমরা ইষ্টবেঙ্গল রিলিফ সোসাইটি তোমাদের খিচুরিটা দেবো একবেলা। একবেলা ভাত দেবো, রাত্রে খিচুরি হবে, খাও। গেদে ৮৪ নম্বর গুমটির ধারে আমাদের একটা খালের মধ্যে নদীর ধারে আমরা সেখানে ক্যাম্প করেছিলাম। সেখানে পাকিস্থানের গুলিতে আমাদের এক বন্ধু পথিক বিশ্বাস মারা যায়, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম, একটু দূরে ছিলাম, ওর ঐ খাকি জামা ছিলো ঐ রকম রং দেখে গুলি করে দিয়েছে। তারপর সেখানে অনেক গোলাগুলি হয়, আমরা ওদেরকে নিয়ে খোঁজ, মাজদিয়া থেকে কিছু লোকাল লোক ছিলো RSP-র কালিকা প্রসাদ, উনি এখন বেঁচে নাই ওরা বললো যে দেখুন ভীমপুরের কাছে এবং কৃষ্ণগঞ্জ থানার কাছে একটা বিশাল জায়গা পড়ে আছে, প্রায় ৩ মাইল লম্বা চার মাইল চওড়া একটা মাঠ পড়ে আছে, ভালো মাঠ ওখান থেকে মুসলিমরা সব চলে গেছে ভয়ে। তো এদেরকে সেই ক্যাম্পে না পাঠিয়ে, এই জায়গাটার দখল নিয়ে বসিয়ে দিন, নদীর ধারে। সেখান থেকে নিয়ে আমরা ১১০০শ ঘরকে সেখানে বসিয়ে দিয়েছি। এবং তার সঙ্গে গ্রামের যে গরীব লোক ছিলো, তাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে সাড়ে তিন বিঘা জমি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় জোর করে। পরে জানা গেলো এটা গভর্ণমেন্ট acquared land। একটা কৃষি ফার্ম হবে বলে গভর্ণমেন্ট acquired করেছে। ২/৩ বছর লড়াই করেই গভর্ণমেন্ট acquisition তুলে নিয়ে এদেরকে জমিটা দিলো, কারণ একজন অফিসার ছিলো Subdivitional officer, Mr. Biswas একজন নমশুদ্র কমিউনিটির লোক আর বসেছে নমশুদ্র কমিউনিটির লোক। আমাদেরও নমশুদ্র কমিউনিটির লোক ভাবতো, বললো যে আপনারা ভালো কাজ করেছেন, এই লোকগুলি বাঁচবে। ঐ জমিটা খুব fertite land ছিল। ওখানে বিনা সারটার না দিয়েই বিঘাতে ১২/১৪ মন করে ধান হয়। পাট হয়, বসে গেল। ঐ জায়গাটার নামই চাষীরা দিলো 'স্বর্ণখালি'। মাটিতে সোনা ফলে। মাঠটার কোন নাম ছিল না। ওরা বলে নামটা দিয়েছে আর কি। আমরা যেখানে যেখানে পেরেছি জমি দিয়ে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। জমি দিয়ে বসিয়ে দিলে হবে কি, দারিদ্রতাটা এক বছরেই দূর হবে।...

প্র : তারাকুণ্ডের সঙ্গে চিঠি চালাচালি হয়েছিল নিরঞ্জন হালদারের। তার লেখা চিঠি পত্র থেকে আমরা জানতে পারি, ঘটনা। আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। আর একটা আপনার মনে আছে বোধহয়, পার্লামেন্টের একটা তদন্ত কমিটি এসেছিল, প্রসন্নভাই মেহেতো, একে নিয়ে আরো দুইজন, ইনি ছিলেন Leader।

অ চৌ : দেখুন CPM এর যে রাজনীতি, CPM বড় পার্টি তো ! অন্য পার্টিগুলো সেই তুলনায় ছোট, সুতরাং তাদের কথাবার্তা ওরা শোনে না। এধরনের কর্তৃত্ববাদের পার্টি যখন ক্ষমতায় বসে, যেভাবেই আসুক না কেন, ক্ষমতায় বসুক না কেন, তারা তখন আর দলের কথাও শোনে না। পুলিশ এবং বড়লোকদের কথা শুনে চলে।

যশোর-খুলনার লোক উভয়ই সম্প্রদায়েরই তারমধ্যে মরিচঝাঁপিও। ওর মধ্যে

নমশুদ্র, পৌন্ড্রক্ষত্রিয় কমিউনিটি হচ্ছে মূল, এরাই majority, কুমিরমারিতেও তাই, সুতরাং একটা জাতীয় ঐক্য ওখানে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল, তবে লোকের মধ্যে বিরক্তি ছিল, এতোগুলি লোক এখানে বসলো, কি খাবে দাবে, কি হবে না হবে একটা আশংকা লোকেদের মধ্যে ছিল। তদসত্ত্বেও বড় যেটা আকংখা ছিল মানুষের, সেটা হল যে ওরা বাঙালী, আমাদেরই স্বজাতির লোক, থাকুক না ক্ষতি কি। এটাই majority-র opinion ছিল।

প্র : কুমিরমারি এবং মোল্লাখালির যে সম্পর্কের কথা বললেন ঐটা বলুন।

অ চৌ : আমাদের তরফ থেকে খুব একটা সাহায্য করতে পারিনি, তবে ওরা কুমিরমারি বাজারে এলে সাধ্যমতো চাল-ডাল দিয়েছে, জল দিয়েছে, তোমরা টিউবওয়েল থেকে হাঁড়ি ভর্তি জল নিয়ে যাও, ওখানে আমাদের পক্ষে টিউবওয়েল বসানো তো সম্ভব হবে না! খাওয়ার জলটা এখান থেকে কুমিরমারি থেকে নিতো, কুমিরমারির পুকুরে-খালে এরা চান করতো এগুলিতে কেউ বাধা দিতো না। বিশেষত মেয়েরা বেরিয়ে আসতো নৌকোয় করে, তাদের কেউ বাধা দিতো না। সুতরাং গভর্নমেন্ট এটাকে পলিসি হিসাবে নিলো, এদেরকে উচ্ছেদ করে দিতে হবে। বনভূমি নষ্ট হচ্ছে, Population equilibrium নষ্ট হচ্ছে, সুতরাং এই সমস্ত কারণ দেখিয়ে উচ্ছেদ করার জন্য পরবর্তী সিদ্ধান্ত ৬ মাস ধরে গভর্নমেন্ট কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

প্র : তখন কি আপনারা কিছু বলেছিলেন, বিরোধিতা করেছিলেন?

অ চৌ : আমরা সেভাবে কোন বিরোধিতা করিনি। আমরা বলেছিলাম যে, এদেরকে যদি এখান থেকে তুলতে হয়, not by force বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে resettlement কত করা যায় এখানে, সেটা দেখে বাদবাকি লোকদের re-settlement করতে হলে অন্য জায়গায় করতে হবে। ২/৩ বার আমরা বলেছিলাম 'দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট' সম্পর্কে মিটিং-এ আমাদের chief secretary সেখানে বসবার কথা ছিল বছরে একবারও তিনি যাননি। সুতরাং দণ্ডকারণ্যে অবস্থা সম্পর্কে আমরা একটা তথ্যপূর্ণ report চাই সেটা গভর্ণমেন্ট করেন নি। কি অবস্থায় লোকগুলি আছে।

প্র : তখন দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট-এর চেয়ারম্যান শৈবাল গুপ্ত, তিনি তো শেষে পদত্যাগ করে চলে আসেন।

অ চৌ : কেউ কিছু করবে না Central Government কিছু করবে না, Central Government refugee rehabilitation Department কে closed chapter বলে তুলেই দিয়েছে। তুলে দিয়েছে, একটা নির্দিষ্ট তারিখের পর ডোলও বন্ধ করে দিয়েছে। এইগুলি ~~করেছে~~ সুতরাং বাঙালীদের প্রতি আর কি Central Government-এর একটা ভয়ঙ্কর রকমের হিংসাত্মক মনোভাব বরাবরই কাজ করেছে,

Bengal Partition, বাংলাদেশের Border নির্ধারণ লাইন টেনেছে, অত্যন্ত injurious পশ্চিমবাংলার অস্তিত্বের পক্ষে। এগুলি re-open করা ছাড়া কোন গতি নাই।

প্র : আপনি কি চান এটার বিচার হোক?

অ চৌ : আমি চাই বিচার হোক। হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ লোক সর্বশান্ত হয়ে গিয়েছে, মানুষের পর্যায়ে তারা সেই এর বিচার না হলে আর কোন বিষয়ের বিচার হবে?

প্র : আর একটা ব্যাপার ছিল যে সেখানে কোন সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি, যে কয়জন ঢুকেছিল, লুকিয়ে চুরিয়ে ঢুকেছিল। Evidence রাখার চেষ্টা করা হয়নি, রাখতে দেওয়া হয়নি।

অ চৌ : তথ্য বেরিয়ে আসুক এটা কোন Governmentই চায় না।

প্র : চারদিক থেকে কণ্ঠ রোধ করা হলো যাতে খবরটা পর্যন্ত না বেরোয়, সেই চেষ্টাটা করে গেছে। আজকে যদি সমস্ত বিষয়গুলি exposed হয়, আপনারা কি কোন ভূমিকা পালন করবেন। একান্ত ব্যক্তিগতভাবে আপনার মতামত চাইছি।

অ চৌ : দুটো জিনিস হতে পারে। এক, সাধারণভাবে Nationwide debate হোক এই বিষয়টার উপর, মরিচঝাঁপিতে সামগ্রিকভাবে কি হয়েছিল তা নিয়ে, এই ঘটনা কেন করা হয়েছে সেই কৈফিয়তটা তলব হোক Central Government ও Bengal Government-এর তরফ থেকে। দুই, দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তুদের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সেখানে Goverment চেপে ধরা Parliament-এ যে তোমরা সেখানে কি করছো? হাজার হাজার বাঙালীদের তোমরা মেরে ফেলছো এর কারণটা কি? এবং এটা নিয়ে দেশব্যাপি একটা আন্দোলন হওয়া উচিত।

আমাদের বাঙালীদের রাজনৈতিক ট্যাজিডিটা হচ্ছে এই বাঙালীরা আত্মঘাতী জাতি। এরা অতীতটাকে দ্রুত ভুলে যেতে পারে। আর এই যে একটা রাজনীতি শুরু হয়েছে CPM-এর জ্বালানোর রাজনীতি। এরা মানুষের অতীতটাকে দ্রুত ভুলিয়ে দিতে পারে।

সাক্ষাৎকার : ৮ মার্চ ২০০৭



প্রথম বামফ্রন্টের পঞ্চায়েত ও ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতি বসুর পরামর্শে, চিফ সেক্রেটারি অমিয় সেনের নির্দেশে গিয়েছিলেন মরিচঝাঁপি।

সরকারি নির্দেশ

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৭ সালে প্রথম মন্ত্রীসভায় আমি 'কারা ও পঞ্চায়েত' দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন : বাংলা ভাগ হওয়ার পর থেকে উদ্বাস্তুদের এদেশে চলে আসার স্রোত থেমে যায়নি, কখনও বেশি কখনও কম...

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : হ্যাঁ এই মুভমেন্ট-এ আমি এবং আমাদের দলও খুব সাংঘাতিকভাবে ইনভলভড ছিল। সাংঘাতিকভাবে রিফিউজিরা ওদেশ থেকে আসছেন তখন আমাদের ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি বলে ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল অমর ব্যানার্জি তার সেক্রেটারি ছিলেন, ডঃ মেঘনাদ সাহা তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, নিখিল দাস তার অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। ইস্ট বেঙ্গল রিলিফ কমিটি যখন হয়, তার পদক্ষেপ তার একটা বিরাট প্রভাব ১৯৫০ সালে, তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ইউ সি আর সি হল, আর আমাদের পার্টি আর এস পি-র নেতৃত্বে এটাতে মেঘনাদ সাহা ছিলেন, অমর ব্যানার্জি ছিলেন, আর সি আর সি [Refugee Central Rehabilitation Council] আর ওদের ছিল ইউ সি আর সি, আর আর সি আর সি এরা দুজনাই তাদের সাধ্যমতো রিফিউজি মুভমেন্ট-এ পার্টিসিপেট

করেছিলেন এবং তখন আর এস পি বিশেষ করে ঐ তল্লাটে বাঘা যতীন, বিদ্যাসাগর কলোনী, নেতাজী কলোনী, যাদবপুর সব জায়গায় আমাদের আর এস পি অ্যাবসোলিউট বিরাট একটা প্রভাব ছিল। রিফিউজি মুভমেন্টে আমরা সাংঘাতিকভাবে ছিলাম।

প্র : এর পরে প্রায় দেড় লক্ষ লোক বিভিন্ন ক্যাম্পগুলিতে ছিল। বাঘজোলা ক্যাম্প, মানা ক্যাম্প, কুপার্স ক্যাম্প, বিভিন্ন ক্যাম্পে এরা ৭/৮/৯/১০ বছর পর্যন্ত ছিল এবং যেটা অমানবিক অবস্থায় ছিল এবং আপনাদের পার্টির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ হয়েছিল এইরকম ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তারপরে যেটা হয়েছে দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট যখন হল, এই প্রোজেক্ট-এর সময় তখন ৭টা প্রদেশে উদ্বাস্তুরা সেটেলড হয়েছে তার মধ্যে উড়িষ্যার মালকানগিরি এবং উমরকোট। এই মালকানগিরিতে দেখা যাচ্ছে ওখানে বাঘ ভাল্লুকের বাস ড্রাই এরিয়া। ওখানকার মানুষ প্রথমদিকে যারা গেছে, ৬ একর করে জমি পেয়েছে তার পরে ৪ একর করে। দেখা যাচ্ছে সমস্ত কিছু ত্যাগ করেও তারা এখানে চলে এসেছে।

দে ব : সালটা তখন ছিল ১৯৭৮/৭৯। তখন সবেমাত্র বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের তরফ থেকে যে ৩ জন মন্ত্রী ছিলেন, যতীন চক্রবর্তী, ননী ভট্টাচার্য এবং আমি, আমি পঞ্চায়েত এবং কারাদপ্তরের দায়িত্বে ছিলাম। এই সময় দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের যে সমস্ত পূর্ববাংলার বাসিন্দারা, অধিবাসীরা ওখানে গিয়েছিলেন, তাদের কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন যে সমস্ত কথা বলে তাদের পুনর্বাসনের কথা বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে পূর্বাপর কোনো চিন্তা ছিল না, কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হল, তারা অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে সেখানে ছিলেন এবং অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। তখন স্বভাবতই আমরা নতুন প্রতিষ্ঠিত যে এদের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে বলে আমরা মনে করতে লাগলাম এবং এই সময়ে বামফ্রন্টের তরফ থেকে আমরা কেউ কেউ তাদেরকে এ কথাও বললাম সেখানে গিয়ে, যে তোমরা পশ্চিমবাংলায় ফিরে এস, আমরা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি একটা জায়গায় তোমাদেরকে থাকবার ব্যবস্থা করব এবং সেই হিসাবে আমাদের কথা শুনে অনেকে চলেও এসেছিলেন, সেখানে যদি ভালো রকম ব্যবস্থা থাকত, আমরা বললেও তাঁরা আসতেন না। কিন্তু যেহেতু সেখানে কোনো চাষবাস ছিল না এবং যেসব জায়গায় করা হয়েছে সেখানে পরিকল্পনা ছিল না, সেইজন্য তাঁরা ভালো সংখ্যায় চলে আসেন। আমার মনে আছে বিশেষ করে ঐ ৭৮/৭৯ সালে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব ছিলেন অমিয় সেন মহাশয় তাঁরই উদ্যোগে একবার মরিচঝাঁপিতে গিয়ে বা মরিচঝাঁপির এলাকার কাছাকাছি গিয়ে তাদের অবস্থাটা জানা এবং বোঝাবার জন্যে আমাদের তিনজন মন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া হয়। সি পি আই এম-এর তরফ

থেকে শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরী মশাই ছিলেন, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর তরফ থেকে কমল গুহ ছিলেন এবং আমাদের দল আর এস পি-র তরফ থেকে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে বিনয় চৌধুরী মহাশয়, কমল গুহ এবং আমি সমস্ত ব্যবস্থা দেখলাম।

প্র : এটা কি '৭৯ সালের দিকে? তখন ওরা ভেতরে স্কুল করেছে, একটা হসপিটাল করেছে...

দে ব : হ্যাঁ '৭৯ সালের দিকে। তখন এইসব হয়ে গেছে। তারপরে অমিয় সেন মশাই বললেন, যে দেখুন ঐখানে সত্যি করে আপনাদের আর এস পি-র প্রভাব রয়েছে এবং মরিচঝাঁপি যেটা গোসাবা এবং যেখানে আপনাদের একটা ঘাঁটি রয়েছে, সেই এলাকায় সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি একটা জায়গা কুমিরমারির কাছে, মোল্লাখালির কাছে উল্টোদিকে এবং বললেন আপনার যাওয়াটা বিশেষ দরকার। আমার বেশ ভালো ভাবে মনে পড়ছে যে আমি যখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য যাব, এরকম কথা ভাবছি বা ওদেরকে ডেকে পাঠাব ওপার থেকে করান নদী দিয়ে সেটা ডিভাইডেড রয়েছে যে তাদেরকে ডেকে পাঠাবো, দেখলাম যে তাঁরা ভীষণভাবে মনে করছেন যে সরকারি লোকেরা এসেছেন, অফিসার যিনি এসেছেন, তাঁরা চিনতেও পেরেছিলে মুখ্যসচিবকে, এরা বোধ হয় আমাদেরকে সব দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য বোঝাতে এসেছেন এবং সেই কারণে দেখলাম ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁরা তীর বর্ষণ করতে লাগলেন, ছুঁড়তে লাগলেন আমাদের দিকে। আমার কাছেই ৫/৭/১০ গজের মধ্যে বহু তীর এসে পড়তে লাগল। এখন যদি আপনি জিজ্ঞেস যখন করছেন এবং স্বভাবতই আপনার একটা জিজ্ঞাস্য হতে পারে এবং সকলেরই জানার ইচ্ছা অছে, আমাদের তখন বক্তব্যটা কী ছিল। আমরা তখন দেখেছি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই তিনি আর নতুন করে ছিন্নমূল বাস্তুহারা মানুষদের, তিনি মনে করতেন যে পশ্চিমবাংলা একেবারে ওভার ক্রাউডেড হয়ে গিয়েছে, এখানে রাখা উচিত নয়, তাদেরকে দণ্ডকারণ্যেই যাওয়া উচিত। এই মতটা তিনি খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং এটা চালু করবার জন্য তিনি প্রায় ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁরই দলের পশ্চিমবাংলার তখন জনতা দলের নেতা ছিলেন শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র মশাই, তিনি মরিচঝাঁপিতেই যাতে তাঁদের আনা হয়, পুনর্বাসন হয়, তার একজন অন্যতম প্রধান এ্যাডভোকেট ছিলেন, এবং সেটাও তিনি ভীষণভাবে প্রচার করেছেন। এবং আমি এটা দেখেছি নিজের চোখে, কাশীকান্ত মৈত্র মশাই ভীষণভাবে মোরারজী দেশাইয়ের বিরাগভাজন হন। আমাদের আর এস পি-র লোকজন যাঁরা ওখানে ছিলেন তাঁরাও কিন্তু এই মতটাতেই বিশ্বাস করতেন যে, এদের মরিচঝাঁপিতে রাখাই ভালো, তার যখন ব্যবস্থা হল না তার একটা দায়িত্ব আছে।

প্র : একটা ঘটনা আমি উল্লেখ করি এরা যখন মরিচঝাঁপি আসে তখন যে একটা টিম ছিল ৮ জন, সেই টিম প্রথম এসে কুমিরমারিতে ওঠে এবং ওখানকার স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি তখন বলেছিলেন আমরা যখন থাকতে পারি তোমরাই বা থাকতে পারবে না কেন? মনে হয় মূলত আর এস পি-র একজন ছিলেন...

দে ব : হ্যাঁ আর এস পি-র, নামটা এই মুহূর্তে আমারও মনে পড়ছে না, তিনি আর এস পি-র একজন (প্রদীপ বিশ্বাস) প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন এবং নেতা ছিলেন।

প্র : এবং এরাই তখন সহযোগিতার করা যা এরাই করেছিলেন আর এস পি থেকেই করেছিলেন।

দে ব : করেছিলেন এবং আমাদের দলেরও তখন স্থানীয়ভাবে যারা ছিলেন, প্রতিপত্তি ছিল, তারাও বিশেষ করে চেয়েছিলেন। যখন তাদের ব্যবস্থা হচ্ছে না, করতে পারল না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, মোরারজী দেশাই যতই বলুন, তখন তাদের মরণের মুখে ফেলে রাখা যায় না, সুতরাং তাদের এখানে ডেকে এনে আমাদের যত কষ্ট হোক, আমরা যখন থাকতে পারছি তাদেরকেও আমরা রাখব। কিন্তু আমার মনে হয়েছে পরবর্তীকালে যে ঠিকই, কিন্তু দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা যদি ঠিক ঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারতেন, তা হলে তো আসার প্রয়োজন ছিল না, তারা আসত না, আমি বিশ্বাস করি এবং আমার দলও বিশ্বাস করে যে একটা বাঙালি যদি অন্য জায়গায় যায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে বাংলার প্রভাব বাংলার সংস্কৃতি অন্য জায়গায় ছড়িয়ে যাবে, এটা তো ভালোই কথা সেইদিক থেকে নীতিগতভাবে তাদের দণ্ডকারণ্যে থাকা উচিত বা যাওয়া এটা নীতিগতভাবে আমরা মানি, কিন্তু যে ব্যবস্থাপনা থাকলে সেখানে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাপনা আদৌ ছিল না, সুতরাং সেই ব্যবস্থাপনা না করে হুইমজিক্যালি তাদের পাঠিয়ে দিলে অন্যায় হবে বলে আমরা মনে করেছিলাম। এই কথা আমরা বিশেষ করে আমি মোরারজী দেশাইকে বলেছিলাম, আপনার প্রস্তাব যে ঠিকই, আপনার যেটা প্রতিপাদ্য বিষয়, আপনি যেটা বলছেন যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ১৯৪৭-৪৮ থেকে '৫০ সালের মধ্যে প্রায় কয়েক লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ এদেশে এসেছে এবং ওভার ক্রাউডেড হয়ে গিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেই কারণে তাদের অন্য জায়গায় ব্যবস্থাপনা করা যায়, পুনর্বাসন হবে, আমরা ওভার ক্রাউডেডনেস-এর প্রবলেম থেকে রেহাই পাব, কিন্তু আপনি তো তাদের একটা ব্যবস্থা করবেন, আমরা যত দূর জানি সেখানে কোনো ব্যবস্থাপনাই নাই। যেসব জায়গায় কয়েক একর জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে কোন জায়গায় জমি দেওয়া হয়েছে, কোন জায়গায় জমি দেওয়া হয়নি। আর যেখানে দেয়া হয়েছে চাষবাসের ব্যবস্থা তারা কিভাবে করবে সেভাবে কোনো ব্যবস্থাপনা সেখানে করা

হয়নি। স্বভাবতই যে প্রশ্নটা ওঠে তাহলে এই আমরা বামফ্রন্টের মন্ত্রীরা গিয়ে অথবা বামফ্রন্টের নেতারা গিয়ে তাদের কি ডেকে এনেছিলাম? এক অর্থে আমরা ডেকে এনেছিলাম, এই কারণে যে আমরা তাদের রাখার সবাই পক্ষে ছিলাম তা নয়, আমরা তাদের পুনর্বাসনের এত গাফিলতি, এতো অব্যবস্থা, এতো পরিকল্পনাবিহীন কাজ দেখলাম, সেই কারণে আমরা কি করে বলব তোমরা ওখানে থাকো, কিন্তু নীতিগতভাবে যেটা উনি বলেছিলেন যে সেটা হওয়া উচিত এবং তাহলে সত্যিকারে আরেকটা জায়গাতে বাঙালিরা প্রতিষ্ঠিত হবেন, বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির কৃষ্টি যত বেশি অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই দৃষ্টিভঙ্গির থেকেও দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট as a whole আমাদের সমর্থনযোগ্য ছিল। কিন্তু একেবারে কোনো পরিকল্পনা ছিল না বলে সেই অব্যবস্থার মধ্যে আমরা মনে করতে পারিনি যে তাদেরকে সেখানে রাখা উচিত। সেই কারণে আমাদের এখানকার জেলা পার্টি দক্ষিণ ২৪ পরগনার, তখন তো একটা ২৪ পরগনা ছিল, ২৪ পরগনা জেলা পার্টির আমাদের স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা স্বভাবতই তাদেরকে সেখানে রাখার কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন।

প্র : আপনাকে একটা খবর জানাই, মধ্যপ্রদেশে যারা আছেন, তারা বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষা লিখতে হয় হিন্দি এবং মালকানগিরিতে যারা আছেন তাদের মাতৃভাষা লিখতে হয় ওড়িয়া।

দে ব : সুতরাং ঠিকই বলেছেন যে উদ্দেশ্যে আমরা ভেবেছিলাম যে বেশ কিছু বাঙালি যদি সেখানে যান তাহলে বাঙালির সংস্কৃতি, বাঙালির কৃষ্টি সেখানে ছড়িয়ে দেবেন, উল্টে দেখা যাচ্ছে তাদের মাতৃভাষা ভুলে যাচ্ছে। মাতৃভাষা এনকারেজ তো করা হচ্ছে না বরঞ্চ জোর করে হিন্দি পড়ানো হচ্ছে, ওড়িয়া ভাষা পড়তে হচ্ছে।

সাক্ষাৎকার : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭



১৯৭৮ সাল থেকে একটানা ২৫ বছর কুমিরমারি দ্বীপের পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন প্রফুল্ল মণ্ডল। মরিচঝাঁপির প্রভাব পড়েছিল কুমিরমারির উপর। প্রফুল্ল মণ্ডল সেসময় কী ভূমিকা নিয়েছিলেন ?

জ্যোতি বসুর একনায়কতন্ত্র

প্রফুল্ল মণ্ডল

প্রশ্ন : আমাদের আলোচ্য বিষয় মরিচঝাঁপি। উদ্বাস্তুরা কুমিরমারির উল্টোদিকে মরিচঝাঁপিতে এসেছিলেন। সেই সময় উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে আপনাদের ভূমিকা কি ছিল ?

প্রফুল্ল মণ্ডল : ১৯৭৮ সালে আমি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হলাম। সেই সময় আমাদের সঙ্গে দল করতেন কমরেড প্রদীপ বিশ্বাস। ও জেলা পরিষদের সদস্য হল। আর.এস.পি দলের সমর্থক। প্রধান হবার পরে ১৯৭৮-এ শরনার্থীরা এল। আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম শরণার্থীরা আসছে। ওরা এল, বন্যার মতো এল। কুমিরমারির·উপর দিয়ে, যোগেশগঞ্জের উপর দিয়ে, সাতজেলিয়ার বিভিন্ন রুট দিয়ে মরিচঝাঁপিতে ওরা প্রথম ঢুকে গেল।

মরিচঝাঁপিতে একটা plantation ছিল। শ'খানেক একর হবে— এটা আমাদের ধারণা। প্রথম ওটাতেই ঢুকে গেল। সাহায্য করার মতো নির্দেশ আমরা পাইনি। আমরা সাহায্য করিনি, বিরোধিতাও করিনি। ওরা যখন ঢুকে গেল, আমি প্রদীপ বিশ্বাস মাঝে মাঝে ওখানে যেতাম দেখতে, কারা, কোথা থেকে এল, কী করছে।

ওখানে সুখচাঁদ মণ্ডল বলে ওদের বোধহয় লিডার ছিলেন। তাকেই দেখলাম ওদের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। সুখচাঁদ মণ্ডল এবং সতীশ মণ্ডল দুজন। ওদের পরিচয় নিলাম। দেখলাম ওদের অধিকাংশ হচ্ছে নমঃ শ্রেণির (নমঃশূদ্র) লোক। যশোর, খুলনা, বরিশাল—ওদিককার লোক। আমরা যারা খুলনা আগত, যদিও আমার জন্ম কুমিরমরিতে, আমার বাবা-ঠাকুর্দা তারা তো খুলনার লোক। ভাষার সামান্য পার্থক্য ছিল।

ওরা আছে। প্রায় পাঁচ-ছ' মাস পর সরকার সিদ্ধান্ত নিল, ওদের তুলে নিতে হবে। ওদের ধারণা ছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ করে জ্যোতিবাবুর, আরএসপি ওদের সহযোগিতা করছে।

অনেক মিটিং মিছিল হবার পর একদিন ডিএম এখানে এসে আমাদের ডেকে পাঠালেন। প্রদীপ বিশ্বাস, আমি গেলাম। আলোচনা হল। (ডিএম) বললেন, আপনাদের নেতৃত্বে শরণার্থীদের তুলে দিতে হবে। সোজাসুজি বললেন। আমরা সেখানে বললাম, দেখুন—আপনি আমাদের নেতা নন। কমরেড নিখিল দাস যদি আমাদের নির্দেশ দেন, মানতে পারি নচেৎ আমরা মানতে পারছি না। তবে এটুকু আমরা বলতে পারি, আমরা কোনও সহযোগিতা করছি না, বিরোধিতাও করছি না।

(ডিএম)—'না আপনাদের বিরোধিতা করতে হবে।'

না, আমরা পারব না।

প্র : 'বিরোধিতা' কীভাবে করতে বলছেন ?

প্র ম : বিরোধিতা বলতে উনি (ডিএম) যেটা বলতে চাইলেন, পুলিশ আসবে, বিভিন্ন ফোর্স আসবে, সহযোগিতা করে ওদের এখান থেকে তুলে দিতে হবে। আমি পরিষ্কার বললাম— এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। Even আমার দলও যদি বলে মারপিট চালাও, আমরা পারব না—কারণ এরা বাঙালি।

প্র : ঠিক কীভাবে সহযোগিতা করতে হবে— এ কথা কি বলেছিলেন ?

প্র ম : সহযোগিতা বলতে— আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। কুমিরমারির যারা আরএসপি নেতৃস্থানীয় তাদের সবাইকে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। আমি বললাম, এটা আমরা পারব না।

প্র : সঙ্গে থেকে গুণ্ডাগিরি করে তুলতে বলেছিলেন ?

প্র ম : খানিকটা তাই। আমরা সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে ওদের সঙ্গে থাকা মানে জুটে তুলতে হবে। অত্যাচার করতে হবে—এই তো অবস্থা !

যখন অস্বীকার করলাম, দিন চারেক পরে দেখলাম— দুটো চিঠি এল আমার নামে এবং প্রদীপ বিশ্বাসের নামে। একটা ডেট দিয়ে জ্যোতিবাবু লিখেছেন— তোমরা এই ডেট-এ এই সময়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমার সঙ্গে দেখা করো। নিখিলদা

(নিখিল দাস) আমাদের জানালেন, তোরা আয়, ওই ডেট-এ আমি রাইটার্স-এ আছি। তখন তিনি এম.এল.এ।

আমরা গেলাম। উনি (নিখিল দাস) বললেন— কথাবার্তা একটু সমঝে বলিস। কারণ জ্যোতিবাবু জানিস তো।

জ্যোতিবাবু প্রথমেই বললেন— তোমাদের কেন ডেকেছি জানো? বললাম, জানি না তো। (জ্যোতিবাবু) ডেকেছি তোমরা শরণার্থীদের সহযোগিতা করছ।

প্রদীপবাবু (প্রদীপ বিশ্বাস) বললেন— কই আমরা তো সহযোগিতা করছি না।

(জ্যোতি বসু) তাহলে তোমরা কী করছ?

(প্রদীপ বিশ্বাস) আমরা সহযোগিতাও করছি না, বিরোধিতাও করছি না।

(জ্যোতি বসু) এখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের নির্দেশ, ওদের ওখান থেকে তুলতে হবে। আমি তোমাদের ডেকেছি এই জন্যে যে, তোমরা ওখানকার বামফ্রন্টের লিডার। তোমরা যদি সহযোগিতা করে থাক, ভবিষ্যতে আর করবে না। তাহলে আমি তুলে নেব।

প্র : তুলে নেব বলতে কী তুলে নেবেন?

প্র ম : মানে অ্যারেস্ট করবেন।

নিখিলদা চুপচাপ আছেন। হঠাৎ আমার মাথায় ক'টা কথা জোগাল— জ্যোতিদা, আমি তো আপনার নাতির বয়সী। আমার তখন বয়স কম। কতো হবে? First term of Panchayet. কলেজ থেকে বেরিয়েই। ওই ২৩/২৪ হবে।

(জ্যোতি বসু)— বলো।

বাঙালিগুলো কি ছাগল কুকুর?

(জ্যোতি বসু)— কেন তুমি এ কথা বলছ?

বেশ খচে গেছেন।

দেখুন, এদের বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে তাড়ানো হল। মানা ক্যাম্প, কোথায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, কোথায় কোথায় রাখা হল। এই ছাগল-কুকুর আমরা যেমন পুষি। ইচ্ছে মতোন এক জায়গায় নিয়ে যাই, আবার আনি। তারপর তাদের সুন্দরবনে আনার জন্য কোনও রাজনৈতিক দল থেকে উসকানি দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মানে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের যদি ইচ্ছা না থাকত এদের স্থান দেব না, কেন সীমান্ত থেকে ফেরত পাঠানো হল না? এখন তাদের এনে মেরে ধরে খুন জখম করে আবার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

তার মানে বাঙালি নিধনযজ্ঞ একটা চলবে।

খুব অসন্তুষ্ট হলেন। নিখিলদা মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি ভেবেছি বলে যাব, তারপর যা হয়... জেলের উপরে আর তো কিছু হবে না। (জ্যোতি বসু)— দেখ খোকা, তোমাদের কাছে এ ধরনের কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই। তবে আমি

একটা কথা বললাম যে— ওদের তুলতে হবে। এবং তুমি যেটা বললে আমি খুব একটা অস্বীকার করব না। গভর্নমেন্টের একটা ভুল হয়েছে।

(প্রফুল্ল)— আর এই ভুলের মাশুল দিতে হবে ওদের। ওরা হাজার হাজার লোক প্রাণ দেবে, মরবে, তাড়া খাবে। ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে বেড়াবে!

(জ্যোতি বসু)— যাইহোক, রাজনীতিতে সেন্টিমেন্ট বলে কিছু নেই। তোমরা এরপর থেকে আর সহযোগিতা করবে না।— ওই ক'টা কথা বলে আমাদের ছেড়ে দিলেন।

আদতে তো আমরা সহযোগিতাই করি। ওরা ওদের মতোই চলে।

তারপর এল সেই দিনটা।

দেখলাম শ'য়ে শ'য়ে লঞ্চ। কত প্রকারের ফোর্স এল, মিলিটারি, আধা-মিলিটারি, র‍্যাফ ইত্যাদি ইত্যাদি। ভর্তি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রে আগুন জ্বলল। সুন্দরবনের যে সমস্ত এলাকায় এরা ছিল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলল, চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্না। আমরাও সেদিন এপারে ছিলাম। সারা রাত ধরে চলল। লাশ বস্তাবন্দি হল। লঞ্চের পর লঞ্চ ভরা হল। গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হল। সবই দেখলাম। সকাল হল সব পরিষ্কার। সব থেমে গেলে বিকেলে আমরা একটু দেখতে গিয়েছিলাম। ৭/৮টা শিশু দেখেছিলাম দাদা, আধ পোড়া অবস্থায় ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে। অবর্ণনীয় অবস্থা। আমি সেদিন বলেছিলাম, জালিয়ানওয়ালাবাগকেও এরা হারিয়ে দিল! ভাল, বাঙালি উৎখাত হোক!

তোলার কিছু দিন আগে শরণার্থীদের ওরা গুলি করতে গিয়ে মেনি মুণ্ডা নামে এক আদিবাসী মহিলাকে গুলি করে মারে।

ওরা একদম অবরোধ করে দিয়েছে, ব্যারিকেট করে দিয়েছে। কুমিরমারিতে শরণার্থীদের আসতে দিচ্ছে না। যাতে ওরা খাদ্য না পায়, জল না পায়— এই ভাবে অবরোধ করেছিল। কিন্তু শরণার্থী পেটের জ্বালায় পার হয়ে এ-পারে কিছু খাদ্যটাদ্য পায় কিনা এসেছিল— ওরা গুলি চালিয়েছিল। সেই গুলির মধ্যে মেনি মুণ্ডা মারা যায়। আমি প্রধান হিসাবে নোট পাঠালাম, আমার গ্রামের মেয়ে। পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ বিডিও দিয়েছিল। সেই টাকাটা নিয়ে ওদের দিয়েছিলাম।

প্র : শরণার্থীদের নৌকোগুলো কি পুলিশ ভেঙেছিল?

প্র ম : শরণার্থীরা আসার পর বেশ কিছু কাঠ কেটে ওরা নৌকা বানিয়েছিল। ওরা নৌকো করে খাদ্য আনত। কেউ কেউ মাছ ধরত। বিভিন্নভাবে জীবিকা অর্জন করত। নৌকোগুলো ওরা (পুলিশ) ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছিল।

প্র : জ্যোতি বসুরা যে অভিযোগগুলো উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে করেছিলেন— বিদেশিদের সঙ্গে হাত রয়েছে, চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত, বনসম্পদ ধ্বংস করছে। বনসম্পদ সম্পর্কে বন দফতরের রিপোর্ট বলছে বড় বড় গাছপালা কিছু নেই। আগাছা টাইপের গাছই বেশি ছিল। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য?

প্র ম : ওরা যেখানে ছিল, Plantation area ওখানে কোনও বড় ধরনের গাছ ছিল না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু নারকেল গাছ লাগিয়েছিল। খুব বেশি অন্য গাছ ছিল না।

ক্ষয়ক্ষতি এরা যা বলেছে— ওরা গভীর জঙ্গল থেকে কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করত, যেটা দেখেছি। রান্নাবান্নার জন্য এটা ওরা করত। বড় ধরনের গাছ কাটতে, দেখিনি... কেটে আনতে গেলে তো আমাদের উপর দিয়েই যেতে হবে। সে রকম কোনও ঘটনা আমরা দেখিনি। এগুলো অজুহাত বলে আমার মনে হয়।

প্র : এই যে নৌকোটা যে বানাল, কাঠ তো চাই, বড় কাঠ না হলে তো নৌকো বানানো যায় না।

প্র ম : ছোট ছোট নৌকো। ডিঙির মতো ৩-৪ জন যেতে পারে। Plantation area-র মধ্যে ছোট ছোট গাছ ছিল, তাই দিয়েই তৈরি করা।

প্র : ওরা প্রায় এক বছর ছিল। শুনেছি এই সময়ের মধ্যে স্কুল, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, তাদের সংস্কৃতি অর্থনীতি—এগুলো আপনি কি দেখেছেন?

প্র ম : ওরা স্কুল করেছিল, দোকান করেছিল। মাল গুলো ওরা ন্যাজাট, বসিরহাট লাইন দিয়ে আনত।

প্র : ওরা স্বশাসিত অঞ্চল তৈরি করেছিল। সেখানে তাদের স্কুল, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় নয়, একটা সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করেছিল— এ বিষয়ে আপনার জানা ঘটনা যদি কিছু থাকে?

প্র ম : আমরা যেটা দেখেছি, যারা সরকারের অধীন কোনও ব্যক্তিই নন। একটা জায়গায় সমবেত হয়েছে। ধরুন এক লক্ষ লোক। তাদের কোনও সরকার নেই, তাদের কোন জাত নেই, কিছুই নেই। তারা এক জায়গায় হয়ে নিজেদের বাঁচার তাগিদে কয়েকটা প্রাইমারি স্কুল করেছিল, কয়েকটা টিউবওয়েল বসিয়েছিল, দোকানপাট খুলেছিল— তাদের মতো চলত— এটাকে স্বয়ংশাসিত সরকার বললে বোধহয় ভুল হবে। স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান যদি বলি তাতেও বোধহয় ভুল হবে। তাদের যতটুকু দরকার, নিজেদের বাচ্ছাগুলোর একটা স্বাক্ষরদানের জন্য কাজগুলো তারা করেছিল—এটা সরকারের বিরোধিতা নয়— তাহলে সরকার যদি তাদের কথা ভাববে— তাহলে ওদের জন্য দোকানপাট, স্কুল, কলেজ সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত ছিল।

প্র : জ্যোতি বসু বলেছিলেন— তাদের উৎখাত করাটা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ। অথচ রাজ্য বিধানসভায় বিরোধীপক্ষ জনতা দলের সদস্যরা শরণার্থীদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। অন্যদিকে সিপিএমের সমর্থন নিয়ে মোরারজি সরকার কেন্দ্রে। মোরারজি সরকার ৩ জনের সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। সংসদীয় দলের রিপোর্ট CPM সংসদে তুলতে দেয়নি, 'রাজ্যের বিষয়' এবং তদন্ত কমিটিতে ৩ জনই ছিলেন জনতা পার্টির সদস্য— এই কারণে দেখিয়ে।

শরণার্থীদের উৎখাতের পিছনে রাজনৈতিক কারণ কী ছিল?

প্র ম : এর ব্যাখ্যাটা ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। ওরা (সরকার) একটা কারণ যেটা দেখিয়েছিল সেটা কিছুটা যুক্তিসঙ্গত। আরগুলো নয়। সুন্দরবন গভীর অরণ্য। এই জঙ্গল কেটে যত সাফ করা হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় তত বাড়বে। এই যুক্তিটা খানিকটা গ্রহণ করা যায়, সবটা নয়। কারণ জঙ্গল তো হামেশাই কাটছে। Timber Merchant-রা কাটছে। এখন কিছুটা বন্ধ হয়েছে। কিছু শরণার্থী এসে জঙ্গল কাটলে পরিবেশের ক্ষতি হবে, ভারসাম্য নষ্ট হবে—এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। আসলে এদের (সরকারের) পিছনে অন্য কোন কারণ ছিল।

প্র : ডিএম আপনাদের ডেকেছিলেন সহযোগিতা করার জন্য। আমরা এমন লোকের সন্ধান পেয়েছি, কয়েক জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, যারা পুলিশের সঙ্গে থেকে শরণার্থীদের ঘর-বাড়ি জ্বালানো, উৎখাত করার সহযোগিতা করে পুলিশের কাছ থেকে পয়সা পেয়েছে। এরা কারা, এরা কি সিপিএমের লোক ছিল?

প্র ম : রাজনীতিতে বলতে গেলে বোঝায় তাই। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক জায়গায় কিছু চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, খুনি— যারা পয়সার বিনিময়ে সিপিএমর ব্যানার দিয়ে সংগ্রহ করেছিল— তারা এই জিনিসটা চালিয়েছিল।

প্র : শরণার্থীদের মূল জীবিকা কি ছিল?

প্র ম : ওদের কাছে কিছু পয়সা ছিল। দীর্ঘদিন জমিয়ে সংগ্রহ করে রেখেছিল একটা আশ্রয়ের আশায়। শুধুমাত্র জ্বালানি কাঠ বেচে কতদিন চলতে পারে? নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। অধিকাংশ লোক ছোট ছোট ডিঙিতে করে মাছ ধরত।

প্র : সেই সময় সরকার থেকে, বিশেষ করে সিপিএম থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল— এরা রাষ্ট্রবিরোধী, সরকারবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। আপনি এদের এ ধরনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখেছেন কি না?

প্র ম : সরকারবিরোধী বলতে কী বলতে চেয়েছে আমি জানি না। কিন্তু একদল বাঁচার তাগিদে এল, থাকল। সরকারবিরোধী বলতে সিপিএম যেটা বলতে চেয়েছিল তদানীন্তন সময়ে—বহিবির্শ্বের সঙ্গে যোগাযোগ, চোর-গুণ্ডার সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অনেকবার গেছি— আমার মনে হয় সে রকম কোনও ঘটনা ছিল না।

সাক্ষাৎকার : ৭ এপ্রিল ২০০৭



তারা জমি বাড়ি গরু বাছুর তাদের আসবাবপত্র জলের দামে বেচে দিয়ে, এমনকি একটা সাইকেল ৫০ টাকায় বেচে দিয়ে চলে গেছিলেন।

কারা দায়ী ?

অশোককুমার মালি

মালকানগিরি M V-7, জগন্নাথ পল্লি আমার গ্রাম। আমার মা-বাবা এখানে এসেছিলেন, ৬ একর ৩৬ সেন্ট জমি পেয়েছিলেন।

তৎকালীন দিনে আমি 6th Class এ পড়তাম তখন বাড়ীতে আমার বাবা ছিলেন না। তখন ১৯৭৮ সালের কথা। সকলে মিলে আলোচনা করছিলেন যে সকলকে মরিচঝাঁপি যেতে হবে। তার কিছু দিন আগে রাম চ্যাটার্জী এসেছিলেন মালকানগিরিতে। তিনি মিটিং করেছিলেন ৭ নম্বরে, বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করেছিলেন। সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। মিটিং করার পরে আমাদের উদ্বাস্তু সমিতির যেসব সদস্যরা ছিলেন বা বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ছিলেন তারা মিটিং করেন। পরে কি যে হলো আমাদের মালকানগিরি সেটেলমেন্ট পেয়েছিলেন যেসব বাঙালীরা, একে একে এবং দলে দলে সব চলে যেতে আরম্ভ করলেন এবং এতোই দুঃখের কথা যে তারা জমি বাড়ী গরু বাছুর তাদের আসবাবপত্র জলের দরে বেচে দিয়ে, এমনকি একটা সাইকেল ৫০ টাকায় বেচে দিয়ে চলে গেছিলেন। এরপর তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি ওখানে যাই। আমরা গিয়ে হাসনাবাদে, তখন তো আর

ঘর নেই। ঐ পলিথিন ২০/২৫ টাকায় কিনে, বাঁশ দিয়ে ছোট একটা ঘর করে, হাজার হাজার মানুষ ঐ ভাবে ঘর করে ছিলেন। তৎকালীন দিনের যে বীভৎস চেহারা বা বিভৎস দৃশ্য আমি দেখেছি তখন যদি আপনাদের মতো Video Camera থাকতো, কিংবা আমরা যদি বুঝতাম, যদি এগুলো উঠোনো হতো, বিশ্ব দরবারেও যদি দেখানো যেত সেই বীভৎস দৃশ্য বা বীভৎস চেহারা তবে আমাদের যারা প্রতিনিধি বা সরকার নিশ্চয় করে এর against-এ যেতো। অনেক ঘটনাই মনে আছে। আমাদের ওখানে হাসনাবাদের কাছে টাকিতে একটা ময়দানে বিরাট মিটিং হয়, ঐখানে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, এখানে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোকের বসতি দিতে পারবো না। তোমাদের আবার সেইসব জায়গায় ফিরে যেতে হবে এবং তোমাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করবো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করবো, এসব কথা বলেছিলেন। তৎকালীন দিনের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী এমনই কথা বলেছিলেন। উনিও এমনি ধরণের কথা বলার পরে আমাদের যেসব বাস্তুহারা মানুষ গুলো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি প্রাণ নিয়ে যারা ওখানে গিয়েছিলেন যে আমরা সুন্দরবনে গিয়ে বাস করবো এবং আমরা একটু সুষ্ট বসতি পাবো বা বাংলার বাঙালী ভাইদের সঙ্গে মিশে থাকবো, এই সব চিন্তাধারা করে তাদের মনে একটা রোষের সঞ্চার হওয়ার জন্য তারা লক্ষ লক্ষ লোক হাত উঁচু করে, জুতো উঁচু করে ওনাদের প্রতিবাদ করেন। ওদের কথায়, আমরা তো সব ছেড়ে এসেছি, আমাদের কিছু করুন। কিন্তু ওরা কিছু করতে চান নি এবং ঐ ভাবেই মিটিং বন্ধ হয়ে যায়। তারপর অল্প কিছুদিনের মধ্যে রাম চ্যাটার্জী মহোদয় ওখানে যান হাসনাবাদ স্টেশনের পেছনে যে জায়গাটা আছে সেখানে বিরাট একটা মিটিং হয়, তৎকালীন দিনে ভাষণে উনি কি কি বলেছেন, আমি অনেক দূরে ছিলাম তথাপি মানুষ এমনই উদ্বুদ্ধ হয়ে গেল যে ঐ মানুষ ইছামতি নদী পাশেই ছিল, তারা কোন ভয় করলো না তারা ঝাঁপিয়ে ওপারে চলে গেল, বিভিন্ন জায়গায় ঘাটে যে ডোঙা বা নৌকো বাঁধা ছিল ঐ সব এনে সঙ্গে সঙ্গে অপর পারে চর হাসনাবাদে যাবার চেষ্টা করলো এবং চলে গেল, এবং এমনই পরিস্থিতি সবারই একটা টান বাংলা মায়ের প্রতি যে আমরা মরিচঝাঁপিতে যাবো এবং সুন্দরবনে আমাদের সুষ্ট পুনর্বাসন হবে। তবে আমি একটা কথাই বলবো যে এই যে যাওয়া আসা এই পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের পদস্থ মন্ত্রীরা ছিলেন, নিশ্চয় করে একশোভাগ দায়ী। আমি ১১/১২ বছরের ছিলাম তখন, আমি ঐ জন্য বেঁচে গেছি। আমি যদি ৯ বছরের নীচে হতাম, নিশ্চয় করে বাঁচতাম না।

প্রশ্ন : মানুষ যে মারা গেছে এই রকম কোন ঘটনা জানা আছে ?

অশোক কুমার মালি : হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের গ্রামের কাশীনাথ বিশ্বাস। ওনার মা মারা গেল ৬০ বছরে, ডাইরিয়া হয়ে, খেতে পেলেননা ওষুধপত্র পেলেন না, ফলে

উনি মারা গেলেন। আমাদের তখন কোন ক্রিয়াকর্ম নেই ঐভাবে ইছামতির জোয়ার ভাটায় ফেলে দিয়ে আসা হতো। কথা প্রসঙ্গে আমার আরও একটা কথা মনে পড়ে। চর হাসনাবাদে দেড়দিন না খেয়ে আছি। দাদা সংসারে একমাত্র কর্ম করতেন, উনি বারাসাতের কোথাও একটা জায়গায় গেছেন। দেখছি ১৫/২০টা নৌকো একবারে চলছে মরিচঝাঁপির দিকে। চর হাসনাবাদ থেকে সকলে উলু ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছে। তখন মনে মনে ভাবছি আমাদের আরও একটি দিন মনে হয় না খেয়ে থাকতে হবে। কেন, কিভাবে কেমন করে বঙ্গলক্ষ্মী মনে হয়, দেখলাম একটা কাগজ পড়ে আছে মোড়ানো করে। যখন ওরা চলে গেল, কাগজটা উঠিয়ে দেখি দুটো দশটাকার নোট মোড়ানো অবস্থায় রয়েছে। আমি ভাবলাম একথা, ওরাতো সব চলে গেছে, যাক ভালো হয়েছে, ২০ টাকা পেয়েছি আজ মনে হয় চাল-ডাল কেনা হয়ে যাবে। এইভাবে আমি মাকে দিলাম, 'মা আর মনে হয় আমাদের না খেয়ে থাকতে হবে না, এই ২০ টাকা দিয়ে চাল কেনো, বড়দা আসলে নিশ্চয় করে টাকা পয়সা আনবে আমরা বেঁচে যাবো।' এমনিভাবে কত লোক না খেয়ে মারা গেছে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। একটা কথা বলি, যদি রামকৃষ্ণ মিশন না যেতো ওখানে, তাহলে হয়তো হাজার হাজার মানুষ এই ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট বলুন, আর আমাদের এই উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট বলুন তাদের মনে হয় এই বাঙালীদের জন্য কষ্ট করতে হতো না, তাহলে নিশ্চয় আধা মানুষ মারা যেতো, ৬০ বছরের উপরের মানুষ মারা গেছে দশ বছরের তলের শিশুরা মারা গেছে। আমার মনে ৬০% মানুষ মারা যেতো নিশ্চয়, এটা বাস্তব কথা। আমি রায় মঙ্গল পর্যন্ত গেছি, যেখানে তিনটা নদী মেলে, যে নৌকোয় আমি যাচ্ছিলাম আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে, আমাদের নৌকোটা প্রায় ডুবে যেতো। কিন্তু কিভাবে আমরা বেঁচে গেলাম। নৌকোটা চরে লাগার পরে, আমাদের ঐখান থেকেই একটা মনে ভাব হলো, ঐ রায়মঙ্গল থেকে অতদূরে আর যাবো না, ঐখান থেকেই ফিরে যাবো, আমাদের মনোভাব তখন হলো। আমরা ফিরে এলাম। এবং আরো মনে পড়ে 'রাইটার্স বিল্ডিং ঘেরাও করো' একথা যখন হয়েছিলো তখন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশরা হাবড়ায়, বারাসাতে ব্যারাকপুরে, উল্টোডাঙায় লাইনের ধারে যত পড়ে, বাঙালীদের বা উড়িষ্যা থেকে যে সব বাঙালী যাদের চিনতে পেরেছে, এদের তো পরনে বসন নেই, ঠিক মতো খায়নি, ধরে ধরে তাদের মারা হয়েছে, আমিও গিয়েছিলাম বারাসাত পর্যন্ত ছোট ছিলাম বলে হয়তো মারেনি, আমি এইসব দেখেছি।

প্র : মালকানগিরিতে আসার পর, আপনারা বাংলা ভাষাটাকে কিভাবে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ?

অ কু মা : আমি এক জন S.I .A Schools হিসাবে বলছি ১৯৮৮ সাল Central Govt যতদিন ছিলো ততদিন আমাদের বাংলা পড়া হতো, আমরা টোটাল

বাংলা পড়তাম। একটাই মাত্র কারণ যেহেতু আমরা উড়িষ্যায় থাকি বা উড়িষ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছি তাই আমাদের লোয়ার ওড়িয়া পড়ানো হতো, যেমন মনে করুন আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি আমরা টোটাল বাংলায় পড়েছি, ক্লাস ওয়ানের যে ওড়িয়াটা পড়ানো হয় সেই ওড়িয়াটা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানো হয়। কিন্তু কালক্রমে যখন Central Govt চলে যায় ১৯৮৮ সালের পর থেকে আমাদের বাংলা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ঐ সময় ১৮৫ জনকে চাকরি দিয়েছিলেন, MIL যাদের ছিল, তাদের চাকরি দিয়েছিলেন, MIL হচ্ছে Mother Indian Language। মাতৃভাষা যাদের বাংলা ছিল, তাদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কালক্রমে কি হয়েছে ঐ যে উমরকোট রয়েছে, মালকানগিরি, উমরকোট দুটো সাব-ডিভিশন দুটো উড়িষ্যার ভিতর দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু ছেলেরা চাকরি পেয়েছে, ওখান থেকে চলে গেছে, কালক্রমে এটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা আর চাই নি যে, পরবর্তীতে আমি যেমন সেভেন পর্যন্ত বাংলা পড়তাম, তারপর MIL টাকে ওড়িয়া করে দিয়েছি। MIL ওড়িয়াতে আমি চাকরি পেয়েছি, ভালো পদে চাকরি করছি। ভাষা অন্দোলনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করছি। আমাদের এখন উদ্দেশ্যে হচ্ছে যে 'কিশলয়' যে বই পশ্চিমবঙ্গে পড়ানো হয় one থেকে five পর্যন্ত একটা Subject, আমাদের One থেকে Five পর্যন্ত পড়ানো হোক। আর সব আমরা ওড়িয়াতে পড়বো, কারণ উড়িষ্যার আমাদের চাকরি করতে হবে, উড়িষ্যায় আমাদের বাঁচতে হবে। আমাদের সব আর বাঙলাতে চাই না, আমাদের মাত্র একটা Subject, আমাদের মাতৃভাষার Subject টি প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হোক।

সাক্ষাৎকার : ২২ জানুয়ারি ২০০৭



মরিচঝাঁপি হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন সমীর সমাদ্দার। বার বার আস্তানা পাল্টেছেন গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য। তাঁর খোঁজ পেলাম মধ্যপ্রদেশের শেষ সীমানায় ইন্দোর থেকে বাসে ২ ঘন্টার পথ পেরিয়ে ধার জেলা শহরে।

এমন বিশ্বাসঘাতকতা দেখিনি

সমীর সমাদ্দার

প্রশ্ন : মরিচঝাঁপির যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের সঙ্গে আপনি কিভাবে যুক্ত হলেন এবং তার পরে ওখানকার ঘটনাগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের কিছু বলেন।

সমীর : আফটার অল, যেটা হয়েছে দেশ বিভক্ত হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং তার পরে পূর্ববাংলার অসংখ্য মানুষ এই পশ্চিমবাংলায় এসেছে, আসার পরে প্রথম গভর্নমেন্ট তাদের থাকার জায়গা দিয়েছে, খাবার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই থাকার জন্য যে জায়গাগুলো এতোটাই দুর্গম যে সেগুলি মানুষের বসবাসযোগ্য জায়গা নয়, DNK প্রোজেক্ট বলতে যেটা বুঝি অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট, সেই প্রোজেক্টটা কেমন? যেমন মধ্যপ্রদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে বস্তার ডিস্ট্রিক্ট, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে কাগজনগর, মহারাষ্ট্র থেকে নেওয়া হয়েছে চাঁদাগড়চুরোলি, উড়িষ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে কোরাপুট। এই তিন প্রভিন্সের দুর্গম যে অরণ্য এরিয়া সেই অরণ্য এরিয়াতে পূর্ববাংলার মানুষদের এনে গভর্নমেন্ট এদের থাকতে দিয়েছে। তখন অবশ্য যেটা হয় বামফ্রন্ট বা তখনকার যারা নেতা ছিলেন তারা অনেকেই শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশন এসে বলতো যে না বাংলার

মানুষকে বাংলায় জায়গা দিতে হবে, বাংলার মানুষকে বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। পাঞ্জাবিদের যেমন করে জায়গা দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাবে, বাঙালিদের তেমনি করে বাংলায় জায়গা দেওয়া হবে। এই সুবাদে এখান থেকে এই রিফিউজিদের হাওড়া স্টেশনে নিয়ে এসে রায়পুরে ট্রানজিট সেন্টার, যেটা মানা, মানা কুরুদ এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখন কিন্তু বামফ্রন্টের আজকে যারা ক্ষমতায় আসেনি এরা সেই সমস্ত সময়ে এখানে এসে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এদের দিয়েছে, এরা তখন এইখানে মিটিং করেছে এবং মানুষকে বুঝিয়েছে যেহেতু আমরা বাঙালি তাই আমাদের বাংলায় জায়গা হবে এবং আমরা বাংলায় থাকব, বাংলার মাটিতেই বড় হব, কৃষ্টি কালচার যা কিছু আমরা বাংলায় করব। তবে আজ আমাদের কিছু নেই, ক্ষমতায় কংগ্রেস সরকার, আমরা কোনোদিন ক্ষমতায় এলে মনে রাখবেন, বাংলার পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত আপনাদের সমর্থনে গর্জে উঠবে। এই বক্তব্যটা জাম্বুবান ধোতে, তারপরে রাম চ্যাটার্জি, সমর মুখার্জি এরা এসে এসব বক্তব্য এখানে রাখত। আর এই নিরন্ন মানুষগুলো আশায় বুক বেঁধে বসেছিল যে কবে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় আসল, আসার পরে এই মানুষগুলো মনে করল যে হ্যাঁ আমাদের দরদী বন্ধুরা আজ ক্ষমতায় এসেছে। আমরা পূর্ববাংলার মানুষ। আমরা কৃষিজীবী, আমরা পশ্চিমবাংলায় জায়গা পাব। এই আশায় বুক বেঁধে এদের সঙ্গে পরামর্শ করেই বাইরের প্রভিন্স যে বাঙালিদের বাসযোগ্য জায়গা নয় সেখান থেকে তাদেরকে ঐ মরিচঝাঁপি দ্বীপে নিয়ে যাবার কথা ওরা তখন ওয়াদা করত। এইবার কী হল পশ্চিমবাংলায় যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল যে মানুষগুলোকে যে এতদিন ওয়াদা করে এসেছে তারা আশার আলো দেখতে পেল। এরা তখন কী করল জ্যোতিবাবু এদের বন্ধু, বামফ্রন্ট সরকার এদের নিজেদের সরকার, সেই আশায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষগুলো হাসনাবাদে গিয়ে হাজির হল। এবং যারা জ্যোতিবাবুদের সঙ্গে বৈঠক করেছে রাম চ্যাটার্জিদের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং যে বাম নেতারা ওখানে গিয়েছিলেন সবার সাথে কথা হয়েছে। ওরা একটা কথাই বলেছিল এদের যে ডেস্ট্রাকটিভ পয়েন্ট সে পয়েন্ট একটাই সেটা হল ওখানে বাঘ আছে, নোনাজল, জঙ্গল, সাপ আছে, পোকামাকড় আছে আপনারা কি এর ভিতরে গিয়ে ওখানে বসবাস করতে পারবেন? সেইদিন কিন্তু এই কমিটি বলেছিল, আমরা এটাকে পরোয়া করছি না। না আমরা কথা দিচ্ছি আমরা জঙ্গল থেকে কাঠ কাটব না, আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি জঙ্গল থেকে কোনো সম্পদ চুরি হবে না, আমরা কথা দিচ্ছি যে ১ কোটি টাকার মাছ প্রতি বছর আমরা সরকারকে দেব। সরকারের সঙ্গে বৈঠক হল, মানুষগুলো হাসনাবাদে এসে জমা হল, বৈঠক হওয়ার পরের দিন যেটা হল যে আমরা ওখানে যাব কি যাব না মরিচঝাঁপির দ্বীপে। কিন্তু যুগান্তরের

পাতায়, তারিখ আমার মনে নেই, যুগান্তরের পাতায় সেদিন এই বক্তব্যটাই লিখল যে বহিরাগত যে সব শরণার্থী এরা হাসনাবাদে ছিল আজ তারা নৌকায় করে মরিচঝাঁপির দ্বীপে যাচ্ছে এবং পুলিশ এবং বি এস এফ তাদের লক্ষ্য করছে। মানুষগুলো এই একটা দুটো লাইন পড়ে আশার আলো পেল যে সরকার আমাদের সমর্থন করছে, আমরা মরিচঝাঁপি দ্বীপে যেতে পারব, ইন ডাইরেক্ট সাপোর্ট এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা নৌকা ভাসালাম, মরিচঝাঁপির দ্বীপে গেলাম, কিন্তু সুন্দর বলতে যে জায়গা, সুন্দরবন বলতে যে জিনিসটা আমি পূর্ব বাংলাতেও দেখেছি, দ্বীপগুলোকে যে সুন্দর দেখায় সেই জন্য নামগুলো সুন্দর হয়নি। প্রচুর সুন্দর গাছ আছে, ঐ সুন্দর গাছের জন্য ঐ জায়গাটার নাম সুন্দরবন হয়েছে। কিন্তু আমরা যেখানে ছিলাম, সেই জায়গাটা সুন্দরবন নয়। সেই জায়গায় কোনো সুন্দর কাঠ নেই, গোলপাতা নেই, সেখানে কী হয়েছিল, ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলা থেকে মানুষগুলো যখন এই দেশে এসেছিল অত্যাচারিত হয়ে তখন ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সেই দিন এইখানটা ফাঁকা করে ঐখানে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ভাবছিল, এখানেই ক্যাম্প করে, খাওয়ানো দাওয়ানোর কথা ভাবছিল। সেইজন্য জঙ্গল কেটে সাফ করে ঝাউগাছ আর নারকেল গাছ বসিয়েছিল। আমরা তার মাঝখানে বসেছিলাম, কিন্তু জানি না এরা যে অ্যাক্টের কথা বলে যে, 'ফরেস্ট অ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্ট।' এই অ্যাক্ট যদি সত্যি হয় তবে সেইটা, সুন্দরবন এরিয়া পড়ে না। সেখানে একমাত্র গাছ গেউয়া গাছ বলে পরিচিত, আমরা জানতাম গেউয়া গাছ। ঐ গাছ এতটাই হালকা যে ঐ গাছ যদি জলের ভিতর পড়ে তো ২৪ ঘন্টার মধ্যে ভ্যানিস হয়ে যায়, পেঁপে গাছ যেমন জলে ফেলে দিলে একদিন দুদিন পরে পচে যায়, আঠা ছাড়া আর কিছু থাকে না, সেইরকম এই গেউয়া গাছ আমরা নষ্ট করেছি, আমরা কেটেছি। কিন্তু আমরা সুন্দরবনের ভিতরে গিয়ে সুন্দর কাঠ কাটিনি, আমরা সুন্দরবনের ভিতরে গিয়ে গোলপাতা চুরি করিনি, সুন্দরবনের ভিতরে গিয়ে সুন্দরবনের মাছ চুরি করিনি, আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সরকার কি দেখেছে আমরা জানি না, প্রথম প্রথম তো আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তারপর আস্তে আস্তে দেখলাম যে ব্যারিকেড বাড়তে শুরু হল এবং আমাদের মানুষজন অসহায় অবস্থায় ১ লক্ষ মানুষ ওখানে হাজির হল, এই ১ লক্ষ মানুষের না আছে কোনো খাবার জল, না আছে কোনো ওষুধপত্র, না আছে কারো ঘর। মাটির দেওয়াল দিয়ে কোনোরকমে আমরা ওখানে বসবাস করতাম। এই মাটির দেওয়ালের ঘরে আমরা চেয়েছিলাম যে ওখানে একটা নতুন জিনিস তৈরি হোক। আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি একটা ঝাউ গাছের পাতাও আমরা নষ্ট করিনি। তবে এট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার ১৪ দিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর মানুষ যখন ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে গেছে, আমরা তখন বলতে বাধ্য হয়েছি যে এই যে নারকেল গাছের গুঁড়ি আছে

যে ওর শাঁস তৈরি হয় যে তোমরা ওটা খাও। আমাদের পানীয় জল নেই, হাইকোর্ট থেকে অর্ডার এল ওদের খাবার জল সরবরাহ করার জন্যে, লঞ্চ ভরে খাবার আসল না, অসুস্থ লোকের জন্য ওষুধপত্র আসল না, লঞ্চ ভরে এল পুলিশ, টিয়ার গ্যাস, এল তাদের বন্দুক, ওদের মিলিটারি ফোর্স আমাদের তুলে নেওয়ার জন্যে। আমরা ওখানে বাজার করে ছিলাম, ইস্কুল করেছিলাম, খেলার মাঠ করেছিলাম, কোনোরকমে ওখানে সরকারের বিরোধিতা করিনি। বার বার কী করেছে যে নৌকোগুলো পারাপারের জন্য ছিল সেই নৌকাগুলোকে ওরা সিজ করেছে। এরা বলছে যে ওরা সুন্দরবনের ভিতরে গিয়ে কাঠ কাটছে, না আমরা তা করিনি। আমরা যে অপরাধটা করেছি সে অপরাধটা যে কত বড়, কতটা ছোট। সে অপরাধটা কী, ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী যখন ঐখানে জায়গা পরিষ্কার করেছে, সেইখানে যে ছোট ছোট গাছ ছিল সেই গাছগুলো গুঁড়ি, আমাদের লোক তুলে, ফর ফুয়েল বিক্রি করার জন্য নিয়ে যেত। এরা রামপুরা হাটে আমাদের নৌকোগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছে, নৌকাগুলি ডুবে গেছে, আমাদের ভাইয়েদের গুলি করে মেরেছে, তাদের লাশগুলিকে পর্যন্ত আমাদের হাতে দেয়নি। এই অত্যাচার ওরা করেছে, বারবার সরকারকে বলতে চেয়েছি, আমরা তোমাদের কথায় এসেছি আমাদের বাঁচার জন্য পায়ের তলায় একটু মাটি দাও আমরা তোমাদের জঙ্গল নষ্ট করব না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে আজ এই রামফ্রন্ট যে বামফ্রন্ট সরকার, যার আশায় গরিব মানুষ বুক বেঁধে বসে থাকে যে বামফ্রন্ট সরকার যদি কোনোদিন ক্ষমতায় আসে সেদিন মানুষ সুখী হবে। বহির্ভারত রাষ্ট্রে কাগজে দিয়েছে যে এরা প্যারালাল গভর্নমেন্ট করেছে, প্যারালাল গভর্নমেন্টের ওখানে মিলিটারি আছে এরা বাইরে থেকে অস্ত্রপাচার করে, না অত্যন্ত মিথ্যা কথা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে, না, এই রকম কুকর্মের মাঝখানে আমাদের কোনো লোক সেখানে যায়নি। এরা বিভিন্ন জায়গায় ব্যারিকেড তৈরি করেছে, যে ব্যারিকেডের জন্য কেন্দ্রীয় টিম পর্যন্ত আসতে পারেনি। আমি প্রফুল্লবাবুর বাড়িতে বসে বলেছিলাম যে আপনিই একমাত্র লোক যিনি পারেন এই এক লক্ষ লোককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, মোরারজী দেশাইকে আপনি বলুন যে মানুষগুলির জন্য যেন খাবার জলের ব্যবস্থাটা করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওরা ষড়যন্ত্র করছে ওখান থেকে আমাদের তুলে আনার, জানি না কোন কালবৈশাখির ঝড়ের কথা ওদের মনে পড়েছে। ওরা মরিচঝাঁপি দ্বীপ থেকে মানুষগুলোকে তুলে নিয়ে আসল। ওরা রাত্রিবেলায় ২টার সময় অসহায় মানুষদের উপর গুলি করেছে, সেই লাশগুলো মাটিতে পুঁতে দেয় নি, পোড়ায়নি, টাইগার প্রোজেক্টে নিয়ে গিয়ে ওরা বাঘকে খাইয়ে দিয়েছে। বাঘ লুফে লুফে খাচ্ছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুস্থ তারা মরেনি তারা চিৎকার করে বলছে যে আমরা মরিনি আমাদের বাঘ দিয়ে খাইও না। এই চরম নারকীয় অত্যাচার ওখানে হয়েছে। এট

দি ইলেভেন্থ আওয়ার আমরা যখন বললাম যে আমরা কিছুতেই এখান থেকে যাব না, আমরা এখানে বসেই মরব। তিল তিল করে আমাদের ৪২০০ মানুষ মারা গেল, ওরা গুলি করে মারল, বিনা চিকিৎসায় মরল আর না খেয়ে মরল। নীলকমল ব্যানার্জি যে অপারেশনটা চালিয়েছিলেন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে নীলকমলবাবু আপনি লঞ্চ নিয়ে কাছে আসেন, আপনার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের দিনে অন্তত মহাকরণে খবরটা দিন যে এই মরিচঝাঁপি দ্বীপের থেকে এই ১০টা অসহায় শিশুর লাশ আপনাকে উপহার দিচ্ছি। মানুষ কতটা নৃশংস হতে পারে, আমি জানি না জালিওয়ালাবাগে কী হয়েছিল, তিয়েনমেন স্কোয়ারে কি হয়েছিল আমি জানি না, কিন্তু মরিচঝাঁপিতে যা হয়েছে তা পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি। অপরাধ দেশ বিভাগ, অপরাধ দেশ দু টুকরো হয়ে যাওয়া, ঐ পূর্ববাংলার অসহায় না খাওয়া মানুষ, গরিব মানুষ এই অপরাধে আমরা অপরাধী। আর কোনো অপরাধ আমাদের নেই। আমরা ওখানে যেতে চেয়েছিলাম। যে পাশ্ববর্তী গ্রাম আছে আমরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুজনের কাছে গিয়েছি। ভাই আমরা তো তোমাদের শত্রু নই। ওরা আমাদের কাছে আসত, কথাবার্তা হত কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে মরিচঝাঁপির অপরপারে মোল্লাখালিতে উনি মিটিং করলেন এবং সেই মিটিং কেমন, 'এই লোকগুলি আসছে, ওরা বন দখল করেছে, কাল তোমাদের ঘরবাড়ি দখল করে নেবে। তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে যাও এদেরকে তাড়াতে হবে,' কিন্তু আমরা তাদেরকে তাড়ানোর জন্য যাই নি বরং সি পি এম সরকার কি করেছে, আমাদের নৌকাগুলো ফুয়েল নিয়ে যাচ্ছিল ঐ রামপুর হাটে ওরা সমস্ত ক্যাডারদের ওরা টাকা দিয়েছে। আজকে দিনবদলের পালা আসবেই, এটা তো নিশ্চিত। কিন্তু মরিচঝাঁপি মানুষের কথা কেন কেউ জানল না এটা বুঝতে পারিনি। তবে আমার যেটা মনে হয় যে একটু আলাদা জিনিস রয়েছে, যদি ঐ মানুষগুলো সিডিউল কাস্ট না হত, যদি মানুষগুলো না খাওয়া মজুর এই অপরাধে, এই অপরাধেই ওদেরকে ওখান থেকে উৎখাত করা গেছে, যদি ঘোষ, বোস, মিত্তির এর ভিতরেই থাকত গোটা ভারতবর্ষ ওদের বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিত। মরিচঝাঁপির মানুষ, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানত যে কত বড় অত্যাচার এখানে হয়েছে। আজ এই কাহিনি, আজ ইতিহাস, ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। কেউ জানল না, নীরব বিপ্লব, অসহায় মানুষের উপর গুলি, অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার, অসহায় মানুষকে জল না দেওয়া, মানুষ মরে গেলে মরার সময় হিন্দু মতে কেউ মৃত্যুমুখে আসে তার মুখে গঙ্গা জল দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা গঙ্গাজল তো দূরের কথা, পানীয় জল যা খেয়ে মানুষ বাঁচে সেই জলটুকু জ্যোতিবাবু আমাদের দেয় নি। আমরা কি করেছিলাম, আমরা ঘেরি করেছিলাম, চারিদিকে ব্যারিকেড করে বর্ষার জলকে আমরা আটকে রাখতাম, এই

বর্ষার জল আটকানো জল, এই জলে স্নান করা যেত, এই জলে জামাকাপড় ধোয়া যেত, কিন্তু এরা কি করল, রাতে এদের অনুচর দিয়ে সেই সব জায়গায় এমন বিষাক্ত জিনিস দিয়ে দিল যদি কেউ স্নান করে, স্নান করার পর মনে হবে যেন সারা শরীরে তার ফোসকা ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। এই চরম অত্যাচার এরা করেছে।

প্র : আপনাদের মধ্যে থেকে কি কাউকে কি কিনতে পেরেছিল যে তাকে আপনাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায় ?

স : একটা জিনিস হয়েছে কি আমি জানি না, তবে আমার ধারণা ওরা যেটা চেয়েছিল যে এই ভারত সরকার চায় মানুষের ভিতরে বিভেদ সৃষ্টি করে দেওয়া যায় তবে মানুষকে সহজে দুর্বল করে দেওয়া যায়।... অনেক প্রলোভন দিয়েছে। আমি যখন রামলাল বাজারে কালীদাসবাবুর বাড়িতে ওরা আমাকে অ্যারেস্ট করার জন্য চেষ্টা করেছিল সেদিন এই সিকিউরিটি আউট হবার কথা ছিল না। যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন বুঝতে পেরেছি যে প্রলুব্ধ হয়েছে। ঐ প্রলোভনের বশেই এটাকে ধ্বংস করতে চাইছে।

প্র : এই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসটা বললেন মরিচঝাঁপি নিয়ে তাতে আপনার ভূমিকা কী ছিল ?

স : আমিও ওখানে যে চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি করেছিলাম, হসপিটাল বলতে পারেন, সেখানে আমাদের সাহায্য করেছেন সাধন সেন, সাহায্য করেছেন ডাক্তার কালীদাস বৈদ্য, এরা ওখানে ওষুধ দিতেন, হসপিটালে তা আমরা রোগীদের দিতে পারতাম, আমাদের এখানে ঐ স্থানীয় মানুষ এসেও চিকিৎসা নিত। আমি সেই হসপিটালের দায়িত্বে ছিলাম। কিন্তু এই দায়িত্বটুকু হসপিটাল হয়ে গেলে সীমিত হয়ে যায়, তা নয়, আমরা চেয়েছিলাম যে প্ল্যান্টেশনটা কোনভাবে হবে, তার রাস্তা কোনদিকে থাকবে বাজার কোনদিকে থাকবে, খেলার মাঠ কোনদিকে থাকবে, কোনদিকে লোকবসতি থাকবে, আমরা সমস্ত ব্যবস্থা সেইভাবে করেছিলাম। এটা যৌথ প্রচেষ্টা, এটা ব্যক্তিগতভাবে যে আমার উপরে চাপানো তা নয়। টোটাল কোনো কিছু করতে গেলে আমরা সকলে একসাথে বসে তা করতাম। যেমন আমার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সতীশ মণ্ডল, সেক্রেটারি ছিলেন রাইহরণ বাড়ৈ। সতীশ মণ্ডল এই উন্নয়নশীল সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আমি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলাম। যাই হোক আমাদের ১৭ জনের একটা বডি ছিল। পবিত্র বিশ্বাস, সকলের নাম আজ মনে নেই রাধাকান্ত বিশ্বাস, এরা আমরা ছিলাম।

প্র : আপনি বলেছিলেন নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলে আপনাদের বাংলায় মরিচঝাঁপিতে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু যখন ক্ষমতায় এলেন তারা আপনাদের সঙ্গে বিরোধিতা করলেন। এই ব্যাপারে আপনার নিজস্ব মত কী বলুন ? কেন, কারণটা কী ?

স : আমি এই জায়গাটায় নিজেও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছি। রামবাবুকে শেষের বারে

আমি যখন ফোন করি, ফোন করার সময় আমার সঙ্গে স্বরাজবন্ধু চট্টরাজ ছিলেন। ওনার সঙ্গে 'তুমি তুমি' করে কথা হয়, অত্যন্ত কাছের মানুষ। উনি সেদিন রাম চ্যাটার্জিকে লক্ষ্য করে যে 'রাম কী ব্যাপার! রাম, এই মানুষগুলি তো তোদের কথার উপরেই বিশ্বাস করে এসেছে, তোর চেয়ারটা কি অত্যন্ত বড় হয়ে গেল, তুই এই মানুযগুলোর কথা কি একটু ভাবলি না? মানুষগুলোর কথা একটু ভাব, মন্ত্রীত্ব আজ আছে কাল থাকবে না, তুইও না থাকতে পারিস কিন্তু এই অসহায় মানুষগুলোকে তোরা কুরুদ, রায়পুর বিভিন্ন জায়গায় বলে এসেছিস যে পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত তোমাদের সমর্থনে গর্জে উঠবে। আমরা ক্ষমতায় এলে তোমাদের পশ্চিমবাংলায় পুনর্বাসন দেব। আমি তো সেই রাম চ্যাটার্জিকে খুঁজছি।' আমি বললাম, যে আজকের রামদাকে আমি চাচ্ছি না, আমি সেই রামদাকে চাচ্ছি যে মানায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে কুরুদে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে মানকানগিরি গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যে চাঁদায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এইসব মানুষকে বাংলায় আমি নিয়ে যাব যদি আমাদের কোনোদিন সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এরা কী বুঝেছে আমি জানি না।

প্র : আপনি একটা কথা বলেছিলেন আপনারা এক কোটি টাকার মাছ সরকারকে দিতে পারেন বা এই এক কোটি টাকার মাছ উৎপাদন করতে পারবেন, সেটা কিভাবে ভেবেছিলেন?

স : সুন্দরবন সম্পর্কে যে জিনিস, চারিদিকে জল খুব সহজ জিনিস, যখন জোয়ার আসে হাই টাইড, জোয়ারে যখন কানায় কানায় ভরে যায় ঐ মাছগুলো বাইরে থেকে আসে, বাইরে থেকে ওখানে আসার ফলে, যখন জোয়ারের জল চলে যায় জাল পেতে রাখলেই তখন মাছ পাওয়া যায়। আমরা ঠিক সেইভাবে চাইছিলাম না, আমরা চাইছিলাম যে এই ছোট ছোট যে প্লট আছে তাতে ছোট ছোট ভেড়ি করে যে মাছটা পাব, তাতে কম করে যে পরিমাণ মাছটা পাবো, পশ্চিমবঙ্গের লোককে এক কোটি টাকার মাছ দিতে পারবো। উৎপাদন শুরু হয়েছিল, আমরা যে বৃষ্টির জল বেঁধে ঐ নোনা জলের মধ্যে চিংড়ি মাছ দিয়েছিলাম এবং সেই মাছটা যখন ম্যাচিওর হয়েছে আমরা ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে। ওদের পুলিশ দিয়ে হোক কিংবা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দিয়ে হোক সেগুলিকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, আমাদের দেউলিয়া করে দিয়েছে।

প্র : একটা জিনিস পরিষ্কার করুন আপনারা নদী সমুদ্র থেকে মাছ ধরে, এটার মূল্য কোটি টাকা ধরছিলেন? আপনারা যে মাছ চাষ করছিলেন...

স : আমার দুটো জিনিসই মিলিয়ে, একদিকে আমরা চিংড়ি মাছের চাষের জন্য ভেড়ি করেছিলাম সেই ভেড়ির যে মাছ। দ্বিতীয়দিকে, এই যে জোয়ার ভাটায় যে মাছ আসে আমি বলেছিলাম যে এই সব মিলিয়ে, একেবারে কম যদি হয় তাহলে পশ্চিমবাংলার মানুষকে এক কোটি টাকার মাছ দেব।



প্র : ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা আইন আছে যে আইনে বাধা আছে মরিচঝাঁপি দখল করার, কিন্তু প্রথম দিকে বলছিলেন যেখানে যেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশ, বস্তার DNA প্রোজেক্ট, যেগুলির কথা বলেছিলেন সেগুলি তো সবই ফরেস্ট এরিয়ার ভিতরে... ফরেস্ট আইন কী সুন্দরবনের জন্য একরকম আর যে সাতটা প্রোজেক্টের কথা বলছেন, প্রোজেক্টগুলো যে ফরেস্টগুলো আছে, তার জন্য আলাদা আইন আছে ?

স : এইখানেই একটা মজার সমস্যা আছে। আমি মালকানগিরির যতটুকু জায়গায় যেতে পেরেছি, সেখানে যারা আছে, তারা কিন্তু পারবে না একটা গাছের ডাল কাটতে, ঐ জঙ্গলের সাপ যদি ঘরে আসে তাকে মারতে, পারবে না ওখান থেকে ঐ বুনো শুয়োরের অত্যাচারে ফসল নষ্ট হচ্ছে সেগুলো মারতে। তাদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে না, ঘরে এসে রেঞ্জার যদি কাঠের কোনো ফার্নিচার দেখে সেগুলিকে সিজ করে নিয়ে যায়। এটা বাংলার বাইরে হচ্ছে। কিন্তু আজকের মরিচঝাঁপিতে যে দ্বীপ সেটা তো কোনো অ্যাক্টের বাইরে। কিন্তু আমরা তো মরিচঝাঁপির দ্বীপে সেভাবে যাইনি, আমরা মরিচঝাঁপি দ্বীপের বাইরে, আমরা টাইগার প্রোজেক্টের বাইরে, আমরা ক্রোকোডাইল প্রজেক্টের বাইরে, এটা তো একটা চর, মরিচঝাঁপির দ্বীপটা সেই সুন্দরবন দ্বীপ নয়।

প্র : বেশ কয়েকটা নলকূপ আপনারা বানিয়েছিলেন, জল যে ওরা আটকে দিল তাতে অসুবিধা কেন হল ?

স : এই জল আমরা যখন এই নলকূপ ছিল না এক দুইটি পাইপে তো জল আসত না। ৪/৫টা পাইপ দিলে তবে মিষ্টি জল পাওয়া যেত। আমরা যে টিউবওয়েল বসিয়েছিলাম কলকাতারই ওনার নাম মনে নেই, উনি এগুলো দিয়েছিলেন, দেখুন কী জঘন্যতম জিনিস এরা রাতের অন্ধকারে ঐ টিউবওয়েল খুলে নিয়ে চলে গেল। এদের ক্যাডার বাহিনী হোক, যে বাহিনী হোক। এই টিউবওয়েলগুলি খুলে নিয়ে চলে গেছে।

প্র : আপনি বলেছিলেন, আপনাদের সঙ্গে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, ইনি কে ছিলেন ?

স : এই সন্ন্যাসী, নাম সমীরণ ঘোষ, আমার সঙ্গে ওনার পরিচয় ঘটে তখন ওনার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে কিংবা ১/২ বছর কমবেশি হবে। হঠাৎ একদিন হসপিটাল বলুন কিংবা চেরিটেবল ডিসপেনসারি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন, আমার মনে আছে একটা ছেলের টাইফয়েড হয়েছে আমার চিকিৎসা দিয়ে বাঁচাতে পারব না। একদিকে বিধবা মায়ের কান্নার চোখের জল দেখছি, ঠিক সেই সময়ে সেই সন্ন্যাসী ওখানে গিয়ে উপস্থিত। তিনি বললেন, 'কি হয়েছে ডাক্তার তোমার রোগীর কী হয়েছে, তোমার চোখে জল মায়ের এত চোখের জল কেন, দেখি আমি একবার দেখি।' আমি বললাম, 'আসুন, মনে মনে ভাবলাম যে দেবদূত, হিন্দি ভাষায় যাকে বলে চমৎকার।' হেসে বললেন, 'বাপ্টিসিয়া আছে।' আমি সেই অসুখের নাম কোনোদিন ভুলব না। ছেলেটার হাত পা খিঁচুনি চলছে। উনি ছেলের মুখে একফোঁটা ব্যাপ্টিসিয়া দিয়ে ছেলেটাকে সুস্থ করলেন। সন্ন্যাসীর কাছে যতবার গেছি উনি আমাকে স্নেহের চোখের দেখতেন। উনি একদিন রাত ৮টায় এসে বললেন, 'চল ডাক্তার এখনি বেরুতে হবে। তুমি তোমার টিম নিয়ে চল।' বললাম যে কোথায় ? তিনি বললেন, 'এত প্রশ্ন করলে হয় ? টিম নিয়ে চল, এক্ষুনি বেরোতে হবে।' নৌকোয় উঠলাম। রাতের অন্ধকার, আপনি তো চিনবেন রায়মঙ্গলের ঘোলা বলে ওরা, সেই ঘোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি, চোখে তো দেখিনি। শুনেছি সেই ঘোলায় লঞ্চও টেনে নিয়ে যায়, আমি একপাশে বসা উনি আমার বাঁদিকে বসা, আমি মনে মনে ভাবছি যে সকলে জানে যে আমি মরিচঝাঁপির দ্বীপে আছি। মরিচঝাঁপির দ্বীপের লোক জানে আমি কোথাও যাচ্ছি সমীরণ ঘোষের সঙ্গে। এই ফিলিংস আমার যখন হচ্ছে যে আমার সলিল সমাধি হয়ে গেছে। আমার নামটাও ওদের দলে হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'চল ডাক্তার, রামপুরায় এসে গেছি।' জানি না এসব কী করে হচ্ছে। একদিন এসে বললেন, 'চল ডাক্তার বনদেবীর পুজো করতে যেতে হবে। ছোলা নাও, ফ্লাস্কে দুধ নাও, আর একটু বেশি করে জল নাও।' রাতের বেলায় নৌকো করে গেলাম। টাইগার প্রোজেক্ট চারিদিকে বাঘ ডাকছে। নৌকা থেকে নামলেন সেখানে পুজো দিলাম। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটা যুগ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওনার ভিতর সেই

জিনিসগুলো নেই। উনি নির্বিকার। ওনার সঙ্গে অন্য নন-বেঙ্গলী ভদ্রলোক ছিল, তার নাম মনে নেই। কী হল পুজো দেওয়ার পরে ভোর হয়ে গেছে। উনি বললেন, 'আমি একটু ঘুরে আসি,' বলে উনি চলে গেলেন, খালের পাড় দিয়ে উনি চলে গেলেন। জোয়ারে আমরা ফিরে আসব, সবাই ব্যস্ত হচ্ছে, নৌকো ছাড়তে হবে, কিন্তু ওনাকে রেখে কি করে আসব। সতীশবাবুকে এসে কী বলব যে সমীরণ বাবুকে কোথায় রেখে এসেছি। লোকজনকে বললাম, 'চল ওনাকে খুঁজতে যেতে হবে, কিন্তু আগে টাইগার প্রোজেক্টের ভিতর আমরা যাব। কে আগে যাবে, ঠিক করলাম। মরতে যখন হবে, আমিই আগে যাব। কিছু দূরে গিয়ে দেখি ওনার কৌপিনটা গাছের উপরে টাঙানো আছে আর একটা বাঘ সদ্য পেরিয়ে গেছে তার গায়ের জল আছে, তখন ভাবলাম উনি এখানে স্নান করছিলেন এবং বাঘের গায়ের জল যখন তখন বাঘ ওনাকে টেনে নিয়ে গেছে। আর ওনাকে পাওয়া যাবে না। ওখানে বসে চিৎকার চেঁচামেচি করলাম, অনেকক্ষণ পরে উনি শব্দ করলেন, কী ব্যাপার ডাক্তার আমি এখানে, আমি তাকে ওখান থেকে আনতে পারলাম না, আমার সঙ্গে আরও একজন ছিলেন, আমি ওনাকে অনুরোধ করেও আনতে পারিনি। তিনি বললেন, 'তুমি সতীশবাবুকে বলবে আমি এখানে আজ-কাল-পরশু থাকব, তিনদিন পরে আমাকে ফোটা বলে একটা নদী আছে ওখান থেকে যেন তুলে নিয়ে যায়।' টাইগার প্রোজেক্টে উনি ৭২ ঘণ্টা কাটালেন, মনে মনে ভাবলাম ওনাকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না। এই সন্ন্যাসী আমাদের সাথে ছিলেন। একদিন উনি আমাকে ওনার বাড়ি কলকাতায় নিয়ে আসছেন, কলেজ স্ট্রিটে পাশে ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগারের কাছে কোথাও থাকতেন, ওনার বিধবা মা, ভাড়াটিয়ারা ৫ টাকা করে ভাড়া দেয়, মাকে বোঝালেন ওদের অবস্থা কত খারাপ তোমার তো চলে যাচ্ছে তোমার অসুবিধা কোথায়? তোমার তো খরচ কিছু নেই, উনি ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগারে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে অনেকের সঙ্গে পরিচয় ঘটালেন। ওনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছে বনগাঁয় বর্ডারে, আমি তখন ১৯৮১/৮২ তে হবে। আমি নদীয়ার হরিণঘাটায় থাকি খবর পেলাম উনি বনগাঁয় আসছেন, মহেশ আমাদের বাড়ির সদস্য, আমার সাথে ছিল। উৎকণ্ঠায় ছিলাম। ওনার সঙ্গে দেখা হল, আমি তাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, কম কথা বলতেন, শুধু বললেন, 'আমি বাংলাদেশে যাচ্ছি।' শেষ খবরটা যেটা জানি উনি বাংলাদেশের জেলে ছিলেন। এক আত্মীয় মারফৎ জানতে পেরেছিলাম যে উনি ঢাকা জেলে আছেন। উনি কথা কম বলতেন, মরিচঝাঁপি থাকাকালীন, আমরা সব ঘরে গিয়ে উঠতে পারিনি, কিন্তু উনি ঘুরে ঘুরে সব বাড়িতেই যেতেন। গিয়ে সকলের খোঁজখবর নিতেন। দরদের সঙ্গে সকলের প্রাত্যহিক জীবনের খবর নিতেন। তিনি কোনো আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

সাক্ষাৎকার : ৩০, ৩১ মে ২০০৬



৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে পুলিশের গুলিতে স্থানীয় মানুষ মেনি মুণ্ডা মারা গিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার মেনি মুণ্ডার মৃত্যুর দাম দিয়েছিলেন ৫ হাজার টাকা তার পরিবারকে। 'নিতাই মুণ্ডা' মেনি মুণ্ডার ভাই। তার দেখা সেদিনের বিবরণ।

এর একটা বিচার হোক

নিতাই মুণ্ডা

প্রশ্ন : আপনার নাম, আপনার বাড়ি ?

নিতাই মুণ্ডা : নিতাই মুণ্ডা, কুমিরমারি, মৃধা ঘেরি।

প্র : কী করেন আপনি ?

নি মু : এই খাটাখাটনি করে খাই।

প্র : ১৯৭৮/৭৯ সালে কুমিরমারিতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল মরিচঝাঁপিতে, তাতে আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু বলুন।

নি মু : আমি নদীর থেকে ইটের নৌকা নিয়ে বুধবারের হাটখোলায় উঠেছিলাম। হাটখোলা থেকে পুলিশের সঙ্গে আমি বাড়ি যাই। বাড়ি যেয়ে দেখি আমার বাড়িতে লোক ভর্তি। তা পুলিশরা বলল, আপনি যেতে পারবেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ আমি যেতে পারব। বলল, চেঙ্গা ছোড়াছুড়ি করছে, তা আপনার ক্ষতি হবে নাতো ? আমি বললাম, না আমার ক্ষতি হবে না। কিছু দূর আগিয়ে যাওয়ার পরে, টিউকল (টিউবওয়েল) ছিল, টিউকলের কাছ থেকে মানে গুলিগোলা শুরু হল। বাড়ি যেইয়ে দেখি যে লোক আমার ভর্তি। তারপর, পুলিশরা আমার বাড়িতে ছিল, যাওয়ার

পরে, জিজ্ঞেস করল, এ্যাই বাড়িতে কোনো লোক আছে? আমি বললাম, না, বাড়িতে কোনো লোক নেই। তখন বাড়ির খোলে প্রচুর লোক ভর্তি হইগেছে। আমি এই কথা বললাম, বাড়িতে কোনো লোক নেই। আমি ফিরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মার, একটা বাড়ি দিছিলো, বাড়ি দেওয়ার পর, দিদিদের বাড়ির দিকে আসতি আমার ভগ্নীকে গুলি করল মাইতে, ভেড়ির কোণা থেকে গুলি করল মাইতে। মাইতে গুলি করার সাথে সাথে দিদি পড়ি গিইছিলো। আমরা আঁচড় কামড় করছি, দিদি তখন ধান তুলছিল বাড়ির মধ্যে, কিছু সময় পরে পুলিশ এসে ধরে লঞ্চে তুলি নিয়ে গেল। আর কিছু মেয়েছেলে ওদের দেখে ছুটি পালিয়ে যাচ্ছিল, সেই মেয়েছেলেদের চুলে মুঠি ধরেছে, ধইরে বাইন গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে কাতানের কোপ দিয়েছে। এটা পুলিশরা করেছে। আমাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, কুমিরমারিতে, মৃধা ঘেরিতে। এইসব হল, হবার পরে বস্তায় পুরে সব লঞ্চে তুলে নিয়ে চলে গেল। নিয়ে গেল বাগনা পিট হয়ে পাকিস্তানের দিকে (বাংলাদেশ) যে বড় নদী, সেই বড় নদীতে ফেলি দিয়েছে। ফেলি দেওয়ার পর ওনারা যখন চলে গিলি, তারপর সেই লোকজন ছিল আমার বাড়িতে। তারপরে বললাম, ভাই, এবার সব ফাঁকা হই গেছে, আস্তে আস্তে তোমরা সরে যাও।

প্র : কুমিরমারির দিকে গুলিটা কেন চলল?

নি মু : গুলিটা কেন চলল? রিফুজিরা [রিফিউজি] ছুটে যাচ্ছিল ...রিফুজিরা নদীর থেকে উঠে আমাদের উঠোনের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওদের গুলি করেছে।

প্র : রিফিউজিরা পুলিশকে আক্রমণ করেছিল?

নি মু : ওরা চেঙ্গা টেঙ্গা নিয়ে আসছিল, ভয়েতে ওরা ছুটেছে তখন এরা গুলি চালিয়েছে। সম্পূর্ণ গুলি চালিয়েছে ওদের মারার জন্য। বহু লোক তো মরেছে। আর সামনে পেয়ে মেয়েছেলেরা যারা দৌড়াতে পারেনি, তাদের চুলের মুঠি ধরেছে বাইনগাছের নিচে নিয়ে যাইয়ে কোপ দিতেছে কাতান দিয়ে। এই এত বড় কাতান দিয়ে কোপ দিয়েছে। এটা আমি নিজেই দেখেছি সব কিছু।

প্র : পুলিশ ওদের উপর গুলি চালাল বা আক্রমণ করল এর কারণটা কী?

নি মু : কারণ কি ওনাদের ওপারে ১ সপ্তাহ পারাপার বন্দ, তাহলে আমাদের খাইদ্য না থাকলে, যে কোনো পথ করতে হবে। পারাপার যে কোনো পথ না করলে, আহার মিটোতে হবে। এই কারণে ওনারা ঐ পার থে সাঁতার দি এইসে, তখন মানে যে আসে, মানে লঞ্চও চালিয়ে দেয়, ওনাদের যে হেড, তার পা কেটে গিছিল, সে লোক যায় আঁচড় কামড় করে এই সে বাড়ির খোল আলার উপরে ছিল। যে হেড তারে আমি বাঁচিই দিলাম। যে বাবা বলেছিল আমায়, তারে বাঁচিই ছিলাম। ৬০/৭০ জন লোক, আমার ঘর বড় ছিল, তাদের বাঁচিয়ে

ছিলাম। নামটা আমি বলতে পারব না দাদা। এইটে আমি... তবে ওখানকার সে হেড ছিল।

প্র : আমরা শুনেছি এখানকার লোকদের দৈনিক মজুরি দিয়ে মরিচঝাঁপি নিয়ে গিয়ে ঘরদোর ভাঙা ও জ্বালানোর কাজ করেছিল, এই ব্যাপারে আপনি কি জানেন?

নি মু : এর পরে ওখানকার ঘরবাড়ি যা কিছু ছিল আমাদের স্থানীয় লোক নি যেইয়ে মজুরি দিয়ে বাড়িঘর সব ভাঙিছিল। বাড়িগুলো সব ভেঙে নিয়েছে, কাটকুটো সব ঝাড় দিয়ে auction-এ মালটা বিক্রি হইয়েছে।

প্র : আপনাদের উদ্বাস্তুরা কোনো ক্ষতি করেছিল?

নি মু : কোনো দিন ওনারা আমাদের ক্ষতি করেনি। ওনারা আমাদের সাহায্য করেছে কাঠ কুটো দিয়ে। আমরা যা পেরেছি সাহায্য করেছি। জল হোক, চাল হোক দিয়ে সাহায্য করেছি।

প্র : বিয়ে থা হয়েছে আপনাদের কুমিরমারি সঙ্গে ওদের কোন?

নি মু : হ্যাঁ, বিয়ে থা হয়েছে। আছে। এখানে এই, সাতজেলিয়ার মেয়ে, আমার বাড়ির উপরেই ছিল সে। আমি তাদের চিনি।

প্র : কুমিরমারি বাজার থেকে কতদূর বাড়ি আপনার?

নি মু : বুধবারের হাটখোলা থেকে বাঁকের মাথে, আমাদের বাড়িটা হচ্ছে মির্ধা ঘেরি, রাসমেলা হয় আমাদের বাড়ির সামনে। বুধবার হাটখোলা। কুমিরমারি থেকে সাতজেলিয়া ১০ টাকার পথ। এখানে আইতে গেলে ১০ টাকার পথ।

প্র : ওরা যে এসেছিল, আপনাদের কোনো ক্ষতি, সরকারের কোনো ক্ষতি কি তারা করেছিল?

নি মু : না, ওনারা যে এসেছিল কোনো ক্ষতি না করা সত্ত্বেও ওনারা পেটের দায় অনেক কিছুই তো করতি পারে, ধরো কাট কেটে হোক, চুরি চামারি কোনো কিছু হয়নি, ওই কাট কেটে ওনাদের খোরাকটা নিরভার (নির্বাহ) কইরতো, ওটা আমার জানা নেই যে ওরা চুরি চামারি কইরতো।

প্র : আপনি মরিচঝাঁপি গেছেন, ওখানে কী কী দেখেছেন?

নি মু : হ্যাঁ গিছি। ওপারে কাট এনে করাত দি কাটতো, নৌকা তৈরি কইরতো, নৌকা তৈরি করি সেই নৌকায় কাট নিয়ে আইসতো, এপারে এনে, মাথা মুটি করি বিক্রি করতো, পেটের জ্বালায় কুমিরমারি নিই আইসতো, মোল্লাখালি নিই আইসতো, এরকম বিভিন্ন জাগায়, মেয়ে হোক, ছেলে হোক সবাই নিই আইসতো। মুদিখানার দোকান ছিল, জিলিপির দোকান ছিল, রুটির কারখানা হইছিল, বলখেলার মাঠ হইছিল, সিনেমা হইছিল, থিয়েটার হইছিল, আমরা দেখতে গিইছিলাম। সেখানে ওনাদের সাথে বল খেলা করিছি, রুটির কারখানার ধারে, রুটিও খেয়ে এসেছি। যেমনি পারাপার বন্ধ করে দেছে, কিছু নারকেলের চারা ছিল, ওই খেত।

প্র : আপনি মৃত্যু দেখেছেন, গুলিতে মরা, না খেয়ে মরা ?

নি মু : যখন হেঙ্গামার (হাঙ্গামা) সময় তো ? তখন যাই নি। আগে আমি পারাপার করতাম। ওই বন্ধটা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ধরুন পারাপার করতে গেলে পুলিশ নৌকো নিয়ে চলে যাবে। সেই ভয়েতে আর পারাপার করতাম না। সরকার থেকে লঞ্চ তুলে দেয়। কত মরে আর দেখার সময় নেই।

থাকলি কি হবে ভাই ! ধরো দেহটা হারিয়ে গেলে মুখ থাকলে, কেউ তো কারো নয়। এই যে কুমিরমারি থেকে এসেছি, যত সময় কাজ করি তত সময় নিরভর করি। মানে খাটনির পরে সব কিছু। ওই জঙ্গলে নি যেতাম বাগদা (বাগদা চিংড়ি) মারতাম। হঠাৎ যদি বলে যে দাদা এইরকম যেতে হবে। আমি বলি, যাব কি করে পথ খরচ কোথায় পাব, আর একটা দিন গেলে তো অনেক খরচ। এর উপায় কি হবে, বলে চলো যা হয় হবে। এইভাবে এই পর্যন্ত আসা।

প্র : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, অবিচার যেটা, মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার, মানুষ হয়ে যে মানুষকে হত্যা করেছে, এটা কি উচিত কি উচিত না ?

নি মু : উচিত না, এই হত্যা করাটা উচিত না।

প্র : এর বিচার হওয়া কি উচিত ?

নি মু : এটার বিচার হওয়া উচিত। মেরে দিলে তো ফুরিয়ে গেল। জীবত (জীবিত) থাকি লড়াই কর, শান্তি আছে। আপনি কি আমি হই মেরে দিলে তো দাম থাকলো না। এর একটা বিচার হোক আমি মনে করি, আমি এটাই বলছি বিচার হোক, স্বাধীন ভাবে থাকি এর বিচার হোক।

সাক্ষাৎকার : ৭ এপ্রিল ২০০৭



তখন মরে যাচ্ছে মা। আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে।... তখন কটা লোক আসলো নিয়ে চলি গেল, লঞ্চে তুলি দিল মাকে, পুলিশি।

মেনি মুণ্ডা আমার মা

রাম মুণ্ডা

প্রশ্ন : যেদিন আপনার মা পুলিশের গুলিতে মারা যান। কিভাবে গুলি চলে?

রাম মুণ্ডা : আমি তো ছিলাম, লোকের বাড়িতে ছিলাম, বোঝলে, কাতু ঘোষের বাড়িতে ছিলাম, বলল যে তোদের বাড়ির দিক কি হয়েছে দেখে আয় তো। আইসে দেখলাম যে মা একেবারে পড়ি গেছে, সত্যি ঘটনা। আর বাচা বুনডা একটা ছোটো ভাই ছিল সেই ভাইটাকে নিয়ে পালিয়ে চলি গেল ঐদিকে। আচ্ছা, সত্যি ঘটনা যেটা চোখে দেখিছি সেটা বলছি। বড় ভাইটারে দেখতে পাচ্ছি দুটো পুলিশ এসে এখানে ঘুসি মারছে ওখানে ঘুসি মারছে। আঃ উঃ করতিছে। বাবা অঞ্চলে চলি গেল, আমি যেটা চোখে দেখিছি ওটা বলবো। সঠিক দেখলাম বাবা চলে যাচ্ছে। মা বলছে তুমি কোথায় যাচ্ছ, তখন মরে যাচ্ছে মা, আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে। তখন কটা লোক আসল। এসে নিয়ে তখন চলি গেল, লঞ্চে তুলে দিল মাকে, পুলিশি।

সাক্ষাৎকার : ২৪ এপ্রিল ২০০৭



সন্তোষ সরকার ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯ তে মরিচঝাঁপির অভুক্ত উদ্বাস্তুদের জন্য খাদ্য আনতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হন। তার ১টি পা কেটে বাদ দিতে হয়। সেই পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষী তিনি নিজেই।

ব্লকেডের সময়

সন্তোষ সরকার

১৯৭০ সালে বাংলাদেশ থেকে আসি। এসে উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল, রুদ্রপুর ক্যাম্পে। রামবাগ কলোনী। আমার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ১৪/১৫ হবে।

প্রশ্ন : যখন মরিচঝাঁপিতে আসেন তখনকার স্মৃতিগুলো আপনার মনে আছে?

সন্তোষ : হ্যাঁ, তখন মোটামুটি কিশোর যৌবনে পদার্পণ করার সময়।

প্র : মরিচঝাঁপিতে আসাটা যখন শুরু হয় আপনি কোন পর্যায় আসেন প্রথমদিকে না শেষের দিকে?

স : শেষের দিকে।

প্র : ওখানে আপনার পা-টা হারালেন কী করে?

স : পাটা গেল, আমি যখন ওখানে যাই, পুলিশ ওখানে ব্যারিকেড করে জানুয়ারিতে, জানুয়ারির শেষের দিকে। সেসময় পুলিশ ব্যারিকেড করার পর ১৪৪ ধারা আইন জারি করে দিয়ে প্রত্যেকের ওখানে মরিচঝাঁপিতে যারা ছিল, তাদের পারাপার বন্ধ করে দেয়। মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে, উদ্বাস্তুদের ওখানে থেকে তোলা।

সেই মতো অবস্থায় ৭/৮ দিন আমরাও ব্যারিকেড করলাম যাতে পুলিশ না ওঠে, পুলিশ ব্যারিকেড করল যাতে আমরা পারাপার না হই। এইরকম অবস্থায় ৭/৮ দিন কেটে গেল, তখন মানুষ অনাহারে, ক্ষুধার্ত মানুষ, না খেতে পেয়ে বাচ্চারা, বুড়োরা ওখানে মারা যেতে লাগল ডায়রিয়ায়। এই রকম একটা অবস্থায় যখন দেখা গেল, যদুপালং খেয়ে, নারকেল গাছের মাথি খেয়েও আর কোনো রকম খাওয়ার সংস্থান নেই, তখন নেতারা ঠিক করে যে ওখান থেকে কিছু মহিলাদেরকে তিনখানা নৌকায় করে, কাঠ বোঝাই করে পারাপার করাবার চেষ্টা করে। মানে ১৪৪ ধারা আইনটা ভেঙে যাতে অন্য বাজারে যেয়ে কাঠগুলো বিক্রি করে কিছু খাবার সংগ্রহ করতে পারে। নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল যদি মহিলাদের দিয়ে পারাপার করানো হয় তবে হয়তো ওদের উপর অত্যাচার হবে না। কিন্তু দেখা গেল অটোমেটিক মাঝ পথে যখন গেছে নদীতে, অটোমেটিক লঞ্চ দিয়ে নৌকোগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হল। মহিলারা তখন সাঁতার কাটতে লাগল, কেউ কেউ তলিয়েও যেতে লাগল। ঐখান থেকে ঐ অবস্থায় আমি তখন খেতে বসেছিলাম, ফেনা ভাত মা দিয়েছিল, সেই খাওয়া আর হয়নি। চিৎকার শুরু হয়ে গেল। তখন আমি ছুটে আসি নদীতে দেখি কেউ কেউ ওদেরকে উদ্ধার করছে। আর পারাপারের চেষ্টা করছে ওপারে যাবার জন্যে। আমি একটা নৌকায় উঠে পড়লাম এবং উদ্ধার কাজে লাগালাম। তারপরে, আমরা ১৪৪ ধারা ভেদ করে মহিলাদের কিছু উদ্ধার করার পর আমরা ওপারে কুমিরমারিতে চলে যাই। যখন কুমিরমারিতে যাই তখন পুলিশ ক্যাম্প ছিল। পুলিশ ক্যাম্পে থেকে ওরা ডাইরেক্ট ফায়ার করল। রবিন জোয়ারদার ভদ্রলোকের হাতে লাগল। সেতো বাপরে মারে করতে লাগল, আমরাও গুলি উপেক্ষা করে ওপারে পার হই। পার হবার পরে কিন্তু পুলিশ ওখান থেকে পালাল, ৫/৭ জন পুলিশ ছিল। ওরা মূল ক্যাম্পে চলে গেল। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ওখানে যা চাল-ডাল ছিল বা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাল-ডাল নিয়ে এপারে পার করা যাতে মানুষগুলো খেয়ে বাঁচে। এইরকমভাবে আমরা সাড়ে নটা থেকে প্রায় সাড়ে তিনটে পর্যন্ত এই পারাপার করলাম। নৌকায় দড়ি বেঁধে forcely যখন লঞ্চ অন্যদিকে রয়েছে বা একটু ফাঁক রয়েছে সেই মুহূর্তে আর কি নৌকা দিয়ে খাওয়ার দাওয়ার পার করা শুরু হল। এই রকম প্ল্যানমাফিক তিনটে পর্যন্ত খাওয়ার দাওয়ার পার করলাম, চাল-ডাল যা কিছু পারি। পুলিশ চেষ্টা করল, উড়ো ফায়ার করল, কিন্তু হল না, যখন কোন দিক দিয়ে রোধ করতে পারছে না তখন ওপর দিয়ে বাগনা-র দিক দিয়ে পুলিশ তুলে দেয় ওপরে। ৫০০ ব্যাটেলিয়ান-এর একটা ফোর্স, অর্ধেক রাইফেলধারী আর অর্ধেক হচ্ছে টিয়ার গ্যাস, ঢাল নিয়ে আমাদের দিকে আক্রমণ করার চেষ্টা করল। মানে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করবে। আমরা যখন যাই তখন ডাইরেক্ট গুলি চালায়। গুলি চালালে অনেকের গুলি লেগে স্পট ডেড হয়ে গেছে।

আমার পায়ে তখন ঐ পুলিশের গুলি লাগে। তখন রাস্তার থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে যাই। এটা হচ্ছে ওখানে পা-টা হারানোর মূল কারণ।

প্র : আপনি আর জি কর হাসপাতালে ছিলেন?

স : হ্যাঁ আমি আর জি করে ছিলাম। ওরা তো আমাকে বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে মারার চেষ্টা করে। কিন্তু ডি এস পি একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। উনি ছুটে এসে আমাকে মারতে দিলেন না।

প্র : পুলিশ বলছে ওখানে একজন লোকও মারা যায়নি একজন আদিবাসী মারা গেছে।

স : আমি স্পট-এ কারণ আমি লাশের মধ্যে পড়েছিলাম। একজন ভদ্রমহিলা তিনি স্থানীয়, আর একজন ভদ্রলোক তার নাম আমি বলতে পারব না। আজও ওনার নামের সন্ধান পাইনি, তিনি লঞ্চে উঠে মারা যান। স্পট ডেড হয়ে যান ভদ্রমহিলা। বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে দুধ দিচ্ছিলেন, এলোপাথরি গুলি চালিয়েছে, স্পট ডেড হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের এখান থেকে লাগে ওপার দিয়ে বেরিয়ে যায়। বুকের সামনে লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। লঞ্চে ওঠা পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন, আমাকেও সেখানে রেখেছিল। আমিও মরে যাব বলে ঐ লাশের মধ্যে আমাকেও রেখেছিল। আহত প্রচুর, চারশোর মতো অ্যারেস্ট হয়েছিল। প্রচুর লোক তো, আন্দোলন কারা করছে সবার সঙ্গে তো পরিচয়ও ছিল না। আমরা একটা জায়গায় জোটবদ্ধ হয়েছি ঠিকই, প্রায় এক, দেড় লক্ষ মানুষ এত পরিচয় করা সম্ভব না। আমার পায়ে গুলি লাগার পর সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চে তুলে বদরতলা হসপিটালে নিয়ে এলেন, ডি এস পি সঙ্গে ছিলেন। বদরতলা হসপিটালে নিয়ে আসার পর আমি শুনেছি, তখন আমার জ্ঞান ছিল না। যখন হসপিটালে নিয়ে আসে তখন আমার জ্ঞানও ছিল না হুঁশও ছিল না, নাকে তুলো গুঁজে রেখেছে। মানে ওখানে অপারেশনটা হবে না। ওখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স-এ করে, সম্ভবত ব্ল্যাডও দেয়। তখন জ্ঞান ছিল না। পরবর্তীকালে জেনেছিলাম ওখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে আর জি কর হাসপিটালে নিয়ে আসে। আর জি কর-এ নিয়ে আসার পরে কিছুটা আমার জ্ঞান ফেরে ওঁদের তত্ত্বাবধানে। তখন তো আমি কান্নাকাটি, অনুরোধ করি। ডাক্তার আশ্বাস দিলেন যে তুমি বেঁচে যাবে, ভয়ের কিছু নেই। ওখানে অপারেশন করে, দুদিন পরে জ্ঞান ফেরে। তখন দেখি পা নেই। এই অবস্থা। ১ মাস ১৩ দিন ঐ হসপিটালে ছিলাম, কেউ ছিল না দেখার। যা ডাক্তার, নার্সরা যথেষ্ট হেলপ করেছেন। একজন নার্স আমাকে যথেষ্ট হেলপ করেছেন। কারো নাম বলতে পারব না। তখন অন্যরকম পরিস্থিতি, মনের অবস্থাও ঠিক ছিল না সেরকম। তবে নাম নেবার চেষ্টা করেছিলাম যে মুহূর্তে ঠিক সেই মহূর্তে আর সেখানে রাখে নি ওখান থেকে পুলিশ দমদম সেন্ট্রাল জেল-এ নিয়ে আসে। জেলে থাকলাম। জেলের

মধ্যে হসপিটালে আমাকে রেখেছিল। জেলে প্রায় মাস দেড়েক ছিলাম। একই সাথে যারা অ্যারেস্ট হয়েছিল ৩০০/৪০০ তাদের ওখানে রেখেছিল। ছেলেদেরও ওখানে রেখেছিল। বিজয় বলে একটা ছেলে ছিল যে সব সময়ের জন্য আমার কাছে থাকত। আমাকে কোলে করে নিয়ে পায়খানা বাথরুম করানো, খাওয়ানো দাওয়ানো। যথেষ্ট মনে রয়েছে। আরও অনেকেই ছিল। তো প্রত্যেকের নাম মনে নেই। আমি আগে যখন হসপিটালে ছিলাম এরা তখন নীচে ছিল। এরা আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। রান্নার কাজ, খাওয়াদাওয়ার ছল করে আমার সঙ্গে দেখা করত। হসপিটালে আর থাকতে পারিনি। ডাক্তারকে বলি যে আমি এখানে থাকতে পারছি না আমাকে ওখানে পাঠান। মনের অবস্থা ভালো ছিল না। ওদের সঙ্গে সাথে থাকলে একটু মনের আদানপ্রদান হবে বা কথাবার্তা। ঠিক সেই করে আমি চলে আসলাম। ডাক্তার তো আসতে দেবে না, তুমি ওখানে গিয়ে এত কষ্ট করবে। মশার কামড়, অমুক তমুক। আমি বললাম, কোনো কষ্ট হবে না ওখানে যেতে হবে। তখন, ক্র্যাচ তখন নেই কিন্তু, লোকের কোলে কোলে আসছি, নীচে আসলাম, আসার পরে ওদের সঙ্গে অনেকটা ব্যথা লাঘব করার...

প্র : কত দিন পরে ছাড়া পেলেন ?

স : ওখানে হসপিটালে সঠিক মনে নেই, দেড় থেকে দুমাস ছিলাম। হসপিটাল বলছি, জেলখানায়। আমি জামিনে বেরিয়েছিলাম যখন তখন ৫/৭ জন ছিল। জামিন আমার দাদা দিয়েছিল। আর জামিনটা দেওয়ার কারণটা ছিল যে আমি প্রতিজ্ঞা করি জামিনে বেরব না। যতদিন ওখানে একটা লোকও থাকবে ততদিন আমি বেরোব না। প্রায় প্রত্যেকে বেরিয়ে গেল ৫/৭ জন যখন ছিল তখন সেই মুহূর্তে দাদা যেয়ে মায়ের অ্যাক্সিডেন্টের খবর বলে, মার অ্যাক্সিডেন্ট... অনেক ইতিহাস এ বলে তো কূলকিনারা করা যাবে না।

জেল থেকে বেরিয়ে দমদম ক্যান্টনমেন্ট প্লাটফর্ম। মা তখন হসপিটালে, নীলরতনে। আমাকে দেখতে যেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। সেখান থেকে ব্রেন শর্ট হয়। ব্রেন শর্ট অবস্থায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট রেল প্লাটফর্মে থাকেন। আমাদের উচ্ছেদের পর বার্ণপুর নিয়ে গিয়েছিল দাদাদের। আমার কেউ সন্ধান পায়নি। তখন ওখান থেকে মা যখন সন্ধান পান, জেলে দেখতে যান, পা নেই এইটা দেখে একদম অবস্থা খারাপ, অজ্ঞান হয়ে যান। এই অবস্থায় উনি দমদম ক্যান্টনমেন্ট প্লাটফর্মে থাকাকালীন ট্রেন এ্যাক্সিডেন্ট হয়, ব্রেন শর্ট এবং কানেও কম শুনতেন। সেই খবরটা আমার কাছে যাবার পরে, আমি দাদাকে বললাম যে আমাকে জামিন দাও আমি অন্তত দেখি। নীলরতনে আমি দেখতে গেলাম। মা তখন শয্যাশায়ী। ওখান থেকে দমদম কান্টনমেন্ট প্ল্যাটফর্মে একবস্ত্রে ছিলাম দীর্ঘদিন, প্রায় এক দেড় মাস। তারপর মা হসপিটাল থেকে বেরবার পর মাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে



দিলাম। বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার দিদি-জামাইবাবু ওখানে ছিল। যেহেতু এখানে আমার এই অবস্থা, বাচ্চা দুটো রয়েছে তাদেরও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নেই। দাদাকে বললাম, মাকে নিয়ে তুমি বাংলাদেশে যাও নয়তো মাকে বাঁচানো যাবে না। দাদা মা কান্নাকাটি করছে। মা তো আমাকে এই অবস্থায় রেখে কিছুতেই যাবে না। আমি বুঝিয়ে বললাম, আমার কোন অসুবিধা হবে না, আমার দুখানা হাত আছে যখন, আমি যে কোনোভাবে বাঁচতে পারব, কিন্তু মাকে বাঁচাও। তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাকে নিয়ে যায়। আমি ওখান থেকে বল্লভপুরে বেড়াচাঁপার কাছে যাই, ওখানে উদ্বাস্তু আন্দোলনের একজন নির্মল দে ছিলেন। তার আগে ছিলাম কানুপুর, দেবব্রত বিশ্বাস, যে নাকি প্রথম মরিচঝাঁপিতে প্রথম গুলি হয়েছিল, ১৪৪ ধারা, সেই দিন যেদিন গুলির খবর পায় ঐ দেবব্রত বিশ্বাসই হাইকোর্ট করে সুব্রত চ্যাটার্জির মাধ্যমে, হাইকোর্ট করে পুলিশ অবরোধ ওখান থেকে তুলে নিয়েছিল। মানে হাইকোর্ট রায় দিল আমাদের ফেভারে, পুলিশ অবরোধ উঠে গেল। ঐ ক্যান্টনমেন্ট প্ল্যাটফর্মে থাকতে থাকতে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয়। তার আগে কিন্তু জানতাম না। তখন ও আমাকে নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে। ওদের বাড়িতে মানে সুব্রত চ্যাটার্জির বাড়িতে ওখানে, কানুপুরে। ওখানে প্রায় মাস তিনেক ছিলাম। আবার ফের আসলাম, বল্লভপুর চলে যাই নির্মলদের বাড়িতে। এইভাবে যাযাবরের মতো যে যেখানে পারছে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে আবার টিবিতে আক্রান্ত হলাম। টিবিতে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য বারাসাতে রবীন চক্রবর্তী বলে সেকেন্ড লিডার, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির। ওনার ওখানে জুতোর দোকান ছিল ওখানে থাকতাম, আর ওখানে চিকিৎসা হতে লাগল আর কি। একটু সুস্থ হবার পর চলে গেলাম দমদম ক্যান্টনমেন্ট, ওখানে কিছুদিন থাকার পর, ওখান থেকে আবার বসিরহাট। বসিরহাটে এক ভদ্রলোকের একটা জায়গা কুঁড়েঘরের মতো থাকার জন্য আমাকে জায়গা দিয়েছিল। মাকে নিয়ে আসা হল। মা সেখানে কিন্তু আবার অগ্নিদগ্ধ হয়, অনেক ঘটনা, আমি কিন্তু সংক্ষেপে

বলে যাচ্ছি। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, সে করুণ খুবই করুণ দৃশ্য। গল্প বলতে গেলে অনেক দিন লাগবে। সেখান থেকে ওনাকে বাঁচিয়ে আবার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে আমি চলে গেলাম আবার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটা অফিস ছিল, যেখানে বহু নেতৃত্ব মিটিং করতেন তৎকালীন স্বাধীনতার সময়। এটি হচ্ছে কলেজস্ট্রিটের অপজিটে। সেখানে ছিলাম ৩ মাস। সমীরণ ঘোষ ছিলেন একজন স্বামীজি। তিনি কলেজস্ট্রিটের কাছে বঙ্কিম ভবন, সেখানে থাকতেন। তারপর কোথায় আছেন, কি অবস্থায় আছেন আমি জানি না। সেখানে থাকার ফলে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল, সমীরণ ঘোষের শিষ্যরা সহযোগিতা করে মুচিপাড়া থানায় আমকে একটা চায়ের দোকান করে দেয়। সেখানে থাকতে লাগলাম, চা-টা করা, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই যে কিছু করা, মানুষগুলো ফুটপাতে, যারা ফেরত গেল তো গেলই। যারা রেললাইনের ধারে পড়ে রয়েছে, তাদের জন্য কিছু করা। এই চিন্তাটা প্রথম থেকেই আমার কিন্তু ছিল। যখন জেলে ছিলাম প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনে যদি কোনোদিন ঘর বেঁধে বসবাস করতে হয়, তাহলে কিচ্ছু না পারি অন্তত ১০টা পরিবারকে নিয়ে এক জায়গায় যারা ছিন্নমূল তাদের নিয়ে এক জায়গায় বসবাস করব। সেইটা করেছিলাম, পাশে একটা গ্রাম আছে বেলগাছি বলে ওখানে আশাটা পূর্ণ হয়েছে। এটা 'পথের শেষ' সেখানে ১২৫ ফ্যামিলি মতো বসানো হয়েছে রেল লাইনের ধারে যারা ছিল তাদেরকে নিয়ে। সেখানে একটা গ্রাম সৃষ্টি হয়েছে। অনেক লড়াইও হয়েছে, অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। পথের শেষ-এ আসলাম ঐ যখন নাকি মুচিপাড়া থানায় আমি ছিলাম, রঙ্গলাল গোলদার খোঁজ করতে করতে ওখানে আসেন। বলেন, এখানে তোর থাকার দরকার নেই আমার ওখানে চলে আয়। তার আগের বছরই পথের শেষ গ্রাম সৃষ্টি হয়। আমি প্রায় ২ বছর পরে আসি। আমাকে নিয়ে আসলেন। আসার পর এখান থেকে সন্ধান পাই ওখানের। বেলেগাছি নবপল্লী একটা কলোনী হয়েছে। ঐ জায়গাটার যে মালিক সে আমাদের সন্ধান করে ওখানে নিয়ে যায়। ঐ গ্রামটা গড়তে পারছিলেন না কোনো মতেই, কিছু সমস্যা রয়েছে স্থানীয় লোকের সঙ্গে। সেটা উদ্ধার করে কলোনীটা করা হয়েছে। এখান থেকে আমি ওখানে যাই। এই ভাবে পথের শেষে নিয়ে আসলেন রঙ্গলাল গোলদার।

প্র : দেশভাগ হল, মানুষের উপর নিপীড়ন, বাঁচার অধিকার যেটা আপনারা পেলেন না, আপনি কি মনে করেন এটা পাওয়া উচিত ছিল?

স : এটা তো কখনই কাম্য নয়, এটা আমরা কেন, আমাদের কী অপরাধ যে সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে আমাদের আসতে হবে!

প্র : সরকার গঠিত হবার পর, সেই সরকারের পুলিশ দিয়ে, অত্যাচার করে তাদের আবার যে সরিয়ে দেওয়া হল, আপনি মনে করেন এটা সঠিক?

স : দেখুন এটা হচ্ছে জটিল প্রশ্ন। তবুও আমি বলব মানবিকতার দিক দিয়ে তো গভর্নমেন্ট ঠিক করেনি। সেই সাথে যেটা আমার বলার গভর্নমেন্ট যেটা করেছে, কী পলিটিকাল কারণে না কি আমি ওই বিতর্কে যাচ্ছি না, এক কথায় এই যে ছিনিমিনিটা খেলা হয়েছে, এটা কক্ষনো কাম্য ছিল না। সে সরকার বলুন না আমাদের নেতৃত্ব বলুন। মরিচঝাঁপিতে আসার পর যে ঘটনাটা ঘটল, ইঙ্গিত যদি সরকারের নাই থাকবে তা হলে এতো লোক, বা অতো সুদূর সেই দণ্ডকারণ্যকে থেকে ধাপে ধাপে এতো লোক মরিচঝাঁপিতে ঢুকল কী করে। তাহলে ইঙ্গিত আছে, যে কথাটা বলেছিল সরকার, হয়তো মনে মনে চিন্তাও করেছিল যে, হ্যাঁ, এটা হোক। কিন্তু পলিটিকাল কারণে হয়তো সরকার বাধ্য হয়েছে ওখান থেকে উচ্ছেদ করার।

প্র : মরিচঝাঁপি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর আপনারা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, এদের কি কোনো খোঁজ রেখেছিলেন, কে কোথায় আছেন, কী রকম আছেন?

স : সেখানকার মানুষগুলো কেমন আছেন, দীর্ঘদিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিল যে তারা ফেরত যেয়ে মালগানগিরিতে কেমন আছে। শুনছি দূর থেকে যে তারা অনেকটা ডেভলপড হয়েছে আগের তুলনায়, বর্তমান ভালোই আছে। তাদের দেখতে ইচ্ছা বা ঐ এলাকাটা দেখতে ইচ্ছা, আগে তো দেখিনি, এটা অনেক দিন ধরেই ছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে সুযোগ হয়নি। সুযোগ না হওয়ার কারণ, আর একটা যদি বলেন কারো খোঁজখবর রাখা, এটাও সুযোগ হয়নি, কারণ আমি কাজের মধ্যেই ডুবেছিলাম, পরিষ্কার কথা। এখানে আর একটা বলেছেন, প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরটা সঠিক হয়নি, সঠিক আমি দিই নি, যেটা বলছেন খোঁজখবর, নেতাদের বলুন, উদ্বাস্তুদের বলুন, এই যে খোঁজটা যে নেওয়া বা নেতৃত্বদের বলুন, তাহলে আমি বলব, যে এদের প্রতি আমার, সরকারের প্রতি যেমন, তেমনি এই নেতাদের প্রতি আমার ঘৃণা। যার কারণ রাম চ্যাটার্জি তখন আমাকে চাকরি দিতে চেয়েছিলেন সেধে, আমি কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সরকারের কোনো সাহায্য আমি আজ পর্যন্ত নিই নি। এটা বলতে পারেন ঘৃণা যে সরকারকে আমি বেশি দায়ী না করলেও দায়ী করি। আবার আমি তুলনামূলকভাবে আমাদের নেতৃত্বের দায় আমার কাছে বেশি, না জেনে শুনে মুর্খের মতো রাজনীতি করেছেন বা নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বিচার তো হওয়া উচিত ছিল। এতগুলো মানুষকে না খাইয়ে মারা, শিশু যে মারা গেল। যে অত্যাচার, যে কষ্ট ওখানে ছিল, হয়েছে যারই দোষ হোক না কেন, এটা উচিত হয়নি এবং যারাই এটা করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত।

সাক্ষাৎকার : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০৭



কতো মানুষ যে বাবা, তিন ট্রাক। আমি ওয়া কইতে পারব না, তিন ট্রাক ভইরাছিল। আমি ভাবছি কি কাঁঠাল নিয়া যায়। বড় সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল। এই রকম উঁচা উঁচা দেখা গেছে। আগে দুইটা ট্রাক গেছে পরে যে ট্রাক গেছে তার পা ফিরানগা আমাগো দিগে।

হাসনাবাদ ক্যাম্পে

সুশীলা বিশ্বাস

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে ?

সুশীলা বিশ্বাস : মনে পড়ে না বাবা ? বাংলাদেশের জন্য আজ মরে যাচ্ছি। বাংলাদেশে আমার চারটা ভাই আছে, তাদের দেখতে পারতেছি না, তাদের কথা মনে পড়ে।

প্র : ওখান থেকে কিভাবে এলেন, বাংলাদেশ থেকে চলে আসতে হল কেন ?

সু বি : সেই সময় ভীষণ বন্যা হইছিল, বৈশাখ মাসে কিছু ছিল না, বন্যায় ভেসে গিয়েছিল ঘরদোর, ইস্কুল-পাঠশালা। তোমার দাদা গো কি কইরগা পড়াশুনা করাবো, তোমার জামাই তো মেট্রিক পাশ ছিল। তার জন্য সব ফেলাইয়ে রাত্রে রওনা কইরা, আমার শ্বশুরকে মাইরা ফেলাবে, তার জন্য রওনা কইরা চইলা আসলাম। আইসা জঙ্গলে থাকছি। তাই কোনোভাবে মাইগ্রেশন করছে, ডেট বেশি করে চলে আসি। এমনে টাকা দিয়া পার হইয়ে এপারে আইছি। ভীষণ কষ্ট বাবা বলা যায় না। অত বলতে পারব না আমি।

প্র : এখন তো আছেন মালকানগিরিতে, তো এই জায়গাটা ভালো লাগছে, না বাংলাদেশটা ?

সু বি : না, বাংলাদেশ এখনও ভালো লাগে বাবা।

প্র : এখানে আপনার কী কী অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে ? কী পাচ্ছেন না যেটা ওখানে পেতেন এখানে নেই ?

সু বি : এইখানে কী পাচ্চিনা, খাদ্য জিনিষ এইখানে কিছু আছে, বাবা ? এইখানে, তোমার দাদা জন্মাবদি মাছে, মাংসের পিপাসা ওদের বেশি, তাতো ঠিক মতন এইখনে চলে না, দুধ তো নিজেরা চেষ্টা কইরা হাতে বানায়া নিচ্ছি, তারপর কেউরে তো দেখি না বাবা এইডাই আমার বেশি দুঃখ। আমার বড় দাদা হাবড়ায় আছে, তা বাবা ঘর বাড়ি ছাইরা আইসা মানুষ রাইখ্যা কাজ কইরয়া আইছে, এখন কিষাণ দিয়া আয়। সে হাবড়ায় রইছে।

প্র : এইখানে খাওয়া পরার অসুবিধাটা নেই এখন, বাংলাদেশের গল্পটা বলুন কিরকমভাবে ছিলেন ?

সু বি : ভালো ছিলাম তো বাবা, কোনোটার অভাব তো ছিল না সেই দেশে, কোনটা অভাব ছিল না।

প্র : আপনার মনে পড়ে এই যে সুন্দরবনে গেছিলেন ?

সু বি : মনে পড়ে না বাবা। মাছি খাবার, এক বিঘত উঁচু হইয়া আসিতেছে। রাস্তার পাশে ছিলাম তো, দালানের পাশে মেচকাঠির হেইহানে একটা দালান ছিল। শেষমেশ ওই স্থানে ছিলাম। তোমার ছোট্ট ভাইডিরে ঘরে নিত না, রাইত পোহাইলে কেবল থু, থু করত, কিছু পেডে নিত না, সেই না নিতে না নিতে, সাত বছর না আট বছর বয়স ছিল, মরার মতন হইয়্যা গেছে, মানুষ মরা দেইখ্যা না, আমি তোমার ভাইডিরে কই, এইখানে তোমার ভাইডি কিন্তু মইরা যাবে, রাইতে দালানের উপর রইতাম এতডা ভাত দিতাম, খাইত।

প্র : আপনি একটা গল্প বলেছিলেন, তিনদিন পড়েছিল, হাত পা দেখা যেত সেটা কি ?

সু বি : এইডা টাকিতে। কত মানুষ যে বাবা তিন টেরাক, আমি ওয়া কইতে পারব না, তিন টেরাক ভইরা ছিল। আমি ভাবছি কি, কাঁটাল নিইয়া যায়। বড় সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল, এইরকম উঁচা উঁচা দেখা গেছে। আগে দুই টেরাক গেছে পরে যে ট্রাক গেছে তার পাও ফিরানগা আমাগো দিকে, কাগজ টানাইয়া রইছি হেই দিগে, হেইয়া দেইখ্যা না, আমি হার্ট ফেল হইয়া পড়ছি। তোমার ভাই তো আর বাঁচবে না। দুইখান না তিনখান সাইকেল নিছিল ওই দেশে যাইয়া ব্যবসা করবে, সেই বিক্রি কইরা যে টাকা পাইছিল। হেইয়া দিয়া চইল্যা আইছি।

সাক্ষাৎকার : ২২ জানুয়ারি ২০০৭



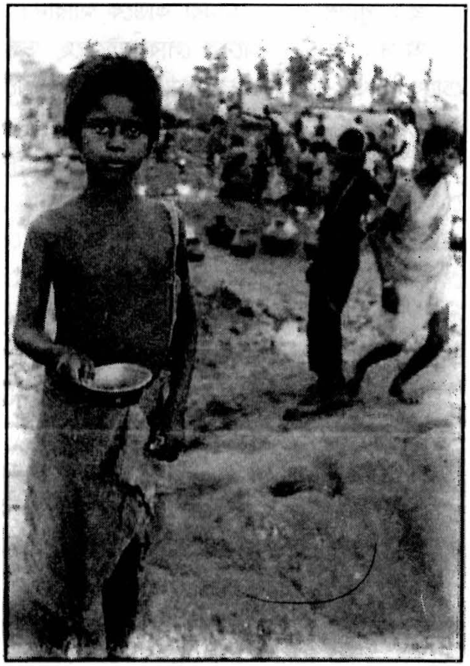
অমলা সরকার মরিচঝাঁপি থেকে দণ্ডকারণ্য ফিরে যাননি। অসহায় এই পরিবারটিকে কুমিরমারির অঞ্চল প্রধান প্রফুল্ল মণ্ডল কুমিরমারিতেই থাকার আস্তানা গড়ে দিয়েছিলেন।

মৃত্যুর সেই দৃশ্য

অমলা সরকার

প্রশ্ন : এখানে কতদিন আছেন ?

অমলা সরকার : যত দিন আমরা জঙ্গলের মরিচঝাঁপি থেকে আইছি ততদিন, তার আগে ছিলাম দণ্ডকারণ্য। কয়লাবাড়ি ক্যাম্পে, মালকানগিরির ভিতরে। গেরামের কথা আমার মনে নাই। আমার বয়স তখন বড় ছেলেডা হইছিল, আমরা এখন থাকি কুমিরমারি। এখানে আমার ফ্যামিলি ছিল, আরও অনেক লোক ছিল। আমার শাশুড়ি ছিল, স্বামী ছিল, বড় ছেলে ছিল। এইখানে যারা থেকে গিয়েছিল, তারা মণ্ডল, বাইন্য মণ্ডল ছিল, ঠাকুর দাস ছিল। আমাদের বলেছিল কি তোমরা প্লেনটেশনটা ছেইড়ে চইলে যাও। যে যেখানে পারো চলে যাও। আমরা রাইতের বেলায় চইলে এইছি। কুমিরমারির জায়গাটা প্রধানেরা থেকে দিইছিল। আমরা যে জঙ্গলে [মরিচঝাঁপি] ছিলাম, সেই বাজারহাট, জলের কল, আমাদের খাইদ্য খাদক পাওয়া যেত বাজারহাট ছিল, ইস্কুল ছিল, ডাক্তারখানা। নেতাদের মধ্যে সতীশবাবুর কথা কইতে পারি, আর কারো কথা মনে নাই। চইলে আসতে বাধ্য হলাম ঐ যে



জবরদস্তি করছিল। মাইরধোর কইরেছিল, ঘরদোর জ্বালিয়ে দিইছিল। মাইয়ে ছেলে উঠায়ে নিই গিইছিল লঞ্চে, লঞ্চে নিই অত্যাচার করেছিল। বাচ্চারা মরেছিল যেমন, সেয়ানা লোকও মইরেছিল। আমরা তো এই জায়গায় ছিলাম। আমার বড় ভাসুরের মাইয়ের একটা ছেলে মইরে গিয়েছিল, বয়স এই এক/দেড় বছরের ছিল। আর কি ওখানকার জলডা সইহ্য হয় নাই। আমার চেনার মইধ্যে সেয়ানা লোক কেউ মরেনি। পুলিশে যাতায়াত বন্ধ কইরে দিইছিল। তখন নাইরকেল গাছের মাথি, যদুপালং খাইছিল। আমরাও তো খাইছিলাম। আমরা জল আগে কুমিরমারির থে নিইতে যেতাম। তার পরে কল হইছিল। তারপরে আমরা কলের থে নিতাম। গোল হলি তো, সেই কলের জল নিতাম রাত্রিবেলায়, অনেক লাইন পড়তো তো। রাত্রিবেলায় জল নিতাম, এই রকম রাত্রিবেলায় জঙ্গলের ভিতর এই রকম জল বোঝাই হই যেতো। আমরা সাতরায়ে জল আনি খাতাম। নৌকায় করে যাতাম, এমনিতে যাতাম। জল আনি খাতাম। আমাদের উপর কোনো অত্যাচার হয়নি। অনেক নৌকা ভাইঙ্গে দিইছিল। অনেক অত্যাচার করিছিল। তাও আমি দেইখেছিলাম এই পারে দাঁড়িয়ে, প্লেনটেশনের পারে দাঁড়িয়ে দেখলাম। অনেক লোককে মাইরেছিল, মাইয়ে ছেলে তুলে নিই গেছে। আর কি মাইরে হাঁটু টাটু ভাইঙ্গে লঞ্চে তুলে নিই গেছে। কেউ গাঙ্গে সাঁতার দিইছিল, লঞ্চের ওটা কী বলে না ইগ্রাফি, ওটা দি মাথায় ঘাই দিইছে, তুলে এনে জুতো দিয়ে দুবিয়েছে বোটে। লঞ্চদি নৌকো ভেঙ্গেছে। নামটাম অত মনে নেই। আমরা তো লেখাপড়া জানি না যে কোন নম্বরটা। মন খারাপ করে। নিজের না হইলেও অন্য পরকে তো মারলে দুক্কু লাগে। ঐদিন দেখে আমাদের খুব খারাপ লেগে ছিল। রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম তো ছেলের বাবা বলে 'ও দেখো না'। অনেক লোক মরে পড়ে জলে ছিল। সে বিরাট দৃশ্য যে দেখা যায় না চোখে। এই সবগুলো মনে আছে।

প্র : পুলিশ বলছে আমরা কাউকে মারিনি। একজন মরে ছিল মেনি মুণ্ডা।

অ স : না, না, অনেক লোক মইরেছে, ভুল বলেছে। আমরা দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছি। বেলা ৪টার সময় মারামারি হইয়েছে। আমি যে লোকগুলো দেখলাম শ'তিনেক হবে। ঐ ইয়ং বয়সের ছেলেপেলে, যে সময় মাইধোর করেছে সে সময় নদীতে পইরেছে। ধরো কুমিরমারি পাড়ে তো পুলিশ রইয়েছে, তখন তো নদী পুরো গোল, তখন অনেকে লোক মেরেছিল আমি তাই দেখেছি অনেক লোক হবে। লঞ্চে করে টেনে তুলে নি গেছে। লঞ্চের ভিতরে নিয়ে তো দেখলাম তুললো। শেষে শোনা গেল বস্তায় করে আর কি মরিচঝাঁপি পাড়ে রেখে আইলো। এই সবগুলো শোনা গেল। কিন্তু অনেক লোক মইরেছে আমি দেখেছি। আর আমার জেটা মশাইয়ের একটা মেয়ে ছিল আর তার বান্ধবী ছিল, তাদের ধইরেছিল তা ধইরে রাখতে পারেনি। সে সময় গুলি করেছিল তো কুমিরমারিতে। তার বয়স ছিল ১৩/১৪ বছর, দুটো মাইয়ের এক সমান বয়স ছিল, আমাদের চেনা। আমার একটা কাকা ছিল, আমার চেনা। ঐ পাড়ে ছিল, তাকেও মারতি পারে নি, এদেরকে মারতি পারে নি, ওরা জানে তো ওরা শুয়ে পইরেছিল। যারা শুয়ে পইরেছিল তারা মারা যাই নি। গুলি গোলাটা এই পারে হইতেছিল। শরণার্থীরা যখন পালাচ্ছিল তখন গুলি কইরেছিল। অনেক পুলিশ ছিল। আমার বোন দুটো পলাই চলি আইছিল, কাকা পলাই আইছিল, আমরা তাদের পাইয়ে গেলাম। আমাদের চেনা লোক কেউ ক্ষতি হয়নি। আমার বোন, আত্মীয়স্বজন সব মসলন্দপুরে আছে। মসলন্দপুরে আছে, কেউ আমঝাড়া আছে, কেউ দণ্ডকারণ্যে গিইছিল। আমরা আর যাইনি।

প্র : আবার কি যেতে ইচ্ছে করে দণ্ডকারণ্য দেখতে ?

অ স : না না আর কী করতে যাবো, আর।

সাক্ষাৎকার : ২৪ এপ্রিল ২০০৭



আমি এখানে এসে বিয়েথা করি। এখানকার মেয়েকে (কুমিরমারির) বিয়ে করি।

কুমিরমারিতেই আছি

পঞ্চানন মণ্ডল

আমার নাম পঞ্চানন মণ্ডল। চল্লিশ বছর বয়েস।

প্রশ্ন : এখানে আসার আগে আপনারা কোথায় ছিলেন ?

পঞ্চানন মণ্ডল : ডণ্ডকরণ (দণ্ডকারণ্য)।

প্র : দণ্ডকারণ্য কোথায় ?

প ম : ডণ্ডকারণ্য ওটা ভারতের শেষ সীমানা বলেও চলে, কটক জিলার ভিতরে, মান্দাভেলী, মালকানগিরি মান্দাভেলী আমরা ছিলাম ৮ নম্বর।

প্র : বাবার নাম ?

প ম : সুরেন মণ্ডল। মারা গিয়েছেন। এই পাঁচ/সাত বছর হল মারা গিয়েছেন। এখানেই মারা গিয়েছেন। আমরা যখন আসি তখন আমার বাবা ছিল, মা ছিল। আমরা তিনজন। তারপর এখানে এসে বিয়ে থা করি। এখানের মেয়েকে বিয়ে করি।

প্র : আপনার বাবা এখানে থেকে গেল কেন সবাই যখন চলে গেল ?

প ম : বাবা বৃদ্ধ ছিল, আমরা যাইনি, দেখলাম যে অবস্থা খুব খারাপ, আমি



খুব ছোট ছিলাম তো কাজ করতে পারতাম না। খাওয়াদাওয়ার কিছু ছিল না, খুব গরিব ছিলাম। তাই এইখানে মা মুথো তুলত গ্রামের মেয়েছেলের সঙ্গে মিশে মিশে তারপর এইখানেই থেকে গেলাম। এইখানের মানুষ সহযোগিতা করেছে। না করলে থাকতে পারতাম না। নেতারা ছিল, বলেছিল তোমাদের জমি দেব। কিন্তু যখন গোলাগুলি চলল, সব চলে গেল। যেখানে আছি এটা আমার শ্বশুরবাড়ির ঘর। শ্বশুরমশাই মারা গেছে, শাশুড়ি মা আছে। ওনাদের আমি খাওয়াদাওয়া করাই। মরিচঝাঁপি কথা মনে আছে। কিন্তু আমরা ওপারে আর যাইনি। আমি যখন আসলাম ছোট ছিলাম। কিন্তু কাজ করতে পারতাম না বলে ওই যে বীরেনবাবু আছে ওনার বাড়ি কাজ করতাম। পাঁচশো খুদি, আড়াইশো খুদি, পেটে ভাত খেয়ে খেয়ে এই পর্যন্ত আছি। আমরা আর মরিচঝাঁপি যাইনি। গোলাগুলি হল। সব চলে গেলো, বিয়ে থা করলাম। এইখানে থেকে গেলাম।

সাক্ষাৎকার : ২৪ এপ্রিল ২০০৭



ঘাটে এসে দেখলাম আমার চালের নৌকা ধরে নিয়ে যাচ্ছে লঞ্চে, নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

পিতৃভূমি বাংলা

রণজিৎ মাঝি

বাংলাদেশ থেকে ২৪.০৭.৭০-এ ক্যাম্পে উঠেছি। কেন্দ্রি ক্যাম্পে ছিলাম ৬ মাস খানিকের মতন। তারপর গেলাম বরদাভাটা, বরদার থিকা আসলাম মানাভাটায়। বরদায় ছিলাম ৩ বছর। মানাভাটায় ছিলাম বছর খানিক। সেখানে থেকে ডাকে এসে সাইড ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরি। ঘুরে ঘুরে এই পর্যন্ত।

প্র : এইখানে কত সালে আসেন ?

র মা : এখানে আসছি আমরা পঁচাত্তর সালে।

প্র : মরিচঝাঁপিতে থাকার সময় অত্যাচারটা হয়েছিল আপনি তো দেখেছেন, একটু ব্যাখ্যা করে বলুন তো কি ধরনের অত্যাচার হয়েছে ?

র মা : সে কিভাবে বলব আপনাকে! গোলাগুলি, গ্যাসবোম না কি বলে, ছোড়াছড়ি। পুলিশ আর পাবলিকে বিস্তর ঝামেলা হইছে।

আমি টুকটাক ছোটখাটো একটা চালের আটার ব্যবসা করতাম। চালের ব্যবসা করতাম। আমরা ফ্যামিলিতে ছিলাম ৪ জন, দুটো ছেলে নিজেরা দুইজন।

আমার মিথ্যা বলার কোনো দরকার নেই। গোসাবা বাজার থেকে চালের নৌকায়

চাল ভরে দিয়ে আমরা বাড়ি চলে আসছি। নৌকায় চাল নিয়ে আসছি। তখন খাওয়া দাওয়া করে আমি ঘরে আছি বসে। তখনই সংবাদ দিল যে তোমার চালের নৌকা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি ঘাটে আসলাম, ঘাটে আসি দেখলাম সত্যি কারে আমার চালের নৌকা ধরি নিয়ে যাচ্ছে লঞ্চে, নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। আমি কয়েকজনকে বললাম যে আমারে লঞ্চটা ধরাই দাও খাইদ্যবস্তু নিয়ে যাচ্ছে। ভালোমন্দ আমি বুঝব। কাউকে আর তেমন সাড়া পাইলাম না। আর যারা আমার সঙ্গে ছিল কেশব, পরিতোষ আর একজন পাগল মণ্ডল আমি একজন, এই চারজনই ছিলাম। তারপর ওদেরকে নিয়ে বেলা যখন ৪.৩০/৫টা হবে তখন বাগনা ফরেস্ট অফিস পৌছাই। পৌছালে ওরা একে একে তিনজন ফাঁকি দিয়ে চলে আসে। আমি তখন একাই ওখানে ছিলাম রাত তখন দশটার অধিক। আমি বড় নিরুপন্ন অবস্থায় পড়লাম। তখন ওইখানকার দেশীই হবে বোধহয়, তার সাড়া পেলাম। আমি তারে ডেকি বললাম, আমি অফিসারের সঙ্গে দেখা করব, সেই সুযোগ আছে? তখন ডেকি দিল। আমি ওনার সঙ্গে দেখা করতি গেলাম। তখন রাত ১০.৩০/১১টা হয়ে গেছে। ওখানে যাইয়ে ওনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের পর বড় রিকোয়েস্ট-এর পরে আমারে অল্প কিছু চাল আটা দয়া পূর্বক রিটার্ন করল। চাল আটা সব নিতে বলতে পারব না, তবে আমাদের চারজনের ১২ কুইন্টালের মতো চাউল ছিল, অত মনে নাই। আর ঐরকম ৮/১০ কুইন্টাল আটা ছিল।

প্র: আর কিছু ঘটনা মনে আছে?

র মা: ওখানে ছিলাম আমরা বড় কষ্টে আমাদের উপর বেশি নিষ্পেষণ, নির্যাতন ছিল। ধরুন পানীয় জল, খাদ্যবস্তু যদি পারাপার না হয়, কি খেয়ে আছি? জলের কষ্ট। যদুপালং সিদ্ধ করি খাই। নারকেল গাছের মাথি, ওয়া কি খাওয়া যায়। নষ্ট করেছে, অনেক নারকেল গাছ নষ্ট করছে। খাদ্য অবরোধ উপায় ছিল না তাই, তারা বাধ্য হইছে।

প্র: আবার যদি সত্যিকার পুনর্বাসন দেয় যাওয়ার ইচ্ছে আছে? আবার কি যাবেন বাংলায়?

র মা: কী বলি, আমার তো শেষ দিন, আর দিন আছে কি সামনে! পিতৃভূমি বাংলাদেশ, বাঙালি আর আমি আর আস্ফালন কেউ ভুলে যায় না তার আশা সবাই করে। তেমন দিন যদি আসে যে পথে চলার সেই পথে চলবো। আমরা তো অনু পথগামী সবাই। কি হবে আইজকে, কি হবে কালকে। যেদিকে হাঁটায় সেদিকে হাটি আমরা। আর কী বলি বলুন। যাবো না বলি কী করে, যাবো বলিই বা কী করে। এই স্থানে তো আমাদের অস্তিত্ব নাই। আমরা বসবাস করতে পারছি কি? তবে যাবো না বলবো কি করে যাবো বলবো কি করে। এখানে অসুবিধা একটাই জানেন আমরা বাঙালি। এইটাই অসুবিধা। যাবার সম্ভাবনা আছে সামনে?

সাক্ষাৎকার: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯



মেলাই লোক ছিল। হরিপদদা, বিমলদা, ননীদা, খোকন হাজরা এদের সব ধরল পুলিশ। চলো তোমাদের ফ্যামিলি ছেড়ে দেবানে, চলো বাগনা অফিসে, সকলকে নিয়ে হাজতে পুরি দেল।

কতোবার উদ্বাস্তু হব

হিমাংশু সরকার

প্রশ্ন: কত সালে বাংলাদেশ থেকে আসেন?

হি স: ১৯৭০-তে।

প্র: এসে কোথায় উঠেছিলেন?

হি স: বিহারে, ১৮.০৫.৭০ সালে বিহারে ছিলাম, তারপর ৪.৭.৭২ আসছি মানাভাটায়, মানাভাটার থে ১৯.৫.৭৯ আইছি কর্মশিবিরে মালকানগিরি। কর্মশিবিরে আসি আমরা জঙ্গলের কাজকর্ম করি খাতাম। এরি মধ্যে ভিলেজের লোক ছিলাম। তারা ভাঙি চলে গেল, ধান ভালো হয় না বলে সুন্দরবন চলি গেলাম। রাম চ্যাটার্জি আসছিল, উনি বলছে যে দেখেন, আমি যখন খাইতে বসি একখান রুটি খাই কেউ যদি না খাই থাকে আমি কি না দিয়ে পারি। পশ্চিমবাংলায় গিলি বহু সুযোগ সুবিধা হবে। জঙ্গল আছে সেখানে সুযোগ সুবিধা হবে। এখানে কষ্ট ভোগ করি কী হবে। তাই সুন্দরবনে গেলাম। সুন্দরবন যাইতে আমরা রায়পুর থাকলাম ২/৩ দিন। ওখান থে আমাদের রাখলো টাটায়। টাটার থে নিয়ে গেলো হাসনাবাদে। আমরা ছিলাম দক্ষিণ হাসনাবাদে। ওখান থেকে গেলাম কুমিরমারি। তার রাত্রে গেলাম



প্ল্যানেটেশোন-এ, বর্ষার সময়, আমাদের কাঁথা-কাপড় ভিজে গেল। কোনো কিছু নেই মরিচঝাঁপিতে কিছু নাই শুধু নাইরকেল গাছ আর ঝাউ গাছ। ওখান যে যাহোক কাগজ টাগজ জোগার করে ঝুপড়ি করে থাকলাম। কী খাই এখন। কাটকুটো কাটি মাথা করি, কুমিরমারি, মোল্লাখালি, সাতজেলে, যোগেশগঞ্জ নি বিক্রি করি খাতাম। খাইতে খাইতে ৫/৬ মাস পরে পুলিশি হাঙ্গামা করতি লাগল। তারপর অমিয় সেন আসি মিটিং করি বললো তোমাদের এখানে স্কুল-কলেজ করি দেওয়া হবে। আমরা সরস্বতী পূজা করলাম। পোলারা যাত্রা করল পুজোর সময়। লঞ্চে করি লোক আসি দেখলো।

যাত্রা করার পর আমাদের সুযোগ সুবিধা দেলে একটা কল দেলে। আমরা নোনাজল খাইতাম, কি স্থানীয় জল আনি খাতাম। কষ্ট হতো মেয়েছেলেদের আনতি। মেটে কলসে ভেঙে যেত। কলের জলটা খুব সুন্দর হল। বহু জায়গার লোক আমাদের কল চেক করতে আসে। পাত্রে জল নি চলি যায়। আঃ খুব সুন্দর জল মরিচঝাঁপিতে, এ খাইলে রোগও সারি যায়। কিছুদিন থাকার পরে বলল, তোমরা এক কাজ কর, বাইরে কাজ কর সব। বিভিন্ন জায়গায় কাজ কর। কাট বেচে কি খাবে, তার যে বাইরে কাজ কর। আমরা মাটি দি ঘেরে বাঁধ বাঁধলাম। তাতে বাগদা চিংড়ির পোনা হল। ২ হাত চওড়া ২ হাত উঁচু খানিক মাথায় রেখে বাঁধ দেলাম। ১ হাত করে ১ টাকা দেবে, টাকা কোথায়, কাজ তো করলাম বিভিন্ন জায়গায়। আর এক কৌটা আটা দেলে, তা খালাস আর বান বন্দী করলাম। সুযোগসুবিধা দেলে, বাইরে কাজ কর। বাগদা চিংড়ি বড় হোক, ফসল হোক আর আপনারা বাইরে কাজ করেন। ফ্যামিলি থাকুক। আর পুলিশি স্থানীয় পাড়ে বসে লেখে। আমরা বাগনা অফিস পাড়ে ছিলাম। পুলিশি লেখে আজকে যদি ১০০০ লোক চলে যায় বাইরে, ৫০০ ঢোকে। তারপর এক এক করে দেখে প্ল্যানেটেশোন-এর লোক হালকা। ইরি পরে ওরা রাউন্ড দেয়। ওরা ভালো বলে, ভালো বলি বলি একদিন পাড়ে উঠিছে। উঠি সব ডাকে। আমাদের ডাকে, মেলাই লোক ছিল,

হরিপদদা, বিমলদা, ননিদা, খোকন হাজরা এদের সব ধরল পুলিশে। চলো, তোমাদের ফ্যামিলি ছেড়ে দেবানে, চল বাগনা অফিসে। সকলকে নি হাজোতে পুরি দেলে। আমাকে ধরতি পারে নাই, বলে বহুত চালাক পোলাটা। ৭/৮ ফ্যামিলি ছিল। সবাই চলি গেলে আমি একাই ছিলাম আর হরিপদ। থাকার পরে আমরা ঐখানে কষ্ট ভোগ করার পরে, পুলিশি বলে, বাবা তোমরা চল। হাল্কা হই গেছে প্ল্যানেটেশন। ওরা যোগেশগঞ্জ সাতজেলে, মোল্লাখালির লোক এনে লাইনে লাইনে আমাদের লঞ্চে তুলি দেলে।

আমাদের লঞ্চে তুলল। বাবু সকল ওঠ তোমাদের হাসনাবাদ পৌছাই দেব। এই বলে লাস্ট অবদি আমাদের মেদিনীপুর ক্যাম্পে আনি রাখল লোক আর ছাড়ে নাই। লাস্ট অবদি কেশবদা ছিলি আমার ভগ্নীপতি। বলে, তোমরা চলি যাও আমি এদের ছাড়ায় আনব। গিয়ে দেখে আমরা ওখানে নাই, আমরা মেদিনীপুর। একদিন রাত রেখে ১৫ টাকা দেলে আর ঐ আটা কী কী দিলি খাইতে। ওখানে থে আনল শিয়ালদা। এখান থে আনল জগদলপুর। শ্রীনিবাস আমাদের ক্যাম্প কম্যান্ডান্ট ছিল, বলে হিমাংশু তোদের মানা করলাম, তোরে একটা চাকরি দিতাম, তুই চলি গেলি ফ্যামিলি ফেলাইয়ে। তা আবার ফিরে আইছিস। আমার খুব লজ্জা লাগল। ওখান থেকে ডাইরেক্ট আমাদের এই কর্ম শিবিরে আইনলো। এই পর্যন্ত।

সাক্ষাৎকার : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯



জাতির টান, ভাষার টান, সেই জন্মভূমির যে একটা টান, এই চেতনাশক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ হয়ে যাবে এই ইচ্ছা তো ততোদিন পর্যন্ত থাকবে।

শাসন ক্ষমতায় এলে

সুনীল বিশ্বাস

বনগাঁয় রেজিস্ট্রেশন অফিস খুললো, বাবা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলের নাম রেজিষ্ট্রি করে R R নম্বর নিয়ে সরকারের সহযোগিতায় মানা ক্যাম্পে চলে আসার পর আরও দুটো ক্যাম্পে আমাদের স্থানান্তরিত করেছিল, ভানুপ্রতাপপুর, পানারগা পুনর্বাসনে নিয়ে আসে এখানে। ২৪ নং গ্রামে আমাদের পুনর্বাসন হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানকার ভৌগোলিক অবস্থাটা কেমন ছিল ?

সুনীল বিশ্বাস : ভৌগোলিক অবস্থা বলতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুই মিল নেই। ১০০ ভাগ বিপরীত। ৫০০ কি.মি. গেলে দুটো মালভূমি অতিক্রম করতে হয়, পাহাড় মালভূমি, উঁচু নীচু খালবিল নদী-নালা। প্রথমে যখন এলাম তখন দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট বলে একটা Resolution ছিল। তার একটা জেরক্স কপি দেখেছি। এবং পরে সেই Resolution মোতাবেকে এখানে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ছিল। তখন ভারতসরকারের কোন কর্ম কর্তা এখানে ছিল না। তারা রাজ্য সরকারের হাতে আমাদের হ্যান্ডওভার করে চলে গেছে। তারমধ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য যেসব সুবিধার পয়েন্ট ছিল সেই অনুযায়ী আমরা ৩০% থেকে ৪০% মাত্র ভোগ

করতে পেরেছি। আমাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম ছিল, যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তাদেরও শিক্ষার মান তেমন উন্নত ছিল না, ফলে ভারত সরকারের পুনর্বাসনের চুক্তি গুলি ভালোভাবে পড়ে বুঝে সেই অনুযায়ী আমাদের জন্য আন্দোলন গড়ে সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারিনি। যার জন্য স্কুল কলেজ করে দেবার যে কথা ছিল তা হয়নি।

প্র : আপনাদের জমিজমা কি ভাবে দেওয়া হয়েছিল ?

সু বি : এখানে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে দুই ধরণের উদ্বাস্তু ছিল ১৯৭০ সালের আগে যারা এখানে এসেছে তাদের old migrant বলা হয় এবং ১৯৭০ এর পরে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ হয় তার ফলে ওদেশ থেকে নূতন করে যে হিন্দু উদ্বাস্তুরা ভারতে আসে তাদের new migrant বলে, সেই সব উদ্বাস্তুরা দন্ডকারণ্য প্রোজেক্টের আওতায় যখন এখানে আসে তারাই new migrant এখন জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের দন্ডকারণ্য প্রোজেক্টের সর্ত অনুযায়ী old migrant দের ৬ একর ৬ ডেসিমেল পরিমান জমি দিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী এখানে আমাদের ১০০ মত গ্রাম আছে। আর new migrant - এর আওতাভূক্ত যারা এসেছে তারাও মানাক্যাম্প, কুরুদ্, কেন্দ্রী, নঁওগা, বরদাভাটা মানাভাটা এইসব কেন্দ্রে ছিলেন। মানা ক্যাম্প থেকেই তাদের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর বন্দোবস্ত হতো। ওটা স্বায়ত্তশাসিত কমান্ডডেন্ট ছিল, তারাই সব করতো। new migrant দের সেই অনুযায়ী মালকানগিরিতে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হলো তাদের ৩ একর ১৬ ডেসিমেল জমি দেওয়া হয়েছে। এটা হয়েছে ৭৪, ৭৫, ৭৬ সাল নাগাদ।

প্র : তখনকার জমি গুলি অবস্থা কেমন ছিল ?

সু বি : ধানচারা গুলি জলের অভাবে ১ বিঘাত যখন হতো শুকিয়ে যেতো। এখানকার জমিতে চাষের কৌশল তেমন জানা ছিল না, কিন্তু যখন বাঁচতে হবে, রাস্তা খুঁজতে হবে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তখনকার দিনে জমিগুলি চাষযোগ্য একদম ছিল না, সরকার ওদের বড় বড় মেশিন পত্র দিয়ে বনজঙ্গল সাফ করে লম্বা একটা আইল ভেঙে জমি ভাগ করে দিলেন, উঁচু নীচু বর্ষা পড়লে জল উপর থেকে গড়িয়ে নিচে চলে যাবে আর উপরে জলটা ৫ মিনিটও থাকতো না, এমনি অবস্থা ছিল, পরে মানুষেরা সেগুলিকে ছোট ছোট রুম করে, প্লেন করে গোবর সার, রাসায়নিক সার দিয়ে চাষযোগ্য করেছে।

প্র : ৭৮ সালে একটা ঘটনা ঘটে তখন পশ্চিমবাংলার মরিচঝাঁপিতে ব্যাপক মানুষ চলে গিয়েছিল, ঐ ঘটনায় আসুন।

সু বি : যদিও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি বেকার ছিলাম, বসে থাকতে ইচ্ছা করে না বাঁচতে তো হবে মা-বাবাকে নিয়ে, একটা সাইকেল ২৫০ টাকায় কিনে গ্রামের আদিবাসী এলাকায় ঘুরতাম। এখানকার আদিবাসীরা খুবই ভালো, আমাদের সঙ্গে

ভালো সম্পর্ক ছিল প্রথম থেকে। আজ পর্যন্ত বাঙালীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়নি, আগে যেটা হতো যে বোঝারভুল, ভাষার তারতম্যের জন্য হতো, ওদের ভাষাটা বুঝতে না পেরে ভাবতাম আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। পরে কিছু ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে, তবে সেটা আমাদের উভয়ের মধ্যকার ব্যাপারে নয়, অন্যকোন স্বার্থান্বেষী মানুষের ইন্ধন যোগানোর জন্য জন্য ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তেমন কিছু হয় নি। ৭৫/৭৬ সালে new migrant দের Settlement হলো ৭৬-এর ঠিক শেষের দিকে। আমি একদিন সাইকেল দুধ নিয়ে আসছিলাম মালকানগিরির আদিবাসীদের থেকে নিয়ে সেগুলি হোটেলে দিতাম তার থেকে প্রতিদিন ২০/২৫ টাকা উপার্জন করতাম। হঠাৎ তিনটা গাড়ী, এই মালকানগিরি থেকে ৩/৪ কি. মি. দূরে গাড়ী তিনটা আমাকে দেখে দাঁড়াল। আমি সাইকেলে দুধ নিয়ে আসছিলাম মালকানগিরি থেকে, গাড়ী থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে আমাকে বলেন আপনার সাথে কিছু কথাবার্তা আছে, চল ভাই বসি, আলের উপর বসলাম, ঠিক রাস্তার পাশেই, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেমন আছো, আমার নাম রাম চ্যাটার্জী পশ্চিমবাংলা থেকে আসছি।' প্রথমে ওঁর নামটা জিজ্ঞাসা করাতে বলেন নি, কেবল বলেছেন, 'তোমরা কেমন আছো।' আমাকে কতদূর পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি যে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছি, উনি বললেন, 'আপনি কি করছেন এই ১০ লিটার দুধ নিয়ে যাচ্ছেন কেন?' আমি বললাম, 'আর তো কোন রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না যে মা-বাবাকে নিয়ে বাঁচবো।' এখানে চাষ বাস ফসলাদিতো হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন উনি বললেন সব মানুষের মধ্যে ছোট ছোট সংকেত আমি পেলাম, কেউ যেন এখানকার পরিবেশ, সামাজিকতা, আবহাওয়া, কোন কিছুই যেন তারা মেনে নিতে পারছে না, সবাই যেন পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে চায়, এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত, আমি বললাম দেখেন এখানে বেঁচে থাকার জন্য যে সর্বনীম্ন বন্দোবস্ত দন্ডকারণ্য প্রোজেক্টের দ্বারা করার কথা ছিল, আমরা সেটা পাই নি, এতো অল্প বন্দোবস্তে মানুষ বাঁচতে পারে না। উনি বলছিলেন হ্যাঁ, এই রকম একটা সুন্দর কথা শুনবো বলে ঘুরছিলাম, কার কাছ থেকে শুনবো। O K, তো আপনাদের গ্রামে বোর্ডিং আছে, ইস্কুল আছে। আমি বলি হ্যাঁ, একটা বোর্ডিং আছে তার উপর নির্ভর করে ৫০/৬০ জন চলি, ইস্কুল আছে ৫ ক্লাস পর্যন্ত পড়ার বন্দোবস্ত আছে। এই সব কথা শুনে উনি বললেন, আপনি আমার সঙ্গে বিকালে দেখা করবেন দন্ডকারণ্য রেস্ট হাউসে। মালকানগিরির কাজ সেরে ওনার সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম। আমি গিয়ে দেখি ওখানে আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসা মুখ্য কিছু মাথা ওখানে হাজির। তারা কথাবার্তা বলছেন। আমি গিয়ে পাশে দাঁড়ানোর পরে, আমাকে আর কোন গুরুত্বের সঙ্গে ভিতরে ডেকে কথাবার্তা বলেন নি। রাম চ্যাটার্জী চলে যাবার পরে, মানুষ সুন্দরবন রওনা হলেন। কাকে কি ধরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন জানি না,

অথচ আমাকেও আর বলেন নি যে মা-বাবাকে নিয়ে চলে আসুন পশ্চিমবঙ্গে, আমরা আপনার সুখ-দুঃখ দেখবো। সকলেই যখন সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে চলে গেল তখন মা-বাবাকে নিয়ে আমি একা। এই অবস্থায় কি করবো বুঝতে পারছিলাম না, তখনকার দিনে বাঘ ভাল্লুকের ভয় ছিল, আবার ভাবলাম এই একা অবস্থায় আদিবাসীরা আমাদের উপর না হামলা করে বসে, এই সব ভেবে শেষে আমরা আরও কাছাকাছি হয়ে গেলাম মালকানগিরির কাছে এখানে ৪২ নম্বরে এসেছিলাম। এসে ১ মাস থাকার পরে একদিন এ্যাডমিনিষ্টারের কাছে গিয়ে বললাম, স্যার, আমাদের গ্রামের সকলে চলে গেছে ওখানে মা বাবা ভাই বোন মিলে আমরা মাত্র ৫ জনের একটিই পরিবার আছে। ওখানে থাকতে পারছিনা একা, আপনি দয়া করে একটা ব্যবস্থা যদি করেন যে এই ৪২ নম্বরের যারা ছেড়ে চলে গেছে তার একটা ভ্যাকেন্ট প্লটে যদি আমাদের থাকার অনুমতি দেন, সঙ্গে সঙ্গে একজনকে ডেকে বললেন, বলার পর বললেন, না সে রকম হবে না, আপনাকে আপনার গ্রামে থাকতে হবে। তাঁর কোন রকম সহযোগিতা না পেয়ে নিজের উদ্যোগে একটা ফাঁকা ঘর দেখে এই ৪২ নং প্লটেই একমাস থাকলাম পরিবারের ৫ জন মিলে। একমাস থাকার পর খবর পেলাম পশ্চিমবঙ্গের সরকার ওখানে সকলের জন্য অজস্র সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না, আমি বাবাকে পাঠালাম, আপনি গিয়ে ওখানকার সিচুয়েশন দেখে আসুন। ওখান থেকে ফিরে এসে বাবা আমাকে একটু চেপে বললেন, না বাবা তুমি যা শুনছে রেডিওর মাধ্যমে নানা লোকের মুখ থেকে সেটা ঠিক আছে। ঠিক আছে আমিও গেলাম, কিন্তু গিয়ে মানুষের অবস্থা দেখে বললাম হে ভগবান এ কোন জায়গায় এলাম, এখানে ভাই বোন মা, বাবা চারিদিকে মলমূত্র। এই জায়গাটা ছিল হাসনাবাদে, এই নারকীয় অবস্থা দেখে আমি আর কোন রকম কাল বিলম্ব না করে ভাইবোন মা বাবাকে নিয়ে একটা ভ্যানে করে ফিরে এলাম টাকি। ওখানে একটা দেশলাই কারখানার মালিক, একটা বড় বিল্ডিং দেখে ওখানে সকলকে নিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে কী ভেবে জানি না উনি নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তুমি কে? আমি বললাম, 'আমরা দন্ডকারণ্য থেকে আসছি।' তুমিও আসছো, লেখাপড়া, সবকিছু জানো, তুমিও আসছো, মা বাবা ভাই বোন নিয়ে? এমনি করে উনি আমাকে কাউন্টার, দূর থেকে শোনা কথা, আর নিজের চোখে দেখার মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য হয়ে যায় তো, তা বুঝতে পারিনি এখানে এসে দেখছি যে যা শুনেছি আর যা দেখছি দুটো একদম আলাদা, তো কি করি এখন কোথায় যাই। উনি দয়া পরবশত হয়ে বললেন তুমি এখানে শোবে রাত্রে আর ঐ যেভাবে রাস্তায় সকলে রান্না করছে ওভাবে করে খাবে। একমাসের মতো রইলাম বোধ হয়। তারপর আমার কাকার একমাত্র ছেলে ওকেও হারালাম। টাকি

হসপিটালে ডাইরিয়া হয়েও মারা গেল। হাওয়া বাতাস কিছুই আমাদের সহ্য হচ্ছিল না, আমার একমাত্র ভাই তাকেও হারালাম। তাই দেখে মনটা বেশী খারাপ হয়ে গেল, তখন ভাবলাম এর পর আর কে মরবে? এই রকম অবস্থা আবার শুনলাম সরকার আবার দন্ডকারণ্য ফিরে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছে চলে আসা উদ্বাস্তুদের, সেখানে গেলে যা যা তোমরা পাওনি, সবরকমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে, মনোমুখী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ভালো পুনর্বাসনের আশ্বাস দিয়ে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আবেদন এলো, সেই অবস্থা আমি এদেশে ফিরে এসেছিলাম সকলের আগে। তারপর সৌভাগ্যক্রমে এই ছোট চাকরী পেয়ে যাই।

প্র : একটা কথা পরিস্কার করে বলুন, প্রথম ব্যাচে (old migrant) এবং দ্বিতীয় ব্যাচে (New migrant) যারা এসেছে তারা কতটা করে জমি পেয়েছেন?

সু বি : তাদের মধ্যে ৫ একর পেয়েছে কিছু ফ্যামিলি, তারও কম ফ্যামিলি পেয়েছে ৪ একর কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি পেয়েছে ৩ একর ১৬ডেসিমেল পরিমান জমি, যারা পরে এসেছে তারা এ MPV-র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্র : মালকানগিরিতে কত ফ্যামিলি আছে?

সু বি : মালকানিগিরিতে টোটাল ফ্যামিলির সংখ্যা ৫ লক্ষের মতো ভোটার সংখ্যা ২.৫০ লক্ষ, প্রত্যেক গ্রামে গড়ে ৫০ থেকে ৪৫০ ফ্যামিলি আছে মোট গ্রাম সংখ্যা ২১৬ এখানে মালকানগিরিতে। দন্ডকারণ্য প্রোজেক্টের আওতায় ৭/৮ টা প্রদেশে উদ্বাস্তুরা আছে, বেশী মালকানগিরিতে। এখানে উড়িষ্যায় আর একটা জোন আছে উমরকোট। এরপর রয়েছে ছত্তিশগড়ে বস্তার জেলার অন্তর্গত পারুলকোট জোন, মহারাষ্ট্রের চাঁদা জেলায় রয়েছে একটা জোন, কর্ণাটকে আছে একটা জোন, অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলায় রয়েছে একটা জোন, পাখানজোড়কেই পারুলকোট বলা হয়।

প্র : কত মানুষ এই দন্ডকারণ্য প্রোজেক্টের আওতায় ছিলেন?

সু বি : সেই পরিসংখ্যান আপনাকে সময় করে বলবো। গোটা ভারতবর্ষে সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসন পেয়েছে।

প্র : দন্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুরা গিয়ে মরিচঝাঁপিতে যখন থাকা শুরু করলেন সরকার থেকে একটা অভিযোগ তোলা হলো এরা বিদেশের সঙ্গে চক্রান্ত করে একটা নাশকতা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, দ্বিতীয়তঃ সুন্দরবনের পরিবেশ নষ্ট করবে আর একটা রাজনৈতিক কারণ হলো এরা কখনই বামফ্রন্ট বিশেষ করে CPM-এর সঙ্গে যুক্ত হয় নি?

সু বি : এটাতো সোল আনা মিথ্যেকথা আমিতো শৈশব থেকে শুনে আসছি যে CPM সরকার ক্ষমতায় আসার আগে জীবনভর বলে আসছে যে যদি আমরা শাসন



ক্ষমতায় যেতে পারি তখন আমাদের পশ্চিমবাংলার ভাইয়েরা যে যেখানেই আছে তাদের ফিরিয়ে এনে তাদের চাওয়া পাওয়া, তাদের স্বার্থ, সমাজ সবকিছুকে বজায় রাখবো— তখন আমি ২/৩ শ্রেণীতে পড়ি তখন দেখতাম যখন ভোট আসতো পশ্চিমবাংলার বুকে, তখন নেতারা ঘুরে ঘুরে এই কথাই বলে বেড়াত এমন কি প্রফুল্ল সেনের সময় থেকে বলে এসেছে বাংলাদেশের কোন উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলার বাইরে যাবে না, আমি যখন আবার এখানে ফিরে এলাম তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তারপর ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ১৯৭৭ সালে এলেন শাসনক্ষমতায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তুদের মনে সেই সুন্দর কথাগুলো ফুটে উঠলো মনে, এককথায় সকলে তৈরী হয়ে গেলেন, তাহলে তো আমাদের সুখের দিন এসে গেলো, এই ভাবটাই তখন ফুটে উঠেছে। আর ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত তো বামফ্রন্টের নেতারা এই এ্যাকটিংই করে এসেছে। মানুষের মনে যে সুখ স্বপ্নের বীজ এরা বুনে দিয়েছিল পরে তার থেকে একটা গাছ বেরয়নি বরং নিদারুন দুঃখ যন্ত্রণা হতাশা হাহুতাস আকাশ ভরে উঠলো। এবং আমি দেখেছি মরিচঝাঁপি থেকে যারা আবার দন্ডকারণ্য ফিরে এসেছে, আমি তো দেখেছি একচেটিয়া পরিবারে ৫/৭ বছরের বাচ্চাকাচ্চা কারো নেই ৬০/৭০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বাবা-মা কারো নেই। ওখানে ফেলে এসেছে তারা মরে গেছে ডায়েরিয়া হয়ে। আর ওখানে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে অনেকে, তাদের ফ্যামিলি এখানে রয়েছে প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেবো।

প্র : তখন অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার SP ছিলেন অমিয়কুমার সামন্ত তিনি বলেছিলেন যে গুলিতে কোন মানুষ মারা যায় নি, মাত্র ২জন আদিবাসী লোক মারা গেছে। এটা কতদূর সত্য ?

সু বি : না, না আপনি চাইলে অন্তত মালকানগিরিতে ২০/৫০ টা evidence জোগাড় করে দিতে পারবো।

প্র : পশ্চিমবাংলায় যাবার জন্য যদি ভবিষ্যতে কোনদিন ডাক আসে, আপনি যাবেন ?

সু বি : দেখেন, জাতির টান, ভাষার টান, সেই জন্মভূমির যে একটা টান এই চেতনা শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ হয়ে যাবে এই ইচ্ছা তো ততদিন পর্যন্ত থাকবে। যত নিষ্ঠুরতাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের উপর করেছে, আমাদের কতটুকু ভালোবাসে না বাসে জানি না, তবে পশ্চিমবাংলার মানুষের ব্যক্তিগত ভালোবাসা এবং বাঙালী হিসাবে কি সে আমাকে ভুলে যেতে পারবে, নাকি আমি তাকে ভুলে যেতে পারবো, এটা কখনও হতে পারে? এখন যদি কেউ ভালোবেসে বলে ভাই এসে এক জায়গায় বসে খাবো এক জায়গায় বসে আমাদের কালযাপন করবো, তখন আবার সেই প্রেম হয়তো আবার জেগে উঠবে, কিন্তু বর্তমান যে অবস্থাতে আছি, দিন আনি দিনখাই, এই অবস্থাতে আছি তবে আমার মতো অবস্থাতেও অনেকে নেই, অনেকে খুব গরীব, এখনও দুটো ভাতের জন্য মরিয়া হয়ে খুঁজে বেড়ান, এই রকম পরিবার আমাদের মধ্যে এখনও ৩০শতাংশ আছে। যাদের একটু ভালো জমি চাষের তারা ৬ মাসের খোরাক পায়, জমির যতটা উর্বরা শক্তি এবং নিজের যোগ্যতা অনুসারে চাষ করে ঐ ৬মাসের মতো খোরাক যোগাড় হয় আর বাকি ৬ মাসের জন্য অন্য রাস্তা বের করতে হয়। এবং যে যেভাবে সেটা করতে পারে তার সেই ভাবে চলে, অন্যরা অসহায়তার মধ্যে চলে, এই ভাবেই চলে যাচ্ছে।

সাক্ষাৎকার : ২২ জানুয়ারি ২০০৭



রেল লাইনের বাংলা অক্ষরগুলো দেখে... মন আনন্দে ভরে উঠতো। আরে এইতো আমাদের মাতৃভূমি, এখানে সবাই মাতৃভাষায় কথা বলে, সবাই বাংলায় কথা বলে, সবাই বাঙালি।

মাতৃভূমির টান

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি ১৯৬২ সালে, বাবা এসেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মা, বড়দা, বড়দিদি, চারজনেই পরিবারে ছিল।

প্রশ্ন : আসার পর কোথায় উঠেছিলেন?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস : বাংলাদেশ থেকে এসে উড়িষ্যার তেরুভেলি ক্যাম্পে উঠেছিলাম, এবং তেরুভেলিতে এসে আমার জন্ম হয়েছে।

বর্তমান আছি উড়িষ্যা প্রদেশের মালকানগিরি জেলার কালিমেলা ব্লকের অন্তর্গত গ্যাম্পকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের MV-66 গ্রামে।

প্র : কে কে আছেন এখানে?

র বি : এখানে আছেন আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার ছোট ছোট তিন ছেলেমেয়ে , আমার ছোট ভাই, তার স্ত্রী, তিন ছেলে, বড়দা, বড়দার স্ত্রী, এবং তিনজন ভাইপো।

প্র : এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, মালকানগিরির মানুষ, শুধু মালকানগিরি নয়, যে সাতটা প্রদেশে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, সেখানে

জায়গা জমি পুনর্বাসন পেয়েও সুন্দরবনে জায়গাটা বেছে নিলেন, সেখানে যাবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ ওখানে কাদের আশ্বাসে গিয়েছিলেন? ওখানে যাওয়ার পর আপনারা কেন উৎখাত হলেন?

র বি : প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এখান থেকে সুন্দরবনে গেলাম কেন? দেখুন মাতৃভূমির টান, বাস্তবে এই জিনিষটা বুঝতে শিখেছি, আমি ১৯৭৮ এ ক্লাস ফাইভে পড়তাম, হঠাৎ শুনলাম MPV 23 নং গ্রামে রাম চ্যাটার্জী এসেছেন, ওনারা মিটিং করছেন, তখন তিনি বোধহয় হোমমিনিষ্টার ছিলেন খুব সম্ভব, এই রকম কিছু। বাঙালি ভদ্রলোক একজন মন্ত্রী শুনে আমাদের গর্বে বুক ভরে উঠলো, উনি বাঙালী, মন্ত্রি। Police Protection আছে। তখন আমাদের প্রাচীনদের বলতে শুনেছি দেখ বাঙালীদের কেউ আছে কিনা! আজ Police ওনার Protection-এ আছে এরা দেখুক। উনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন-মাতৃভূমির টান, বাস্তবে মাতৃভূমির জন্য টান আমাদের বাবা কাকার মধ্যে আছে সেই জিনিসটা আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলাম, বুঝতে শিখেছিলাম। এবং ঐ মিটিং-এ ভাষণ শুনেছিলাম রাম চ্যাটার্জীর যে মাতৃভূমি আজ দুহাত তুলে ডাকছে ওরে অবুঝ সন্তান তোরা ছুটে আয়....সাহিত্যিক ভাষায় এবং সেই ডাকে খুব সাড়া পেয়েছিলেন রাম চ্যাটার্জীও। জানি না এই ভদ্রলোকের কেন মমতা এসেছিল আমাদের প্রতি, কোন কারণে। তখন আমরা ছুটে যাই সেখানে। শুধু একটাই কারণে মাতৃভূমির টানের কারণে এবং যে টানটা এখনও রয়ে গেছে আমাদের ভিতরে। সেখানে ছুটে গেছি, যাওয়ার পরে, আমাদের প্রতি যে অন্যায় অত্যাচার হয়েছে। পরবর্তীতে ঘরের থেকে পা বাড়িয়েই আমি দেখছি, মানব অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে আমাদের প্রতি, অতি নিম্নভাবে, আমরা পথে ঘাটে, মানে, আমাদের দিন কেটেছে।

প্র : আপনাদের যাওয়ার পর থেকে যে অত্যাচার গুলি হয়েছে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি আপনাদের যারা গিয়েছিলেন সেটা বলুন?

র বি : এখান থেকে আমরা হেঁটে চলে যাই বর্তমান ছত্তিশগড় তৎকালীন মধ্যপ্রদেশে দ্রোনপাল, সেখানে নদীর পাড়ে হাজার হাজার লোক জংশনে গিয়ে উঠলাম। রায়পুর প্ল্যাটফর্মে ফাঁকা আকাশের নীচে শ' পরিবার আমরা যেভাবে বসবাস করেছি সে কথা ভাষার বর্ণনা করা যায় না। এবং সামাজিক মর্য্যাদা, লোকেও যে আমাদের কত নিম্ন চোখে দেখেছে, ঘৃণার চোখে সেসব কথা এখন ভাবতেও কষ্ট লাগে, রায়পুর থেকে আসানসোল আমরা চলে যাই, শুনলাম এদিকে রাস্তা বন্ধ ছিল, আসানসোলে একটা রুটই খোলা ছিল। ঐ রুটে আমরা যাই পশ্চিমবাঙলায় এবং যাবার সময় পথে ঘাটে যে পরিমানে লোক মরেছে এবং সেখানে গিয়েও দেখেছি পচা ফলের মত মানুষ মৃতদেহ ফেলছে।

মূলতঃ মৃত্যুগুলো হয়েছিল রোগে অসুখ বিসুখেই বেশি হয়, শিশুমারা যায়

অকালে মায়ের কোল খালি হয়ে যায়, অকালে অনেক লোক মৃত্যু বরণ করে, কুলবধূরা মানে অকালে বিধবা হয়ে যায় এবং যারা একটু প্রাচীন ক্লাসের লোক ছিল, বার্দ্ধক্য তারা তো বহুত লোকই মরেছে। এবং খাদ্যখানারও এত অভাব ছিল, বহুত লোককে ভিক্ষা করতে দেখেছি, যারা কি ভালোভাবে মোটামুটি ছিল, কোনদিন ভিক্ষার কথা মনেও ভাবেনি, তারা ভিক্ষাও করেছে পেটের জ্বালায়। বিদেশে কাজকর্মও জোটেনি এতলোক একজায়গায় থাকলে এক শহরের ভিতরে জীবিকার নির্বাহ করা অত সহজ কথা নয়। আর নিঃসম্বল অবস্থায় লোকে প্রায় গিয়েছে। এখানে তো পুঁজি পটকারা বেশী ছিল না, পুনর্বাসন যখন পেয়েছে, আমাদের প্রতি বাস্তবে খুবই অন্যায় হয়েছে। চিন্তা করতে গেলে, পাঞ্জাবে যখন পুনর্বাসন দেয় সরকারের তরফ থেকে এককালীন অবস্থায় মোটা অংকের টাকা লোন দেয়, ভালো বাড়ী করে দেয় এবং এক প্রকার সুস্থ পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ক্ষেত্রে এতো অন্যায় করা হয়েছে যে কখনও মোটা অংকের পয়সা হাতে দেওয়া হয়নি। সরকারের একটা অবিশ্বাস ছিল বরাবরই এদের হাতে যদি পয়সা পড়ে এরা আবার মাতৃভূমিতে পালিয়ে যাবে। যেটাকে ডোল বলতো, আমার মনে হয় ডোল মানে ভিক্ষাটিক্ষা এইরকম কিছু একটা হয়ে থাকবে original মানে তো মাস গেলে মাস প্রতি হয়তো তৎকালীন অবস্থায় ৫/১০ টাকা এরকম দেওয়া হতো। কোনোরকম বেঁচে থাকা যায়, আমাদের তৎকালীন অবস্থায় রেশন দেওয়া হতো। দিল পুনর্বাসন। এখানকার জমি একেবারে বালিজমি, অনুর্বর বালি, পাথর এবং নিচু জমিগুলো স্থানীয় আদিবাসীদের দিয়েছে। সে কথা আমরা বলতে ভয় পাই কেননা ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে বৈষম্যতা সৃষ্টি হয়। আমরা ভয়ে ঐ কথা কখনও বলি না, উঁচু জমি দিয়েছে। তৎকালীন অবস্থায় গরু কিন্‌তে টাকাও দেয়নি। গরু দিয়েছে, লাঙ্গলের ফাল, চিমনি, হ্যারিকেন এবং সপ্তাহে সপ্তাহে চাউল দেওয়া হতো, একমাসের চাউল আমাদের কোনদিন একসঙ্গে দেয়নি, সরকারের বরাবরই অবিশ্বাস আমাদের প্রতি, সরকার ভাবত এদের হাতে যদি একসঙ্গে টাকাপয়সা দেওয়া হয় তাহলে এরা চলে যাবে। বিশ্বাস করবেন না, একথা বলার সুযোগ পাই নি, ছোট ছিলাম খেরুবালী ক্যাম্পে রেলওয়ে স্টেশনে গুলি চলেছিল, কত গোল মরে ছিল সরকারের গুলিতে, একমাত্র অপরাধ ছিল এরা মাতৃভূমিতে ফিরে চলে যাচ্ছিল। বলেছিল দরকার নেই এই আমাদের পুনর্বাসন, এটা পুনর্বাসনের নামে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে। তাই যারা সরকারের ক্যাম্পের থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত চলে এসেছে তাদের বোঝাতে গিয়ে বিফল হয়ে গুলি করে মেরেছে তাদের রেল স্টেশনে। ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে রয়েছে তৎকালীন কিছু দর্শক ছাড়া আর সাক্ষী নেই।

প্র : এটা কত সালে ঘটেছিল ?

র বি : এটা ঘটেছিল ১৯৬৭/৬৮ সালে হয়ে থাকবে। মানা ক্যাম্পেরও ঠিক

একই অবস্থা, আমি মানা ক্যাম্পের কথা শুনেছি। তার কিছুদিন পরের ঘটনা, ২২ তারিখের, মানা ক্যাম্পের প্রত্যেকে জানে ২২ তারিখের ঘটনা। যে সব লোককে গুলি করে মেরেছিল ঘরে তাদের রক্ত লেগেছিল, মাংস লেগেছিল, গুলি করেছে লাশগুলো গায়ের করে দিয়েছে সরকার থেকে। লাশেরও কোনদিন সন্ধান পাওয়া যায় নি। মানুষ এখানে পুনর্বাসনে মোটামুটি রাজী ছিলনা যখন আসছে। বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রলোভন দিয়ে এখানে আনা হয়েছে। আনার পরও আমরা বাস্তবিক সামাজিক মর্য্যাদা কখনও ফিরে পাওয়া আমাদের আর সম্ভব হয়নি। আগামীতে ফিরে পাবো কিনা জানি না, সেকথা আমাদের অদৃষ্ট ভবিষ্যতই জানে। আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ কি সেকথা ভেবে আমরা শিহরে উঠি। ১৯৬৪ সালে যখন এখানে পুনর্বসতি দেয়, তৎকালীন অবস্থার আমাদের ৬ একর জমি দেওয়া হয়। পরবর্তিতে ৪একর ৩একর জমি দেওয়া হয়, যাদের ৩ একর দিয়েছে তাতে Condition ছিল পটেরু ইরিগেশন সেচ প্রকল্প'-এ তাদের জমিতে জল দেওয়া হবে। সেচপ্রকল্পের উপর ভরসা করে এখানে তো চাষ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় প্রথমত। দ্বিতীয়তঃ তৎকালীন অবস্থায় যে ৩ একর বা ৬ একর জমি দেওয়া হয়েছিল এক পরিবারকে বর্তমান এক একটা পরিবার সদস্য সংখ্যা বেড়ে ৪/৫ পরিবার হয়েছে। জমি মাত্র সেই সীমিত জমি রয়েছে। যদিও এখানে আমাদের সামাজিক অধিকার আছে, রাজনৈতিক এবং আমরা পূর্ননাগরিকতার অধিকার পেয়েছি এখানে, তথাপি আমাদের ক্ষেত্রে রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট একটা বৈষম্য মনোভাব পোষণ করেছে এদ্দিন। কোথাও একটা রিজার্ভ জমি, সরকারী এ্যাক্ট-এ আছে কিছুদিন কেউ যদি Occupy করে তাহলে তার নামে পাট্টা দিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ণ অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য রাজ্যে যেসব দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আমাদের একমাত্র উড়িষ্যার কোন বাঙালির নামে কোন রিজার্ভ জমি কখনও পাট্টা দেওয়া হয় না। এখনও এটা চলছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন এক অফিসারকে, স্যার বলুন এর কারণটা কী? আমাদের তো সব রকমের অধিকার দেওয়া হয়েছে, আমরা হরিজন এখানে, সামাজিক বর্গে যেখানে যে স্থানে থাকার কথা সেখানে সেই স্থানে সেইভাবে আছি, অন্যান্য সরকারী facility পাচ্ছি রাজনৈতিক অধিকার আছে, সব কিছু পাচ্ছি, অথচ (রিজার্ভ) জমি Occupy করলে আমাদের বেলায় এই রকম একটা বৈমাতৃক মনোভাব। তখন সে বললো, দেখুন আপনারা বাঙালী। সবকিছুর নীচে, আমি কথাটা Un-officialy বলছি, সবকিছুর নীচে আপনাদের বাঙালী শব্দটা লেখা আছে। যখনই আপনাদের টাইটেল দেখে, নাম দেখে তখনই কোন অফিসার আপনাদের নামে পাট্টা issue করেনা। বাস্তবিক এটাও আমাদের প্রতি সামাজিক অত্যাচার। উপরন্তু দেখুন, আমাদেরকে কেন্দ্র করে কোন media কোন ভালো কথা লিখতে সাহস করে না।



প্র : মরিচঝাঁপির ব্যাপার আপনি বলেননি, যে টর্চার আপনি দেখেছেন, এগুলি বলুন। আমাদের ফিরে আসতে হবে সেই প্রসঙ্গে।

র বি : আমি তখন ফাইভে পড়ি বলেছি আগেই, এখান থেকে পশ্চিমবাংলায় যখন গেছি, সেই ওটাকে এখানে মরিচঝাঁপি issue করে বলছেন আমরা ঐ সময় এটাকে সুন্দরবন issue বলে থাকি বরাবর। জিনিসটা যদিও সুন্দরবন issue। এইরকম হীনভাবে বসবাস করেছি, আমরা তখন হাসনাবাদে ছিলাম, জনসংখ্যা এতো পরিমাণে ছিল, যেখানে ভাত খাচ্ছি, ভাতের থালার নীচে রাখতে পারছি না কারণ নীচে পায়খানা শুধু মানুষের। সেইখানেই রান্নাবান্না করে খাওয়া এবং পায়খানার পোকাগুলো হেঁটে বেড়াচ্ছে আমি নিজে দেখেছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হচ্ছে, আর মানুষ তা হলে চিন্তা করুন, কত সংখ্যায় সেখানে, কিছু পরিমাণে মানুষ ছিল সেই ছবিটা ভাষায় বর্ণনা করা কখনও সম্ভব নয়। এবং মানুষ ওখানে রোগ ব্যাধিতে এত পরিমাণ লোক মরেছে, বিনা চিকিৎসায়, অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সাহায্যের হাত তখন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে স্বামীজিরা এসে আমাদের সাবান, বিস্কুট, খাদ্যপদার্থ, ভোজ্য পদার্থ আমাদের অনেক দিয়েছে কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট ছিল না আমাদের জন্য, বিনা চিকিৎসায় বলতে গেলে মানুষ মরেছে, রোগ ব্যাধি হয়েছে, ঈশ্বরই ভরসা। মেডিক্যালে গেলে সেখানে আমাদের প্রতি ব্যবহার ঠিক নেই, রিফিউজি বলে সামাজিক মর্য্যাদা ওখানে ক্ষুন্ন হতো, ট্রেনে উঠলে রিফিউজি উঠেছে, অনেকে নাকে হাত দিয়েছে। সেইসব কথা মনে পড়লে খুবই খারাপ লাগে।

প্র : মরিচঝাঁপির ভেতরে গিয়েছেন ?

র বি : না, আমি মরিচঝাঁপির ভিতরে ঢুকিনি, হাসনাবাদ অবদি গিয়েছি। হাসনাবাদের ঘটনা বলতে পারবো। আমাদেরই এক উদ্বাস্তু ট্রেনে এ্যাকসিডেন্ট হয়, তার এক হাত এক পা কাটা পড়ে। সেই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছে এখানে। বহুত লোক তখন ট্রেনে থেকেও মরেছে।

প্র : আপনাদের এখানের একজন ভদ্রলোক যেমন বলছিলেন, আবার যদি সুযোগ আসে তাহলে কি যাবেন ?

র বি : মাতৃভূমির টান। এত ক্ষয়ক্ষতির পরেও মানুষের মনে আমাদের মনে কেন যে সাড়া জাগে আবার সেখানে ছুটে যেতে সেটা কি আমাদের অপরাধ। না ভুল বুঝতে পারি না, এখনও বুঝতে পারি না। প্রথম যখন বাংলায় গেলাম, রেল লাইনের বাংলা অক্ষরগুলো দেখে, বিভিন্ন জায়গায় নাম লেখা সাইনবোর্ডে মন আনন্দে ভরে উঠতো, আরে এই তো আমাদের মাতৃভাষা চোখে জল চলে এসেছিল প্রথম দেখে। আরে এই তো মাতৃভূমি এখানে সবাই মাতৃভাষায় বলে, সবাই বাংলা ভাষা বলে, সবাই বাঙালী আমার মনে হয় এই ভাবনার কারণেই নাকি আবারও যদি ওরকম হয় যদি আশা পায় মানুষ যদি বাংলার মাটি আমাদের ডাকছে, সেখানে গেলে আবার থাকবার ব্যবস্থা হবে মানুষ ভবিষ্যতে যেতে হয়তো ভুল করবেনা মনে হয়।

প্র : ওখানকার সরকার আপনাদের থাকতে দেয়নি, আপনারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করছেন, আপনাদের সঙ্গে বিদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তাদের সঙ্গে চক্রান্ত করেছেন, টাকা নিচ্ছে এই সব অভিযোগের সম্পর্কে আপনার অভিযোগ আছে ?

র বি : নিশ্চয়ই আছে, সরকার চরম ভুল করেছে, বেইমানী করেছে আমাদের প্রতি, আমাদের ভাষা বোঝার চেষ্টা করেনি, সরকার তারা নিজেদের রাজনৈতিক জীবনকে চরিতার্থ করবার জন্য আমাদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছে। সরকার জানে অধিকাংশ দলিত লোক এর মধ্যে আছে, অশিক্ষিত লোক আছে, ব্যবহার জানেনা, আচার জানেনা। টাকিতে যে মিটিং হয়েছিল, সরকার তো সাহায্যের হাত বাড়াবে, সরকার তো সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকিতে আসে। বলেছিল আপনারা আমাদের খেয়ে আমাদের সঙ্গে আন্দোলন করুন। তাদের বোঝা উচিৎ ছিল অশিক্ষিত লোকের মিটিং এর মধ্যে যাচ্ছি। সেখানে ব্যবহার ভালোই পেতে পারি খারাপও পেতে পারি। যদি সেখানে কোন খারাপ করেছিল, সেখানে জুতার মালা দেওয়া হয়েছিল, কেউ জুতা ছুড়ে মেরেছিল মিটিংএ। রাজনৈতিক জীবনে মানুষের ফুলের মালা দেবার অধিকার আছে, তো জুতার মালা দেবার অধিকার আছে। ফুলের মালা আমরা খুশী হয়ে যাবো, জুতারমালায় আমরা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবো এটাতো ঠিক না। সেই জুতার মালার পরিণামে এদের আবার এখানে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। ফিরে আসা লেগেছে।

প্র : মরিচঝাঁপির পর্বে অজস্র মানুষকে না খাইয়ে মারা যেমন অন্যায়, গুলি করে মারা, নৌকো ডুবিয়ে মারা, বিনা চিকিৎসায় মারা যায় সে চরম অন্যায়। এই সব বিষয় মাথায় রেখে ভবিষ্যতে যদি সরকার বিরুদ্ধে এর বিচার হয়, আপনি কি বিচার চান ?

র বি : এর তো রীতিমতো বিচার চাই , এবং বিচার শুধু চাই না, ভবিষ্যতে

যদি কেউ কোনদিন অধিকার দাবী করে সুন্দরবনের, এখন শুনেছি সরকার সুন্দরবনকে বিক্রি করতে চলেছে, এরকম যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের এখন থেকে প্রথম বিদ্রোহের সুর ওঠা উচিৎ যেহেতু সেটাকে আমরা পৈত্রিক সম্পত্তি মনে করি। আমরা যা খুইয়েছি, হাজার হাজার জীবন আমাদের রাস্তায় কেটেছে, পথে ঘাটে দিয়েছি, আমরা সাজানো সংসার, বহুত কিছু এইভাবে ফেলে চলে গেছে সেখানে। খালি হাতে গিয়ে উঠেছে সেই মাতৃভূমির টানে, সেই মাতৃভূমি যদি বিক্রি করতে চলে, তো এটাও একটা মারাত্মক অন্যায় হবে আমাদের প্রতি।

ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বাঙালিরা ঐ বাংলায় আবার পুনর্বাসনের সুযোগ পায়। নিশ্চয়ই এরা সেই পুর্নবাসনের সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করবে। নচেৎ এমন কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে এই বাঙালীদের দ্বারা, গড়ে উঠতেও পারে, বাঙালীর পুনর্বাসন বাংলায় চাই। আমাদের এখানে পূর্ণবসতি দেওয়া হয় নাই। নির্বাসনে দিয়েছে আমাদের এখানে, এখন আমরা রীতিমতো বনবাসে আছি। বাংলার মাটিতে বাঙালীরা কোনদিন ভবিষ্যতে বসবাস করবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আমিও সমাজের প্রতি আমার নিবেদন তারা যেন সেখানে এই আশা নিয়ে বসবাস করে।

সাক্ষাৎকার : ২২ জানুয়ারি ২০০৭

ঘরে চাউল নাই... মা ওখানে মানুষের বাড়ি কুলি খেটেছে,
তাচ্ছিল্যের মতো সেখানকার ব্যবহার। সে সব বলা যায় না।

কেমন ছিলাম

নিরাপদ বিশ্বাস

প্রশ্ন : আপনার নাম, এখানে কোথায় থাকেন ?

নিরাপদ : নিরাপদ বিশ্বাস, এখানে থাকি MV 98 , চিত্রাক গ্রাম পঞ্চায়েত। কালিমেলা থেকে ২৩ কি. মি.। আমি বর্তমানে বেকার, বাংলাদেশে আমার বাড়ী খুলনা জেলার পাইটগাছা থানার অন্তর্গত খড়েমঠবাড়ী গ্রাম। আমি যখন এখানে আসি আমার বয়স ৫ বছর, সঙ্গে মা ছিলেন, বাবা ছিলেন আর আমরা ৫ ভাই বোন, আমি সবার ছোট, মানা ক্যাম্পে ছিলাম না, মানা ভাটাতে ছিলাম। মানা ভাটা থেকে প্রথম একবার আমি তখন ৭৭ সালের আগে প্রথম একবার এসেছিলাম এখানে এসে 23 নম্বর এখন যেটা ১০৬ ক্যাম্প-এ প্রথম ছিলাম, ১৯৭৭ সালে রাম চ্যাটার্জী, সতীশ মন্ডল এরা এসে মিটিং করলেন আমাদের আবার যেতে হবে পশ্চিমবাংলার মরিচঝাঁপিতে। সেখানে আমরা যাবো। সেই সময় রাম চ্যাটার্জীর ঐ মিটিং-এ আমি বাবার হাত ধরে আসছিলাম। এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেতে হবে সুন্দরবনে থাকতে হবে এই যে একটা জনজাগরণ হয়েছিল, তা সকলে বেশ উল্লসিত, সেই মিটিং-এ আমি ছিলাম, এবং ৭৮ সালে আমরা যাই মরিচঝাঁপির উদ্দেশ্যে এবং হাসনাবাদে গিয়ে থাকি। মাসখানেকের মতো

ওখানে থাকলাম, তারপর আমরা হেঁটে হেঁটে গিয়ে নৌকো করে মরিচঝাঁপিতে গিয়ে উঠলাম। মরিচঝাঁপিতে ৭/৮ মাসের উপরে ছিলাম। প্রথম আমার শৈশবের অবস্থা যেটা, সেই সময় আমি অনুভব করেছি যেটা, যে হাসনাবাদে আমরা যখন গেলাম, আমাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন ব্যবস্থা তো ওখানে নেই, ঝুপড়ি করে আমরা ছিলাম, মানুষের যে সব কষ্ট দেখেছি চোখে, এবং চোখের সামনে মানুষের মৃত্যু দেখেছি, তখনকার কালে তাতেই আমি ভীষণ মর্মাহত হয়েছিলাম, দেখেছিলাম, ধরেন, মানুষ ডায়েরিয়াতে মারা যাচ্ছে, চিকিৎসার অভাব হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার নেই, ডাক্তার প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং ওখানকার স্থানীয় লোকে ভীষণ ঘৃণিতভাব এবং দেখেছি ল্যাট্রিনের কোন ব্যবস্থা নেই আমার বাস্তব ভিত্তিতে দেখেছি যে, এক জায়গায়, বোধহয় ওখানকার স্থানীয় ব্যবস্থার ভিতর জমির ভিতরে খাল করে ল্যাট্রিন করা হয়েছিল, চাঁচ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়ে ছিল। তাতে দুটো করে বাঁশ দিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছিল ল্যাট্রিনের, কিন্তু তাতে আমি দেখেছি একটা লোক রাতে পায়খানা করতে গিয়ে তাতে পড়ে গেল, সারারাত উঠতে পারলো না, জল ওতে ভর্ত্তি, সেই পায়খানার মধ্যে সারারাত হাবুডুবু খেতে খেতে লোকটা সকালে মারা গেছে ঠান্ডায়। আর চারিদিকে লোকের মৃত্যু আর বাবার মুখ দিয়ে ঐসব শুনতাম যে ভীষণ অবস্থা খারাপ তারপর বললেন কি এখানে আমাদের পক্ষে থাকা সম্ভব নয় আমাদের মরিচঝাঁপিতে যেতে হবে। হেঁটে হেঁটে রায়মঙ্গল পাড়ি দিয়ে গেলাম মরিচঝাঁপিতে। মরিচঝাঁপিতে গিয়ে দেখি ভীষণ জঙ্গল, নারকেল বাগান, ঝাউবাগানের ভিতরে আমাদেরও আগে কিছু লোকজন ঝুপড়ি করে করে আছে। লোকের খাদ্যের ভীষণ খারাপ অবস্থা তো অন্নের জন্য কেউ জঙ্গল থেকে কাট কেটে ধরেন বিভিন্ন রকম কেউ একটা বটির আছার আর যে যা কাজ জানে, কিছু জ্বালানী কাঠ বিক্রি করে কুমিরমারি গ্রাম, মোল্লাখালি গ্রামে বিক্রি করে কিছু পয়সা দেয়, কারে কিছু খাইদ্যখাদক দেয় তাই নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে, তারপরে অনেকের এমন অবস্থা হয়েছে প্রসাশনের কোন সাহায্য-সহানুভূতি নেই, ওখানকার স্থানীয় লোকেরা ঐখানে একটা বাজার ধীরে ধীরে গড়ে ওঠালেন। সে বাজারও আমি গিয়েছি। দেখেছি ওখানকার স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় একটা স্কুল হয়েছে ছাত্রদের পড়ানোর জন্য, স্কুলে আমুও গিয়েছি, বাজার ও দেখেছি ওখানে, এমনি করে চলতো, আমি বাবার সঙ্গে অনেকবার অন্নসংস্থান তখন ভীষণ অবস্থা, আমার এক দাদাকে এক বাড়িতে মাইনে করে রাখা হলো। আমিও বাবার সঙ্গে কাঠ নিয়ে নিয়ে নৌকো পার হয়ে ঐ পাশের গ্রামে যেতাম, যে ঐ কাঠ বিক্রি করতাম, একদিন এই রকম অবস্থা ঘরেতে চাউল নাই, আমার খাওয়াও নেই এমন অবস্থা, মায়ের সঙ্গে গিয়েছি হাঁটতে হাঁটতে কেউ আর কাঠও নিতে চাচ্ছে না। খুব ক্ষিদায় কাতর হয়ে ধনী বাড়ীতে যেয়ে বললাম, মা, আমায় দুটো খাতি দেন, মা খুব অনুরোধ করলেন তাতেও কিন্তু মানতে রাজি না। তারপর আমি ভীষণ কান্না করে ফেললাম, খিদীতে আমি আর পারছি না, তাতে ঐ বুড়িমাকে মা ভীষণ ধরাধরি করার পরে

বললেন, ঠিক আছে কাঠ রেখে দাও। দিয়েটিয়ে আমরা দুপুরে ওখানে খাওয়া দাওয়া করলাম। তো সেই সব যে চিত্র, মা ওখানে মানুষের বাড়ী কুলি খেটেছে, তাচ্ছিল্যের মতো সেকানকার ব্যবহার। সে সব বলা যায় না করুণ কাহিনী। আমি দেখেছি আমার পাশের লোকেরা ওখানে যে গাছ হোতো ক্ষুধার জ্বালায় কেউ নারকেলের মাথি উঠাই খেয়েছে, তারপর কি ঐ যদুপালং ঐ উঠায়ে খেতে আমি দেখেছি। আমার এক জেঠা মশাই ছিল ঝড়খালি মাঝে মাঝে ওখানে একটু যেতাম, কিছু কাজ করতো বাবা তাই এনে এনে খেতাম। তাতে কিছুটা চলে যেতো। আমার বাবার সঙ্গে বহুদূর জঙ্গলের ভিতর আমি গেছি মাছ মারতে, আমাদের একটা নৌকোও করা হয়েছিল, তারপরে এমনি হয়ে আর চলে না। তারপরে একদিন শুনলাম যে আমাদের এখান থেকে তাড়ানো হবে। এখানে আমাদের আর থাকতে দেবে না এই জায়গায় সরকার। তারপরে এই যখন শুনলাম মানুষের ভিতরে শোকের ছায়া, দেখলাম কিছু কিছু মানুষ কোলের বাচ্চাকে এরকম ফেলাই দিয়ে যাচ্ছে। মরে গেছে আর কি করবে। ফেলাই দিচ্ছে আমি চোখের সামনে সেসব দেখেছি, তারপর একদিন দেখা গেল যে সরকারের লঞ্চ করে পুলিশ পাঠিয়েছে। নদীতে টহল দিয়ে আর লোকেরা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য গরান কাঠে বিভিন্ন রকম যা সম্ভব হয়, অস্ত্র গোলাবারুদের সামনে তো আমাদের কোন হাতিয়ার নেই, সামান্য এসব দিয়ে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রকম পন্থা আমাদের নেতারা নিয়েছিলেন যা আমাদের বলেছেন, আমরা সেই রকম ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম সরকার পুলিশ পাঠিয়ে মাঝে মাঝে এসে গণ্ডগোল করতো, করতে করতে ভীষণ অবস্থা, লোকজন মারা যাচ্ছে। আমাদের পার হতে দিচ্ছে না, টাকার দরকার, মানুষ পার না হতে পারলে, কিছু টাকা চাল যোগাড় করার জন্য কাজের জায়গায় যেতে পারছে না, এই রকম নির্য্যাতন। তারপর একদিন বাবা বললেন এখানে এইভাবে বাঁচা যাবে না, চলো চলে যাই। তারপর আমরা ওখানে থেকে চলে আসি। বাংলার মাটিতে যখন জন্ম গ্রহণ করেছি, বাংলার জনজীবন বা সেখানকার মাটির যে মায়া, অনুভব তো তখন যদিও না করতে পারি কিন্তু বাবা মায়ের রক্তের ভিতর আমার যখন জন্ম, তাদের যখন আন্তরিকতা ছিল, তো সে মায়া আমার ভিতরেও ছিল। কিন্তু পরে যখন ভেবেছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার ঘরে যত ভাই বোন সব এক হউক এক হউক' তো আমরাও তো সেই বাংলারই জন্ম। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার ভাইবোন এক হউক', এই সব লেখা কি খাতা কলমে চিরদিন থেকে যাবে? আমরা বাংলারই মানুষ, সেখানে ফিরে যেতে চেয়েছি তাদের মতো আমরাও বসবাস করতে চেয়েছি সেই মাটিতে অথচ আমাদের বসবাসের কোন ব্যবস্থাই হলো না। আমাদের নিদারুনভাবে নির্যাতন করে ওখান থেকে তাড়ায়ে দেওয়া হলো।

সাক্ষাৎকার : ২৪ জানুয়ারি ২০০৭

আমাদের ঘর জ্বালাই দিল

রমেশ রায়

প্রশ্ন : মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন, ওখানে থাকতে পারলেন না কেন ?

রমেশ রায় : পুলিশ দিয়ে আমাদের ঘর জ্বালাই দিল। ওখানে জ্যোতি বাবু, পুলিশ দি পিটায়ে, লঞ্চে উঠাই নিয়ে এল, থাকবো কি করে, অত্যাচার যে না বেরুইচে তারে পেটাইচে, গুলিতি মারি ফেলাইছে, আমার চোখের সামনে যেটা গুলিতি মরেনি সেডারে বুট দি পড়াই মারিছে, চেনাজানা কোনো নাম আমি বলতি পারব না। অনেক অত্যাচার, আমরা তো যদুপালং খাইছি। খাইদ্য বন্ধ করে দেইছে, নারকেলের মাথি খাইছি, যদুপালং দি সিদ্ধ করে, তারপর পুলিশ দ্বারা লঞ্চে নিয়ে আসছে হাসনাবাদে। সেখান থে নিই এলো দুধকুণ্ডি ক্যাম্পে।

সাক্ষাৎকার : ২৪ জানুয়ারি ২০০৭

আমরা জানতাম জ্যোতি বসু আমাদের লোক, তিনি বড়োলোকের নন। বামফ্রন্ট সরকার তো উদ্বাস্তুদের সরকার। তবুও আমাদের ওপর পুলিশ দিয়ে এরকমভাবে আক্রমণ করতে পারে— এটা আমাদের ভাবনার বাইরে ছিল।

প্রথম সেদিন পুলিশ নৌকো ভাঙ্গে

সুজিতকুমার বিশ্বাস

আমরা মরিচঝাঁপি যাবার পর প্রথম ছ-সাত মাস বামফ্রন্ট সরকার থেকে আমাদের উপর কোনো পুলিশি আক্রমণ হয়নি। এরপর যেটা শুরু করে একটা দুটো নৌকা ধরে নিয়ে যায় বাগনা পুলিশ ক্যাম্পে। মরিচঝাঁপি বাজারের জন্য আনা চাল-আটা-তেল-ডাল ওরা ছিনতাই করতে শুরু করে। এরপর আক্রমণ বাড়াতে থাকে। এবারে নৌকার লোকগুলোকে এ্যারেস্ট করতে শুরু করে। মেয়েদের ধরে নিয়ে বাগনা পুলিশ ক্যাম্পে ৭ দিন ৮ দিন ১০ দিন অত্যাচার করে ছেড়ে দেয়।

আমরা ঠিক করি এভাবে তো হবে না। আমরা ছিটে গরান, হেতাল কাঠ নিয়ে কিছু কিছু অন্যান্য দ্বীপে বিক্রি করতাম। অন্যান্য দ্বীপ যেমন কুমিরমারি, মোল্লাখালি, সন্দেশখালি, ধামাখালি যেতাম, ওখান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস আনতাম। আমরা ঠিক করলাম একটা দুটো নৌকো নিয়ে গেলে ওরা তো আক্রমণ করছে। এবারে একসাথে ১০০র উপর নৌকো নিয়ে যাবো। আমাদের তখন মরিচঝাঁপিতে ১৫০র উপর নৌকো হয়ে গেছে। ছোট নৌকোগুলোতে ৮ জন বসতে পারতো। ৭০ মন থেকে ২০০ মন মাল ধরে এমন নৌকো আমাদের ছিল।

একদিন আমরা ১০০র উপর নৌকো নিয়ে বেরিয়েছি করানখালি নদী পেরিয়ে গেছি। সেদিন নদীতে নৌকোয় রান্না করে খেয়েছি। বিনা বাধায় এগিয়ে যাচ্ছি। নদীর ২ পাড় দিয়ে দুভাগে ভাগ করে এগিয়ে যাচ্ছি। রাত্রিবেলা, রায়মঙ্গল নদীর কাছে আমাদের ব্যারিকেড করে দিয়েছে। তখন আমাদের মধ্যে অনেকে কি করবো বুঝতে না পেরে মশাল জ্বালিয়ে এগিয়ে যাই। তুসখালি নদীর সামনে এসে আমরা পুলিশের মুখোমুখি হয়ে পড়ি। পুলিশ আমাদের উপর অজস্র টিয়ার গ্যাস ছুড়তে থাকে। আমরা তুসখালি দিয়ে ধামাখালি যাবো, সেখান থেকে যাবো রামপুরহাট। ধামাখালির উল্টোদিকেই সন্দেশখালি। আমরা যখন তুসখালি পার হয়ে ধামাখালির দিকে যাচ্ছি তখনই পুলিশ লঞ্চ দিয়ে আমাদের নৌকার মাঝখানে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেয়। এতোখানি অমানবিকভাবে এরা নৌকো ভেঙে ফেলবে তা আমরা কেউ ধারণা করতে পারিনি। কতো জন ডুবে গেছে, নদীতে ভেসে গেছে তার খবরও আমরা রাখতে পারিনি। আমরা জানতাম জ্যোতি বসু আমাদের লোক— বড়লোকর তিনি নন। বামফ্রন্ট সরকার তো উদ্বাস্তুদের সরকার। তারা যে আমাদের উপর এরকম ভাবে পুলিশ দিয়ে আক্রমণ করতে পারে— এটা আমাদের ভাবনার বাইরে ছিল। আমার নৌকোর মাঝখানে এসে প্রথম ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকটা নৌকো ভেঙে দেয়। নৌকোগুলো ডুবে যায়, আমরা সাঁতার দিয়ে ধামাখালির কাছে গিয়ে উঠি। এরই মধ্যে দু তিনটে নৌকো ফাঁক দিয়ে নদীর পাড়ে চলে যায়। পুলিশ ক্রমাগত টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে। পুলিশ মাইকে প্রচার করছে— এদের কাছ থেকে কেউ কিছু কিনবে না, বেচবে না। আমরা সবাইকে বললাম যে কাঠ আছে, ছোট ছোট টুকরো করে দুদিকে ছুঁচলো করো। পুলিশ আক্রমণ করলে ওদের দিকে একসাথে অনেকগুলো করে ছোড়ো, যাতে ওরা পালায়। কিন্তু পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে আমরা এভাবে কতোক্ষণ যুদ্ধ করবো। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো আর থামছে না। অনেক নৌকো ভেঙে ফেললো লঞ্চ দিয়ে, মালপত্র লুট করে নিল, অনেককে এ্যারেস্ট করলো। আমাদের ধরতে পারলো না, আমরা ডাঙ্গায় উঠে জলা জমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছি। কাঁদানে গ্যাসে সারা শরীর জ্বলে যেতে লাগল। আমরা তখন স্থানীয় মানুষদের বলতে লাগলাম যে ওরা এইভাবে আমাদের উপর অত্যাচার করছে দেখুন। আমার সঙ্গে ছিল সতীশ গোলদারের ভাগনে গৌর। সন্ধে হয়ে আসলে পুলিশের আক্রমণ কম হয়ে গেল। ওরা চলে গেলে আমরা খালি হাতে হাঁটতে হাঁটতে পরের দিন সকালে মরিচঝাঁপিতে পৌছাই।

সাক্ষাৎকার : ২৫ জুলাই ২০১০



সামনে ছিল বিনোদ ওর দুটো ছেলে একটা মেয়ে গেল মরে... পাশে ছিল আমার দিদির মেজ জা, ওনার একটা মেয়ে জলে ডুবে মরি গেল,... আমার সামনে ছিল জেঠাতো ভাই কান্ত তার একটা মেয়ে মরল। পিছনে ছিল একজন তার তিন ছেলেমেয়ে মরি গেল। একজন ব্রাহ্মণ তার পাঁচটার একটাও বাঁচি থাকল না।

যেসব মৃত্যু দেখেছি

চম্পারানি রায়

প্রশ্ন : আপনি মরিচঝাঁপি গিয়েছিলেন, ওখানকার ঘটনা জানেন? কেন গেলেন?

চম্পারানি রায় : হ্যাঁ গেছিলাম, প্রথমে রাম চ্যাটার্জি আসছিল। এসে মিটিং করে বলল, আপনাদের সুন্দরবনে সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হবে। লোক তো চলি গেল, পরে আমরা গেছি। আমাদের ফ্যামিলিতে ছিল স্বামী, বাবা, মা, দিদি, দাদাবাবু, আরও অনেক লোক ছিল, ১০/১৫ পরিবার এখানে। যখন আমরা ৫৮ নম্বরে যাই, তখন রাম চ্যাটার্জি বলেছিল যে আপনারা সুন্দরবন যান, সব লোক চলে গেল, আমরা দুই পাঁচ ফ্যামিলি থাকি কি করব। এখানে আদিবাসীর ভয়। তারপর তো ওখানে গেলাম হাসনাবাদে। আমরা ঐ প্রলোভনে ওখানে গেলাম। ওখানে যাওয়ার পরে তো পুলিশ ফোর্স লঞ্চ নিয়ে হানা দিতে আমাদের উঠানোর জন্যে। আমরা ওখান থেকে বেরনোর দু মাস পরে ওখানে একজনও টিকতে পারল না। তখন ওখানে করব কি, ওখানে আমার স্বামী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে, কোনো কাজই ছিল না। আমার কোলে একটা ছেলে ছিল। ছেলেটারে ১৮ দিন যখন নদী পারাপার বন্ধ ছিল, তখন আমি বিচিকলা লোনা জল দিয়ে সিদ্ধ করে খাওয়াইছি ছেলেটারে।

তারপরে যখন দেখা গেল লোকজন আর টিকতি পারছে না, সব সময়ের জন্য লঞ্চে অত্যাচার, মারামারি গুলিগোলা চলতি লাগল, তারপর একদিন ভয়ে একটা গাছের নিচে গিয়ে বসলাম, গুলি চালাল, গুলি গাছ ফুড়ি বেরিয়ে গেল, ছেলেটারে গাছের নীচে আঁচল দিয়ে ঢাকে নিয়ে বসিছিলাম, আমার স্বামী তখন ছিল না ওখানে, পার হই আসতি পারে নি, লঞ্চঘাট সব বন্ধ নৌকা পারাপার সব বন্ধ। তারপরে বলল কি যদি ভলানটিয়ারে কেউ কেউ যদি নাম দেও মিছিল নিয়ে, তাতে পুলিশ প্ল্যান্টেশনে না ঢুকতি পারে। আমরা অনেক মেয়েছেলে মিছিল নিয়ে যাইতাম কিসের জন্যে যে এক পোয়া করি আটা দিত, বাচ্চাটারে একপোয়া আটা খাওয়ানোর জন্যি, শুধু বাচ্চাটারে বাঁচানোর জন্য, একপোয়া আটার প্রলোভনে ঐ মিছিল নিয়ে ভলান্টিয়ার হয়ে বেরতাম। এইভাবে থাকার পরে পারাপার খুলল। ওখান থেকে দুই মাস আগে বেরোয়ে চলে আসছিলাম, মালকানগিরি ফিরে আসলাম। এসে আবার জায়গা জমি ফিরে পেয়েছি। এখন মোটামুটি আছি। তবুও তত সুবিধা নেই সংসারে। স্বামী তো গ্যাস্টিকির রুগী কাম করতি পারে না, আমি বিড়ি বান্দি।

প্র : মরিচঝাঁপির ঘটনার কথা বলুন।

চ র : সামনে ছিল বিনোদ। ওর দুটো ছেলে, একটা মেয়ে, গেল মরে। তারপর পাশে ছিল আমার দিদির মেজজা। ওনার একটা মেয়ে জলে ডুবে মরে গেল, আমি নিজে উঠাইছি সেই মেয়েটারে, ঐ একজন গেল, আমার সামনে ছিল জেঠাতো ভাই কান্ত, তার একটা মেয়ে মরল, পিছনে ছিল একজন আর তিন ছেলে মেয়ে সবই মরি গেল। একজন ব্রাহ্মণ তার পাঁচটা ছেলে একটাও বাঁচি থাকল না। সব মরি গেল, তারপর স্বামী স্ত্রী বৃন্দাবন চলি গেল।

সাক্ষাৎকার : ২৪ জানুয়ারি ২০০৭

ছোট ভাইটি মরি গেল

দীপালি বালা

আমরা যখন সুন্দরবনে চলে গেছি, আমরা তখন ছোট, মানে বারো তেরো বছর বয়স হবে। আমরা তিন ভাই বোন ছিলাম। বাবা মা দুই ভাই আর আমি, পাঁচজন গিয়েছিলাম। আমি তখন ছোট। আমার বাবা মা আমার কাছে দুই ভাই রাইখে সুন্দরবনে যেত গরানকাট কাইটতে, গেয়ো কাট, গেয়ো কাট কাঠতে। এনে বোঝা বাইন্দে নদীতে ভাসায়ে দেত। তার উপরে বাবা মা বসে নদী পার করে বিক্রি করে যা পয়সা পাইতো তাই দিয়ে চাল কিনে আইনে তাই খাইতাম। তার পর আমার ভাইডি হইল ডাইরিয়া। মা করছে কি এই জায়গায় আর থাকা যাবে না। থালা বাসন যা ছিল সব বিক্রি করে দেছে, বিক্রি করে মা কইছে কি এই জায়গায় থাকপো না, তা হলি আমার ছেলেমেয়ে বাঁচাতি পারব না। তারপরে হাসনাবাদে আসলাম, দুধ, বিস্কুট, এগুলি দেত, ওগুলি ওঠাতাম। ছোট মানুষ না গেলে আবার দেতো না। মা কইতো কি তুই যা, আমরা গেলে তো দেবে না, তুই যা তুই নি আয়। তা মা আমারে পাঠায়ে দেত। আমি আনতাম, আনি খাতাম। তারপরে কয়কি এইভাবে বাচ্চাকাচ্চা মোটে বাঁচানো যাবে না। ওই সময় আমার ছোট্ট ভাইটির ডাইরিয়া হল।

ওইখানে আমার ছোট ভাইটি মারা গেল, মরি গেল পরে, বলছে কি আর এই জায়গায় থাকপো না। আমার জিনিসপত্র যা আছে টুকটাক বিক্রি করি চলি যাব, বিক্রি করে চলি আসল এই দেশে। মালকানগিরি।

প্রশ্ন : এই সময় মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছিল ?

দীপালি বালা : সেইসব আমি জানি না সে সময়ে আমি বেশি বড় না। ছোটো তো যতটুকু জানি। এখন আমি এম পি ভি ২৩ নম্বর-এ থাকি।

সাক্ষাৎকার : ২৪ জানুয়ারি ২০০৭

একজনের বয়স ৬ বছর। আর একজনের ৩ বছর হবে। না খাইয়ে, চিকিৎসা করতি পারলাম না, পয়সাকড়ি নাই। দুজনে কাঠ কাইটে... এক টাকা দেড় টাকা হয়, তাতে কি আর সংসার চলে ?

আমার দুটো বাচ্চা মারা গেছে

বিনোদবিহারী মণ্ডল

প্রশ্ন : আপনিও সুন্দরবন গেছিলেন !

বিনোদবিহারী মণ্ডল : আমিও সুন্দরবন গেছিলাম। এখানে এসে আমাদের রাম চ্যাটার্জি বাবু এসে মিটিং করে বললেন, আপনারা যারা আছেন সুন্দরবনে আসেন। আমি মিটিং-এ ছিলাম, বহু লোক ছিল এখানের। আমরা এখানে গরু বাছুর যা ছিল সব কিছু জমা দিয়ে, সুন্দরবন যাই। তারপর হাসনাবাদে ছিলাম ১০/১৫ দিন। থাকার পর আবার চর হাসনাবাদে ছিলাম ৫/৬ দিন। আমরা ফাস্টে নৌকায় করে, সতীশ মণ্ডল নৌকো ঠিক করে দেয়, আমরা চলে যাই মরিচঝাঁপি। ঐখানে আমরা ছিলাম প্রায় ১ বছর। ফাস্টের থেকে লাস্টে। ওখানে জমিজমা দেবে বলে প্লট কাটছিল, ওইখানে বানবন্দী করতাম। তারপর জবরদস্তি পুলিশ উঠাই দিল। গুলিগোলা চলল। আমার দুটো বাচ্চা মারা গেছে। একজনের বয়স ৬ বছর, একজনের ৩ বছর হবে। না খাইয়ে চিকিৎসা করতে পারলাম না, পয়সাকড়ি নাই, দুইজন কাট কাইটে আর কি করব। আর ঘেরে কাজকর্ম কইরলে আর কতো হবে একটা টাকা/দেড় টাকা হয় তাতে কি আর সংসার চলে। ১৪ দিন না খাওয়া হলে

ঐ নারকেল গাছ খেয়ে আর যদুপালং এইসব খাওয়াদাওয়ারপর আর ঠিক রাখতি পারলাম না। আমরা ছয়জন লোক গিয়েছিলাম। আমরা দুইজন তিন ছেলেমেয়ে আর মা ছিল। চলে আসলাম চার জন। একটা মেয়ে আমরা দুইজন আর মা। দুইজনকে ওখানে রাখি আসলাম। এখন থাকি এম পি ভি ২৩ নম্বরে।

প্র : মরিচঝাঁপিতে আরও মৃত্যু দেখেছেন ?

বি ম : বহু মৃত্যু দেখেছি। দেখেছি বহু মৃত্যু, আমি ফেলাইছি নিজের হাতে করি। তারা বাড়িঘরে নেই, একসাথে সব পরিচিত লোক। ১০/২০ জনকে আমি ফেলাইছি।

সাক্ষাৎকার : ২৪ জানুয়ারি ২০০৭



...ভাল্লুক আইসা মাথায় কামড় দিয়া নীচে ফেলাই দিছে। ফেলাই দিয়ে পিছনের পিটটা পুরা খাইয়া ফেলাইছে।

মানুষ-বাঘ-ভাল্লুক

সুভাষচন্দ্র সমাদ্দার

এইখানে এম পি ভি ৬৭-তে যখন আসি রাস্তাঘাটের পরিবেশ, বনজঙ্গল ছিল। আমাদের যেরকম এ্যাক্সিডেন্ট হইছে অন্যদের তেমন হয় নাই। অন্যান্য এ্যাক্সিডেন্ট হইছে, মারাত্মক কিছু হয় নাই। আসার সময় যেখানে ছিলাম ২/৩ ঘর ছিল, ফাঁকা জায়গা ছিল, এই কালীমেলায়। টাউনের ভিতরে। রাস্তা থেকে ৩০ ফুট সাইডে পাকা রাস্তা। ওখানে করছে কি আমার ছেলে ইস্কুলে গেছিল সকালে। মধ্যাহ্ন ভোজনে আসে ২টার সময়। আসলে পরে বলছে যে খাওয়াদাওয়া করবে। দিদি বলছে কি, তুই খাওয়াদাওয়া করবি ? যা, জোগারে আয়। ও বলছে কি, আমি একটু পায়খানা করতে যাব। ছোট একটা ভাই ছিল, চার বছর বয়স তখন। ওরে নিয়া ঐ পায়খানা করতে গেছে, সাইডে কেনেল ঘরের পিছনে। ওইখানে বসছে পরে পিছন থেকে ভাল্লুক আইসা মাথায় কামড় দিয়া নীচে ফেলাই দিছে। ফেলাই দিয়া পিছন পিটটা পুরা খাইয়্যা ফেলাইছে। ছোট ভাই যে ছিল সঙ্গে, ও আদো আদো কথা বলতে পারত। তাও বলছে যে, দাদারে খাইয়্যা দিল, দাদারে খাইয়্যা দিল। এইয়্যা কইতে কইতে দৌড়াই আসছে। আসছে পরে ভয় পাইছে বাচ্চা ছেলে। এর মইধ্যে

ভাল্লুক একটা ডাক দিছে, আমরা ঘরে বইসা শুনছি। তা আমরা চিন্তা করছি ঐ ভাল্লুকের ডাকের জন্য বোধহয় ভয় পাইছে। আসছে পরে একটা ঝাড়া দেওয়ার পর একটু সুস্থ হইল। ও বলতে পারল না যে, আমার দাদারে খাইয়্যা ফেলছে। ক্রিকেট মাঠে ছেলেপেলেরা খেলছিল, ওরা ওই সাইড দিয়া বেড় দিছিলো, কি ব্যাপার কি ভাল্লুকে কেন ডাক দিল রাস্তার উপরে? দেখে যে কেনেল সাইডে ওরে খাচ্ছে। ওরা বলতেছে, এই পিলা খাইয়্যা দিলো কার, পিলা খাইয়্যা দিলো, তখন আমরা আর কি চর্তুপাশ দিয়া গেছি। কিন্তু আমরা যখন যাই, ৫০/৬০ জন লোক চর্তুপাশ দিয়া আসতেছিল। আমিও গেছি, আমার স্ত্রী, আমরা সবাই ছিলাম। কিন্তু ওর ভিতর দিয়া ছেলে খাওয়া দিয়া, ভাল্লুক একটু কাইত করে আমার দিক একটু ফেরল, ফেরার পর লাফ দিয়া আইসা আমার উপর পড়ল। প্রায় ৫০/৬০ হাত দূরের থা আমার উপর লাফ দি আসি পড়ল। এই রকম কামড় দিলে পর ঝুলে গেছে মাথা, আমি কিছু দেখতে পারতাছি না, আমি এই রকম পড়ে আছি। ও আর কি দুই হাত দিয়া চিবাইছে। মাটিতে পড়ে আছি, মাটিতে পড়ে যাবার পরে আমার পিছনটা খাইছে। পিছনটা এই পাশ দিয়া পুরা খাইয়্যা ফেলাই ছিল, কোনো মাংস ছিল না।

তু ভ : হাতের কোন কোন জায়গা কামড়িয়েছিল?

সু স : হাতের এই এই জায়গা, তারপর নাক মুখে, তারপর এই সাইড পুরা খাইয়্যা দিছিল। হাত এর বেশি জাগানো যায় না। পিছন পা-টা পুরা খাইয়া দিচ্ছিল, এগুলান পুরা নতুন মাংস।

তু ভ : কিভাবে চিকিৎসা হল?

সু স : তারপর চিকিৎসা মানে, কালেকটার এইখান থেকে পাঠাই দিল ব্লকের জিপে, ছেলেটা জায়গায় মরে গেল। আমারে রাত্রে মালকানগিরি হসপিটালে পাঠাই দিল। সেলাইন দিয়ে তখন আমি অজ্ঞান। ১৫ দিনের চিন্তা ছিল বাঁচবে না। কালেকটার বলছে সবাই বলছে তোমারে ট্রিটমেন্ট করার পয়সা দেওয়া হবে, এক পয়সাও দ্যায় নাই, খালি বলাই সত্য। বোলকের (ব্লক) দিকে কোনো সাহায্য করে নাই। বলছিল সাহায্য করবে তাও কিছু করল না, কালেকটার বলছে যে তোমারে সাহায্য না কইর্যা, তোমারে লেবার অফিসে একটা কাজ দেব। সেই কাজ করলে মাসে মাসে ভাতিটা [ভাতা] পাবা, তাতে তোমার সংসার চলে যাবে। এই রকম পোলোভন [প্রলোভন] দিচ্ছিল। কিন্তু সেত কিছু দ্যায় নাই। লেবার অফিসে ফাইল জমা দেওয়া হইছিল, কিন্তু আমারে আর কাজ দ্যায় নাই। আজ আসে কাল আসে বলে, ২ বছর হয়ে গেল, কালেকটার ট্রান্সফার হই গেল। আর লেবার অফিসার আর আমারে কাজ দিল না।

সাক্ষাৎকার : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯



রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস— উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির প্রচার সচিব। মরিচঝাঁপি নিয়ে গান, কবিতা, যাত্রা লিখেছিলেন। এখন ব্যানার, ফেস্টুন লিখে জীবিকা নির্বাহ করেন।

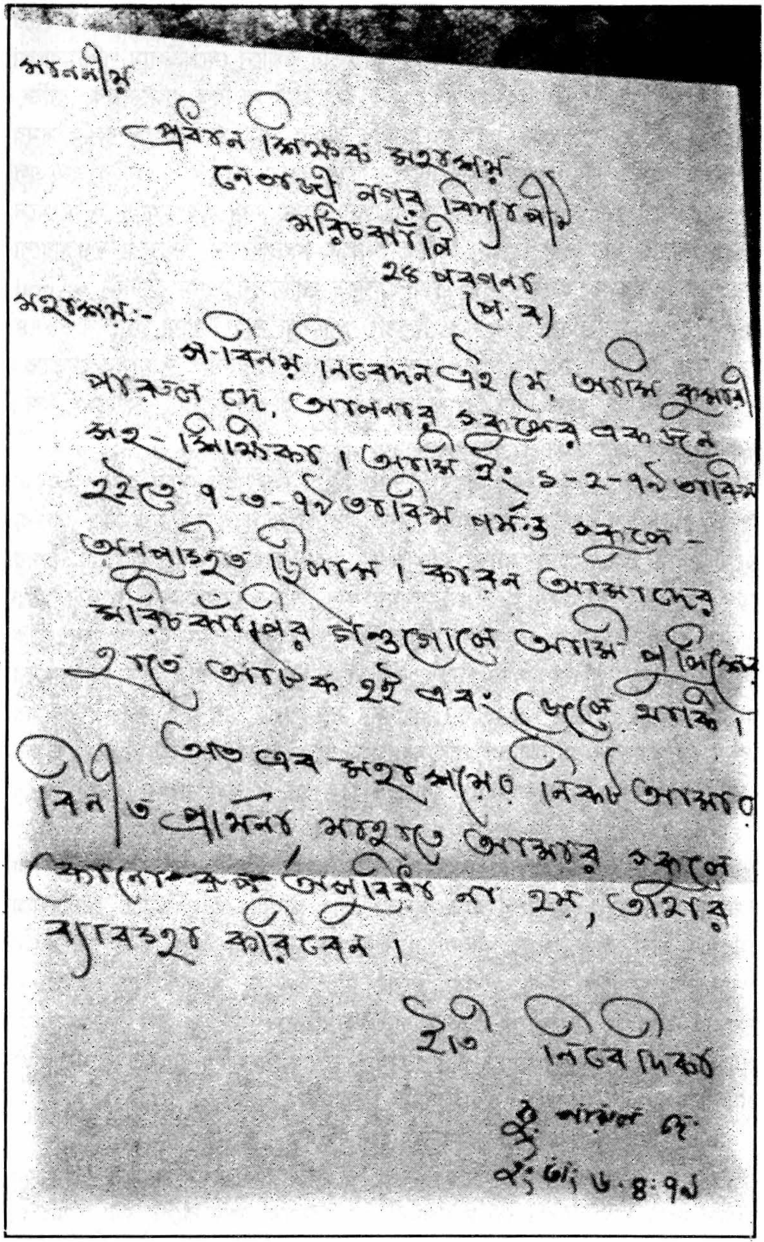
মরিচঝাঁপিতে ১৩ মাস

রাধিকারঞ্জন বিশ্বাস

রাধিকা : বাংলাদেশ থেকে ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসের ২০ তারিখে আমার মনে আছে, হাসনাবাদে এসে পৌছাই উদ্বাস্তু হিসাবে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেটা ছিল সেটা তো ঐ সাম্প্রদায়িক যে বিদ্বেষ, সেই কারণ আর কি, এই জন্য চলে আসতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : দণ্ডকারণ্য থেকে আসার কি কারণ ছিল মরিচঝাঁপিতে ?

রা : আসার কারণ ছিল, আমারও সংক্ষেপে বলতে হবে আর কি, সে তো বিরাট একটা ইতিহাস, দণ্ডকারণ্যে যখন থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখন থেকেই দেখা গেল ওখানে উদ্বাস্তুরা সরকারের কাছে এতো বঞ্চনা পেলেন যে তারা আর্থিক দিক দিয়ে, সামাজিক দিক দিয়ে, সমস্ত দিক দিয়ে তারা অত্যাচারিত আর কি, সঠিক পুনর্বাসন বলতে যা বোঝাত, হয়নি এবং দীর্ঘদিন কষ্ট সহ্য করে করে একটা প্রতিবাদের মানসিকতা তাদের তৈরি হতে থাকে এবং এই সময় উদ্বাস্তুদের ভিতর কিছু চিন্তাশীল মানুষ চিন্তা করতে শুরু করেন যে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে কিভাবে! পশ্চিমবাংলার এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকারও কিছু রাজনৈতিক নেতাও এই চিন্তাভাবনটাকে উস্কে দেবার কাজে


মাননীয়

প্রধান শিক্ষক মহাশয়
নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠ
মরিচঝাঁপি
২৪ পরগনা
(দ: ২)

মহাশয়:-

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি কুমারী পারুল দে, আপনার স্কুলের একজন সহ-শিক্ষিকা। আমি গত ১-২-৭৯ তারিখ হইতে ৭-৩-৭৯ তারিখ পর্যন্ত স্কুলে অনুপস্থিত ছিলাম। কারণ আমাদের মরিচঝাঁপির গণ্ডগোলে আমি পুলিশের হাতে আটক হই এবং জেলে থাকি।

অতএব মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যাহাতে আমার স্কুলে কোনোরূপ অসুবিধা না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

ইতি
নিবেদিকা
কু: পারুল দে
তাং ৮·৪·৭৯

মরিচঝাঁপি নেতাজী নগর বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা পারুল দে-র চিঠি

সহায়তা করেছেন। আমার যেটা মনে আছে আমি যখন কুরুদ উদ্বাস্তু শিবিরে ছিলাম মানা গ্রুফ অফ ট্রানজিট সেন্টারের আওতায় ওখানে দেখেছিলাম পশ্চিমবাংলা থেকে সংসদীয় প্রতিনিধি দল, সংসদীয় ঠিক বলা যাবে না কিছু রাজনৈতিক, ব্যক্তি, এম এল এ, হরিদাস মিত্র ছিলেন, আমার যাদের নাম মনে আছে বলছি সমর মুখোপাধ্যায় ছিলেন, কিরণময় নন্দ ছিলেন তিনি তখন সোসালিস্ট পার্টির এম এল এ, তার পরে আরও কিছু কিছু ব্যক্তি ছিলেন যাদের নাম এই মুহূর্তে আমি মনে করতে পারছি না। এরা ছিলেন, তাঁরা দেখতে গিয়েছিলেন উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে খারাপ পরিস্থিতিতে আছে, সেটা তাঁরা দেখতে গেছিলেন, রাম চ্যাটার্জী several times দেখতে গেছিলেন তার সঙ্গে ছিলেন কৃপাসিন্ধু সাহা। মানা ক্যাম্পে ১৯৭৪ সালে অল ইন্ডিয়া রিফিউজি কনফারেন্স হয় উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতৃত্বে। ওখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গিয়েছিলেন রাম চাটার্জি, কৃপাসিন্ধু সাহা, কিরণময় নন্দ। মহারাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন মহাবিদর্ভ এবং সংঘর্ষ সমিতির নেতা এবং এম পি জাম্বুবানরাও ধোঁতে। ঐ ধোঁতে সাহেব উনিও গিয়েছিলেন এবং মানা ক্যাম্পে একটা বিশাল সমাবেশে এরা প্রত্যেকেই বক্তব্য রেখেছিলেন। কিরণময় নন্দ বক্তব্য রেখেছিলেন, রাম চ্যাটার্জি বক্তব্য রেখেছিলেন, রাম চ্যাটার্জি এবং কিরণময় নন্দের বক্তব্য আমার স্পষ্ট মনে আছে। কিরণময় নন্দ সেদিন বলেছিলেন, বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একদম প্রকাশ্যে, আপনারা যদি এখান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে যান, ঠিক এই ভাষায় যে, 'পশ্চিমবাংলার পাঁচ কোটি মানুষ দশ কোটি হাত দিয়ে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে,' এটা বলেছিলেন কিরণময় নন্দ, আর রাম চ্যাটার্জিও ঐ ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন যে আমরা পশ্চিমবাংলায় চলে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সক্রিয় সমর্থন থাকবে। তার জাম্বুবানরাও ধোঁতেও ঠিক এই ধরনের বক্তব্য রেখেছিল যে বাঙালির বাংলাদেশে চলে যাওয়া উচিত। আমরা উদ্বাস্তু সংগঠনের তরফ থেকে দেখেছিলাম যে পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি কিছু ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে ফাঁকা জায়গায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন হতে পারে। এবং আমরা এটাও উদ্ধৃত করেছিলাম তারিখটা মনে করে বলতে পারব না যাদবপুরে ইউ সি আর সি-র যে একটা কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে ওরা প্রস্তাব নিয়েছিল যে মরিচঝাঁপিতে পুনর্বাসন দেওয়ার আর কি। সেখানে আমরা দাবি করেছিলাম যেহেতু ইউ সি আর সি মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের বসতি গড়ে তোলার প্রস্তাব নিয়েছিল সেহেতু আমরাও ঐ জায়গাটারও দাবি জানাচ্ছি। এটা আমরা বলেছিলাম।

প্র : উদ্বাস্তু আন্দোলন... কোন ভূমিকায় ছিলেন আপনি ?

রা : আমি সেটাই বলতে যাচ্ছি। যে অবস্থা থেকে এরা যখন গেলেন, আমাদের ওখানে যখন কমিটি তৈরি হল দণ্ডকারণ্য এবং মানাকে কেন্দ্র করেই এটা হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কমিটিটা তৈরি হয়েছিল। মানা

ছিল তার কেন্দ্র আর কি। সমিতি যে কার্যালয় সেটাও মানাতেই ছিল। ওখানে তো মোটামুটি একদিনেই হয়নি। উদ্বাস্তুদের নিয়ে আন্দোলন করতে করতে তৈরি হয়।

প্র : আন্দোলনটা করার প্রয়াজনীয়তা হল কেন ?

রা : ঐ যে বললাম, ওখানে উদ্বাস্তুদের থাকার মতো পরিবেশ ছিল না। তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামাজিক দিক দিয়ে তারা অসুবিধার মধ্যে ছিল। যার জন্যে মনে হয়েছিল যে এখানে থাকা যাবে না, আর পশ্চিমবাংলায় ফিরে যেতে হলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বও সেই ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

প্র : তারপর আপনারা যখন এখানে এলেন আপনার ভূমিকাটা কী ছিল ?

রা : আমি তখন মোটামুটি প্রচারের দায়িত্বে ছিলাম। অরগানাইজিং সেক্রেটারি, উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির যে কমিটি ছিল।

প্র : কিভাবে কাজগুলি পরিচালনা করতেন তখন ? ওখানকার সামগ্রিক যে পরিস্থিতি যে অর্থনৈতিক দিক থেকে, শিক্ষা এইগুলিকে আপনারা কিভাবে করতে পেরেছিলেন ?

রা : মরিচঝাঁপিতে এসে যখন, নেতৃত্বের আগে যাঁরা ছিলেন তাদের নাম মনে করতে পারি ঠিক তাদের নামটা স্মরণে আসে না, তবে কমিটির মোটামুটি মাথা ছিলেন যারা, সতীশ মণ্ডল ছিলেন সভাপতি, রাইহরণ বাড়ৈ ছিলেন সাধারণ সম্পাদক, অরবিন্দ মিস্ত্রি যুগ্ম সম্পাদক, আমি প্রচার সম্পাদক ছিলাম, রঙ্গলাল গোলদার ছিলেন মুখ্য উপদেষ্টা। আরও কয়েকজন ছিলেন, যুবনেতা ছিলেন মধু মালাকার, তারও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

প্র : পবিত্র বিশ্বাস...

রা : পবিত্র বিশ্বাস ছিলেন, তিনি সতীশ বাবুর জামাই। উনি যুব বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন।

প্র : আপনারা যে গেলেন, অত্যাচার, উৎখাত হল এর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা কী ?

রা : রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা বামফ্রন্ট সরকার চাননি যে আমরা এখানে থাকি। কারণ হিসাবে তখনকার সময় মুসলমান কিছু নেতৃত্ব বা জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে আপত্তি করা হয়েছিল যে উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনে থাকলে আমাদের খুব অসুবিধা। এখানে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিটা ঠিক থাকছে না, এইজন্য তারা আপত্তি করেছিলেন এবং চাপ সৃষ্টি করেছিলেন বামফ্রন্টকে তার মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন কলিমুদ্দিন সামস, আরও কিছু কিছু নেতা ছিলেন মুখ্য ভূমিকায় আর কি এরাই সেদিন উদ্বাস্তুদের ওখানে না থাকার পক্ষে একটা মুসলিম জনমত গড়ে তুলে বামফ্রন্ট সরকারকে বিরাটভাবে চাপ দিয়েছিলেন।

প্র : এরা যেটা বলেছিলেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা এই সমস্যা হাজির করেছিলেন, এর পিছনে যুক্তি কতখানি ছিল?

রা : প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার ব্যাপারে এরা যেটা বলেছে, আমাদের মনে হয়েছে নিছক একটা অজুহাত। কারণ সুন্দরবনের যে অংশটা যে গাছপালা আছে সেগুলিকে আর যাই বলা যাক অবশ্য সম্পদ বলা যায় না। তার কারণ ওখানেতে কোনো অরণ্য সম্পদ ছিল না, কার্যকরী গাছ যেটা জঙ্গলের সম্পদ বলা হয় ওখানে তেমন কিছুই ছিল না, ওটাকে মরা জঙ্গল বলা যেতে পারে। মরিচঝাঁপি এলাকার প্রধানতম গাছ ছিল ছোট ছোট গরান ছিটে এবং হেতাল গাছ আর কিছু গোলগাছ সেগুলো সংখ্যায় খুবই কম, মোটামুটি ওখানে দামি কোনো গাছ ছিল না।

প্র : ওখানে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ নমশূদ্র সম্প্রদায় এটাও কি একটা বড় কারণ?

রা : শুনেন ওখানে যে মানুষগুলো ছিল সংখ্যার দিক দিয়ে নমঃশূদ্রের সংখ্যাই বেশি ছিল। নমশূদ্র বললে তো ভুল বলা হবে, পিছিয়ে পড়া যে জনগোষ্ঠী তারা চিরকালই বিভিন্ন গ্রাউন্ডে তথাকথিত উপরে যারা আছে তাদের দ্বারা বিভিন্ন কায়দায় নিষ্পেষিত হয় শোষিত হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রমও ঘটেনি বলে আমার মনে হয়, কারণ সিমপ্যাথি, আবার এখানে আর একটা কথা বলতে হবে যে এদের প্রতি যারা সিমপ্যাথি দেখিয়েছে, সেদিকটাও মাথায় রাখতে হবে, অনেকেই বর্ণ হিন্দু ছিলেন।

প্র : এবার একটু অন্য জায়গায় যাই। কুমিরমারি দ্বীপেই তো আপনারা প্রথম যান ওখান থেকে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢোকেন। ওখানে কারা ছিলেন যারা হেলপ করেছিলেন বিশেষ করে কুমিরমারিতে?

রা : সকলের নাম তো এই মুহূর্তে মনে করে বলা তো সম্ভব নয়। তখন পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন প্রফুল্ল মণ্ডল, প্রদীপ বিশ্বাস ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য, এরা প্রত্যেকে আর এস পি করতেন। এরা খুবই সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া কুমিরমারির সমস্ত বাসিন্দারাই আমাদের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। আর লালমোহন বাবু বলে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, উনি আর বেঁচে নেই। উনি এবং আরও বহু মানুষ আমি যেটা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, সময় নিলে বলতে পারব, স্থানীয় মানুষরা সহযোগিতা করেছিলেন ভালোরকম এটুকু বলতে পারি।

প্র : একটা ঘটনা আমরা শুনলাম রাম চ্যাটার্জি শেষে একবার গিয়েছিলেন ওখানে। গিয়েছিলেন লঞ্চে চড়ে, উনি তখন নামেন নি বলা সত্ত্বেও অনেকে তাকে ডেকেছিলেন এবং ২০/২৫ জন ছেলেকে বন্যার কাজে নিয়ে যাবার নাম করে তাদের ব্রেন ওয়াশ করা হয়। এইরকম কোনো ঘটনা আপনার জানা আছে?

রা : এইরকম একটা ঘটনা আপনি যে বলছেন ওখানে নামেন নি এটা ঠিক নয়। উনি ওখানে নেমেছিলেন একবার। উনি লঞ্চে মিনিস্টার হিসাবেই গিয়েছিলেন। আমরা বলেছিলাম যে আপনাকে মিনিস্টার হিসাবে এখানে নামতে দেব না,

গভর্নমেন্টের মিনিস্টার হিসাবে নামতে দেব না, আপনি আমাদের লোক হয়ে নামেন তো আপনি নেমে আসতে পারেন। রাজি হলেন। রাজি হয়ে ওখানে নামলেন এবং নামার পরে ঘরে ঢুকে সহানুভূতিশীল অনেক কথা বললেন আমাদের সঙ্গে। আগে থাকতে ওনার তো একটা সম্পর্ক ছিল। এই ঘটনাটা আমি যখন বলছি আমি তখন দাঁড়িয়েই ছিলাম নদীর পাড়ে, তখন উনি এসে মোটামুটি আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং বললেন আমি কিছু সাহায্য পাঠাব— যেমন শাড়ি, চাল, এগুলি তোরা না করিস না এগুলি তোরা নিস আর আপনি যে কথাটা বলছেন, এটা আমি ডাইরেক্ট না জানলেও আমাদের একটা আলোচনা ছিল যে এই ধরনের এরা বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ আর কি ওদের পারচেস্ট করে নিয়ে মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের যাতে তুলে দেওয়া যায়...

প্র : বাড়িঘরগুলিকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এতে মূলত ভূমিকাটা কারা নিয়েছিল ? বলা হচ্ছে যে ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা করা হয়েছিল ?

রা : গুণ্ডা কিনা বলতে পারব না, লাল রুমাল গলায় বেঁধে কাপড় আর কি গলায় বেঁধে পুলিশের সঙ্গে মিশে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ওখানে ঘরবাড়িতে আগুন ধরানোর কাজে নিয়োজিত ছিল।

প্র : ওখানে অত্যাচারটা কী ধরনের হয়েছিল, আপনার স্মরণীয় ঘটনা কি মনে হয়েছিল ?

রা : ওখানে অত্যাচার আমার মনে স্মরণীয় ঘটনা যেটা হয়েছে ১৬ দিন ওখানে অবরোধ করে রাখা হয়েছিল। খাদ্য, পানীয় জল কোনো কিছুই ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয় নি এবং আমাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল বহু মানুষ শিশু, রুগী সহ না খেয়েছিল এবং বহু মানুষ অনাহারের ফলে মারাও গিয়েছিল। আমার যেটা সব থেকে স্মরণীয় যদি বলেন, আমি একটা দৃশ্য জীবনে হয়তো ভুলতে পারব না, আপনাদের জানা থাকতে পারে যে সংসদ থেকে মোরারজি দেশাই প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন যার নেতা ছিলেন প্রসন্ন ভাই মেহেতা। উনি যখন মরিচঝাঁপিতে লঞ্চ থেকে নামলেন, তখন নদীতে ভাটা ছিল, চরের উপ দিয়ে ওনাদের উঠতে হয়েছিল মরিচঝাঁপিতে, আমরা ওনাদের সঙ্গেই ছিলাম তো উনি উঠতে গিয়ে চরের উপর প্রায় দশ বারোটা উলঙ্গ শিশুর ডেড বডি, উনি থমকে দাঁড়ালেন। থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে এগুলো কী, তখন বলা হল এরা অনাহারে মারা গেছে এখানে। অবরোধ করে রাখা হয়েছিল ষোলো দিন। উনি তখন মানে দৃশ্যতই চোখের জল মুছেছিলেন। তার সঙ্গে যে সরকারি ফটোগ্রাফার ছিল তাদের ডেকে উনি ফটো তুলতে বললেন, তারা ফটো তুলল। এরপরে উনি যখন মরিচঝাঁপি ঘুরে দেখলেন, ঘুরে দেখার পরে উদ্বাস্তুদের ডাকলেন। এক জায়গায় আমাদের নেতাদেরই বললেন, সবাইকে এক জায়গায়

আসতে বলুন, আমি কিছু বক্তব্য রাখব, সেখানে উনি বললেন, 'এই স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজকে এতকাল পরে প্রায় চল্লিশ বছর। আজকে এখানে উদ্বাস্তু সমস্যা বলে একটা জ্বলন্ত সমস্যা রয়েছে আমি সংসদ সদস্য হিসাবে জানতাম না আমি খুব লজ্জিত, আপনাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি আপনাদের পক্ষে রিপোর্টটা মোরারজী দেশাইকে দেব' এবং উনি দিয়েছিলেন। আমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে জেনেছিলাম এবং সেই ৩০৩ পাতার একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং সম্পূর্ণ উদ্বাস্তুদের পক্ষে উনি দিয়েছিলেন।

প্র : আর কোনো সদস্য ছিলেন ?

রা : আমি এই মুহূর্তে নামটা বলতে পারছি না। আরো দুজন এম পি ওনার নামটা আমার মনে নেই ওনার বাড়ি গুজরাটে।

প্র : ধরুন আপনারা যদি রাজনীতিগতভাবে সরকার পক্ষ সি পি এম-এর পক্ষ নিতেন তাদের পক্ষে যদি কথা বলতেন, তাহলে হয়তো আপনাদের এইরকম অবস্থা হত না!

রা : ঠিক কী হত ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে...

প্র : এমন কোনো প্রস্তাব এসেছিল, তোমরা আমাদের ঝাণ্ডার তলায় এস।

রা : সে তো ওরা বার বার বলেছে, বার বার বলেছে কিন্তু আসলে আমার মনে হয় ঠিক তা নয় ওদের স্বার্থের হানি হচ্ছিল আমরা এখানে থাকলে অনেক দিক দিয়ে। শেষপর্যন্ত সেই ঝুঁকিটা ওরা আর নিতে চায়নি, এটাই আমার মনে হয়, ওদের দলে গেলেই আমাদের রেহাই দিত আমার মনে হয় না।

প্র : যারা একসময় আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন— আপনারা আসার পর তারা উল্টো দিকে হাঁটলেন কেন ?

রা : শুনেন কিরণময় নন্দ মন্ত্রী হবার পরে ওনার একটা বিবৃতি দেখেছিলাম। যদিও কাগজের মাধ্যমে। ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে মরিচঝাঁপির এই যে ঘটনা আপনারাই তো ওদের দণ্ডকারণ্য থেকে ডেকে এনেছিলেন, আহ্বান করেছিলেন, পরে আপনারা এইরকম করলেন কেন ? 'ক্ষমতায় আসার আগে যা বলা যায় ক্ষমতায় থাকলে ঠিক তা বলাও যায় না, করাও যায় না ?' এই কথাটাই উনি বলেছিলেন।

প্র : আর কিছু মনে আছে ?

রা : বলার তো অনেককিছুই... মুখ্য যেগুলো এই যে মানুষগুলো ওখানে প্রায় ১,০০,০০০ পরিবারের মতো ছিল। এই মানুষগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে গেল অর্ধেকের বেশি, অর্ধেক চলে গেল দণ্ডকারণ্যে। এরকমভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে এখানে রয়ে গেল তারা সবাই কিন্তু পুরোপুরিভাবে সুস্পষ্টভাবে বাঁচতে চেষ্টা করেও সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারেনি এবং এদের জন্য মনে হয় পরবর্তীতে কারো কিছু করা উচিত ছিল, এদের অন্তত ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু ভাবা সে সরকারি

বেসরকারি সবদিক দিয়ে একটা চিন্তাভাবনা করা উচিত ছিল। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা আমরা তেমনভাবে লক্ষ্য করিনি।

প্র : তাদের উপর কিভাবে অত্যাচার হয়েছিল ?

রা : হ্যাঁ এটা প্রথমদিকে হয়েছিল। মহিলাদের উপর ধর্ষণ হয়েছে, মারধোর, লাথিমারা আর কিছু বাকি থাকেনি আর কী। ওরকম অত্যাচার মানুষের উপরে হয়, সেটা তো হয়েছে। তার পরে গুলি করে তো ৫০ উপরে মেরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল নদীতে, সেই তারিখটা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৯। ১৫০ উপরে লোক মারা গিয়েছিল। ঘটনা হচ্ছে ওখানে যে গুলিতে মারা গেল যে লোকগুলো ওদের সঙ্গে সন্তোষ সরকার বলে একটা ছেলে ছিল সে মারা যায়নি আহত হয়ে ছিল, সেই ছেলেটা পরবর্তীকালে ঘুটিয়ারি শরিফে ছিল গুলিতে আহত হওয়ার পরে ওর একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। পা কেটে বাদ দেওয়ার পরে তো অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে সে বেঁচেছিল। ঘুটিয়ারি শরিফে এসে ও এখন মোটামুটি ওখানে আছে। ওর ঘটনাটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল যে একটা সুস্থ সবল মানুষ এইভাবে অত্যাচারে শেষ হয়ে গেল। এইরকম কিছু কিছু চরিত্র আমি জানি, সবার নাম আমার মনে নেই। তাদের জীবনে বিভিন্নভাবে ঘটতে দেখেছি কেউ পঙ্গু হয়েছে। অরবিন্দদা তো আছেনই, ওখানে মরিচঝাঁপিতে আমাদের ডাক্তার এস সমাদ্দার। আমাদের ওখানে যে হাসপাতাল করা হয়েছিল, ছোটখাটো, ঐ হাসপাতালের দায়িত্বে উনি ছিলেন। সমীর সমাদ্দার, উনি এখানেই ছিলেন এবং এখান থেকে ওখানে গিয়েছিলেন মানুষকে শুধু সেবা করার তাগিদে।

প্র : অন্য কোনো চরিত্র ?

রা : আর একটা চরিত্রের কথা মনে আছে যে আমার কাছে খুব বেদনাদায়ক মনে হয় আমি তাকে দাদু বলে ডাকতাম, বীরেনবাবু, ভদ্রলোক ভালো গান করতে পারতেন। সেই ভদ্রলোককে দেখেছি তার পরিবারের সমস্ত সদস্য মারা গেছেন, তিনি কেবল একাই বেঁচে ছিলেন; কেউ না খেয়ে কেউ রোগে মারা গেছে। ওনার কেউ ছিল না শেষপর্যন্ত একাকী বেঁচে ছিলেন। বহু দিন তাকে দেখেছি গান গেয়ে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াতেন। এই বনগাঁ লাইনেও দেখেছি আমার বাড়িতেও কয়েকবার এসেছিলেন এই সে ঘটনা। এটা আমার কাছে দুঃখজনক মনে হয়েছে, এইরকম অনেক পরিবারই... বেশ কিছুদিন তার সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আগে মাঝেমধ্যে আসতেন এখন আর আসেন না। প্রায় চার বছর হয়ে গেল। আর এক ভদ্রলোক ছিলেন, ওনাকে আমরা গোঁসাই বলে ডাকতাম। তারও নামটা এই মুহূর্তে আমার আর মনে নেই। উনি এইরকম। ওনার নয়জনের পরিবার ছিল, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, উনি একাই ছিলেন। এইরকম বহু পরিবার মরিচঝাঁপিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

সাক্ষাৎকার : ৭ মার্চ ২০০৬

স্বদেশকুমার মণ্ডল সন্দেশখালির বাসিন্দা। তাঁর চোখে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা।

যে দৃশ্য দেখেছি

স্বদেশকুমার মণ্ডল

একদিকে কুমিরমারি অন্যদিকে মরিচঝাঁপি, মরিচঝাঁপিতে অনেক শরণার্থী এসেছিল। তখন সরকার ঐ দ্বীপে উঠতে দেবে না মানে থাকতে দেবে না, ওরা কিছু দলবল উঠেছিল, উঠে যেতে সরকার ওদের খাদ্য বন্ধ করে দেয়।

প্রশ্ন : তখন আপনি ওখানে কি গিয়েছিলেন ?

স্বদেশকুমার মণ্ডল : আমি যাবার পর দেখেছিলাম ওরা টিউবওয়েল, স্কুল তৈরি করেছে, মিষ্টির দোকান করেছে, তাঁতি তাঁত বুনছে। অনেক কিছু জিনিস তৈরি করে ওরা হাটে হাটে যায়, জীবিকা নির্বাহ করছিল, তারপরে সরকার তাদেরকে ওখানে কিছুতেই বসবাস করতে দেবে না। তাদেরকে কিছুতেই থাকতে দেবে না। ওদের খাদ্য খাবার যখন বন্ধ করে দিল, ওরা তখন কিছু কাঠ কুটো নিয়ে জঙ্গলের থেকে লোকালয়ে আসার চেষ্টা করছে তখন তাদেরকে মারার জন্য চেষ্টা করে, লঞ্চ দিয়ে নৌকাগুলির মাঝামাঝি সরাসরি ধাক্কা মেরে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। তাতে কিছু মানুষ জলের উপর ভেসে উঠেছে কিছু লোক ডুবেও গেছে। যে লঞ্চটা দিয়ে নৌকা

ডোবানোর জন্য ব্যবহার করেছে ওটার নাম দেবযানী। এটাই সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছে, অনেক লঞ্চই ছিল কিন্তু মূল ভূমিকা নিয়েছিল দেবযানী লঞ্চটি।

প্র : অনেক দ্বীপেই তো মানুষ আছে, ঐ দ্বীপেই কিছু শরণার্থী থাকলে কোনো ক্ষতি হত?

স্ব কু ম : আমার মনে হয় ভালো কাজই করেছিল। ঐ দ্বীপে যদি ওরা বসবাস করত তবে অন্য দ্বীপগুলিও ভালো থাকত। অন্য দ্বীপগুলির তো কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। মাঠে কিছুটা ধান চাষ করেছিল এবং ধানের গোছগুলি মোটা মোটা হয়েছিল, আমাদের লোকালয়ের গোছগুলি থেকেও মোটা, এটা আমার চোখে দেখা।

প্র : ওদের উপর কিভাবে অত্যাচার আপনি তা দেখেছিলেন?

স্ব কু ম : অত্যাচার বলতে ওদের নৌকাগুলি ডোবানো হয়, খাদ্যজল নিয়ে যে নৌকাগুলি ওরা নিয়ে যেত সেগুলিকে ডোবানো হয়। তারপর পুলিশের সঙ্গে যখন ওরা লড়তে পারল না তখন পুলিশ ওদের জোর করে লঞ্চে তোলে, হাসনাবাদে নিয়ে যায় এই পর্যন্ত জানি তার বেশি কিছু জানি না।

প্র : তখন সরকার এই কাজের জন্য সব প্রাইভেট লঞ্চগুলি সিজ করে নিয়েছিল বলে জানা যায়, চারিদিকে ব্লকেড করে রেখেছিল।

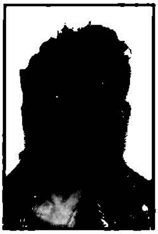
স্ব কু ম : তবে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাচ্চা, শিশু, এরাই। মহিলার প্রতিও কিছু টর্চারিং হয়েছে, এই যে ব্যাটেলিয়ান ফোর্স যারা, বেশ কিছু মহিলার প্রতি অত্যাচার করেছে, নির্যাতন করে রেপ কেস করেছে, কিছু মেরেওছে, কারণ প্ল্যান্টেশনের কাছে আমরা দেখেছি, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা শুধু চিতাই জ্বলতো। গুলিতেই হোক কি অন্যভাবে হোক মেরেছে। আমরা ৪/৫ জন বন্ধু মিলে কুমিরমারিতে একটা স্কুলে এসে থাকি। দৃশ্যগুলি দেখেছি এবং দিনের বেলা একটা ছোট নৌকো নিয়ে বেশ মাইলের পর মাইল বেশ কিছু ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখি জনবসতি হয়ে গেছে সব, বাজারহাট।

প্র : এই ঘটনা আপনার উপর রেখাপাত করেছিল কখন?

স্ব কু ম : রেখাপাত বলতে, তখন মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি এত অত্যাচার এই নিয়ে আমার একটু রেখাপাত হয়েছিল, আশেপাশের কুমিরমারির লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনারা কিছু করছেন না কেন?' তারা বলেছিল, আমরা কিছু করতে গেলে পুলিশের অত্যাচার হয়, আমাদের কিছু করতে দেয় না, আমাদের এখানে গ্রামের কিছু গরিব মানুষ ওদের সঙ্গে সায় দিয়েছিল, জঙ্গলে কিছু লোক উঠেও গিয়েছিল তারা। আর কালীনগর, ঘোষপুর গোন্দালিয়া গ্রামের ২০/৫০ জন লোক এসে সুন্দরবনের শরণার্থীদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার এক জামাইবাবু দূর সম্পর্কে জামাইবাবু অতুল মণ্ডল, উনিও কিছুদিন এসে শরণার্থীদের সঙ্গে মিশে যায় এবং খোঁজ নেই, দিদি এসে কান্নাকাটি করে বলে দেখ তোর জামাইবাবু গেছে

আসছে না। তার কিছুদিন পরে দিদি এসে কান্নাকাটি করতে কিছু লোক নিয়ে থানায় গিয়ে জামাইবাবুকে ওখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। পুলিশ দণ্ডকারণ্যে চালান করবে বলে নিয়ে যাচ্ছিল, জানাজানি হতে এখানে কিছু কালীনগরের লোকজন এসে ওনাকে আমরাও কিছু সহযোগিতা করি আর কি। অতুল মণ্ডল চাষবাস করতেন গরিব মানুষ। উনি আসছিলেন যে চাষবাস করে আমিও কিছু জমিজমা পাই তো ওখান থেকে যাব, এখন তিনি বাড়িতেই আছেন গোজালিয়া, ঘোষপুর, কালীনগর।

সাক্ষাৎকার : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৬



দিল্লিতে জ্যোতি বসু তারাকুণ্ডের বাড়িতে হাজির হয়ে বললেন, রিফিউজি নিয়ে আমাদেরও ইন্টারেস্ট আছে। ওরা বন কাটছে সুতরাং আপনারা ওখানে যাবেন না।

একজন সাংবাদিক-মানবাধিকার কর্মীর চোখে মরিচঝাঁপি

নিরঞ্জন হালদার

দণ্ডকারণ্য থেকে যখন উদ্বাস্তুরা আসে তখন আমি তাদের বিরোধিতা করেছিলাম। তখন জনতা পার্টির সরকার ছিল, আমার এক বন্ধু ছিলেন ইন্দোরের ল্যাডলিমেহন নাগম, তিনি রাজ্য সভার সদস্য, ঠিক ছিল সে আর আমি দুজনে দণ্ডকারণ্যের সেই রিফিউজি এলাকাগুলো ঘুরব। মোটামুটি ঠিক ছিল, আমাদের পরিকল্পনা রূপায়িত হবার আগেই উদ্বাস্তুরা আসতে শুরু করলেন। প্রথমে কাগজে খবর বেরল দণ্ডকারণ্য যেতে যারা হাসনাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে ট্রেনে করে। তাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রেন থেকে নামাচ্ছে। তাদের আর হাসনাবাদ যেতে দিচ্ছেনা। ভারতীয় নাগরিক তারাতো যেকোন জায়গায় আসতে পারে —এটাই প্রথম আমাকে ধাক্কাদিল তারা যখন এখানে আসছে সরকার তখন ট্রেন থেকে নামাচ্ছে কেন। এদের আগেও একবার ট্রেন থেকে নামানো হয়েছিল তারা তখন দণ্ডকারণ্য থেকে আসছিল বর্দ্ধমান, দূর্গাপুর, খড়গপুর ইত্যাদি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠিয়ে আবার দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এইটে আমার প্রথম ধাক্কা লাগল, "কেন"।

তারপর তারাতো আসছে হাসনাবাদে, তাদের যারা রিলিফ দিতে যাচ্ছে, আমার পরিচিত ছেলেরা যাচ্ছে। তাদের দেখতে, তাদের কোন সাহায্য করা যায় কিনা। দেখছে তাদের কোন রিলিফ দিতে দিচ্ছে না। তখন আমাদের মনে হল কোলকাতার লোকদের জানানো দরকার। জানানোর তো কোন সুযোগ নেই, খুব কম লোকই জানে। তখন আমরা শৈবাল গুপ্তকে ধরলাম, শৈবাল গুপ্ত যিনি দণ্ডকারণ্যের একজন এড্‌মিনিসট্রেটর ছিলেন। দন্ডকারণ্য প্রকল্পের এবং মন্ত্রী মেহের চাঁদ খান্নার সঙ্গে বিরোধিতার ফলে তিনি পদত্যাগ করে চলে আসেন। শৈবাল গুপ্তকে নিয়ে দুদিন দুটো বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়, 'সিটিজেনস্ ফর ডেমোক্র্যাসির' পক্ষ থেকে। সেই বক্তৃতার পর আমরা জানলাম, দণ্ডকারণ্যের যারা বাঙ্গালী রিফিউজি তাদের সেই অর্থে পূনর্বাসন হয়নি। তাদের ক্যাম্পে রেখে নানারকম নির্যাতন করা হয়। এরপর আমাদের বন্ধু মণি দাশগুপ্ত, তিনি গৌরকিশোর ঘোষকে বুঝিয়ে, শৈবাল গুপ্তর দুটি প্রবন্ধ আনন্দবাজারে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন, পর পর দুদিন। এই প্রথম বাঙ্গালীরা জানলো, সত্যি সত্যি ওরা কী অসুবিধায় আছে। তারপর কাগজে যেই বেরোলো সরকার আরও বেশী ক্ষিপ্ত হোলো। কোন কাগজেই যাতে এই খবর ছাপা না হয়, যে ওখানে রিফিউজিরা এসেছে। অধিকাংশ লোকসব না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। বাচ্চারা মারা যাচ্ছে , আমাদের বন্ধু সুনীল গাঙ্গুলী গিয়ে দেখেছেন তারা কিভাবে, কি পরিস্থিতিতে তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। পান্নালাল দাশগুপ্ত দেখেছিলেন যে সব মারা যাচ্ছে যে সব শিশু, তাদের ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তাদের কবর দেবার কথা ভাবছে না। এই সব কথা তিনি যুগান্তর পত্রিকায় লিখলেন। পরেরদিন থেকে তার আর সে লেখা ছাপা হলনা।

ওরা হাসনাবাদ থেকে কোলকাতার যেদিন বিক্ষোভ জানাতে এলো, শহীদ মিনারে একটা সভা করলো কিন্তু সব থেকে নারকীয় কান্ড হল এই, কাশী বিশ্বনাথ সেবা সংঘ যেখানেই সভা সমিতি হয় সেখানেই তারা জলের গাড়ী নিয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ রিফিউজিরা যারা এসেছে হাসনাবাদ থেকে শহীদ মিনারের নিচে বিক্ষোভ জানাতে, তাদের জন্যে জলের ট্যাঙ্ক কাশী বিশ্বনাথ সেবা সংঘ থেকে এসেছে, তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোল। ওরা তৃষ্ণায় ওরা কোথাও পানীয় জল পাচ্ছে না তখন মোহনদাস তড়াগের পুষ্করিনীর দূষিত জল সেই জল তারা খেল। এই ঘটনাটা ধরে রেখেছেন, কবি সুনীল পাঁজা।

ঐ যে কারবালা প্রান্তরে জল খেতে দেওয়া হয়নি আমরা সেটা জানি, সেই হাসান-হোসেনকে, এখানেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার অসহায় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের তৃষ্ণার জল না দিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

এই ঘটনার প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, সুনীল গাঙ্গুলী, জ্যোতির্ময় দত্ত, শম্ভু রক্ষিত সহ আরও অনেকে। তারপর একদিন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে রিফিউজীরা

মরিচঝাঁপি চলে গেলেন। তাদের খবর কোলকাতার কোন কাগজে ছাপা হোত না। সরকারী চাপের কারণেই বিশেষ করে সি. পি. এম চায়নি দণ্ডকারণ্যের রিফিউজিরা পশ্চিমবঙ্গে আসুক। এরা দন্ডকারণ্যের রিফিউজীদের নিয়ে আন্দোলন করেছিল এই কারণে উড়িষ্যার মধ্যপ্রদেশের সি, পি, এম প্রার্থী করলে সেই ভোটে তাদের পার্লামেন্টে তাদের সংখ্যা বাড়ে।

শক্তি সরকার লোকজন নিয়ে বার বার মরিচঝাঁপিতে নিয়ে উদ্বাস্তুদের দেখাতেন জনমত তৈরী করতে। এখানে উল্লেখ করা দরকার সন্তোষ মল্লিকের কথা। সন্তোষ মল্লিক উদ্বাস্তুদের পরিস্থিতি দেখে উত্তেজনায় তার মৃত্যু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির একজন নেতা ছিলেন।

মরিচঝাঁপি রিফিউজিদের জন্য টাকা তোলা হচ্ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে টাকা তোলা হয়েছিল।

একটি গানের আয়োজন করেছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত, সেখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গীতা ঘটক, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, —তারা গান গেয়ে দন্ডকারণ্যের রিফিউজিদের জন্য টাকা তুলেদিয়েছিলেন।

এদের সমর্থনে সন্তোষ মল্লিক ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের হল বুক করে সিটিজেনস্ ফর ডেমোক্র্যাসির উদ্যোগে সভা হল। দ্বিজেন গুপ্ত সহ অন্যান্যদের নিয়ে আমরা সভা করছিলাম। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে তেমনভাবে সাড়া জাগল না, কেননা ওখানে নমশুদ্র আর পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়ের রক্ত ঝরছিল। বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে রিফিউজিদের সমস্ত নৌকো বাজেয়াপ্ত করে, ভেঙ্গে ফেলে, খাদ্য লুট করে এদের গ্রেপ্তার করে। ওদের জল আনা বন্ধ করে দিলে কুমিরমারি থেকে —যাতে ওরা না খেয়ে মারা যায়। কুমিরমারিতে খাদ্য ও জল আনতে গেলে এই বামফ্রন্টের পুলিশ রিফিউজিদের গুলি করে মারে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত জানালেন— ওরা এখানে প্যারালাল গভর্ণমেন্ট চালাচ্ছে সুতরাং ওদের এখানে থাকতে দেওয়া যায় না। মুসলিম ইনসটিউটে মাইনরিটি কমিশনের একসভায় কলিমুদ্দিন সামস্ উদ্বাস্তুদের বিরোধিতা করলেন। অথচ দেশভাগের পর প্রথম যারা এসেছিলেন তারা সবাই জবর দখল কলোনি করলো-বামফ্রন্ট তাদের স্বীকৃতি দিল। অথচ মরিচঝাঁপির ক্ষেত্রে বলা হোল ওরা জবর দখল করছে অতএব ওদের থাকতে দেওয়া যায় না। মোরারজী দেশাইকে প্রভাবিত করার জন্য আর একটি স্লোগান বামফ্রন্ট তুললো— রিফিউজীরা বন কেটে সাবাড় করছে। মোরারজীকে বোঝাবার দায়িত্ব নিয়েছিলে সিপিএমের এম. পি জ্যোতির্ময় বসু। অথচ ওখানে কোন বন ছিলনা, ছিল ঝোপ। সেই সময় মরিচঝাঁপি নিয়ে স্টেটস্‌ম্যান, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকায় বেশি খবর বেরোতো, প্রমোদ দাশগুপ্তর নির্দেশে সাংবাদিক অনিল ভট্টাচার্য্যের নির্দেশে মরিচঝাঁপির সব খবর বন্ধ করে দেওয়া হয়। আনন্দ

বাজার পত্রিকায় তখন খবর প্রায় ছাপাই হোত না। ইন্ডিয়ান একস্‌প্রেসের যে সব সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন তারা তাদের পত্রিকার মাধ্যমে সারা ভারতে মরিচঝাঁপির খবর ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। তখন একজিকিউটিভ এডিটর ছিলেন অরুণ শৌরী। অরুণ শৌরী তার রিপোর্টারদের নির্দেশ দিলেন— আমাদের দেশে এখন উজ্জ্বল তারকা হচ্ছেন জ্যোতি বসু তার ইমেজ এভাবে খারাপ করা যাবে না। তার বিরুদ্ধে কোন খবর ছাপা হবে না। এইভাবে ইন্ডিয়ান একস্‌প্রেসের খবর বন্ধ হয়ে যায়। পরে অরুণ শৌরী বি.জে.পি'র একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী হয়েছিলেন। দিল্লীতে একটা খবর রটলো নিরঞ্জন হালদার গ্রেপ্তার হয়েছেন। তখন সিটিজেনস ফর ডেমোক্র্যাসির সেক্রেটারী সি. এম. তারাকুন্ডে ঠিক করলেন তিনি একটা ডেলিগেশন পাঠাবেন। সেই ডেলিগেশনে লায়লা ফার্ণান্ডেজ, সুমন, বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিতের মেয়ে নামটা মনে পড়ছে না, তাঁদের একটা টিম আসার কথা ছিল তারা মরিচঝাঁপিতে যাবেন। কিন্তু দিল্লীতে জ্যোতিবসু তারাকুন্ডের বাড়ীতে হাজির হয়ে বললেন, 'রিফিউজি নিয়ে আমাদেরও ইনটারেষ্ট আছে। ওরা বন কাটছে সুতরাং আপনারা ওখানে যাবেন না।' তারাকুন্ডে সহ সিটিজেনস্ ফর ডেমোক্র্যাসির কোন টিম এলো না। তিনি আমাকে চিঠি পাঠিয়ে বললেন, আমরা আপাতত মরিচঝাঁপিতে যাওয়াটা স্থগিত রাখলাম। আমি জানালাম এরপর জ্যোতিবাবুরা অপারেশনটা করবেন, এরপর মরিচঝাঁপিতে দেখবার কিছু থাকবে না। উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সেক্রেটারি রাইহরণ বাড়ৈ খুব দক্ষ ছিলেন, যা যা ঘটনা ঘটতো সব তিনি লিখে রাখতেন। অভিযোগ করতেন, প্রচার করতেন। আমার কাছেও উনি মাঝে মাঝে আসতেন, এবং অন্যলোকের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে দিতেন। আমার কাজ ছিল কো-অর্ডিনেটরের। বাড়ীতে বসে কাকে কী পাঠাতে হবে, সেগুলো পাঠাতাম। উনি নিজেও সরাসরি অনেক জায়গায় পাঠাতেন।

শক্তি সরকারের ব্যবস্থাপনায় পার্লামেন্টের তিন প্রতিনিধিদল যখন মরিচঝাঁপিতে এলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওদের পুলিশ লঞ্চে পাঠাতে চেয়েছিলেন, এরা রাজি হননি। কিন্তু যাত্রাপথে বার বার বাধা পেয়েছেন, যাতে ওদের যেতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। রাইহরণ, সতীশ মন্ডল, অরবিন্দ মিস্ত্রী ওরা সমস্ত তথ্য লিখিত আকারে ওদের হাতে তুলে দেন।

রিফিউজীরা স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলেছিল, কোন সরকারী সাহায্য ছাড়াই। এটা সি.পি. এম সহ্য করতে পারেনি। তারা ভাবলো এ ঘটনা যদি অন্যত্র প্রচার হয়ে যায়, তারাও যদি স্বনির্ভরতার রাস্তা তৈরী করতে শুরু করে তবে সি পি এমকে তারা মানবে না, পঞ্চায়েতের দারস্থ হবে না। এই ভয়টা সি. পি. এম পেয়েছিল। তাই তাদের দরকার ছিল রিফিউজিদের উৎখাত করা। জ্যোতিবসু সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে ওদের খাদ্য ও পানীয় বন্ধ করে দেওয়ায় হাইকোর্টে

মামলা হয়। হাইকোর্টের রায় রিফিউজিদের পক্ষে যায়। সেইদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সুনীল গাঙ্গুলীর সভাপতিত্বে সভা হয়। আমরা সবাই আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতাম। কিন্তু সভার খবর আনন্দ বাজার পত্রিকায় ছাপা হল না। ছ'লাইনের খবর ছাপা হোল যুগান্তর পত্রিকায়। ইংরাজী পত্রিকা স্টেটস্‌ম্যানে ছাপা হোল। কিন্তু সে খবর বাঙ্গালীরা জানতে পারলো না। '৭৯ মে মাসে যখন সরকারি অপারেশন শুরু হবে তার কয়েকদিন আগে রাইহরণ বাড়ৈ আমার কাছে এসে কাগজপত্রগুলো রেখে যান এবং বলেন সরকার আমাদের উৎখাত করার চক্রান্ত করছে।

একটা ঘটনা কোন কাগজেই যখন কোন খবর বেরোচ্ছে না তখন কিছুদিন গৌরকিশোর ঘোষ আনন্দ বাজার পত্রিকার দায়িত্বে ছিলেন ঐ সময় অশোক সরকার সম্পাদক এবং তার ছেলে বাইরে ছিলেন। গৌরকিশোর ঘোষ বললেন, 'তোর চিঠিপত্রগুলো যা আসবে তা ছেপে দিবি।' এদিকে কুমিরমারিতে আর. এস. পির পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান প্রফুল্ল মন্ডল ও জেলা পরিষদ সদস্য প্রদীপ বিশ্বাসকে জ্যোতি বাবু ধমকে দিলেন। কেননা ওরা রিফিউজিদের সহযোগিতা করে চলছিল।

জ্যোতি বসুর বামফ্রন্ট সরকার কতো মানুষকে হত্যা করে, ধর্ষণ করে, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে ওদের উৎখাত করেছিল তার পুরোপুরি হিসেব কোনদিনই হয়তো পাওয়া যাবে না। কেননা সে সময় জ্যোতিবসুরা সাংবাদিক সহ কাউকেই অপারেশনের সময় ঢুকতে দেয় নি।

সাক্ষাৎকার : ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় চলে জনতা পার্টির সরকার, পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় বিরোধী পক্ষে 'জনতা পার্টি'। তার নেতা ছিলেন কাশীকান্ত মৈত্র। কেন্দ্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজ্যে জনতা পার্টি মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলো সক্রিয়ভাবে।

গত ২৫ বছরে এদের কথা কেউ বলেনি

কাশীকান্ত মৈত্র

কাশীকান্ত মৈত্র : মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উপর যে অমানুষিক বর্বরোচিত, অমানবিক আচরণ এ রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সংগঠিত হয়েছিল— আমার কাছে মনে হয়েছিল সেটা বিস্মৃত অধ্যায়। ২৫/২৬ বছর কেটে গেল এ নিয়ে পশ্চিমবাংলায়— ভারতবর্ষে কোনো জায়গায় আলোড়ন বা আন্দোলন তো হয়ইনি, পশ্চিমবাংলার মানুষও সেই উনআশি সালের মে মাসের পর এই হতভাগ্য মানুষদের কী হয়েছিল পরবর্তীকালেই বা কী হল, মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হবার পর কারোর কোনো আগ্রহ ছিল না। না ছিল কোনো অনুসন্ধিৎসা বা আগ্রহ দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার বুদ্ধিজীবীদের। বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে আমার একটা কথা মনে পড়ে— একজন বিখ্যাত পশ্চিমের লেখক জার্মান সাহিত্যিক বলেছিলেন যে 'বুদ্ধিজীবীর ধর্ম হচ্ছে, অন্যায়কে অন্যায় বলে চিহ্নিত করা এবং যারা অপমানিত, নির্যাতিত, যারা অত্যাচারিত, ইতিহাস যাদের প্রতি সুবিচার করেনি, রাষ্ট্র ও সমাজ যাদের প্রতি সুবিচার করেনি— তাদের সুবিচারের জন্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো।' বুদ্ধিজীবীদের motto হবে where

there is power beyond the side of Powerless। যেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, অর্থের বৈভবের, বিদ্যার অহঙ্কার অথবা পাশবিক শক্তির দাপটই হোক এর বিকাশ যেখানে হবে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

এরা তো সম্পূর্ণ বিস্মৃত— এদের কথা তো গত ২৫ বছরেও কেউ বলেনি। এতোদিন বাদে আপনারা বলছেন আমার— খুব ভালো লাগছে— আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাচ্ছি, অন্তরের প্রণতি আপনাদের জানাচ্ছি যে বিপন্ন মানুষদের আপনারা স্মরণে রেখেছেন।

এই সমস্যাটা বুঝতে হলে বুঝতে হবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ৭০ দশকের ৭৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পে কয়েক সহস্র পরিবারকে পুনর্বাসনের নাম করে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে গিয়েছিল দণ্ডকারণ্যের বিভিন্ন জায়গায়। সেই দণ্ডকারণ্য প্রকল্পটি আদৌ সফলতার গৌরব অর্জন করেনি। এবং সেখানে উদ্বাস্তুরা সরল বিশ্বাসে সেখানে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন জমি পাবেন— এদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবি। সেই হিসেবে তাদের চাষবাসের সুযোগ থাকবে এবং তারা নিজেদের পুনর্বাসন সরকারের সাহায্যে করে নিতে পারবেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ, সেখানে প্রশাসন তাদের প্রতি নির্যাতন করেছে এবং নানানভাবে তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। জমি বন্টন, সেচের ব্যাপারেও তারা করেছে এবং তাদের ৩ থেকে ৫ একর জমি তাদের দেওয়া হয়েছিল যতোদূর আমার মনে পড়ে। সেই সব পাথুরে জমিতে প্রকৃত চাষ হয় না। এই সব উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকার কোনোরকম মমত্ববোধ তারা দেখাননি। নানা রকম অত্যাচার পুলিশি নির্যাতন প্রচুর হয়েছিল। তারা শেষকালে সেখান থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করেন। ফিরে কোথায় আসবেন। এলে পশ্চিমবাংলাতেই আসবেন— এটাই তারা মনে করেছিলেন। এদের সম্পর্কে জনতা দলের কোনো ভূমিকা ছিল না। সেখানে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উদ্বাস্তু সংগঠন শক্তিশালী বিরাট সংগঠন, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের এতোবড়ো উদ্বাস্তু সংগঠন ছিল না। এই সংগঠনের বড়ো মাপের নেতারা দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন— তাদের সভা হয়। উদ্বাস্তুদের অবস্থাটা শুনেছিলেন এবং খবরেরকাগজেও আমরা তখন দেখেছিলাম জ্যোতি বসু তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে আপনাদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা কোরবো।' এ রকম আশ্বাস তিনি শুনিয়েছিলেন।

এই উদ্বাস্তুরা অনাহারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘর ছাড়েন এবং পশ্চিমবঙ্গমুখী হন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার নানান বাধা দেন পুলিশ দিয়ে তাদের আটকাবার চেষ্টা করেন কিন্তু তারা তা সত্ত্বেও এখানে চলে আসেন। তারা আশ্বাস পেয়েছিলেন সুন্দরবনে তাদের জায়গা হবে। এগুলো সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানা। কেননা আমি

দণ্ডকারণ্য যাইনি। আমাদের দলেরও কেউ সরেজমিনে কেউ দেখতেও যাননি, কি পরিস্থিতি সেখানে উদ্বাস্তুদের। খবরের কাগজ তখন বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল— বিশেষ করে বাংলা কাগজ। প্রথম শ্রেণির বাংলা কাগজগুলো দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুদের অবস্থা তুলে ধরেছিল বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং দণ্ডকারণ্যের প্রকল্প প্রশাসনের অবিচার তুলে ধরেছিলেন নিখুঁতভাবে।

উদ্বাস্তু স্রোত আসা শুরু হল, দণ্ডকারণ্য থেকে তারা সব এসে উঠলেন হাসনাবাদে। এদের সংখ্যা আনুমানিক ২৫/৩০ হাজার করে কমবেশি। হাসনাবাদ থেকে পরবর্তীকালে যান কুমিরমারি। কুমিরমারিতে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে নদীপার হয়ে তারা মরিচঝাঁপি দ্বীপে যান। বড় দ্বীপ, জমি স্তর খুব নীচু, লোনা জল প্লাবিত করে যেত। এরা খুব পরিশ্রম করে উঁচু বাঁধ তৈরি করে তারা লোনা জল আটকিয়ে ছিল। তারা নানান রকমের কাজের মাধ্যমে Self employment এর পথ বার করেছিল। রুজি-রোজগারের ব্যবস্থাও করেছিল। মাছের ভেড়ি তৈরি করেছিল, তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল করেছিলেন। এমনকি তারা নিজেদের চেষ্টায় চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। আশ্চর্য! মিষ্টি জলের জন্য নলকূপ বসিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার '৭৭ সালে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসেন। এদের এই পরিবর্তনটা আমাদের কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছিল। আমি জানি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি, তার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে খানিকটা সৌহার্দও ছিল বিধানসভার ভিতরে, বাইরে নয়। তিনি বিধানসভায় মন খুলে কথা বলতেন। তিনি এই উদ্বাস্তুদের প্রতি দরদী ছিলেন। তৎকালীন বিধানসভার বাইরের কিছু নেতা কর্মী বিশেষ করে সরল দেব, ছায়া ঘোষের বিশেষ সহযোগিতা ছিল। কিন্তু সরকারে থাকার জন্য যে ডিসিপ্লিন মানতে হয়, তাই তারা এর বেশি করতে পারেননি।

এই ব্যাপারটা যখন আমরা জানতে পারি, তখন বিধানসভার ভিতরে আমরা প্রতিবাদ করি। গণতান্ত্রিক এবং মানবতাবাদী দল হিসাবে বিধানসভার বাইরে এবং ভিতরে আমাদের সাধ্যমতন এদের পক্ষ নিয়ে আমরা কথা বলেছি, আন্দোলন করেছি, সভা সমিতি করেছি।

প্রশ্ন যখন ওরা তোলেন তাদের এখানে আসতে দেওয়া হবে না— এদের আবার পাঠিয়ে দিতে হবে দণ্ডকারণ্যে। তখন আমরা বিধানসভায় প্রশ্ন করেছিলাম ভারতবর্ষে সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাবার অধিকার আছে। এটা মৌল অধিকার। এই মৌল অধিকার লঙ্ঘন করা কোনো রাজ্য সরকারের থাকতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব মেলেনি। কয়েক বছর ধরে সে প্রশ্ন উঠছে— বাংলাদেশ থেকে যারা চলে আসছেন যাদের অনুপ্রবেশকারী বলা হচ্ছে— তারা ঘটনার চাপে থাকতে না পেরে পালিয়ে চলে আসছেন এখানে। তারা যখন এখানে আসছেন তারা কিন্তু ভারতীয় নাগরিক নন। গত ৩০ বছরে সরকার

তাদের তো বাধা দেননি তোমরা এখানে আসবে না। এদের পঞ্চায়েত যেখানে যেখানে আছে এমনকি কংগ্রেস আই-এর পঞ্চায়েত যেখানে যেখানে ছিল তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। আর এরা তো ভারতীয় নাগরিক! এরা তো অন্য দেশের নাগরিক নন। এরা দণ্ডকারণ্যের পুনর্বাসনে কিছু করতে পারবেন না— তখন তারা এই রাজ্যে আসবার চেষ্টা করলেন। তারা বামফ্রন্ট নেতাদের আশ্বাস পেয়েই এসেছিলেন। তারা উৎসাহিত হয়ে এসেছিলেন। আমরা তো ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মানুষকে হাত বাড়িয়ে তাদের আহ্বান করছি, বলছি আসুন, কেউ বাধা দিচ্ছি না বা কেউ বাধা দিতে পারে? অন্য রাজ্যের মানুষ তো আসছেন, অন্ন সংস্থানের জন্য। শিল্প গড়ার জন্য কেউ তাদের বেলা কেউতো বলেন না পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। অন্য রাজ্যের মানুষ এসে সব এক হয়ে গেছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি এ জন্য বাঙালি হিসাবে গর্ববোধ করি। তাহলে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। পশ্চিমবাংলার সর্বনাশ হবে। এই ভুতুড়ে তত্ত্ব কোত্থেকে এল? কি করে তারা পেলেন? যুক্তি দিয়ে এ তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না। গায়ের জোরে, প্রশাসনের জোরে, লাঠির জোরে আপনারা এটা করতে পারেন, ক্ষমতার জোরে আপনারা এটা করতে পারেন কিন্তু যুক্তি দিয়ে এটা টিকবে না।

প্র : উদ্বাস্তু উৎখাতের পিছনে রাজনৈতিক কারণ কী ছিল?

কা. মৈ. : প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকটা কথা মনে হয়। যখন দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনাটা ব্যর্থ হচ্ছে, উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে তখন উচিত ছিল বড় দল হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে এবং সমস্ত দল মিলে দণ্ডকারণ্যের সমস্ত নিগৃহীত উদ্বাস্তুদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে চাপ সৃষ্টি করা। আমাদের শক্তি তো কিছুই ছিল না। আমরা ১৯৭৭ সালে Power এ আসি। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়নি দল তৈরি হবার আগে Power এসেছে কেউ। এখানে নির্বাচনে জেতার পর দল তৈরি হল। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় যারা এলেন তাদের তো উদ্বাস্তু আন্দোলনের বিরাট ইতিহাস তাদের আছে। তারা দণ্ডকারণ্যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কোনো চাপ সৃষ্টি করলেন না। আবার ডা. বিধান রায়ের উদ্বাস্তু পরিকল্পনা যা ছিল সেটাও তারা বাধা দিলেন। আন্দামানে পাঠানোর ব্যাপারে ভুল রাজনীতির কারণে সে সুযোগ আমরা হারালাম। আবার দণ্ডকারণ্য থেকে তারা যখন এলেন এরা তার বিরোধিতা করলেন। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার সেটা ধারণা। এটা বাংলার tragedy– কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় এসেছেন পশ্চিমবাংলার স্বার্থের ব্যাপারেতে তাদের উদাসীনতা। পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে, সর্বভারতীয় issue হিসাবে কোনো দল দেখেনি। মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি বাংলা ও

পাঞ্জাব ভাগ না হোত তাহলে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারতো না। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরই তারা উদ্বাস্তুদের কথা ভুলে গেলেন।

এই প্রেক্ষাপটে বলতে হয়, মোরারজী সরকার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন নীতি যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তা থাকবে এটা মেনে নিয়েছিলেন। পশ্চিমবাংলার জ্যোতি বসুর সরকারও সেটা মেনে নিয়েছিলেন। এ নীতির কোনো পরিবর্তন কিছু হবে না। জ্যোতি বসু জানতেন কেন্দ্রের দরকার এ রাজ্যের সমর্থন। কেন্দ্রে সরকার চালাতে গেলে সে সমর্থন দরকার ছিল তা তাদের ছিল না। আবার রাজ্যেরও দরকার ছিল তাদের সমর্থন। Food for work কে base করে তারা তাদের রাজনীতির পরিধি বাড়ালেন। এখানে অন্য কারো নাক গলানোর অধিকার ছিল না। প্রশাসনেরই ভূমিকা ছিল।

আপনারা জানেন মোরারজী ভাই দেশাই সরকার মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেননি। কিন্তু যখন ১৯৭৯ পার্লামেন্ট 'যখন পড়ে যাচ্ছে তখন বামফ্রন্টের ভোটগুলো একান্ত দরকার ছিল। জ্যোতি বসু তখন ইউরোপে। মোরারজী ভাই তাকে জানালেন, পার্লামেন্টে যদি কংগ্রেস আই অনাস্থা প্রস্তাব আনে তাহলে যেন বামফ্রন্টের সাপোর্টটা পান। এই সাপোর্টটা যদি মোরারজী ভাই পেতেন তাহলে জনতা পার্টির শাসনটা পড়তো না। ঠিক সময়ে সে সাপোর্টটা ওরা দেননি। কিন্তু ইতিহাসের lessonটা কেউ নিলেন না।

আমার যেটা মনে হয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী দল হিসেবে তারা উদ্বাস্তুদের সমর্থন পেয়েছিলেন বিপুলভাবে। যেহেতু কংগ্রেস তাদের বিমুখ করেছে। এই মরিচঝাঁপির মাত্র কয়েক হাজার উদ্বাস্তুকে তারা যদি তাড়াতে পারেন তবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সে সহযোগিতা তারা পাবেন, অঙ্কের হিসেবে আরও বেশি তা প্রয়োজনীয় বলে তাদের মনে হয়েছে। কয়েক হাজার উদ্বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা জ্যোতি বসু করতে চাননি।

শক্তি সরকার ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলের পার্লামেন্টের জনপ্রিয় প্রতিনিধি। ওর নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়, আমাদের আহ্বান জানান মরিচঝাঁপি দেখতে যাবার জন্য, সরেজমিনে তদন্ত করতে যাবার জন্যে। সেখানে আমরা গিয়েছিলাম সেখানে হরিপদ ভারতী, আমি ছিলাম, সন্দীপ দাস ছিলেন জনতা পার্টির এম এল এ, আরও কয়েকজন এম এল এ ছিলেন। আই সি এস শ্রী শৈবাল গুপ্ত এবং তার স্ত্রী অশোকা গুপ্ত তাঁরও ভূমিকা অনবদ্য। সমাজসেবিকা হিসেবে অশোকাদি যা কাজ করে গেছেন অনেকেই জানেন না। আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে জানি, আমিও তাকে শ্রদ্ধা জানাই। বহু সাংবাদিকও গিয়েছিলেন। সেই সময় ঐ জায়গাটা দেখেছিলাম, ঐ জায়গাটা ওরা কাঠ দিয়ে ঘিরেছিলেন। সেই দ্বীপের ভিতরে আমরা গিয়েছিলাম। তাদের সামর্থ অনুযায়ী তাদের আতিথেয়তা তারা দিয়েছেন। আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম তাদের আতিথেয়তা দেখে। ঐ দারিদ্রতার মধ্যে থেকেও তারা এতোগুলো মানুষকে আয়োজন করে রান্না করে খাইয়েছিলেন।

ভুলবো না কোনোদিন। অবিস্মরণীয়! আমি বিধানসভাতেও বলেছিলাম এরা দেশের মূল্যবান সম্পদ— তাদের এখান থেকে এভাবে উচ্ছেদ করবেন না। আমরা ফিরে আসার পর ওদের উপর নানান অত্যাচার শুরু করে দিল। ওরা পানীয় জল বন্ধ করে দিল। এইভাবে এদের ভাতে মারবার চেষ্টা, এটা ভাবাই যায় না। এদের উপর পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করা, ক্যাডার দিয়ে অসম্মান করা এসব তো ছিলই। জ্যোতি বসু এরপর ওদের উঠে যাবার জন্য target date দিয়ে দিলেন। এবং বললেন, ওদের পাশে দাঁড়াবার জন্য কাউকে মরিচঝাঁপিতে যেতে দেওয়া হবে না। এটা ছিল প্রশাসনিক নির্দেশ। সেই নির্দেশ অমান্য করেই আমরা মরিচঝাঁপিতে যাবার চেষ্টা করবো— এ কথা আমি বিধানসভাতে বলেছিলাম। আমরা যাবার দুদিন আগে ময়দানে শহিদ মিনারের নীচে জনসভা হয়, প্রয়াত গান্ধীবাদী নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, তিনি সভায় সভাপতিত্ব করেন। বীণা ভৌমিক বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী, তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিছু অর্থ, জামাকাপড় নিয়ে আমরা মরিচঝাঁপি রওনা হয়েছিলাম। সেই সময় কোনো রাজনৈতিক দল যাতে মরিচঝাঁপি না যেতে পারে সরকার সেই সময় লঞ্চ নিয়ে Round the clock ঘুরেছেন। আমরা এরই মধ্যে মরিচঝাঁপি পার হয়ে যাই।

মাননীয় জ্যোতি বসু যে targated date দিয়েছিলেন, সেই dateএ ওদের তুলতে পারেননি। এরই কয়েক মাস পর আরও নির্মমভাবে ক্যাডার লাগিয়ে ওদের উৎখাত করেছিলেন। উৎখাত করার পর তাদের কানপুর ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল। আমি সেখানেও গোপনে গিয়ে তাদের চেহারা দেখে এসেছিলাম, তাদের দুঃখের কাহিনি শুনেছি। কিছু লোককে বর্ধমানে রাখা হয়েছিল। বিখ্যাত আইনজীবী ভোলানাথ সেন আমার বন্ধু ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন রাতে বৃষ্টির মধ্যে ট্রাকের পর ট্রাক এনে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হল। বিধানসভায় ভোলানাথ সেন এটাও তুলেছিলেন।

ওদের বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন ছিল— অদ্ভুত অদ্ভুত সব রিপোর্ট প্রচার হয়েছিল— ওখানে বিদেশি চক্রান্তের একটা ঘাঁটি তৈরি হচ্ছে, ওখানে ট্রেনিং দিচ্ছে। ওখানে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের কেন্দ্র হচ্ছে। ওখানে বাংলাদেশ থেকে লোক এনে বসাবার চেষ্টা হচ্ছে। এরকম সব আজগুবি সব রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল আই বি গোয়েন্দা দপ্তর থেকে।

সেই সময় ৭/৮ জন সাংবাদিক জীবনকে তুচ্ছ করে মরিচঝাঁপির সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। আপনারাও যে এতোদিন বাদে এই ঘটনা নিয়ে জনমত গড়ে তুলতে চাইছেন, ঐতিহাসিক ঘটনাকে জনসমক্ষে আনতে চাইছেন— এই জন্য আপনাদের প্রয়াসের জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

একটা অন্যায় এমনভাবে চাপা পড়ে থাকুক এটা ঠিক নয়। প্রকাশ পাবেই। ইতিহাস বড়ো কঠোর বিচারক, নির্মম বিচারক, কাউকেই ইতিহাস ক্ষমা করে না।

সাক্ষাৎকার : ২৮ জুলাই ২০০৬

১৯৭৯ সালে উদ্বাস্তু উৎখাতের অব্যবহিত পরে সতীশ মণ্ডল, অরবিন্দ মিস্ত্রী ও রাধিকারঞ্জন বিশ্বাসের অডিও সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন নকুল মল্লিক। সাক্ষাৎকারটি ২৭ জুন ২০০৬-এ সংগ্রহ করা হয় নকুলবাবুর কাছ থেকে।

নকুল মল্লিক : নমস্কার সতীশবাবু শরীর কেমন আছে ?

সতীশ মণ্ডল : ভালো আছি ভাই, নমস্কার।

ন ম : আপনার কথা তো অনেক শুনেছি, সাক্ষাৎ পাইনি। আমাদের দুর্ভাগ্য এতদিন, আমরা শুনেছি যে মরিচঝাঁপির এই আন্দোলনের মূল পুরোধা আপনি। আপনার মুখ থেকে একটু জানতে ইচ্ছা করে এই মরিচঝাঁপির চিন্তা আপনি কবে থেকে শুরু করেছিলেন ?

স ম : ১৯৭৪-এ সময় মুখার্জী আমাদের মানা ক্যাম্পে যেয়ে জেনারেল মিটিং করেন, সেই মিটিং-এ সময় মুখার্জীর সামনে আমাদের বাংলার বাইরের যে সমস্ত অসুবিধা তার সামনে তুলে ধরি, জনসাধারণ এই মরিচঝাঁপির কথা সুন্দরবনের কথা তাঁরা ঐ সময় মুখার্জীর সামনেই রেখেছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন যে আমরা তো ভাই ক্ষমতায় না, আমরা তো লড়ছি, তোমরাও লড়ো, যদি আমরা কোনো সময় পাওয়ারে আসি, তখন এই তোমাদের ডিমান্ড আমরা চেষ্টা করব।

ন ম : আপনারা মানা ক্যাম্প ছেড়ে মরিচঝাঁপি আসার চিন্তা করলেন কেন, সেখানে কি অসুবিধা হচ্ছিল আপনাদের ?

স ম : সেখানে সরকার যে সমস্ত জমি জায়গা দিয়েছে তাতে কোনো ফসল হয় না। দ্বিতীয়ত সরকারকে আমরা বারংবার সমস্ত কষ্টের কথা জানাবার সত্ত্বেও সরকার আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। তারপর সেখানে আমরা ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে সরকারকে

বহুবার বলেছি যে আমাদের পুনর্বাসন ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে দেওয়া হোক, তারা সেই সমস্ত না দিয়ে ঐ মোরামের উপর ৫ একর করে জমি দিয়ে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন, তাতে কোনো ফসল হয়নি এবং আদিবাসীর যে সমস্ত অত্যাচার, সে অত্যাচারগুলো কোর্ট, কাছারি, থানায় কোনো সুবিধাজনক আমাদের বিচার হয় না। আর এই সমস্ত কথা আমরা জ্যোতিবাবুকে বহুবার জানিয়েছি তার কোনো ফল পাইনি, তার ফলে আমরা শেষ পর্যন্ত বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হই।

ন ম : তো বাংলায় এসে আপনারা মরিচঝাঁপিতে কিভাবে বাঁচবেন এর কি চিন্তা করেছিলেন ?

স ম : মরিচঝাঁপিতে আমরা যে মাছ তৈরি করতাম, মাছের পরে সেখানে ধান হত, তাই দিয়ে আমরা সংসার নির্বাহ করব এই ভেবে আমরা সেখানে এসেছিলাম।

ন ম : সরকারের কোনো সহযোগিতা না নিয়েও আপনারা নিজেরা কায়ক্লেশে বাঁচতে পারতেন ?

স ম : অনায়াসেই বাঁচতে পারতাম।

ন ম : এই চিন্তায় মনে হয় এসেছিলেন আপনারা, সরকার আপনাদের সহযোগিতা করলেন না কেন, এই বিষয়ে আপনাদের কি চিন্তা ?

স ম : সরকার আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করলেন না মনে হয় তাঁরা হায়ার কাস্ট আর আমরা সিডিউল কাস্ট বলে তাঁরা আমাদের উপর ক্ষ্যাপা। আমরা এই অনুন্নত সমাজ সেইজন্য সরকার আমাদের উপর এইভাবে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

ন ম : অনুন্নত সমাজের মানুষের ঐক্য হলে সরকারের একটা ভীতির সৃষ্টি হতে পারে ? সেইজন্য সহযোগিতা করেননি। আপনাদের উপর কি ধরনের অত্যাচার হয়েছিল সেইসব কাহিনি তো অনেক কাগজে পড়েছি, আপনার মুখ থেকে শুনতে পারালে মনে হয় তৃপ্ত হতাম ?

স ম : অত্যাচার তো কোনো সীমাবদ্ধ অত্যাচার, সরকার যে অত্যাচার করেছে এই অত্যাচার আগে কোনো সময় হিন্দুস্থানে হয়েছে কিনা বলতে পারি নে, তবে আমাদের উপরে যে খাদ্যশস্য বন্ধ করে দিয়ে, সমস্ত লোক যেভাবে কষ্ট করেছে, প্ল্যান্ট-এ যারা গিয়েছিল, সরকার সেই সমস্ত মেয়েছেলে ধরে নিয়ে বাগনা-র অফিসে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেছে। নির্মম অত্যাচার করেছে। ১৩ মে আমাদের এই প্লান্টটেশান উঠে সরকার সমস্ত ধারে অত্যাচার করেছে এবং আমার ঘর ছিল যেটা, ঘরের মটকা কেটে চাল দুটো দুই ধারে নামিয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রীকে মারধোর করেছে এবং হাতের শাঁখা পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছে।

ন ম : মরিচঝাঁপি পাওয়া সম্পর্কে আপনার কোনো নতুন চিন্তা আছে ?

স ম : এটার কথা এখন বন্ধই রাখেন।

ন ম : আচ্ছা আপনার আন্দোলনের সহযোগী কে ছিলেন ?

স ম : প্রথমে ছিলেন সমর মুখার্জি, ইউ সি আর সি-র প্রেসিডেন্ট প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, তারপরে তাঁহারা আমাদের ছেড়ে যাওয়ার পরে ফরোয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষ, রাম চ্যাটার্জি, নাগপুরের জাম্বোবানরাও ধোতে তাঁহারা আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন।

ন ম : আপনাদের একটা সংগঠন আছে না...

স ম : হ্যাঁ, আমাদের সংগঠনটাই 'উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি'।

ন ম : এই সংগঠনের আপনার সহযোগী কে কে ছিলেন ?

স ম : রাইহরণ বাড়ৈ সেক্রেটারি ছিলেন, রঙ্গলাল গোলদার ক্যাশিয়ার ছিলেন, রবীন চক্রবর্তী ভাইস প্রেসিডেন্ট, যুগ্ম সম্পাদক অরবিন্দ মিস্ত্রী।

অরবিন্দ মিস্ত্রী : আমাদের আগের পরেটা ছেড়ে দিয়ে শেষটা বলছি! ৩১ জানুয়ারি গুলি করার পরেও, আমাদের ৩৮'টা মানুষকে মেরে ফেলার পরেও, ওরা যে অর্থনৈতিক ব্যারিকেড করেছিল, তোলে নি, আমাদের মধ্যে তখন দারুণ খাদ্যাভাব এমন কি পানীয় অভাব দেখা দিয়েছে। আমরা চেষ্টা করতে থাকি এই পুলিশী অবরোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। কিন্তু সরকার পক্ষ, সরকারের পুলিশ পক্ষ আমাদের চেষ্টাকে বার বার প্রতিহত করতে থাকে এবং পুলিশি শক্তিকে আরও বাড়াতে থাকে। আমাদের মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে আমাদের এই মরিচঝাঁপি দুর্গটা রক্ষা করবার জন্য রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা পাহারায় থাকি। কিন্তু খাদ্যাভাব চরমে চলে যাওয়ায় আমাদের প্রায় পুরুষ ছেলে গুলি সক্ষম— মরিচঝাঁপি থেকে বেরিয়ে চলে যায়, কলকাতা বা অন্যান্য অঞ্চলে কাজকাম করে তারা কিছু পয়সাকড়ি পাঠাতে থাকে। ১১ মে ঠিক ভোরে পুরুষ ডিউটি ছেড়ে আসবে, চৌকির ডিউটি ছেড়ে আসবে এবং মেয়েরা চৌকির ডিউটিতে যাবে এইরকম শিপ্টিং টাইমটায় চারিদিক দিয়ে পুলিশ হঠাৎ মরিচঝাঁপিতে উঠে পড়ে। তখন কিছুটা ধ্বস্তাধস্তি হয় এবং আমাদের সেই ধ্বস্তাধস্তিকে ওরা উপেক্ষা করে ঠিক যুদ্ধ করতে গেলে যতটা প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ততটা প্রস্তুতি নিয়ে ওরা উঠে। আমরা নিরস্ত্র মানুষ, আর তাছাড়া ডিউটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওরা উঠে পড়ে মাইকে নানা কথা প্রচার করতে থাকে। আমাদের জনগণ নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে, পুলিশ তার সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ওখানে বসেই পড়ে ক্যাম্প করে ইতাদি। ১৩ তারিখে ওরা অপারেশন শুরু করে। সেই অপারেশনের প্রথম ধাপ, ঘরটা কেটে দাও— এটা ভোররাত্রের দিকে এবং সকালের দিক থেকে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া শুরু হয়। সে যে কিরকমভাবে পৈশাচিকভাব, যেমন ধরুন সিগারেট খেয়ে ম্যাচের কাঠিটা ঘরে ফেলে দাও..

ন ম : যাতে আগুন ধরে যায়...

অ ম : আগুন ধরে যায়। এই যে পুলিশ ছাড়া ওদের সঙ্গে ছিল আর একদল সাধারণ মানুষ। সাধারণ বলছি তারা গভর্নমেন্টের লোক নয়, তারা দলীয় কর্মী।

ন ম : কোনো বিশেষ একটা পার্টির লোক হতে পারে...

অ ম : আমাদেরও তাই বিশ্বাস। এবং ঘরের থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে একদিকে

পিটাপিটি চলছে অন্যদিকে মেয়েছেলেদের টেনে নিয়ে যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছে, অচল অক্ষম বুড়োদের লাথি মেরে বের করে দেওয়া হচ্ছে আর যুবতী মেয়েদের কোথায় আমাদের জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। পুড়ে আছে সেই মানুষকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সত্যি দাদা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। এই যে নারকীয় অত্যাচার, এ বোধ হয়, আমার মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। যা হোক, ওরা যখন তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের, পরিজনের, পরিবারের অভিভাবক শূন্য, কারো সঙ্গে কারো দেখারও অবকাশ নেই, মেলার অবকাশ নেই, সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। আজ দুঃখের সঙ্গে বলব, আমাদেরই একটি বোন তার মা-বাবাকে হারিয়ে আজ পতিতালয়ে আছে।

ন ম : বাঁচার অন্য কোনো পথ খুঁজে পায়নি...

অ ম : বাঁচার পথ সে বেছেও নেয়নি। অনিচ্ছাকৃত। অবশ্য এখন সে মুক্তি পেতে চায়।...

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেছে তার। কোথায় তার মা, কোথায় ভাই, কোথায় তার বোন, কেউ সে জানে না।

ন ম : আপনজনেরা কেউ নেই...

অ ম : নেই। এমনি একটি নয়, আরও ঘটনা আছে। তাহলে বলুন সেই মেয়েটি বয়স তখন ১৩ থেকে ১৪। ইচ্ছাকৃতভাবে প্রস কোয়ার্টারে যায়নি।

ন ম : আপনাদের সঙ্গে সহযোগী ছিলেন যুবনেতা রাধাকান্ত বিশ্বাস। তিনি ভালো কবিতা লেখেন, তার কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। রাধাকান্তবাবু মরিচঝাঁপি নিয়ে একটি কবিতা যদি বলেন!

রাধাকান্ত:

মরিচঝাঁপির বনান্তরালে রক্ত দিয়েছ যারা
যারা লিখে গেল বেদনার ইতিহাস
তাঁদেরই স্মরণে আমার এ দীর্ঘশ্বাস।
        মৃত্যুকে করি জয়
        বলে গেল ওরা
        আমরা বাঙালি করিনি কারোকে ভয়
পাষাণ কঠিন দণ্ডক হতে
এলো ভেসে ওরা দুঃখের স্রোতে
জীবনের তরী আঘাতে আঘাতে
        হয়ে গেল বানচাল
নোনাকালো মাটি হোল আজ খাঁটি
        মৃত্যু শয্যাতল
মরিচঝাঁপির বন মর্মরে ওদের কণ্ঠ শুনে

ভাবি ওরা কি আজ যায় কাল গুনে
আজও কি ওরা রয়েছে অপেক্ষায়
বনের চিড়িয়া পূজা না পেয়ে
পাবে মানুষ সুনিশ্চয়
বাস্তুহারার মিলন গীতিতে
রিক্ত বনানী মরিচঝাঁপি
হবে কোলাহলময়
চিরবঞ্চিত বাস্তুহারার হৃদয়ের নিধি ওরা
হয়তো বা কোন দুঃখিনী মায়ের ধন
হয়তো সে মা-র পুনঃদণ্ডকে হয়েছে নির্বাসন।
বাঁচতে চেয়ে অপরাধী ওরা
ওরা যে বাস্তুহারা
বুকের আগুন শত জ্বললেও
মুখ আজ ভাষা হারা।
ওদের কথা বলেছে আজ সবাই
ইতিহাসের মরিচঝাঁপি নীরব নিথর তাই
তবু বঞ্চিত ঐ আত্মার সাথে
আমি কাল গুনে যাই।
শ্রদ্ধার সাথে প্রণাম জানাই
নব ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যারা
নীরবে তাদেরই পা-য়।

ন ম : আচ্ছা রাধাকান্তবাবু এই রকম কবিতা আপনি কতগুলো লিখেছেন ?

রা বি : এ রকম কবিতা আমি আরও অনেকেই লিখেছি। আমি বাস্তুহারা, নিজের জীবনে যে দুঃখ যে ব্যথা যে বেদনা অনুভব করেছি, তাই আমার কাব্যের আমার কবিতার উপজীব্য বিষয়।

ন ম : মরিচঝাঁপি জীবনকাব্য নিয়ে আপনার কি বড় করে কোনো গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা আছে ?

রা বি : আমার ইচ্ছা রয়েছে, আমি নিজে উদ্বাস্তু দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দণ্ডকের পাষাণ প্রান্তরে, বহির্ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে যে ব্যথা পেয়েছি, বা উদ্বাস্তু ভাইবোনদের যে ব্যথা বেদনা আমি দেখেছি, তা নিয়ে সুবৃহৎ আকারে একটা উপন্যাস রচনা করবো। যার নাম দেব : 'মুখর দণ্ডকারণ্য'। এমনি একটা পরিকল্পনা আমার মনের মধ্যে রয়েছে। তাছাড়া আমি বর্তমানে লিখে চলেছি উদ্বাস্তুদের জীবন কাহিনি নিয়ে ছোট ছোট গল্প, ছোট ছোট কবিতা, জানি না এসব কোনো দিন প্রকাশ হবে কিনা, তবে লেখার তাগিদেই আমি লিখে চলেছি।

দণ্ডকারণ্যের বাঙালি উদ্বাস্তুরা ভীষণভাবে বিশ্বাস করেছিলেন বাংলার মানুষকে, বাংলার বামফ্রন্ট সরকারকে। ১৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৭৮ রাম চ্যাটার্জি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষ দণ্ডকারণ্য ঘুরে প্রতিশ্রুতি আর আহ্বান জানানোর পর উদ্বাস্তুদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। তারা বাংলায় যাচ্ছেনই। ২২ জানুয়ারি ১৯৭৮ এ উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির পক্ষ থেকে সতীশ মণ্ডল যে আবেদন প্রচার করেন তাতে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা ফেব্রুয়ারি থেকে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। মার্চ ১৯৭৮ এ তারা মরিচঝাঁপি যাত্রা শুরু করেন। হাতে লেখা আবেদনটি প্রকাশিত হল।

সতীশ মণ্ডলের চিঠি

Office of The Udbastu Unnayansheel Samity
Mana Camp, Raipur (MP)
Pin-492015

উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি
মানা শিবির, রায়পুর
মধ্যপ্রদেশ। তাং-২২।১।৭৮

আমরা বাস্তুহারা ভাই বোন ও মায়েরা,

আপনারা জানেন যে গত ১৬।১।৭৮ তাং উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতৃত্বে প: বাংলা বামফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্র (অসামরিক প্রতিরক্ষা) বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রী রাম চ্যাটার্জি ও বামফ্রন্ট সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সম্পাদক ও ফরোয়ার্ড ব্লকের (প: বাংলা) সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী অশোক ঘোষ বর্হিবাংলায় বাঙালি উদ্বাস্তুদের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত ও স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য মানা সহ দণ্ডকারণ্য ও অন্যান্য এলাকায় পরিদর্শন আসেন।

উক্ত নেতৃবৃন্দ ১৬।১।৭৮ তাং থেকে ১৯।১।৭৮ তাং পর্যন্ত বিরামহীনভাবে

মধ্যপ্রদেশের পারুলকোট জোন, মহারাষ্ট্রের চান্দা (চন্দ্রপুর), অন্ধ্রপ্রদেশের কাগজনগর প্রভৃতি অঞ্চলের মর্মান্তিক দুঃখপূর্ণ কাহিনি স্বকর্ণে শ্রবণ করেছেন এবং হৃদয়বিদায়ক করুণ অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন এবং চারটি জনসভায় তাঁদের উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রেখে ১৯।১।৭৮ তাং বোম্বে হাওড়া মেল যোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

বর্ণিত জায়গার বাস্তুহারাগণ তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের দুঃখকষ্টের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সমস্ত উদ্বাস্তু উক্ত নেতৃবৃন্দের নিকট সাশ্রু নয়নে ও দীপ্ত কণ্ঠে একটি মাত্র দাবি রেখেছেন— 'এ সব জায়গায় আর একদিনও নয়। পশ্চিমবাংলায় আমাদের নিয়ে চলুন। সুন্দরবনে আমাদের বসতি দিন। এই নির্বাসন থেকে আমাদের বাঁচান, আমাদের রক্ষা করুন।'

মাননীয় শ্রীরামবাবু তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছেন— 'আমরা আপনাদের এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই এসেছি। এই অবস্থায় মানুষ বাঁচতে পারে না। এ অবস্থার পরিবর্তন আমরা করবই। পরিবর্তনের দিন আর বেশি বাকি নেই। আপনারা দলাদলি, ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে যান এবং সংঘবদ্ধভাবে এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকুন। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমরা যখন ডাকবো— তখনই আপনারা বেরিয়ে পড়বেন। আপনাদের সঙ্গে আমি অতীতে ছিলাম, বর্তমানে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।'

মাননীয় শ্রী অশোকবাবু বলেন— 'বাংলার বাইরে উদ্বাস্তুদের কংগ্রেসী রাজত্বে আনা হয়েছিল, তখন আমরা বাঁধা দিয়েছিলাম। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, সরদার প্যাটেল ও পঃ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায় আমাদের সঙ্গে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে বাংলার বাইরে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের এক জায়গায় রেখে সুষ্ঠ পুনর্বাসন দিয়ে দ্বিতীয় বাংলা গড়ে তোলা হবে। এবং বাঙালীদের শিক্ষাদীক্ষা, আচার, ব্যবহার, কৃষ্টিসংস্কৃতি ও ভাষা প্রভৃতি সমস্ত সুযোগ অবশ্যই বজায় রাখা হবে। কিন্তু এখানে এসে দেখছি সুষ্ঠু পুনর্বাসন তো হয়নি বরং সব কিছুই তার বিপরীত। উদ্বাস্তুরা অনাচারে, শোষণে, অবিচারে, সুষ্ঠ পুনর্বসতির অভাবে চরম দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। এ অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই চাই। কারণ যে কথা দিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের এখানে এনেছেন সে কথা তারা পালন করে নি। এ অন্যায় অত্যাচার আমরা সহ্য করব না। তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন— 'আমরা পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত আপনাদের সঙ্গে আছি। আপনাদের যে কোনো দুর্দিনে আমরা গর্জে উঠে আপনাদের রক্ষা করবই— এ কথার অন্যথা হবে না।' তিনি আরও বলেন— 'আপনাদের সমিতির সভাপতি সতীশবাবু, সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাবু ১৯৭৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের কাছে 'সুন্দরবন' অঞ্চলে সুষ্ঠ পুনর্বাসনের প্রস্তাব রেখেছেন— তা আমাদের কাছে আছে

নতুন পুরানো ভেদাভেদ ভুলে যেয়ে একত্রিত হন। ডাক আপনাদের আসবে, আমাদের ডাকে তখন যেন আপনারা একসঙ্গে বেরিয়ে আসেন।'

মাননীয় নেতাদের বক্তব্যানুসারে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির পক্ষ থেকে আমরাও ঐ একই আওয়াজ ঐ একই কথা বলছি। সমস্ত রেষারেষি ভুলে অন্তর্দ্বন্দ্ব ভুলে একাত্ম হন এবং নির্ভয়ে সমিতির পতাকাতলে আশ্রয় নিন, বিশ্বাস করুন এই সমিতি আপনাদের সুষ্ঠ ও সঠিক পুনর্বাসন আদায় করবেই করবে। সেদিনেরও আর বেশি বাকি নেই। আপনারা প্রস্তুত থাকুন। মুক্তি-ডাক আপনাদের আসছে। আর সেই ডাকেই নির্বাসনের কবল থেকে ছিনিয়ে আনবে আপনাদের শুভ মুক্তি।

ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

জয়হিন্দ
সতীশ মণ্ডল
সভাপতি
উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি

১৬ মে ১৯৭৯ মরিচঝাঁপির থেকে উদ্বাস্তুদের নিকেশ করা হল। বিচ্ছিন্ন উদ্বাস্তুরা ২৪০ জন স্বাক্ষর সম্বলিত এক প্রচারপত্র লিখেছিলেন ২৫ মে ১৯৭৯ তারিখে বামফ্রন্টের বর্ণময় অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। আমরা সেটি প্রকাশ করলাম।

মহাশয়,

আমরা মরিচঝাঁপির বাসিন্দা এবং সাধারণ বাঙালী নাগরিক হিসাবে আমাদের মরিচঝাঁপিতে প্রতিষ্ঠিত জীবনধারাকে সম্পূর্ণরূপে বিঘ্ন করার জন্য সরকারের গত কয়েকদিনের অমানুষিক ও নিষ্ঠুরভাবে উৎখাত করনের জন্য কার্য প্রণালীগুলি আপনাদের দ্বারা এবং মাধ্যমে প্রকৃত সুরাহার আশায় লিখে জানাইতেছি।

গত ৭ই মে সকাল ৪টা নাগাদ আমাদের নেতাজীনগরের তিন দিক থেকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী হঠাৎ নেমে পড়ে এবং দ্রুতগতিতে আমাদের স্কুলমাঠে এক জায়গায় মিলিত হয়। তারপর আমাদের নেতাজীনগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে এবং উক্ত স্কুলমাঠে তাঁবু খাটিয়ে বসে পড়ে। এবং তখন থেকেই নানাভাবে আমাদের নির্যাতন চালিয়ে যেতে থাকে। যেমন আমাদের জলের ২টি কল তারা দখল করে নেয়। স্কুলের মাঠে ছেলেদের খেলা বন্ধ করে দেয়। স্কুলের চেয়ার বেঞ্চিগুলি তারা জোর পূর্ব্বক দখল করে নেয়। এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কোন কথা বললে তারা আমাদের এই বলে শাসায় আর ৭ দিন দেরী কর তারপর দেখাচ্ছি মজা, এত লম্বা লম্বা কথা কোথায় থাকে। তারপর ১৩/৫ তারিখে তারা এক গোপন মিটিং-এ স্কুল ঘরে মিলিত হয়, তখন বিকাল প্রায় ৫টা। সন্ধ্যার পর বাজারে এবং ব্লকে ব্লকে

প্রচার করতে শুরু করে যে আগামীদিন সকাল থেকেই লঞ্চে উঠতে হবে সকলে প্রস্তুত থাকবে, কোন রকম ব্যাতিক্রম চলবে না। পিটিয়ে পিটিয়ে চামড়া উঠিয়ে দেব, হাত পা ভেঙে বেঁধে লঞ্চে উঠাব। মরিচঝাঁপিতে আজকের মতই তোমাদের শেষ, সকাল সকাল ঘুমোওগে যাও।

এরপর ১৪ তারিখ সকাল ৪টা থেকেই পুলিশ আক্রমণ আমাদের উপর চারদিক থেকেই শুরু হয়। আমরা দেখতে পাই প্রায় হাজার তিনেক পুলিশ স্থানে স্থানে দলবদ্ধভাবে হামলা শুরু করে দিয়েছে। এবং আমরা দেখতে পাই আমাদের সেচ্ছাসেবকদের ঘরগুলি পুলিশ ঘিরে ফেলে হৈহুল্লা শুরু করে। অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তারা মারপিটও শুরু করে। সকালে একজন সেচ্ছাসেবক নির্মল হালদারের হাত ভেঙে ঝুলিয়ে দিয়ে এবং এবং হীরেন অধিকারীর উপর প্রচণ্ডভাবে মারপিট করে। এইসময় একদল পুলিশ সমিতির অফিসঘর ঘিরে ফেলে আলমারির তালা ভেঙে কাগজপত্র সব ছিঁড়ে ফেলে —পরে কুড়ুল দিয়ে আলমারিগুলি টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর অফিসঘরটা কেটে কুটে তছনছ করে ফেলে। পাশেই সমিতির সভাপতি শ্রীসতীশ মণ্ডল-এর ঘরখানিও পুলিশ ভেঙে দেয়। অনেক জিনিসপত্র বিচ্ছিন্নভাবে ছুঁড়ে ফেলে এবং ভাল ভাল জিনিসগুলি লুঠ করে নিয়ে যায়। এই সময় সতীশবাবুর স্ত্রীর উনানে চাপানো ভাতের হাঁড়ি পুলিশ জোর করে ভেঙে ফেলে এবং জলের কলস লাথি মেরে ভেঙে ফেলে এবং অকথ্যভাষায় সতীশবাবুর উদ্দেশ্যে গালাগালি দেয়। এবং সতীশবাবুর স্ত্রীর হাত ধরে টানাটানি করার ফলে তার হাতের শাঁখা ভেঙে যায়। এবং তাঁর ঘরের মূল্যবান অলংকার গুলিও পুলিশ বাক্স ভেঙে নিয়ে যায়। ভয়ে ভয়ে সতীশবাবুর স্ত্রী তার ৩ মাসের বয়সের শিশুকন্যাকে নিয়ে লঞ্চে উঠতে বাধ্য হন। এরপর প্রায় ৩৬ ঘন্টা তিনি কোন খাবার বা পানীয় পাননি।

৩নং সেকটরে বিভূতি গাইনের ঘরে পুলিশ জোর হামলা করে তাকে মারধর করে ঘরে আটক করে রাখে। এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ বাড়ীর কেহই কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় পায়নি। এইভাবে পুলিশ আমাদের ১৭০ জন সেচ্ছাসেবকের বন্দী করে। আমাদের জলের কলের মাথাগুলি তুলে নেয়। যাতে করে আমরা জলও না খেতে পারি। বাজারও বন্ধ করে দেয়। বাজারের মালও লুঠ করে। পুরোপুরি ভীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। বাইরের লোক যাতে তাদের অত্যাচারের কাহিনি না জানতে পারে তার জন্য খেয়া নৌকাগুলি সব বন্ধ করে দেয়। এত অত্যাচার ও সন্ত্রাস সৃষ্টির পরেও উদ্বাস্তুরা যখন মরিচঝাঁপি ছেড়ে লঞ্চে উঠতে রাজি না হওয়ায় পুলিশ লঞ্চে করে কুমিরমারির পার থেকে শত শত সি.পি.এমের গুন্ডা পার করে নিয়ে আসে। তাদের দিয়েই উদ্বাস্তুদের ঘরে আগুন দিতে শুরু

করে। এবং টেনে হিচড়ে এবং মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে লঞ্চে জোর করে উঠায়। এবং আমাদের থালা বাসন বিছানাপত্র এলোমেলোভাবে লঞ্চের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং কোন কোন ঘরে আগুন দেওয়ার সময় শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা যারা ঘরে ছিল তারা আগুনে পুড়ে যায়। যেমন কালিবালা মণ্ডল আগুনে পুড়ে দুধকুণ্ডি ক্যাম্পে বিনা চিকিৎসায় ধুকছেন। যার চিত্র আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ২৩/৫ তারিখে ছাপা হয়েছে। এবং আরও ৪জন শিশু ও ৬ জন বৃদ্ধ, ১ জন বৃদ্ধা এই অত্যাচারের শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন। যাদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এছাড়াও পুলিশি অত্যাচারের ফলে ১জন মহিলা ঝাউগাছে গলায় দড়ি দিয়ে তার কলঙ্কিত জীবন শেষ করেছে।

এরপর ২/৩ দিন ধরে লঞ্চে ছাগল ভেড়ার মত গাদাগাদি করে ২৪ ঘন্টার মত কোন পানীয় পর্যন্ত না দিয়ে হাসনাবাদ নিয়ে এসে আমাদের নামায়। এবং সেখানে কোন বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে এমনকি কোন সদ্য প্রসূতি জননীকেও জোর পূর্ব্বক পশুর মত খোলা স্থানে গাদাগাদি করে সুদীর্ঘ বার্ণপুর ও দুধকুণ্ডি ক্যাম্পে পাঠান হয়। এরফলে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র অনেকে সঙ্গে নিতে পারেনি। এবং পরিবর্গের লোকজন ইতঃস্বত্তঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কোন সংসার স্বামী হারিয়েছে, কেউ স্ত্রী হারা, কেউ পুত্র কেউবা কন্যা ইত্যাদি...। এইভাবে মরিচঝাঁপিতে পশুর অধম অসুর অত্যাচারের কাহিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই আগে থেকেই মরিচঝাঁপির ২৩শে জানুযারী থেকে অর্থনৈতিক অবরোধ সংক্রান্ত অত্যাচার গুলি চালনা ও নারী ধর্ষনের সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনাগুলি জ্ঞাত আছেন। যার জন্য আপনাদের মাধ্যমে মহামান্য উচ্চ আদালতের বিচার প্রার্থনা করা হয়েছিল এবং আদালতও খাদ্য অবরোধ সংক্রান্ত অগণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি রাজ্য সরকারকে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য সরকার পূর্বকৃত অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য কোনরূপ নম্রতা না দেখিয়ে এবং উচ্চ আদালতের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নির্লজ্জভাবে নিরীহ উদ্বাস্তুদের উপর যে জঘন্য অত্যাচার চালিয়ে গেল তার নজির ইতিহাস সৃষ্টি করিল। দুষ্ট চেঙ্গিজ খাঁ, তৈমুর লঙ, নাদির শায়ের অত্যাচারও এর কাছে হার মানে। তখন না হয় গণতন্ত্র ছিল না, কিন্তু বর্তমানে সুসভ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের উপর এইরকম অত্যাচার কি করে সম্ভব হল তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। এতদভিন্ন উচ্চ আদালতে সর্ব্বৈবভাবে জ্ঞাত করা সত্ত্বেও দুষ্কৃতকারীরা কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করে এইরকম জঘন্য অত্যাচার চালিয়ে গেল। অতএব মনে হয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আজও হয়নি। ভুয়া গণতন্ত্রের নামে দেশের লোককে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে এবং সন্ত্রাসবাদ কায়েম করা হচ্ছে। অতএব আমরা কি করে বাঁচব তার পথ দেখান।

অতএব মহামান্য আদালতের নিকট করুণ প্রার্থনা এই যে, যেভাবে আমরা বেঁচে থাকতে পারি এবং মরিচঝাঁপিতে পূনর্বসবাসের অধিকার পাইতে পারি এবং আমাদের উপর এই নারকীয় অত্যাচারের সুবিচার পাইতে পারি এবং দুবৃর্ত্তকারীদের অত্যাচারের যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা হয় তার বিহিত করিয়া সর্ব্বহারা নিপীড়িত বাঙ্গালীজাতির এক বিপুল অংশকে প্রতিষ্ঠিত করিতে আজ্ঞা হয়।

ইতি

বিনীত

স্বাক্ষরকারীবৃন্দ

১। রঙ্গলাল গোলদার ২৫/৫/৭৯

২। দেবব্রত বিশ্বাস ২৫/৫/৭৯

এবং আরও ২৩৮জন সাক্ষরকারী

১৯৪৭ এ ভারতভাগ। অর্থাৎ পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ। ভারত সরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় উদ্বাস্তু পাঞ্জাবী এবং বাঙালিদের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেদিন থেকে—তারই একটি চিত্র আমরা পেয়েছি নীতিশ বিশ্বাসের লেখা 'বাংলা ভাষা ও ভারতের সংবিধান' থেকে। সেটি সংযোজিত হল।

	কাজ	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
	১	২	৩
১.	উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৎসর	১৯৪৭	১৯৫৫-৫৬
২.	যে বৎসর কেন্দ্র রাজ্য সরকার-গুলিকে পুনর্বাসনের অবশিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করতে বলে	১৯৬০	১৯৬০
৩.	মুসলিম দেশত্যাগীদের জমির পরিমাণ যা বিনামূল্যে বণ্টন করা হয়েছে	প্রায় ৭০ লাখ একর	০
৪.	২০ হাজার টাকা মূল্যের নিচে দেশত্যাগী মুসলিমদের বাড়ির সংখ্যা (বিনামূল্যে বণ্টিত)	প্রায় ৭ লাখ	০
৫.	ক্ষতিপূরণ হিসাবে বণ্টিত দেশত্যাগী মুসলিমদের শহরের বাড়ির সংখ্যা	৩,০২,৩০০	০

	কাজ	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
	১	২	৩
৬.	ক্ষতিপূরণ হিসাবে কেন্দ্রের অনুদান	৯১ কোঃ টাঃ	০
৭.	কেন্দ্রের খরচে তৈরি বাড়ি, দোকান ইত্যাদির সংখ্যা (ক্ষতিপূরণ হিসাবে বণ্টিত)	২,২১,০০০	০
৮.	পাক সরকারের কাছে দেশ বিভাগের পূর্বে উদ্বাস্তু কনট্রাকটের সবরকমের দাবি কেন্দ্র পূরণ করেছে ?	হ্যাঁ	না
৯.	দেশ বিভাগের পূর্বে উদ্বাস্তুরা রেশনের দোকান, শস্যভাণ্ডার, মদের দোকান ইত্যাদির জন্য পাক সরকারের কাছে যেসব জামানত রেখেছিলেন, কেন্দ্র সেগুলি দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১০.	উদ্বাস্তু কনট্রাকটররা পাক সরকারের কাছে যেসব জামানত রেখেছিলেন কেন্দ্র তার দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১১.	পাক আদালতের দেওয়া জামানত এবং সরকারের কাছে দেওয়া অন্যান্য ছোটখাট জামানত কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১২.	পাক আদালতের ডিক্রি বাবদ উদ্বাস্তুদের দাবি কেন্দ্র মিটিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৩.	পাকিস্তানের প্রাপ্য উদ্বাস্তুদের বেতন, ছুটির বেতন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং জমা দেওয়া পরীক্ষার ফি কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৪.	পাকিস্তানের প্রাপ্য উদ্বাস্তু ছাত্রদের স্কলারশিপের অর্থ কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৫.	পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের যৌথ কোম্পানির সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না

	কাজ	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
	১	২	৩
১৬.	পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা যেসব ক্ষতিগ্রস্ত নোট এনেছিলেন, তার বদলে টাকা কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৭.	পাক সরকারের কর্মচারী ছিলেন যেসব উদ্বাস্তু, কেন্দ্র তাঁদের পেনসন দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
১৮.	১৯৩৫ সালে কোয়েটার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব মানুষ দেশ বিভাগের পরে ভারতে এসেছেন, কেন্দ্র তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ?	হ্যাঁ	প্রশ্ন ওঠে না
১৯.	পাক সরকারের যেসব কর্মচারী পঙ্গু হয়েছিলেন, তাঁদের পেনসন কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না
২০.	উদ্বাস্তুদের সরকারী ও আধাসরকারী অফিসে কাজ জুটিয়ে দেবার জন্য সরকারের বিশেষ দপ্তর গঠিত হয়েছে ?	হ্যাঁ	না
২১.	এইসব দফতর ও কর্মসংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে ও অন্যান্য জায়গায় চাকরি পাওয়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা	২,০২,০০ (১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত)	২০৪ (১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত)
২২.	১৯৪৭ সাল থেকে ৫ বছরের মধ্যে সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা	কয়েক লাখ	নামমাত্র (যদি থাকে)
২৩.	সুদসহ ঋণ এবং অগ্রিম হিসাবে কেন্দ্র যেসব দোকান, বাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছে তার সংখ্যা	০	কয়েক হাজার
২৪.	কেন্দ্রের খরচার হাতে কলমে শিক্ষা পাওয়া উদ্বাস্তুদের সংখ্যা	১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত ৯২ হাজার	নামমাত্র

	কাজ	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী
২৫.	নতুন শিল্প তৈরি করতে বিশেষ অগ্রাধিকারে ভিত্তিতে কেন্দ্র কাঁচামাল দিয়েছে ?	হ্যাঁ	না (এমন কি পশ্চিমবঙ্গের চালু শিল্পগুলোও তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে)
২৬.	জমি দখল করে এবং উন্নতি করে সুদসহ ঋণের বিনিময়ে কেন্দ্র কাঁচামাল দিয়েছে ?	না (দেশত্যাগী মুসলিমদের ছেড়ে যাওয়া জমির পরিমাণ ছিল প্রচুর)	হ্যাঁ (কয়েক লাখ একর)
২৭.	জমি কিনতে, বাড়ি বানাতে এবং ব্যবসায়িক ঋণ কেন্দ্র দিয়েছে ?	হ্যাঁ (তবে ক্ষতিপূরণের হিসাবে তা পরে ধরে নেওয়া হয়েছে)	হ্যাঁ (খুব অল্প সবটাই সুদসহ ঋণের বোঝা হয়ে রয়েছে)
২৮.	উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা (১৯৭০ পর্যন্ত হিসাব)	১ লাখ ৪৩ হাজার	১০ লাখ ৪৩ হাজার
২৯.	যেসব পরিবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ফেলে আসা জমি, দোকান, বাড়িঘর ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তাদের সংখ্যা	১০ লাখ ৩ হাজার মোট উদ্বাস্তু পরিবার থেকে ৬০,০০০ পরিবার বেশি	০
৩০.	দিল্লিতে উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা	৬০ হাজার	জানা নেই
৩১.	দিল্লিতে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা	৯৮ হাজার (মোট উদ্বাস্তু দাবিদার থেকে ৩৮,০০০ বেশি)	০

Manindra Narayan Majumder
Former Professor of Chemistry and
Dean, Faculty of Science,
University of Kalyani

Residence :
B-14/349, Kalyani, Nadia
Pin : 741235
Phone : (033) 2582 5104
Mobile : 94334 10306

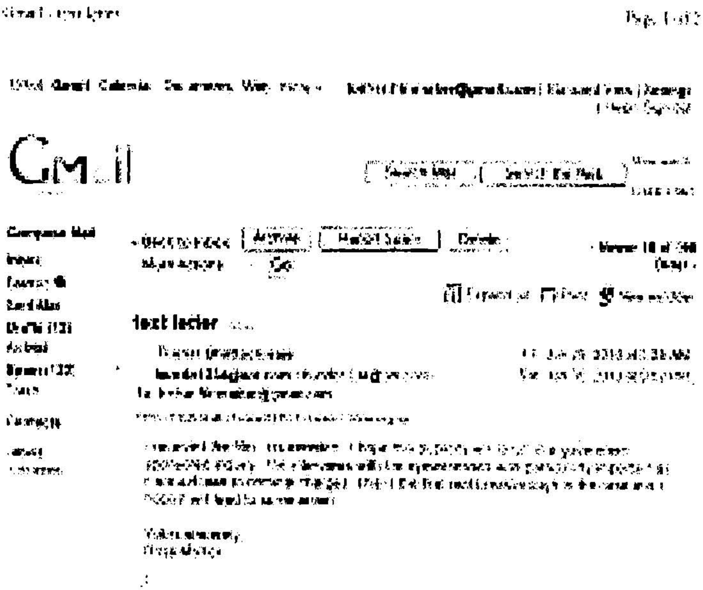
Date : 21-09-2008

শ্রী তুষার ভট্টাচার্য্য,

"মরিচ ঝাঁপি, ১৯৭৮-৭৯, আক্রান্ত মানবিকতা" শিরোনামে যে ডকুমেন্টারিটি আপনারা করেছেন তার 'সিডি' দেখে আমি গভীর ভাবে আনন্দিত, আশান্বিত ও অনুপ্রাণিত। এতে যে প্রচুর শ্রম, অর্থব্যয়, বুদ্ধি ও সাহস লেগেছে, তা আমার কাছে স্পষ্ট। কিন্তু দেশের সরকার বা বড় কোন প্রতিষ্ঠান তার স্বীকৃতি বা পুরস্কার দেবে, এমন আশা করি না। সাধারণ একজন দর্শক হিসাবে, যে উদ্বাস্তুদের সমস্যা জানে, বোঝে এবং তাঁদের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তা দেখেছে সে আপনার তথ্য চিত্রটির মর্মোপলব্ধি যথার্থই করবে। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের প্রতি যে অসম্মান, যে অবহেলা, নির্যাতন হয়েছে, তা নিয়ে এদেশের বুদ্ধিজীবিরাও আশ্চর্য উদাসীন।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সাহসী একটি ভাল কাজ করার জন্য আমি সামান্য পাঁচ হাজার টাকা আপনাকে পুরস্কার দিতে চাই। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

মণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

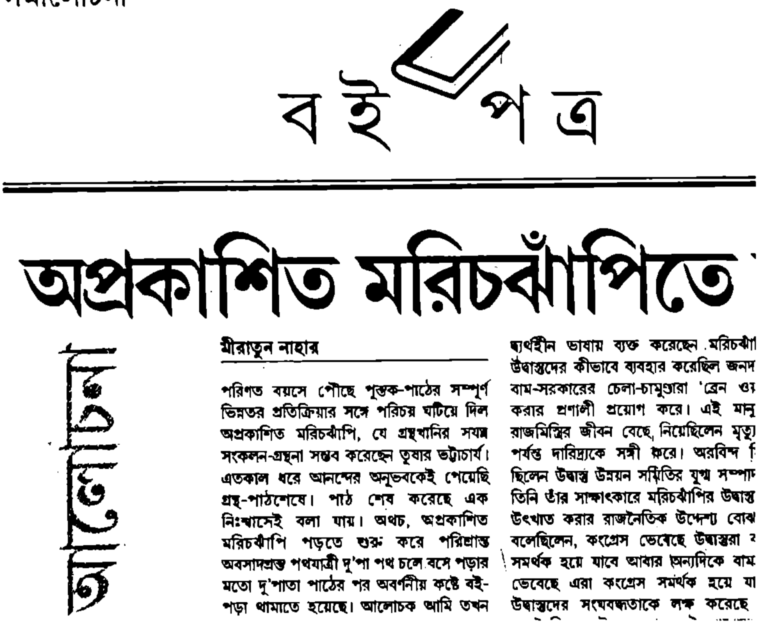


I received the film. It is excellent. I hope this publicity will result in a government sponsored inquiry. The inverviews with the eyewitnesses was particularly important as it should lead to criminal charges. This is the first real breakthrough in the case and I hope it will lead to some action.

Yours sincerely,
Ross Mallick

Marichjhanpi 1978-79 Tortured Humanity'
তথ্যচিত্র দেখার পর কানাডা থেকে রস মল্লিকের ই-মেলে পাঠানো চিঠি

সমালোচনা



বইপত্র

অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপিতে

আলোচনা

মীরাতুন নাহার

পরিণত বয়সে পৌঁছে পুস্তক-পাঠের সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিল অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, যে গ্রন্থখানির সযত্ন সংকলন-গ্রন্থনা সম্ভব করেছেন তুষার ভট্টাচার্য। এতকাল ধরে আনন্দের অনুভবকেই পেয়েছি গ্রন্থ-পাঠশেষে। পাঠ শেষ করেছে এক নিঃশ্বাসেই বলা যায়। অথচ, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি পড়তে শুরু করে পরিশ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত পথযাত্রী দু'পা পথ চলে বসে পড়ার মতো দু'পাতা পাঠের পর অবর্ণনীয় কষ্টে বই-পড়া থামাতে হয়েছে। আলোচক আমি তখন

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন .মরিচঝাঁ
উদ্বাস্তুদের কীভাবে ব্যবহার করেছিল জনদ
বাম-সরকারের চেলা-চামুণ্ডারা 'ব্রেন ওয়
করার প্রণালী প্রয়োগ করে। এই মানু
রাজমিস্ত্রির জীবন বেছে নিয়েছিলেন মৃত্যু
পর্যন্ত দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে। অরবিন্দ
ছিলেন উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির যুগ্ম সম্পা
তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু
উৎখাত করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বোঝ
বলেছিলেন, কংগ্রেস ভেবেছে উদ্বাস্তুরা
সমর্থক হয়ে যাবে আবার অন্যদিকে বাম
ভেবেছে এরা কংগ্রেস সমর্থক হয়ে যা
উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধতাকে লক্ষ করেছে

অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপিতে অসহনীয় জ্যোতি

মীরাতুন নাহার

পরিণত বয়সে পৌঁছে পুস্তক-পাঠের সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিল অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, যে গ্রন্থখানির সযত্ন সংকলন-গ্রন্থনা সম্ভব করেছেন তুষার ভট্টাচার্য। এতকাল ধরে আনন্দের অনুভবকেই পেয়েছি গ্রন্থ-পাঠশেষে। পাঠ শেষ করেছে এক নিঃশ্বাসেই বলা যায়। অথচ অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি পড়তে শুরু করে পরিশ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত পথযাত্রী দু-পা পথ চলে বসে পড়ার মতো দুপাতা পাঠের পর অবর্ণনীয় কষ্টে বই-পড়া থামাতে হয়েছে। আলোচক আমি তখন বহুদূরে। তাগাদা পেয়ে সে নড়েচড়ে বসতে চাইলেও সম্বিৎ ফির পাচ্ছে না যেন। এমন সময় গ্রন্থ-সংকলক জানালেন, মরিচঝাঁপি-কাণ্ডের উদ্বাস্তু নেতা হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়েছিলেন এমন দুজন লড়াকু মানুষ গত জানুয়ারিতে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। পবিত্রকুমার বিশ্বাস এবং অরবিন্দ মিস্ত্রী। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরা মৃত্যুপথযাত্রী হয়েছেন যথাক্রমে ২৩ জানুারি এবং ২৯ জানুয়ারি। দুজনেরই সাক্ষাৎকার গ্রন্থিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে। অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উন্মোচক সেই সাক্ষাৎকার। অসহ্য মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে রাজনীতির জগতের শাসক ও

ক্যাডার গোষ্ঠীর বাসিন্দাদের নোংরা খেলা এবং তারই পাশাপাশি কিছু ভালো মানুষদের নিরন্তর সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত হয়েছে উভয়ের সাক্ষাৎকারে। পবিত্রবাবু দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের কীভাবে ব্যবহার করেছিল জনদরদি বাম-সরকারের চোলা-চামুণ্ডারা 'ব্রেন ওয়াশ' করার প্রণালী প্রয়োগ করে। এই মানুষটি রাজমিস্ত্রির জীবন বেছে নিয়েছিলেন মৃত্যুদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে। অরবিন্দ মিস্ত্রি ছিলেন উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক। তিনি তাঁর সাক্ষাৎকারে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের উৎখাত করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বোঝাতে বলেছিলেন, কংগ্রেস ভেবেছে উদ্বাস্তুরা বাম-সমর্থক হয়ে যাবে আবার অন্যদিকে বামফ্রন্ট ভেবেছে এরা কংগ্রেস সমর্থক হয়ে যাবে। উদ্বাস্তুদের সংঘবদ্ধতাকে লক্ষ করেছে সব রাজনৈতিক দলই এবং তাদের ঐক্যকে ভাঙতে চেষ্টা করেছে প্রাণপণে। তারই পরিণতি পরিকল্পিত উৎখাত-উচ্ছেদ এবং নিষ্ঠুর নিপীড়ন। মনটা বিকল হয়েই ছিল। এই মানুষ দুজনের প্রয়াণ-সংবাদে অপরাধবোধ মনকে আরও বিবশ করে ফেলল। এ কী করলাম! কবে বইটি হাতে পেয়েছি! নিজেদের দেওয়া প্রকাশিত সাক্ষাৎকার এই দুজন মানুষ দেখে গেছেন এবং তার ওপর আলোচনা হয়েছে জানলে হয়তো একটুখানি হলেও শান্তি পেতেন মনে...'। স্নেহাস্পদ ঝিনুক ওরফে শৈলেন চক্রবর্তীর মতো নিরুচ্চারে চিৎকার করে চলেছিলাম— কেউ বলুক, এসবই মিথ্যে কাহিনি। সত্য নয়। সত্য নয়। মনের মধ্যে রক্তক্ষরণ চলছিল। কলমের কালি ঝরিয়ে লেখার উদ্যম গ্রহণ করতে পারিনি। এবার নিজেকে শক্ত করে ৪১৬ পৃষ্ঠার বিশালাকার গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করলাম। পাঠকের কাজ সমাপ্ত হল। কিন্তু আলোচকের কাজ শুরু করি কীভাবে?

গ্রন্থটিতে প্রথমেই ঘোষিত হয়েছে অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপিতে স্থান পেয়েছে কেবল দুখানি পূর্বে প্রকাশিত রচনা। অর্থাৎ, এটির নামকরণে যৌক্তিকতা রয়েছে। সংকলক দুবার লিখেছেন যে, তিনি গবেষক-সাহিত্যিক-কবি-লেখক ইত্যাদি নন; তিনি একজন তথ্যচিত্র নির্মাতা মাত্র। তাঁর এই উচ্চারণ মনে দাগ কেটেছে— পাঠক আমার মনে। তাঁর উচ্চারণে উক্ত শ্রেণিভুক্ত মানুষজনের প্রতি একটু শ্লেষ মিশ্রিত হয়েছে অথবা, তিনি বিনয়প্রকাশের জন্য এমনটি লিখেছেন একাধিকবার হতে পারে। তিনি তথ্যচিত্র নির্মাতার মতোই মূল্যবান, অতি মূল্যবান সব সাক্ষাৎকার ছবিতে নয়, ছাপার অক্ষরে তুলে ধরেছেন মরমি পাঠককুলের কাছে, গবেষকদের কাছে, সত্যান্বেষী মানুষজনের কাছে। জননায়ক হয়ে রয়ে গিয়েছেন যেন নিরবধিকাল, এমন মানুষের পরিকল্পিত শাসন এবং মারণনীতি পড়ে, জেনে— তার সমালোচনা করব কোন ভাষায়, জানা নেই! দুটি শব্দ— 'স্বাধীনতার বলি' ভাবিয়েছে গ্রন্থটি পাঠ কালে বারংবার। স্বাধীনতা পেল কারা? বলি হল কারা? কারা তাদের বলি করল? হায় স্বাধীনতা! যতবার শব্দ দুটি মনে হয়েছে মন বলছে, একেই বোধহয় বলে

Paradox of life বা জীবনের হেঁয়ালি! স্বাধীনতা! দেশভাগ! উদ্বাস্তু! সংখ্যালঘু! সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! রাজনৈতিক রেষারেষি! এসবের সঙ্গে কেমন অনায়াসে যুক্ত হয়ে যায় মানুষে মানুষে হানাহানি! শ্রমজীবী-বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-নারী, কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, বামপন্থী-ডানপন্থী— কতরকমের বিভাজননীতিও! সব ছাপিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সেই মানবিক ঘোষণা— সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই! কোথায় মানুষ! বড় হয়ে ওঠে তার অর্থ, মন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ধন, সম্পদ, জাত, পাত আরও কত কী!

আমার আলোচক মন দিশেহারা হয়ে পড়ে এভাবে। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা নিগৃহীত হয়েছিল সর্বহারাদের দরদি নেতাদের ষড়যন্ত্রে সত্তরের দশকে। সে মারণযজ্ঞের কথা তো কেউ মনে রাখেনি! অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি-র প্রস্তুতি শুরু হয় বছর পাঁচেক আগে। সারা হতে হতে আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। অপ্রকাশিত বিবৃতি, তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে ২০১০-এর অক্টোবরে। সেই বছরে অথবা সময়ে যখন ইতিহাসের নিয়মে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামক বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দেশবাসীকে জাগিয়ে দিয়ে। জাগিয়েছে জনগণ— আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, নিরস্ত্র এবং দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিত প্রাণের জনগণ। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত, সম্পন্ন শ্রেণিও যখন সজাগ হয়েছে, 'কিছু একটা করা চাই' গোছের মনোভাব নিয়ে! সেই জাগরণের ধারায় আবার তাদের সমরণে ঠাঁই পেল মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিধন ঘটল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। এই মানুষগুলির কথাও শোনা গেছে গ্রন্থ সংকলকের আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশক কিছু অভিজ্ঞতা ও ঘটনা রোমন্থনে। আমি তাঁকে সাধুবাদ জানাই যে, তিনি বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে পুস্তকপ্রেমী পাঠক-গবেষক এবং মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়ার অতিদ আয়াসসাধ্য কাজটি সম্ভব করে তুলেছেন। উদ্বাস্তুরা নিগৃহীত হয়েছিল যাদের হাতে তেমন দুজন ভাড়া করা দুষ্কৃতির সাক্ষাৎকারও তিনি গ্রন্থভুক্ত 'করতে পেরেছেন। এই গ্রন্থটি পাঠশেষে মনের মধ্যে বেজে উঠেছে গ্রন্থখানির প্রথমেই উচ্চারিত একটি বাক্য মর্মন্তুদ ধ্বনির মতো কেমনভাবে সাজালে বইয়ের সৌন্দর্য বাড়বে!' মানুষের প্রতি মানুষের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারের প্রমাণপত্রস্বরূপ এমন গ্রন্থেরও রূপসজ্জার কথা ভাবতে হয়? জিজ্ঞাসায় আর্ত হল অন্তর। আরও কিছু প্রশ্ন তীক্ষ্ণ মুখে শাসাতে থাকে আমার আলোচক মনকে:

১. এমন নৃশংস অমানবিক ঘটনার মূল নায়ক মানুষটি। এরপরেও সুদীর্ঘ সম কালব্যাপী জননায়ক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থেকে গেলেন কীভাবে?

২. তেমন না হলেও প্রায় তেমনই অন্তত আপাত-হুঙ্কারে, এমন জননায়কের শাসনকালে আবারও ঘটল জন-দমন-পীড়নকাণ্ড পুলিশ ও অনুচর সহায়তায়— একই রাজ্যে?

৩. শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ভূমিকা তাহলে কি নেহাতই দেখেও না দেখার ভানকারীর ?

৪. জনগণই, দেখা যায়, বিক্ষোভ-আন্দোলনে প্রাণ-মান-সম্মান সবই বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসে— তবুও তারা সাধারণই থেকে যায় ?

৫. দ্বিচারীর ভূমিকায় শিক্ষিত সুবিধাভোগী মানুষদের অগ্রগামিতা বিস্ময়কর। তবুও তারাই উপরের তলার বাসিন্দা থেকে দিব্যি অভিনয় করে যায় ভণ্ডামির। এদের জন্য কী ধরনের শাস্তি নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ? কেউ কেন সে প্রশ্ন তোলে না ?

৬. প্রথিতযশা কিছু ব্যক্তিত্বকেও খোলামনে কথা বলতে দ্বিধান্বিত দেখা গিয়েছে। কেন এমন দ্বিধা ? শঙ্কা ?

৭. এককালের জনপ্রিয় নেতা কাশীকান্ত মৈত্র মহাশয়ের ভূমিকা ও কষ্ট স্বীকারের 'বাস্তব কাহিনী' আবারও পড়ে আশার মুখ দেখেছি প্রবল নৈরাশ্যের ঝড়ে বিধ্বস্ত অবস্থায়। খুব কাছের করে পাওয়া কিছু ব্যক্তিত্বদের অসহায় উদ্বাস্তুদের উপকার সাধনে যথাযথ ভূমিকা নেওয়ার তথ্য জেনে বিষণ্ণ মনকে চাঙা করেছি। প্রশ্ন জেগেছে মনে: আঁধার ঘনিয়ে তোলে যারা তারা এমন আলো-জাগানো প্রাণগুলির জন্যই কি প্রস্তুত করে দেয় কর্মক্ষেত্র ?

এর আগে নকুল মল্লিকের 'ক্ষমা নেই' পড়ে কষ্ট পেয়েছিলাম। তুষার ভট্টাচার্য মহাশয় ও নিষ্ঠুর বাস্তবকে সাক্ষ্যসাবুদ-সহ হাজির করেছেন পাঠক-গবেষক দরবারে। আমি সমৃদ্ধ হয়েছি (খারাপ লাগছে বলতে) বহু তথ্য জানতে পেরে। আমার বিশ্বাস, গবেষকরা উপকৃত হবেন এই গ্রন্থপাঠে বহুল মাত্রায়। প্রচলিত রীতিতে এই গ্রন্থের আলোচনা যেমন হওয়ার কথা তা করা সম্ভব হল না আমার পক্ষে। কেবল আরেকটি কথা বলে শেষ করি। এই গ্রন্থ বহু না-জানা তথ্য প্রকাশ করে যেমন সার্থকনামা হয়েছে তেমনই একটি কেবলই আড়ালে চলে যাওয়া সত্যকে তুলে ধরেছে পাঠকসমীপে। সেটি হল, কেবলমাত্র শাসন-শোষণ এবং ক্ষমতা দখলই লক্ষ্য যাদের সেই রাজনীতির সাধকরা জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে প্রবল শক্তিধর শত্রু অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিসাধক বলে গণ্য করে এবং সেই শক্তির মোকাবিলায় সমস্ত শুভবুদ্ধিকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু উৎখাত সাধন বামশাসকদের দ্বারা সংঘটিত তেমনই একটি কাণ্ড। যথাযথরূপে সেই কাণ্ডকে তুলে ধরার জন্য তুষার ভট্টাচার্য ধন্যবাদার্হ।

অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি— সংকলন-গ্রন্থনা: তুষার ভট্টাচার্য
প্রাত্যহিক খবর: রবিবার, ২৭ মার্চ ২০১২

জন

মরিচঝাঁপির নথি হারায়

৬ নভেম্বর 'বর্তমান' পত্রিকার
ষ্ঠায় 'নথি নেই, মরিচঝাঁপি
ন্ত অথৈ জলে'—শিরোনামে
ংবাদ বেরিয়েছে।
র পশ্চিমবঙ্গ ও দণ্ডকারণ্যে
থাকা মরিচঝাঁপির বহু উদ্বাস্তু
রে হতাশা ব্যক্ত করেছেন।
দপ্তর থেকে 'নথি' হারিয়ে
অস্বাভাবিক হলেও এটাই
ভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে
কোনও সরকারের আমলে
। এবং মানবতা বিরোধী' ঘটনা

' না হয় খোয়া গেল। কিন্তু
গী সাক্ষীরা, আমলা, পুলিশ
র, বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে
পি অপারেশনে যিনি নেতৃত্ব
লেন, অভিভক্ত ২৪ পরগনা
এস পি অমিয়কুমার সামন্ত

মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতারা। ২০১১-র ২০ জুন মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করে আমলাদের জানান, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। গত বছর ২৩ জুন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে আমি মহাকরণে বিভাগীয় মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনজন উদ্বাস্তু নেতাও আমার সঙ্গে ছিলেন। উপেনবাবু আমার পূর্ব পরিচিত। মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করার সময় উনি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। মরিচঝাঁপির উপর উপেনবাবুর একটি ওয়েবসাইটও আছে। ওঁরা উদ্বাস্তু পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা জানতে চাইলেন। জানালাম, আড়াই-তি

মরিচঝাঁপির নথি হারায়নি, দরকার শুধু সদিচ্ছা

তুষার ভট্টাচার্য

গত ২৬ নভেম্বর 'বর্তমান' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'নথি নেই, মরিচঝাঁপি নিয়ে তদন্ত অথৈ জলে'— শিরোনামে একটি সংবাদ বেরিয়েছে।

এর পর পশ্চিমবঙ্গ ও দণ্ডকারণ্যে ছড়িয়ে থাকা মরিচঝাঁপির বহু উদ্বাস্তু ফোন করে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। সরকারি দপ্তর থেকে 'নথি' হারিয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক হলেও এটাই এখন স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে যখন কোনো সরকারের আমলে 'গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী' ঘটনা ঘটে!

'নথি' না হয় খোয়া গেল। কিন্তু ভুক্তভোগী সাক্ষীরা, আমলা, পুলিশ অফিসার, বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপি অপারেশনে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার এস পি অমিয়কুমার সামন্ত আজও বেঁচে আছেন। তাঁদের সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই। অমিয়কুমার সামন্ত তাঁর মরিচঝাঁপি নিয়ে অনেক লেখায় বিভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন। আমাকেও উনি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় জানিয়েছিলেন, ওই সময়কার সব সরকারি কাগজপত্রের কপি তাঁর কাছে আছে। এর পর আছেন কুমিরমারি দ্বীপের গণহত্যার

প্রত্যক্ষদর্শীরা। আছে মরিচঝাঁপি এলাকার বন দপ্তর, বি ডি ও, এস ডি ও-র দপ্তর। ওই সময় এদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। মরিচঝাঁপি নিয়ে বিধানসভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একাধিক বিবৃতিওতো উধাও হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে নথি হারিয়ে যাওয়ার কথা উঠছে কেন?

'তদন্ত' নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্যোগ' থাকলেও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের সদিচ্ছা কতখানি? এর উপরেই তো আগে একটা তদন্ত কমিশন বসানো উচিত।

একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত কমিশন ঘোষণা করার পরই আইনমন্ত্রী মরিচঝাঁপির উপর লেখা আমার বই এবং তথ্যচিত্র সংগ্রহ করেন। আমার সংগ্রহে যেসব তথ্য আছে, তা দিয়ে তদন্তে সহযোগিতা করার আশ্বাসও দিয়েছিলাম। সরকার পরিবর্তনের পর পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে থাকা মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের নিয়ে আর একটি খেলা এই সরকারের আমলেই ঘটেছে। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নেতারা। ২০১১-র ২০ জুন মুখ্যমন্ত্রী মিটিং করে আমলাদের জানান, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। গত বছর ২৩ জুন উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে আমি মহাকরণে বিভাগীয় মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর ও অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনজন উদ্বাস্তু নেতাও আমার সঙ্গে ছিলেন। উপেনবাবু আমার পূর্ব পরিচিত। মরিচঝাঁপি নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করার সময় উনি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। মরিচঝাঁপির উপর উপেনবাবুর একটি ওয়েবসাইটও আছে। ওঁরা উদ্বাস্তু পরিবারের আনুমানিক সংখ্যা জানতে চাইলেন। জানালাম, আড়াই-তিন হাজারের বেশি হবে না। মন্ত্রীরা জানালেন, সরকারের কাছে যে খাস জমি আছ, তাতে এই পরিবারগুলিকে পুনর্বাসন দেওয়ার সমস্যা হবে না। পরিবারগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হল। মঞ্জুলবাবু আমার লেখা বই ও তথ্যচিত্রের সিডি পাঠাতে বললেন। পাঠিয়ে তার প্রাপ্তি স্বীকারও পেলাম। উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করাটা সহজ ছিল না। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েই তালিকা প্রস্তুত করা হল। প্রথম দফায় ৬৭৫ জনের একটি তালিকা জেলা শাসকের দপ্তর থেকে মহাকরণে পাঠানো হয় (Memo No. c/390/ L&L. R(N) Dated 29 Aug. 2011)। গত ২৭ জানুয়ারি দ্বিতীয় দফায় পাঠানো হয় ৩৬৫ জনের আরও একটি তালিকা (Memo No. 767(4)/RR/BST)।

দুবার তালিকা দেওয়ার পর সরকারের তরফ থেকে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী উদ্বাস্তু নেতারা গত ছমাস যাবৎ সরকারের মন্ত্রী ও শাসক দলের নেতাদের ধরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ পাননি।

মরিচঝাঁপির গণহত্যার বিচার এবং পুনর্বাসনের আশা এবার বোধহয় পুরোটাই চাপা পড়ে গেল। অন্তত উদ্বাস্তুদের ধারণা এমনই। স্বাধীনতার বলি উদ্বাস্তুরা বলছেন, তাঁদের মতো হতভাগ্যদের কথা ভাবার লোক নেই। বাঙালি উদ্বাস্তুদের নিয়ে বার বার বিশ্বাসভঙ্গের নজির বোধহয় নজিরবিহীন! ওঁরা বিশ্বাস করেন, ওঁদের কবর দিলেও, ওঁরা ইতিহাস হয়ে আবার কবর থেকেই উঠে আসবেন।

বর্তমান, ১০ ডিসেম্বর ২০১২

মরিচঝাঁপি দ্বীপ থেকে বাঙালি উদ্বাস্তু উৎখাতের পর বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উদ্যোগ নিয়েছিলেন দণ্ডকারণ্যে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ফিরে যাননি তাদের পুনর্বাসন দিতে। বামফ্রন্ট সরকারে বাধা দানের কারণে তার উদ্যোগ সফল হয়নি।

অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি পড়াশোনা করেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, আরম্ভ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এম.এ.বি.এড. পাশ করেছেন, গড়ে তুলেছিলেন নজরুল মহাবিদ্যালয় এবং কয়েকটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মুজিবর রহমানের হত্যার পর তিনি ২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ভারতে চলে আসেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনে সামিল হন। ১৯৭৮ সালে উদ্বাস্তুদের মুখপত্র হিসেবে 'নিখিল ভারত' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। নিয়মিত অনিয়মে তার শরীর ভেঙে পড়ে। ১৯৮৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আজীবন বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রতি দায়বদ্ধ বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বহু লেখা লিখেছেন, তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত অংশ

মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে প্রয়াত উদ্বাস্তু নেতা বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৫ আগস্টের কালরাত্রির অবসানে তাঁরা দেখলেন, নিজ বাসভূমে তাঁরা পরবাসী হয়ে গেছেন, তাঁর 'শত্রু' হয়ে গেছেন। কতক চলে এলেন নতুন টানা কৃত্রিম সীমান্তরেখা পেরিয়ে, কতক রয়ে গেলেন, তাঁদের প্রতিদিন 'দুঃখের নাহিক ওর'। আর যারা সীমান্ত পেরিয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভাগ্যবান ছাড়া আর সকলেই আজ পথের ধুলোয়। কেউ মরছে রাস্তাঘাটে, রেলস্টেশনে। কাদেরও বা বহুকষ্টে গড়ে তোলা পাতার কুটির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে অবাধ অনুপ্রবেশকারী বলে। তাঁরা মরছেন দণ্ডকারণ্যে, মরিচঝাঁপিতে, আসামে, মেঘালয়ে, ত্রিপুরায়। মরছেন বিনা দোষে হাজারে হাজারে। আজ তাঁরা ভারতের বুকে 'বিদেশী'। তাঁদের জায়গা কোথায় হবে কেউ যেন তা বুঝতে পারছেন না। এই যাদের পরিণতি আজকের এই ১৫ আগস্টকে তাঁর বন্দনা করবে কী দিয়ে? ১৫ আগস্ট তাঁদের কাছে এক অভিশপ্ত কলংকময় দিন। তাই যে ভাগ্যবানেরা আজ উৎসবে মেতে উঠবেন এই হতভাগ্যরা তাতে স্বাভাবিক ভাবে যোগ দিতে পারেন না। তবে রক্তচক্ষুর ভয়ে যদি যোগ দিতে বাধ্য হন তো অন্য কথা। আমরা রাজ্যে আজো বুঝতে পারছি না (অথবা বুঝতে পারলেও সাহস করে বলতে পারছি না) কেন আমাদের নেতারা এই দেশবিভাগ

মেনে নিলেন। পৃথিবীতে যাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজকে যারা অস্ত্র ও আন্দোলনের দ্বারা পরাজিত করতে চেয়েছেন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কেন কয়েকজন গুণ্ডার কাছে নতি স্বীকার করে জাতীয়তাবাদকে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বলি দিয়ে ধর্মভিত্তিক দেশ ভাগ মেনে নিলেন? কেন তাঁরা এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন না?

সাদা ইংরাজের রাজত্বে আমাদের ভিটে ছাড়তে হয়নি, বাঙালির ও ভারতীয়ত্ব হারাতে হয়নি। আজ কালো ইংরাজের রাজত্বে, গান্ধী মহারাজের স্বাধীনতায় আমাদের তাও গেল। সেদিন ইংরাজ রাজত্বে আমাদের মাটির অধিকার কেউ কেড়ে নেয়নি। আজ শুধুই আমাদের ঘর হারাবার পালা। পূর্ববঙ্গের ঘর হারালাম, পশ্চিমবঙ্গের ঘর হারিয়ে দণ্ডকে গেলাম, আসামের, মেঘালয়ের, ত্রিপুরার বাঁধা ঘরও পুড়ে গেল, পুড়ে গেল মরিচঝাঁপির বাঁধা ঘর। ত্রিপুরায় তো আমরা ঐ উপজাতি, মরিচঝাঁপিতে আমরা হয়েছি অ-বাঘ, অ-কুমীর। কারণ কুমীর ও বাঘকে আমাদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। তাই আজ আমরা হিন্দুত্ব, বাঙালিত্ব, ভারতীয়ত্ব ও মনুষ্যত্ব হারিয়ে হয়েছি অমুসলমান জিম্মি, অনসমীয়া অ-উপজাতি, বিদেশি ও অ-মানুষ। অ-মানুষের প্রতি ব্যবহৃত সব আচরণ করা হলেও কর্তারা অনুগ্রহ করে আমাদের এখানে 'অমানুষ' বলছেন না।

তেত্রিশ বছর ধরে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা শিকার হয়েছেন এ দেশের অতি স্বার্থপর ভীরু এবং কূটচক্রী রাজনীতিকদের দাবা খেলায়। এ দেশীয় রাজনীতিকেরা উদ্বাস্তুদের নামে যা কিছু করেছেন সবই হয় নিজের তহবিল পূর্তি নয়তো গদি আঁকড়ে থাকার অথবা গদি লাভ করার একান্ত বাসনার তাগিদে। এ কারণেই বিভিন্ন সময়ে তাদের জন্য মায়া কান্না কাঁদলেও যখুনি কর্তব্যের ডাক এসেছে আমরা দেখেছি বুকভরা দরদ নিয়ে সত্যি কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়াননি।

দেশভাগের কারণে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে এসেছিল, তাদের কোনোমতেই রাষ্ট্রহীন বা বেনাগরিক বলে আখ্যা দেওয়া চলবে না। নাগরিকপত্র নেই বলে 'টেক্‌নিক্যালী নকআউট' তো করা চলবেই না। কারণ, দেশ বিভাগের আগে এবং বিশেষ করে পরে, ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দেশভাগের কারণে যারা ভিটে ছেড়ে আসবেন তাদের জন্য ভারতের দুয়ার চিরকালই খোলা থাকবে। আজ সাধারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষ নাগরিকপত্র যোগাড় করতে পারেননি বলে তাঁরা ভোটাধিকার সহ সমস্ত নাগরিক-অধিকার বঞ্চিত রাষ্ট্রহীন মানুষ হয়ে যাবেন? তা কখনো হতে পারে না। এটা রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদেরও পরিপন্থী।

নাগরিকত্ব যদি কাউকে হারাতে হয়, তাদেরই হারানো উচিত যারা ক্ষমতার মোহে ইংরাজের শূন্য গদিতে বসার জন্য উন্মাদ হয়ে দেশবিভাগের মতো একটি নারকীয় ব্যাপারকে স্বীকার করে নিয়ে কোটি কোটি মানুষকে ভিটেছাড়া করায়, লক্ষ লক্ষ মানুষকে পৈশাচিক দাঙ্গায় ও পথে ঘাটে অকালে অসহায় মৃত্যুবরণ করায়।

The Hit
LINE
SUNDAY • JANUARY 10 • 2010 • NAGPUR • T

After 60 years of sea
angladeshi refugees

ie journey that began in 1947
10 migrated to India to save t
e right direction. On January
ace right in the heart of our O

ankaj Kumar

SANDS of people from
he country, still referred as
leshi refugees, enthusiasti-
rted gathering in the Orange
on Friday evening. It was
y for them. For they have

Gharami (
(Gadchiroli
ers. The sp
topics like
the refugee
lems of a s
tion of righ
"Probler

जयसंतरी मंदिर प्रांगण में हुआ विराट बंगाली स

'हर कुर्बानी देने त

पीलीभीत। हिन्दुस्तान संवाद

निखिल भारत बंगाली उद्वास्तु समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुबोध विश्वास ने कहा कि प्रदेश में जन्मे बच्चे को यहां की नागरिकता मिलनी चाहिए चाहे वह किसी जाति अथवा धर्म का हो। परंतु बंगाली समुदाय के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाली जागरूक होकर एक जुट हो चुका है और अपने हक को पाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है।

मां जयसंतरी देवी मंदिर प्रांगण मे



मां जयसंतरी देवी मंदिर प्रांगण में आयोजित बंगाली

দৈনিক
যুগশঙ্খ

নাগরিকত্বের
সরকারকে চাপ

'সেন্টিমেন্ট' টানতে মঞ্চে থেকে



জনমত

মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিচ
আগামীতে ভোটের অঙ্ক

যুগ্মসচিব বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার পর সরকারে

মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। গেলেই মতুয়া। যাঁরা বীণাপাণিদেবী তথা চলেন। এই মতুয়া ... করে রেখেছেন

প্রাক্তন যুগ্মসচিব বিস্তারিত তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার পর সরকারের তরফে কোনও রকম বাহানা ও গাফিলতি করা চলে না। সরকার এখনও আবোল তাবোল বকলে ধরে নিতে হবে যে, এই সরকারও এত বড়

দৃশ্যের ... যানবাহন ... দারিদ্র্য ... দুর্লভ ... কথা এ ... সরকার

সংবাদ লহরি

নির্বাচনি ইস্তাহারে লিখে

ক্ষমতায় এলে
ভোটার সমস্যা

রূপকুমার দাস

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : আসন্ন লোকসভা ভোটের পর বিজেপি ক্ষমতায় এলে ডি ভোটার সহ রাজ্যের বাঙালিদের জাতীয় সমস্যার সমাধান হবে। নাগরিকত্ব নিয়ে সৃষ্টি হওয়া সমস্যা কিংবা ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকা মানুষও মুক্ত আকাশের নীচে আসবেন। ২০১৫ সালের পর রাজ্যের

থাকে। তাহ
প্রতিশ্রুতি দি
নির্বাচনি ইস্ত
করল। তাহে
নেতা-নেত্রী
২য় পৃ

জনসত্তা

'नागरिक ... हैं ... हुए

संवाद मल्लिक
कोलकाता, ५ जुलाई। नागरिकता
(संशोधन) अधिनियम, २००३, के

সহায়িকা গ্রন্থ, সাময়িক পত্রিকা, সংবাদপত্র, সাক্ষাৎকার

গ্রন্থ

- নিরঞ্জন হালদার, 'মরিচঝাঁপি' (১লা পৌষ ১৩৮৬) কোলকাতা।
- জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, 'মরিচঝাঁপি, নৈঃশব্দের অন্তরালে' (২০০২) কোলকাতা।
- শিবনাথ চৌধুরী, 'মরিচঝাঁপির কান্না' (২০০৪) কৃষ্ণনগর।
- শৈবাল গুপ্ত, 'কিছু স্মৃতি, কিছু কথা' (২০০৩) কোলকাতা।
- ভারতজ্যোতি রায়চৌধুরী, 'সাতচল্লিশ থেকে সত্তর এবং আগে পরে' (২০০৮)।
- নীতিশ বিশ্বাস, 'বাংলা ভাষা ও ভারতের সংবিধান' (২০০৫) কোলকাতা।
- অসিতবরণ ঠাকুর, 'সর্বহারার নেতৃত্বে বাঙালি উদ্বাস্তু এবং মুক্তির সমাজ দর্পণ' (২০১০) কোলকাতা।
- অতুল পাল, 'মনমানুষের খোঁজে' (২০০৫) কোলকাতা।
- কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'দেশ বিভাজনের অন্তরালে' (২০০৩) কোলকাতা।
- সন্তোষ রানা, কুমার রান্না, 'পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী' (২০০৯) কোলকাতা।
- সরোজ দত্ত, 'সরোজ দত্তের কবিতা সংগ্রহ' (১৯৮৮) কোলকাতা।
- সুকুমার মিত্র, 'সুন্দরবনের ভাঙাগড়া' (১৯৯৬) মধ্যমগ্রাম, উঃ ২৪ পরগনা।
- জয়া চ্যাটার্জি, 'বাঙলা ভাগ হল' (২০০৩) ঢাকা।
- Annu Jalis, Forest of Tigers, People, Politics & Environment in the Sunderban (2010) New Delhi.
- Sumit Sarkar, 'The Swadeshi Movement in Bengal' (1973) New Delhi.

সাময়িকী

- The Statesman, Festival 2009.
- Economic & Political Weekly, 23 April 2005.

(Dwelling on Marichjhanpi, when Tigers Became Citizen Refugees Tiger Food - by Annu Jalais)
- Asian Studies, Vol 58, Feb 1999 (Refugee Resettlement in Forest Reserves; • West Bengal Policy Reversal and the Marichjhanpi by Ross Mallick)

সংবাদপত্র

যুগান্তর, কালান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, সত্যযুগ, গণশক্তি, The Statesman.

সাক্ষাৎকার

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত (সাংবাদিক)

তথ্যানুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ : তুষার ভট্টাচার্য

e-mail : tushar.filmmaker@gmail.com

কেবল একটি দ্বীপের নাম মাত্র নয়, মরিঝঝাঁপি প্রাণ ও অধিকার হত্যার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ। মরিচঝাঁপি মানে নিরন্ন, অনিকেত মানুষের নতুন করে গড়ে তোলার লড়াই। মরিচঝাঁপি মানে প্রকৃতি ও রাষ্ট্র, এই দুই প্রবলতম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। মরিচঝাঁপি মানে আক্রান্ত মানুষের জন্য বৃহত্তর জনসমাজের বরাদ্দ হওয়া নির্বিকার নীরবতা।

এইসব টুকরোটাকরা, নীরবতার ইতিহাস, লড়াই ও পরাজয়ের অভিজ্ঞতা নিয়েই এই বই। এর নাম 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি', কারণ, মরিচঝাঁপির সম্পূর্ণ ইতিহাস এখনও অপ্রকাশিতই।

গুরুচণ্ডা৯

একটি উল্টো পাল্টা প্রতিষ্ঠান